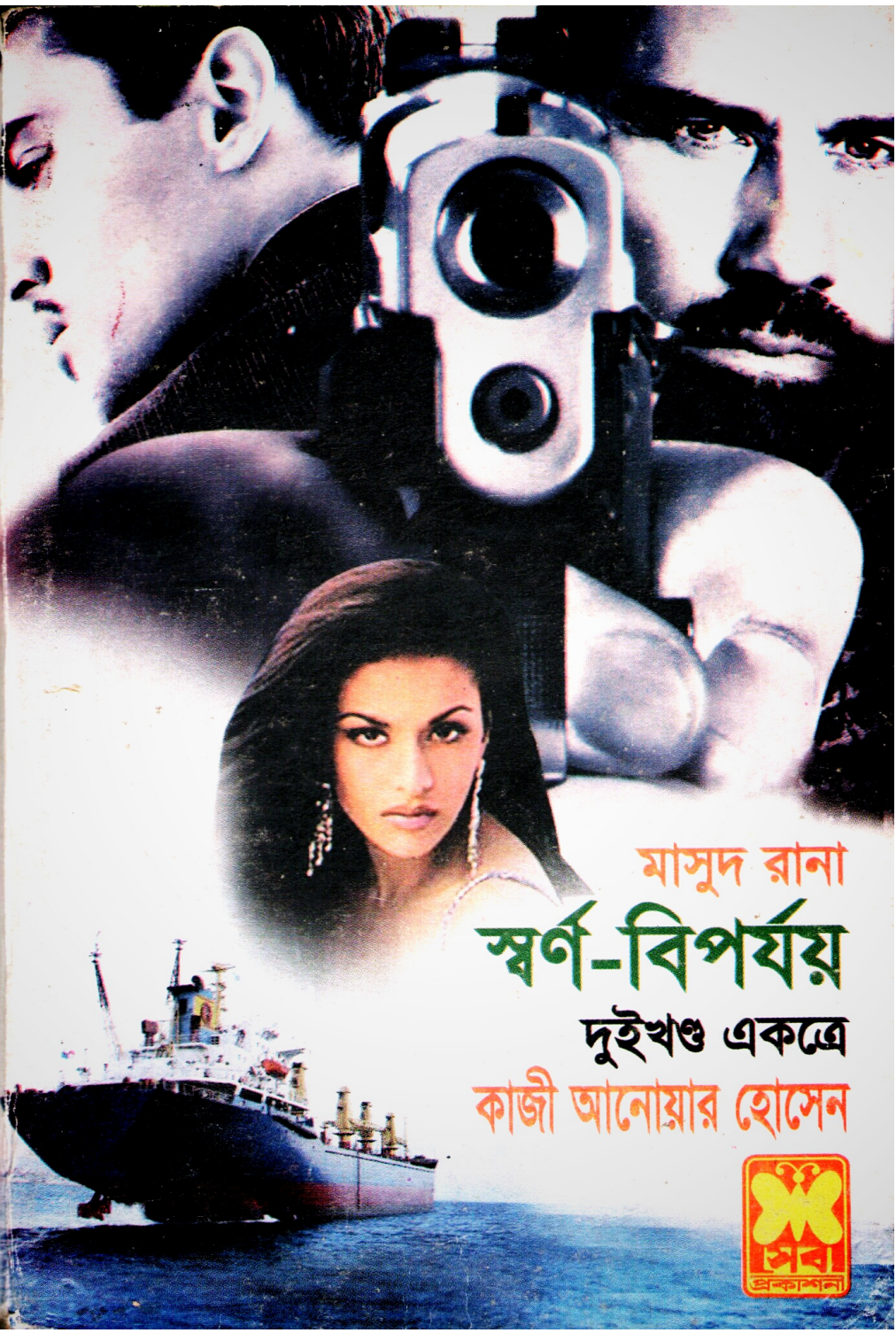

মাসুদ রানা

স্বর্ণ-বিপর্যয়

দুইখণ্ড একত্রে

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা

স্বর্ণ-বিপর্যয়

(দুইখণ্ড একত্রে)

কাজী আনোয়ার হোসেন

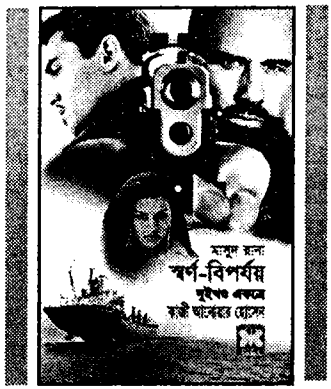

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7686-9

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ২০১১

রচনা: বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
ভিক্টর নীল

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana
SHARNO-BIPORJOY
Part I & II
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

সেবা প্রকাশনী

একাত্তর টাকা

স্বর্ণ-বিপর্যয়-১ : ৫–১৩০
স্বর্ণ-বিপর্যয়-২ : ১৩১–২৬৪

মাসুদ রানার ভলিউম

১-২-৩ ধ্বংস পাহাড়+ভারতনাট্যম+স্বর্ণমৃগ ৬৪/-
৪-৫-৬ দুঃসাহসিক+মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা+দুর্গম দুর্গ ৬৭/-
৭-৩৭২ শত্রু ভয়ঙ্কর+অরক্ষিত জলসীমা ৫৯/-
৮-৯ সাগর সঙ্গম-১,২ (একত্রে) ৩১/-
১০-১১ রানা! সাবধান!!+বিস্মরণ ৫৯/-
১২-৫৫ বুডুয়াঁপ+কুউউ ৪৯/-
১৩-১৪ নীল আতঙ্ক-১,২ (একত্রে) ৩১/-
১৫-১৬ কায়রো+মৃত্যু প্রহর ৫৮/-
১৭-১৮ গুপ্তচক্র+মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র ৩৭/-
১৯-২০ রাত্রি অন্ধকার+জাল ৪৬/-
২১-২২ অটল সিংহাসন+মৃত্যুর ঠিকানা ৩৪/-
২৩-২৪ ক্ষ্যাপা নর্তক+শয়তানের দূত ৩২/-
২৫-২৬ এখনও ষড়যন্ত্র+প্রমাণ কই ৩৩/-
২৭-২৮ বিপদজনক-১,২ (একত্রে) ৪৯/-
২৯-৩০ রক্তের রঙ-১,২ (একত্রে) ৩১/-
৩১-৩২ অদৃশ্য শত্রু+পিশাচ দ্বীপ (একত্রে) ৫৯/-
৩৩-৩৪ বিদেশী গুপ্তচর-১,২ (একত্রে) ৩৬/-
৩৫-৩৬ র‍্যাক স্পাইডার-১,২ (একত্রে) ৫১/-
৩৭-৩৮ গুপ্তহত্যা+তিনশত্রু ৩৮/-
৩৯-৪০ অকস্মাৎ সীমান্ত-১,২ (একত্রে) ৫১/-
৪১-৪৬ সতর্ক শয়তান+পাগল বৈজ্ঞানিক ৪৬/-
৪২-৪৩ নীল ছবি-১,২ (একত্রে) ৩৯/-
৪৪-৪৫ প্রবেশ নিষেধ-১,২ (একত্রে) ৩২/-
৪৭-৪৮ এসপিওনাজ-১,২ (একত্রে) ৪৯/-
৪৯-৫০ লাল পাহাড়+হৃৎকম্পন ৫২/-
৫১-৫২ প্রতিহিংসা-১,২ (একত্রে) ৩৯/-
৫৩-৫৪ হংকং সম্রাট-১,২ (একত্রে) ৪৮/-
৫৬-৫৭-৫৮ বিদায়, রানা-১,২,৩ (একত্রে) ৫৯/-
৫৯-৬০ প্রতিদ্বন্দ্বী-১,২ (একত্রে) ৩৩/-
৬১-৬২ আক্রমণ ১,২ (একত্রে) ৫০/-
৬৩-৬৪ গ্রাস-১,২ (একত্রে) ৩৭/-
৬৫-৬৬ স্বর্ণতরী-১,২ (একত্রে) ৩৮/-
৬৭-১৬১ পপি+বুমেরাং ৬০/-
৬৮-৬৯ জিপসী-১,২ (একত্রে) ৫৮/-
৭০-৭১ আমিই রানা-১,২ (একত্রে) ৬৮/-
৭২-৭৩ সেই উ সেন-১,২ (একত্রে) ৬৮/-
৭৪-৭৫ হ্যালো, সোহানা ১,২ (একত্রে) ৫৭/-
৭৬-৭৭ হাইজ্যাক-১,২ (একত্রে) ৩৮/-
৭৮-৭৯-৮০ আই লাভ ইউ, ম্যান (তিনখণ্ড একত্রে) ৯৬/-
৮১-৮২ সাগর কন্যা-১,২ (একত্রে) ৬৩/-
৮৩-৮৪ পালাবে কোথায়-১,২ (একত্রে) ৬৬/-
৮৫-৮৬ টার্গেট নাইন-১,২ (একত্রে) ৩২/-
৮৭-৮৮ বিষ নিঃশ্বাস-১,২ (একত্রে) ৫৯/-
৮৯-৯০ প্রেতাত্মা-১,২ (একত্রে) ৪৩/-
৯১-৯২ বন্দী গগল+জিম্মি ৪২/-
৯৩-৯৪ তুষার যাত্রা-১,২ (একত্রে) ৪১/-
৯৫-৯৬ স্বর্ণ সংকট-১,২ (একত্রে) ৩২/-
৯৭-৯৮ সন্ন্যাসিনী+পাশের কামরা ৪১/-
৯৯-১০০ নিরাপদ কারাগার-১,২ (একত্রে) ৩২/-
১০১-১০২ স্বর্গরাজ্য-১,২ (একত্রে) ৩৮/-
১০৩-১০৪ উদ্ধার-১,২ (একত্রে) ৩৩/-
১০৫-১০৬ হামলা-১,২ (একত্রে) ৩১/-
১০৭-১০৮ প্রতিশোধ-১,২ (একত্রে) ৩৩/-
১০৯-১১০ মেজর রাহাত-১,২ (একত্রে) ৪০/-
১১১-১১২ লেনিনগ্রাদ-১,২ (একত্রে) ৫৯/-
১১৩-১১৪ অ্যামবুশ-১,২ (একত্রে) ৩২/-
১১৫-১১৬ আরেক বারমুডা-১,২ (একত্রে) ৩৮/-
১১৭-১১৮ বেনামী বন্দর-১,২ (একত্রে) ৫৪/-
১১৯-১২০ নকল রানা-১,২ (একত্রে) ৪৩/-
১২১-১২২ রিপোর্টার-১,২ (একত্রে) ৪৫/-
১২৩-১২৪ মরুযাত্রা-১,২ (একত্রে) ৩৮/-
১২৫-১৩১ বন্ধু+চ্যালেঞ্জ ৪৮/-
১২৬-১২৭-১২৮ সংকেত-১,২,৩ (একত্রে) ৮৮/-
১২৯-১৩০ স্পর্ধা-১,২ (একত্রে) ৩৫/-
১৩২-১৫৩ শত্রুপক্ষ+ছদ্মবেশী ৪৮/-
১৩৩-১৩৪ চারিদিকে শত্রু-১,২ (একত্রে) ৩৪/-
১৩৫-১৩৬ অগ্নিপুরুষ-১,২ (একত্রে) ৬৪/-
১৩৭-১৩৮ অন্ধকারে চিতা-১,২ (একত্রে) ৪৬/-
১৩৯-১৪০ মরণকামড়-১,২ (একত্রে) ৩৩/-
১৪১-১৪২ মরণখেলা-১,২ (একত্রে) ৪০/-
১৪৩-১৪৪ অপহরণ-১,২ (একত্রে) ৪১/-
১৪৫-১৪৬ আবার সেই দুঃস্বপ্ন-১,২ (একত্রে) ৩৩/-
১৪৭-১৪৮ বিপর্যয়-১,২ (একত্রে) ৪১/-
১৪৯-১৫০ শান্তিদূত-১,২ (একত্রে) ৪৩/-
১৫১-১৫২ শ্বেত সন্ত্রাস-১,২ (একত্রে) ৭৫/-
১৫৬-১৫৭ মৃত্যু আলিঙ্গন-১,২ (একত্রে) ৫২/-
১৫৮-১৬২ সময়সীমা মধ্যরাত+মাফিয়া ৫৯/-
১৫৯-১৬০ আবার উ সেন-১,২ (একত্রে) ৪৭/-
১৬২-১৬৫ কে কেন কিভাবে+কুচক্র ৪৭/-
১৬৩-১৬৪ মুক্ত বিহঙ্গ-১,২ (একত্রে) ৯০/-
১৬৬-১৬৭ চাই সাম্রাজ্য-১,২ (একত্রে) ৮৫/-
১৬৮-১৬৯ অনুপ্রবেশ-১,২ (একত্রে) ৪২/-
১৭০-১৭১ যাত্রা অশুভ-১,২ (একত্রে) ৪৩/-
১৭২-১৭৩ জুয়াড়ী ১,২ (একত্রে) ৩৪/-
১৭৪-১৭৫ কালো টাকা ১,২ (একত্রে) ৪৩/-
১৭৬-১৭৭ কোকেন সম্রাট ১,২ (একত্রে) ৪২/-
১৮০-১৮১ সত্যবাবা-১,২ (একত্রে) ৬১/-

১৮২-১৮৩ যাত্রীরা হুঁশিয়ার+অপারেশন চিতা ৪৩/-
১৮৪-১৮৫ আক্রমণ ৮৯-১,২ (একত্রে) ৪১/-
১৮৬-১৮৭ অশান্ত সাগর-১,২ (একত্রে) ৪২/-
১৮৮-১৮৯-১৯০ শ্বাপদ সংকুল-১,২,৩ (একত্রে) ৬৫/-
১৯১-১৯২ দংশন-১,২ (একত্রে) ৪২/-
১৯৩-১৯৪ প্রলয়সঙ্কেত-১,২ (একত্রে) ৬৫/-
৯৫-১৯৬ ব্ল্যাক ম্যাজিক-১,২ (একত্রে) ৪৫/-
১৯৭-১৯৮ তিক্ত অবকাশ-১,২ (একত্রে) ৩৭/-
১৯৯-২০০ ডাবল এজেন্ট-১,২ (একত্রে) ৩৭/-
২০১-২০২ আমি সোহানা-১,২ (একত্রে) ৫৮/-
২০৩-২০৪ অগ্নিশপথ-১,২ (একত্রে) ৩৫/-
২০৫-২০৬-২০৭ জাপানী ফ্যানাটিক-১,২,৩ (একত্রে) ৭৫/-
২০৮-২০৯ সাক্ষাৎ শয়তান-১,২ (একত্রে) ৩৮/-
২১০-২১১ গুপ্তঘাতক-১,২ (একত্রে) ৩৯/-
২১২-২১৩-২১৪ নরপিশাচ-১,২,৩ (একত্রে) ৬৭/-
২১৭-২১৮ অন্ধশিকারী১,২ (একত্রে) ৩৭/-
২১৯-২২০ দুই নম্বর-১,২ (একত্রে) ৩৬/-
২২১-২২২ কৃষ্ণপক্ষ-১,২ (একত্রে) ৩৭/-
২২৩-২২৪ কালোছায়া-১,২ (একত্রে) ৩৯/-
২২৫-২২৬ নকল বিজ্ঞানী-১,২ (একত্রে) ৩৪/-
২২৭-২২৮ বড় ক্ষুধা-১,২ (একত্রে) ৩৮/-
২২৯-২৩০ স্বর্ণদ্বীপ-১,২ (একত্রে) ৪০/-
২৩১-২৩২-২৩৩ রক্তপিপাসা-১,২,৩ (একত্রে) ৬০/-
২৩৪-২৩৫ অপচ্ছায়া-১,২ (একত্রে) ৩৬/-
২৩৬-২৩৭ ব্যর্থ মিশন-১,২ (একত্রে) ৩১/-
২৩৮-২৩৯ নীল দংশন-১,২ (একত্রে) ৩২/-
২৪০-২৪১ সাড়ীদরা ১০৫-১,২ (একত্রে) ৩৬/-
২৪২-২৪৩-২৪৪ কালপুরুষ-১,২,৩ (একত্রে) ৫৫/-
২৪৫-২৪৬ নীল বজ্র ১,২ (একত্রে) ৩২/-
২৪৯-২৫০-২৫১ কালকূট-১,২,৩ (একত্রে) ৫০/-
২৫৪-২৫৫ সবাই চলে গেছে ১,২ (একত্রে) ৩৮/-
২৫৬-২৫৭ অনন্ত যাত্রা ১,২ (একত্রে) ৩৯/-
২৬৩-২৬৪ হীরক সম্রাট ১,২ (একত্রে) ৪২/-
২৫৮-২৬৫ রক্তচোষা+সাত রাজার ধন ৪৩/-
২৫৯-২৬০-২৬১ কালো ফাইল ১,২,৩ (একত্রে) ৬৩/-
২৬৬-২৬৭-২৬৮ শেষ চাল ১,২,৩ (একত্রে) ৫৬/-
২৬৯-২৮৫ বিগব্যাঙ্ক+মাদকচক্র ৪৩/-
২৭০-২৭১ অপারেশন বসনিয়া+টার্গেট বাংলাদেশ ৩৮/-
২৭২-২৭৩ মহাপ্রলয়+যুদ্ধবাজ ৩৯/-
২৭৪-২৭৫ প্রিন্সেস হিয়া ১,২ (একত্রে) ৫২/-
২৭৬-২৯১ মৃত্যু ফাঁদ+সীমালঙ্ঘন ৪৫/-
২৭৯-২৮২ মায়ান ট্রেজার+জন্মভূমি ৫১/-
২৮০-২৮৯ ঝড়ের পূর্বাভাস+কালসাপ ৩৮/-
২৮১-২৭৭ আক্রান্ত দূতাবাস+শয়তানের ঘাঁটি ৪৬/-
২৮৩-২৮৮ দুর্গম গিরি+তুরুপের তাস ৪৭/-
২৮৪-৩১২ মরণযাত্রা+সিক্রেট এজেন্ট ৪২/-
২৮৬-২৮৭ শকুনের ছায়া ১,২ (একত্রে) ৪১/-
২৯০-২৯৩ গুডবাই, রানা+কান্তার মরু ৪৬/-
২৯২-২৯৮ রুদ্রঝড়+অগ্নিবাণ ৩৭/-
২৯৪-৩০৪ কর্কটের বিষ+সার্বিয়া চক্রান্ত ৪২/-
২৯৫-২৯৭ বোস্টন জ্বলছে+নরকের ঠিকানা ৩৩/-
২৯৬-৩০৬ শয়তানের দোসর+কিলার কোবরা ৪২/-
২৯৯-২৭৮ কুহেলি রাত+ধ্বংসের নকশা ৪৩/-
৩০০-৩০২ বিষাক্ত থাবা+মৃত্যুর হাতছানি ৪০/-
৩০১-৩৪৪ জন্মশত্রু+ক্রাইম বস ৪১/-
৩০৫-৩০৭ দুরভিসন্ধি+মৃত্যুপথের যাত্রী ৪৭/-
৩০৮-৩৪২ পালাও, রানা+অন্ধপ্রেম ৫৪/-
৩০৯-৩১০ দেশপ্রেম+রক্তলালসা ৪১/-
৩১১-৩১৪ বাঘের খাঁচা+মৃত্যুপণ ৪৭/-
৩১৫-৩১৬ চীনে সঙ্কট+গোপন শত্রু ৪৯/-
৩১৭-৩১৯ মোসাদ চক্রান্ত+বিপদসীমা ৪০/-
৩১৮-৩৪৭ চরসম্রাট+ইশকাপনের টেক্কা ৫০/-
৩২০-৩২১ মৃত্যুবীজ+জাতগোক্ষুর ৫৫/-
৩২২-৩৩৬ আঁধার ষড়যন্ত্র+অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা ৫৪/-
৩২৩-৩৫২ অন্ধ আক্রোশ+মরুকন্যা ৬২/-
৩২৪-৩২৮ অতন্ত প্রহর+অপারেশন ইজরাইল ৭৬/-
৩২৫-৩৫১ কলকতরা+দুর্গে অন্তরীণ ৪৪/-
৩২৬-৩২৭ স্বর্ণখনি ১,২ (একত্রে) ৭৬/-
৩২৯-৩৩০ শয়তানের উপাসক+হারানো মিগ ৪৬/-
৩৩১-৩৪১ ব্লাইন্ড মিশন+আরেক গডফাদার ৬১/-
৩৩২-৩৩৩ টপ সিক্রেট ১,২ (একত্রে) ৩৯/-
৩৩৪-৩৩৫ মহাবিপদ সঙ্কেত+সবুজ সঙ্কেত ৫০/-
৩৩৭-৩৩৮ গহীন অরণ্য+প্রজেক্ট X-15 ৫৯/-
৩৩৯-৩৫৩ অন্ধকারের বন্ধু+রেড ড্রাগন ৫৪/-
৩৪০-৩৪৩ আবার সোহানা+মিশন তেল আবিব ৪৮/-
৩৪৫-৩৪৬ সুমেরুর ডাক-১,২ (একত্রে) ৫৫/-
৩৪৮-৩৪৯ কালো নকশা+কালনাগিনী ৬৬/-
৩৫০-৩৫৬ বেঈমান+মাফিয়া ডন ৪৮/-
৩৫৪-৩৫৯ বিষচক্র+মৃত্যুবাণ ৫০/-
৩৫৫-৩৩১ শয়তানের দ্বীপ+বেদুঈন কন্যা ৭১/-
৩৫৭-৩৫৮ হারানো আটলান্টিস-১,২ (একত্রে) ৬২/-
৩৬০-৩৬৭ কমান্ডো মিশন+সহযোদ্ধা ৬৬/-
৩৬১-৩৬২ শেষ হাসি-১,২ (একত্রে) ৭৪/-
৩৬৩-৩৬৪ স্মাগলার+বন্দি রানা ৫৯/-
৩৬৫-৩৬৬ নাটের গুরু+আসছে সইক্রোন ৫৪/-
৩৬৮-৩৬৯ গুপ্ত সংকেত-১,২ (একত্রে) ৬৮/-
৩৭০-৩৭৬ ক্রিমিনাল+অমানুষ ৭৯/-
৩৭৩-৩৭৪ দুরন্ত ঈগল-১,২ (একত্রে) ৫৪/-
৩৭৫-৩৭৭ সর্পলতা+অখণ্ড অবসর ৭৮/-
৩৭৮-৩৭৯ স্নাইপার ১,২ (একত্রে) ৬৮/-
৩৮০-৩৮১ ক্যাসিনো আন্দামান+জলরাক্ষস ৮৯/-
৩৮৪-৩৮৮ স্বপ্নের ভালবাসা+নির্খোজ ৮১/-
৩৮৫-৩৮৬ হ্যাকার ১,২ (একত্রে) ৭৮/-
৩৮৭-৩৮৯ খুনে মাফিয়া+বুশ পাইলট ৬৭/-
৩৯০-৩৯১ অচেনা বন্দর ১,২ (একত্রে) ৮৪/-
৩৯২-৩৯৯ ব্ল্যাকমেইলার+বিপদে সোহানা ৬৪/-
৩৯৩-৩৯৪ অন্তর্ধান ১,২ (একত্রে) ৭০/-
৩৯৫-৩৯৬ ড্রাগ লর্ড+দ্বীপান্তর ৬৮/-
৩৯৭-৩৯৮ গুপ্ত আততায়ী ১,২ (একত্রে ৮৪/-
৪০০-৪০১ চাই ঐশ্বর্য ১,২ (একত্রে) ৯৪/-
৪০২-৪০৩ স্বর্ণ বিপর্যয় ১,২ (একত্রে) ৭১/-
৪০৪-৪০৫ কিল-মাস্টার+মৃত্যুর টিকেট ৭৪/-

স্বর্ণ বিপর্যয়-১

প্রথম প্রকাশ: ২০১০

এক

তাইওয়ান।

হুয়া-লিয়েন এয়ারফোর্স বেইস। রাত এগারোটা দশ। একটু আগে অজস্র হলুদ বাতি রানওয়ের দু'পাশে জ্বলে উঠেছে।

মসৃণভাবে নেমে এল বোইং-এর ফায়ার এগজেকিউটিভ জেট। ওটার চাকাগুলো রানওয়ে ছুঁতেই ভুশ করে উঠল পোড়া রাবারের ধোঁয়া। আড়াইশো গজ ছুটে থামল প্লেনটা, তারপর ঘুরে টার্মিনাল বিল্ডিঙের দিকে এগোল।

মাথার উপর দিয়ে তীক্ষ্ণ কানফাটা আওয়াজে আকাশটা চিরে দিয়ে ছুটে চলে গেল দুটো টমক্যাট ফোরটিন ফাইটার-বম্বার। এগজেকিউটিভ জেট তাইওয়ানের আকাশ-সীমায় ঢুকতেই পিছু নিয়েছিল ওরা, এখন ফিরে চলল রাজধানী তাইপের দিকে।

ফায়ার এগজেকিউটিভ জেট টার্মিনাল ভবনের সামনে এসে থামল। ওটার দিকে এগিয়ে এল কুচকুচে কালো একটা ক্যাডিলাক। বিমানের পাশে থামল ওটা। তিনজন অফিসার ক্যাডিলাক ছেড়ে নামলেন। তাঁদের পিছু নিয়ে এসেছে দুটো ফোর্ড জিপ, ওগুলো প্লেনের বিশ ফুট কাছে গিয়ে ব্রেক কষল। আটজন সৈন্য লাফিয়ে নামল। সাব-মেশিনগান হাতে প্লেনটাকে ঘিরে পজিশন নিল তারা, ককপিটের দিকে অস্ত্র তাক করা।

এইমাত্র এগজেকিউটিভ জেট নিয়ে পৌঁচেছেন মধ্যপ্রাচ্যের একটি রাষ্ট্রের কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। তাঁরা তাইওয়ানে এসেছেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা সরকারি কাজে।

প্লেনের ইঞ্জিন বন্ধ করা হয়েছে। যাত্রীদের দরজায় একটা চিড় দেখা গেল। সাদা কংক্রিটে হলুদ আলোর সরু রেখা পড়ল। দরজার দুপাশে অবস্থান নেওয়া দুই সেন্ট্রি সাব-মেশিনগান উঁচিয়ে তাকিয়ে থাকল—সবার আগে দেখতে চায় কী ঘটে।

ধীরে ধীরে নেমে এসে নীচের কংক্রিট স্পর্শ করল ডোর-লেডার। সিঁড়ির উপরের ধাপে এসে দাঁড়ালেন নিষ্ঠুর চেহারার এক দীর্ঘদেহী, পরনে জলপাই রঙা আর্মি ইউনিফর্ম, মাথায় ক্যাপ। ইনসিগনিয়া বলে দিল, তিনি একজন কর্নেল। দু'আঙুলে পুরু গোঁফে তা দিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে চারপাশটা দেখে নিলেন তিনি। মনে হলো সৈন্যদের দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে খুঁত পেয়েছেন। বিরক্ত চেহারায় নেমে এলেন সাবলীল ভঙ্গিতে।

তাঁর পিছু নিয়ে এলেন আরও দু'জন। এঁদের একজনের মাথায় মৌলভীদের গোল টুপি, গায়ে র‍্যাবাইদের জোব্বা। প্রকাণ্ড মানুষ তিনি, কুচকুচে কালো দাড়িগুলো বুক ছাড়িয়ে নাভির কাছে চলে এসেছে। তৃতীয় লোকটির পরনে দামি

WWW.DOWNLOADPDFBOOK.CO

কমপ্লিট সুট। সুদর্শন, ক্লিন শেভ্ড্।

আর্মির তিন অফিসার কর্ডনের মধ্য দিয়ে ডেলিগেটদের দিকে এগিয়ে এলেন। মুখোমুখি হয়ে উচ্চপদস্থ অফিসারটি তাইওয়ানিজ ভাষায় অতিথিদের উদ্দেশ্যে কিছু বললেন, তারপর বাঁ পাশের অফিসারের জন্য একটু অপেক্ষা করলেন।

দ্বিতীয় অফিসার দোভাষী, তিনি ইঙ্গিতে তাঁর বসের বক্তব্য জানালেন: 'কর্নেল পেরন, আপনাদেরকে স্বাগত জানাতে পেরে জেনারেল হো পিয়েং অত্যন্ত আনন্দিত। তিনি জানতে চান দীর্ঘ যাত্রায় শারীরিক কোনও অসুবিধা আপনাদের হয়েছে কি না।'

ইজরায়েল স্ট্র্যাটেজিক মিসাইল ফোর্সেস-এর ডেপুটি ডিরেক্টর কর্নেল হাউয়াজি পেরন বললেন, 'জেনারেল পিয়েং নিজে কষ্ট করে এসেছেন বলে ধন্যবাদ। না, পথে কোনও সমস্যা হয়নি।'

জেনারেল হো পিয়েং দোভাষীর বক্তব্য শুনে মাথা দোলালেন। তাঁকে বড় একটা হাঁ করতে দেখে হাউয়াজি তাড়াতাড়ি করে জানালেন, 'আমাদের মাতৃভাষায় আপনাদের দখল আছে, সেটা আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের বিষয়, তবে ইংরেজিতে আলাপ করলে বোধহয় দু'পক্ষেরই সুবিধে হবে। আমি শুনেছি জেনারেল পিয়েং চমৎকার ইংরেজি বলতে পারেন।'

দোভাষীর কথা শেষ হতেই বারকয়েক চোখ পিটপিট করলেন জেনারেল, তারপর অশুদ্ধ উচ্চারণে ইংরেজিতে বললেন, 'কর্নেল, আমি ইংরেজি ভাষা অনেক ইংরেজের চেয়ে ভাল জানি। ফ্রেঞ্চ, ল্যাটিন, স্প্যানিশ আর ইতালিয়ানোয়েও আমার দখল আছে।'

'অত্যন্ত আনন্দের কথা। অবশ্য ওগুলো আমিও জানি,' দ্রুত বললেন হাউয়াজি। বোঝা গেল ডেলিগেটদের নিয়ম অনুযায়ী কথায় হারতে রাজি নন তিনি। বিশেষ করে যখন কারও কাছে মাথা নত করতে হবে না।

জেনারেল পিয়েং হাসি হাসি চেহারা করলেন, তবে মুখ কালো হয়ে গেল। অন্য কেউ ওঁর সমান হয়ে যাবে তা মানতে কষ্ট হচ্ছে তাঁর। বললেন, 'নিশ্চয়ই আপনি সরকারি কাজে বিভিন্ন দেশে গেছেন?'

'বহুবার, জেনারেল।'

'আমিও,' বললেন জেনারেল। 'বিশেষ করে বারবার চায়নায় গেছি। ওরা আমাদের ভয় পায়। ওরা জানে বেশি বাড়াবাড়ি করলে ওদের কী সর্বনাশ হবে।'

'তা তো বটেই,' মুখে বললেন কর্নেল হাউয়াজি; মনে মনে বললেন: সারা দুনিয়া জানে, খুঁটির জোরে পাঁঠা কোঁদে, তোমরাও মাটিতে ক্ষুর দাপাও মার্কিন খুঁটির জোরে।

'আপনাদের জন্যে ট্র্যান্সপোর্টেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে,' বললেন পিয়েং। 'ইস্ট কোস্ট-এর নান-আও নেভাল বেইস-এ যাব আমরা। ...আপনাদের পাইলটরা হুয়া-লিয়েন এয়ারফোর্স বেইস-এই অফিসার্স মেসে থাকতে পারবে।'

'আমন্ত্রণের জন্যে ধন্যবাদ,' বললেন হাউয়াজি, গোঁফে আলতো করে তা দিলেন। 'পাইলটদের উপর ফিরে যাবার নির্দেশ আছে। আসার সময় তাদের

একজন ঘুমিয়েছে, এখন আপনারা রিফুয়েলিঙের ব্যবস্থা করলে উপকৃত হব।'

জেনারেল শ্রাগ করলেন। 'বেশ, আপনি যা বলেন।' ঘাড় ফিরিয়ে অধস্তন অফিসারকে নির্দেশ দিলেন। সে আবার নির্দেশ দিল সিকিউরিটি ডিটেইলের-এর হেডকে। লোকটা অকিটকি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

ততক্ষণে কর্নেল পেরনের দাড়িওয়ালা সঙ্গী তাঁর ব্যাগেজ নামিয়ে ফেলেছেন। দূরে একটা ফিউল ট্যাঙ্কার দেখা গেল। ট্রাকটা প্লেনের পাশে এসে থামল। কর্মীরা হোস পাইপের রোল খুলতে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

জেনারেলের চোখে অন্তহীন চোখ রাখলেন কর্নেল। 'আমাদের টেকনিক্যাল এক্সপার্ট আর্নেস্ট ফ্রয়েশম্যান জাহাজের সঙ্গে যাবেন না, ফিরবেন পাইলটদের সঙ্গে। তিনি রওনা হওয়ার আগে পিস-কিপারগুলো পরীক্ষা করবেন। লঞ্চারগুলোও দেখবেন।'

কমপ্লিট সুট আস্তে মাথা দোলালেন।

জেনারেল পিয়েঙের চেহারায় কোনও ছাপ পড়ল না, তবে বোঝা গেল তিনি চান না ইজরায়েলি জাহাজ নিয়ে ওখানে দেরি করা হোক। বললেন, 'আপনারা তো সাগরে গিয়ে যত খুশি পরীক্ষা করতে পারবেন।' আবারও বললেন, 'চিন্তা করবেন না, ওগুলো আপনাদের জাহাজে তুলে দেয়া হবে।'

হাউয়াজি মাথা নাড়লেন। 'ফ্রয়েশম্যান জাহাজে উঠলে অসুস্থ হয়ে পড়ে, তখন কেবিন ছেড়ে বেরোতে পারে না। কাজেই ও বিমানে ফিরবে। মিসাইলগুলো এখনই দেখতে চায়।'

জেনারেল পিয়েং ঠাণ্ডা স্বরে বললেন, 'ভাবতে অবাক লাগছে যে সাগর-পথে মিসাইল যাবে, অথচ সঙ্গে এক্সপার্ট থাকবে না! জানতে ইচ্ছে করে এরকম এক অসুস্থ লোককে কেন পাঠানো হলো।'

কর্নেল পেরনের চোখের কোণ কুঁচকে গেল। ইজরায়েল দু'হাজার ছয়শো মিলিয়ন ডলার খরচ করছে, টাকাগুলো যাচ্ছে আমেরিকার পেটে। মিসাইল ও বোমাগুলো ইজরায়েল ঠিকমত বুঝে নেবে না? এই তাইওয়ানি জেনারেলের কোনও প্রশ্ন তোলার অধিকার নেই। আড়ষ্ট স্বরে বললেন পেরন, 'ও মিসাইল চেনে বলেই ওকে পাঠানো হয়েছে, জেনারেল। ওর ব্যাপারে আপনার চিন্তা না করলেও চলবে। মিসাইলগুলো পরীক্ষা করতে পাঠানো হয়েছে ওকে। ইজরায়েলি জাহাজ সকালে ছাড়া হবে।'

স্বয়ং প্রেসিডেন্ট নির্দেশ দিয়েছেন, ইজরায়েলি ডেলিগেশন বিদায় হওয়া পর্যন্ত তাঁকে ওদের সঙ্গে থাকতে হবে। জেনারেল ঠিক করলেন, তাঁর স্ত্রীকে ফোন করে বলে দেবেন, কাল বিকেলের আগে তাইপে-তে ফিরতে পারছেন না। আফসোস করে ভাবলেন, আজ রাতে নতুন রক্ষিতা ওঁকে পেল না। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, মাঝে মাঝে দেশের জন্য এমন ত্যাগ স্বীকার করতেই হয়। বললেন, 'বেশ, কর্নেল, হার্বার মাস্টারকে জানিয়ে দেব আপনারা সকালে বন্দর ছাড়বেন। চলুন, মিস্টার ফ্রয়েশম্যান আপনাদের নতুন খেলনা দেখুন।'

জেনারেলের পিছু নিয়ে ক্যাডিলাকে উঠল তিন ইজরায়েলি। জেনারেলের সঙ্গীরা জিপে চড়ে চলে গেলেন।

www.downloadpdfbook.com

ক্যাডিলাকের ভিতরে সিগারেটের কটু গন্ধ। জেনারেল পিয়েং আরাম করে বসলেন, সিগারেটের প্যাকেট বের করে কর্নেল পেরনকে একটা সিগারেট অফার করলেন।

মাথা নাড়লেন কর্নেল। 'থ্যাঙ্ক ইউ, খাই না।'

অন্য দু'জনের দিকে তাকালেন জেনারেল। 'আপনারা?'

'নো, থ্যাঙ্কস,' মাথা নাড়লেন তাঁরা।

জেনারেলের ভাব দেখে মনে হলো তাঁর যখন সমস্যা হচ্ছে না, তখন আর কারও সমস্যা হতেই পারে না—সিগারেট ধরিয়ে ভুসভুস করে ধোঁয়া ছাড়লেন। ড্রাইভারকে আদেশ দিলেন, 'নান-আও নেভাল বেইস।'

ক্যাডিলাক টার্মিনাল ছেড়ে বেরিয়ে হুয়া লিয়েন-পেইপি হাইওয়েতে পড়ল। পনেরো মিনিট পর গাড়িটা বামে তারোকো ন্যাশনাল পার্ক রেখে প্রশান্ত মহাসাগরের পাশ দিয়ে ছুটে চলল। আকাশে বড়সড় চাঁদ উঠেছে, কালো ঢেউগুলোর মাথায় আলোর ঝিলিমিলি।

জেনারেল পিয়েং কয়েকবার আলাপ জমাতে চাইলেন, কিন্তু পারলেন না। ভাবলেন, ব্যাটা গোমরামুখো বেরসিক, থাক প্রেমিকার চিন্তায় বিভোর হয়ে।

একঘণ্টা পর নান-আও নেভাল বেজের পেরিমিটার ফেন্স দেখা গেল। ক্যাডিলাক ডানপাশের মাঝারি একটা পথে এগোল। পাঁচ মিনিট পর থামতে হলো। গার্ডরা গাড়ির নক্ষত্র-ভরা পতাকা দেখে খঠাস্ করে স্যালিউট জানাল, হুড়োহুড়ি করে গেট খুলে দিল। গাড়িটা বেইসে ঢুকল।

দু'পাশে বেশ কিছু বড় বড় মেইনটেনেন্স বিল্ডিং পড়ল, তারপর আধ কিলোমিটার পর্যন্ত একটার পর একটা জেটি। নোঙর ফেলেছে চারটে প্যাট্রল বোট আর একটা লঞ্চ। একটু দূরে একটা ডেস্ট্রয়ার—ওটার চিমনি দিয়ে সাদা ধোঁয়ার ফিতে উঠছে আকাশে।

জেনারেলের নির্দেশে বড় একটা ডেরিক পাশ কাটাল ড্রাইভার, চারশো ফুটি একটা কার্গো জাহাজের পাশে থামল।

ড্রাইভার দরজা খুলে সরে দাঁড়াল। জেনারেল পিছলে বেরিয়ে যাবেন, এমনি সময়ে কর্নেল পেরন তাঁর ইউনিফর্মের হাতায় টান দিলেন। ঘাড় ফেরালেন জেনারেল। পেরন নরম স্বরে বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ, জেনারেল।'

আন্তরিক হাসলেন জেনারেল পিয়েং। পরস্পরকে সন্দেহ করেন তাঁরা, কিন্তু এই মুহূর্তে কর্নেলকে খুব বেশি অপছন্দ হলো না তাঁর। তাঁরা এমন দুটো রাষ্ট্রের নাগরিক, যারা আমেরিকার সাহায্য না পেলে ধুলোয় মিশে যাবে। আমেরিকা এশিয়ায় নিজের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্যে তাদের ব্যবহার করছে। তাতে কী? জেনারেলের হাসিটা আরও চওড়া হলো। 'ইট ইজ নাথিং, কর্নেল।'

কর্নেল পেরন ঘড়ি দেখলেন। রাত সোয়া বারোটা। 'আমরা কখন আপনাদের জাহাজে উঠছি, জেনারেল?'

একটু দূরের জাহাজটা দেখিয়ে দিলেন জেনারেল পিয়েং। 'এটাই দি আফ্রিকান স্টার। জিনিস এটাতে এসেছে।'

'এদিকের জোয়ার-ভাটা কেমন?' জানতে চাইলেন কর্নেল।

শ্রাগ করলেন পিয়েং। 'নান-আওয়ে জোয়ার-ভাটা খুব মৃদু, আপনাদের জাহাজ এলেই মাল তুলে দেয়া হবে। নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন, আপনাদের জিনিস ঠিক আছে।'

পথ দেখালেন তিনি। চারজনের দলটি দি আফ্রিকান স্টার-এ গিয়ে উঠল।

ইজরায়েলি ডেলিগেটদেরকে তিনটে কেবিন দেখিয়ে দেয়া হলো। টয়লেট থেকে হাত-মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে নিলেন সবাই।

পাঁচ মিনিট পর তাঁরা কর্নেল পেরনের কেবিনে জড় হলেন। আর্নেস্ট ফ্রয়েশম্যান বাঙ্কে বসে ব্রিফকেসটা পাশে রাখলেন। কেবিনে একটা মাত্র পোর্টহোল, ওটার নীচে ছোট একটা ডেস্ক, কর্নেল পেরন ওখানে বসলেন। প্রফেসর সিমন কাউচ একটা বাল্কহেডে ঠেস দিয়ে বুকে হাত বাঁধলেন, ফুঁ দিলেন দাড়িতে। এবার কর্নেল অদ্ভুত একটা কাজ করলেন—দু'আঙুলে চোখ দুটো ছুঁয়ে মাথা নাড়লেন, তারপর কান ছুঁয়ে হ্যাঁ-সূচক ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন। কেবিনের ছাদে সস্তা ব্র্যাস-এর লাইট ফিক্সচার দেখালেন তিনি, ডেস্কের উপরে লাগানো ল্যাম্পটাও।

এবার জানতে চাইলেন, 'ইন্সপেকশন শেষ করতে কতক্ষণ লাগবে তোমার, ফ্রয়েশম্যান?'

সুট-জ্যাকেটের পকেট হাতড়ালেন ফ্রয়েশম্যান, খুদে টেপ-রেকর্ডারটা বের করে প্লে বাটন টিপলেন। একটা স্বর কথা বলে উঠল। গলার আওয়াজটা আসলে কর্নেল পেরনের, তবে ডিজিটালি বদলে নেওয়া হয়েছে। ইদ্দিশ ভাষায় বলে উঠলেন, 'বড় জোর দু'ঘণ্টা, কর্নেল, তার বেশি না। মিসাইলের কাভার খুলতে একটু সময় লাগে, তবে সার্কিট দেখতে সময় লাগে না।'

কর্নেল ইতিমধ্যে তাঁর মিনি রেকর্ডার বের করে ফেলেছেন। ফ্রয়েশম্যানের বক্তব্য শেষ হতেই প্লে বাটন টিপলেন তিনি। তাঁর বক্তব্য শুরু হলো।

টেপ চলছে, চুপ করে অপেক্ষা করলেন তাঁরা। তারপর প্রফেসর সিমন কাউচ নিজের সময় আসতেই তাঁর টেপ-রেকর্ডার চালু করলেন। এই কথাগুলোও আসলে কর্নেলেরই। বুঝবার উপায় নেই যে তিনি নিজেই নাটকের একমাত্র চরিত্র।

মিসাইল নিয়ে তিনজনের আলাপ চলছে।

এবার ইজরায়েলিরা কেবিনের এক কোনায় চলে গেলেন।

বিসিআই-এর চিফ অ্যাডমিনিস্টেটর সোহেল আহমেদ ফিসফিস করে বলল, 'তুই ঠিকই বলেছিস, দুটো ছারপোকা। তাইওয়ানিজরা যথেষ্ট বিশ্বাস করছে আমাদের।'

রানা আলতো করে গোঁফটা খুলে ফেলল। ওটা একবার দেখে নিয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'আরেকটু হলে ফিনিশ হয়ে গেছিলাম!' সোহেলকে তাকাতে দেখে বলল, 'মোফিজ বিল্লাহ্ বলেছিল দারুণ আঠা বানিয়েছে, ছোকরা এটা বলেনি যে হঠাৎ করে আমাদের গোঁফ খসে পড়বে!' গ্লু-র কৌটা বের করে গোঁফে আঠা লাগিয়ে নিল ও, সাবধানে আবার লাগাল ঠোঁটের উপর। 'আর কখনও ছোকরার গোঁফে বিশ্বাস করা যাবে না।'

সেকেণ্ড লেফটেন্যান্ট আতাসির ভ্রূ কুঁচকে গেল। 'অনেকক্ষণ ধরে থুতনি চুলকাচ্ছে, বস্! ভাল করেছি দাড়িটা টাচ না করে। ওগুলো খসে পড়লে তো মহা বিপদ ঘটে যেত!'

দ্য মার্ভেল অভ গ্রিস অত্যাধুনিক জাহাজ, সেকেণ্ড লেফটেন্যান্ট আতাসিকে ওটার সিকিউরিটি ও সারভেইলান্স ডিরেক্টর পদ দেয়া হয়েছে।

পঁচিশ দিন আগে জাহাজটা হাতে পেয়েছে ওরা, তার পরদিনই বিরাট একটা অপারেশনে নেমেছে সবাই মিলে। বেশ কয়েকটা দেশের সেরা কমাণ্ডো ও স্পাই নিয়ে একটা দল গঠন করা হয়েছে। এসেছে চিনের লিউ ফু-চুং, ভারতের অনিল চ্যাটার্জি। আরও অনেকে। নেতৃত্ব দিচ্ছে বাংলাদেশের মাসুদ রানা।

'জাহাজে ফিরে বিল্লাহ্‌কে কষে ধাতানি দেব,' বলল সোহেল। 'ছোকরা ওর জাদুর দোকানে এসব কী বানাচ্ছে!' সোহেল ক্রুদের কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করে। রানার দিকে তাকাল ও। 'তোর কি মনে হয়, আরও দেরি করা উচিত?'

বাংলাদেশ নেভির লেফটেন্যান্ট কমাণ্ডার আলতাফ নাদ্‌ভী কিছুক্ষণ পর প্লেন নিয়ে উড়ে যাবে। ও আন্দাজ দশ ঘণ্টা পর আফগানিস্তানের গারদিজে এক নির্জন উপত্যকায় নামবে, চটপট সরে পড়বে। আমেরিকানরা তাদের ইহুদি বন্ধুদের খুঁজে বের করুক।

রানা বলল, 'না। আলতাফ কিছুক্ষণ পর রওনা হবে। এদিকে উর্বশী চারদিন সময় পেয়েছে, এরমধ্যে যদি বন্দরে ঢুকতে না পারে, তা হলে ধরে নিতে হবে আর আসছে না ও।'

'তাইওয়ানিজ নেভি কখনও কোনও সাবমারসিবল ধরতে পেরেছে বলে জানি না আমরা,' বলল সোহেল। 'কাজেই ধরে নেয়া যায় ও আসবে।'

মনে হলো নিজের নকল দাড়িকে শোনাল আতাসি, 'আমরা এখন আর পিছাব না।' রানার দিকে তাকাল, 'চকলেট জায়গা মত রেখে দৌড়?'

মাথা দোলাল রানা, 'যত দ্রুত সম্ভব।'

উর্বশী দাশা ওদের সরিয়ে নিতে পনেরো মিনিট সময় পাবে। ও ইন্দোনেশিয়ান নেভাল ইন্টেলিজেন্সের লেফটেন্যান্ট কমাণ্ডার। ওদের নেভাল ইন্টেলিজেন্স ওকে দুটো অ্যাসাইনমেন্ট দান করেছে।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চুপ করে থাকল ওরা, তারপর আতাসি বিড়বিড় করে বলল, 'আমেরিকা আর ইজরায়েল পোঁদে লাথি খেয়ে হজম করবে, মাঝখানে তাইওয়ান চ্যালামি করে ডুবল।'

ইজরায়েল সরকার মিসাইলগুলো অত্যন্ত জরুরি কাজে কিনেছে। ওগুলো সোমালিয়ার ব্যান্দারবেয়লায় নিয়ে যাবে। উপকূলে তাদের দুটো টিম অপেক্ষা করছে। তারা মিসাইলগুলো বুঝে নেবে। তেল-আবিব নির্দেশ দিলে ওখান থেকেই মিসাইল লঞ্চ করা হবে। মধ্যপ্রাচ্যের সকল সমস্যা একদিনে সমাধান করতে চলেছে ওরা: মক্কা, মদিনা, রিয়াদ, কায়রো, ত্রিপোলি, দামাস্কাস, বাগদাদ, তেহরান, দুবাই-এ একইসঙ্গে পারমাণবিক বোমার হামলা চালানো হবে।

ইজরায়েলিরা অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করে শত্রুর শেষ রাখতে নেই, এইভাবেই বৈরী মুসলিম দেশগুলোর সমস্ত বিরোধিতার সমাপ্তি টানা সম্ভব। আমেরিকান

সরকার মোসাদ-এর পরিকল্পনায় সায় জানিয়েছে, তাদের শুধু ছোট্ট একটু আবদার আছে—শেষ বোমাটা খরচ করতে হবে মোগাদিশুতে। ওরা ভুলে যায়নি, সোমালিয়ায় বেমক্কা মার হজম করতে হয়েছে ওদের। মিসাইলের দামটা অবশ্য যাবে ইজরায়েলের পকেট থেকে। আমেরিকার ভূমিকা হবে ধোয়া তুলসিপাতা। আসলে সিআইএ মোসাদ-এর এই পরিকল্পনা নিখুঁত না করে দিলে তারা এতবড় কাজে নামতে পারত না।

এই ঘটনা প্রথমে টের পায় লেবানন সিক্রেট সার্ভিস। তারা জানায় অন্যদের। এরফলে মিড্‌ল্ ইস্টের সিক্রেট সার্ভিসগুলো ব্যস্ত হয়ে ওঠে। পরদিনই লেবানন সিক্রেট সার্ভিসের জেনারেল আরাবী মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানকে রাষ্ট্রীয় আমন্ত্রণ পাঠান।

সিক্রেট সার্ভিস-এর চিফরা এককথায় স্বীকার করেন, মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান তাঁদের সত্যিকার বন্ধু। তাঁরা জানেন, এখন আর তাঁর মত সামরিক বিশেষজ্ঞ পাওয়া যায় না। যুদ্ধ পরিকল্পনায় তাঁর ক্রিয়েটিভ ব্রেনের তুলনা হয় না। মিটিঙে সবার অনুরোধে রাহাত খান প্রতি-আক্রমণ পরিকল্পনাটা তৈরি করেন। এরপর জেনারেল আরাবী সবার পক্ষ হয়ে মাসুদ রানাকে চেয়ে বসেন। বিসিআই-এর চিফ এই অনুরোধ ফেলতে পারেননি।

রাহাত খানের উর্বর মস্তিষ্ক তৈরি করেছে এই 'দ্য ট্রায়ো অপারেশন্স'। এতে তিনি তিনটে পর্যায় রেখেছেন।

প্রথম কাজ ছিল কাবুল ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে ঢুকে ইজরায়েলিদের বন্দি করে প্লেন নিয়ে উড়ে যাওয়া। কাজটা সহজেই করা গেছে। এয়ারপোর্ট কর্তৃপক্ষ কোনও সন্দেহ করেনি। পারমিশান চাইতেই বলে দিয়েছে রানওয়ে ক্লিয়ার করা হচ্ছে।

অপারেশনের দ্বিতীয় কাজ ছিল তাইওয়ানের নান-আও নেভাল বেইস-এ ঢুকে দি আফ্রিকান স্টার-এ ওঠা।

এখন তৃতীয় কাজ পারমাণবিক মিসাইলগুলো ধ্বংস করে বন্দর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া।

উর্বশী দাশা নিশ্চয়ই সাবমারসিবল নিয়ে বন্দরে ঢুকেছে। মাত্র একবার ভেসে উঠবে ও—রানা, সোহেল ও আতাসিকে তুলে নেবে, তারপর খোলা সাগরে বেরিয়ে যাবে।

দেশগুলো নিজেদের জন্য আন্তর্জাতিক পানি-সীমা ঠিক করেছে বারো মাইল। কিন্তু ঝুঁকি নেয়নি রানা, দ্য মার্ভেল অভ গ্রিস ওদের জন্য বিশ মাইল দূরে অপেক্ষা করছে।

টেপ রেকর্ডারের কথা শেষ হয়ে আসছে। যে-কোনও মুহূর্তে তাইওয়ানিজ সিকিউরিটি অ্যাণ্ড সিক্রেট সার্ভিস এজেন্সির লোকজন চলে আসবে। ওরা যার যার জায়গায় ফিরে এল। সোহেল ডানহাতে ব্রিফকেস খুলল। খুদে দুটো তাওরাত বের করে রানা ও আতাসিকে দিল। নিজে ডুবে গেল পিস-কিপার মিসাইলের স্পেক শিট-এ।

www.downloadpdfbook.com

দুই

তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকারটা জুডি স্টিভেনসনের ঘুম ভাঙিয়ে দিল। এবং, বাঁচিয়ে দিল ওকে।

রয়েল জিওগ্রাফিক সোসাইটির রিসার্চ ভেসেল অ্যাভালাঞ্চ-এ জুডি ছাড়া আর কোনও মেয়ে নেই। গতকাল ওর একমাত্র সঙ্গিনীর অ্যাপেণ্ডিসাইটিসের ব্যথা উঠেছিল। তাকে জাপানের একটা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। জুডির বেঁচে যাওয়ার আরেকটা বড় কারণ, কেবিনে ও ছাড়া আর কেউ নেই।

সঙ্গিনীর মত জুডি একগাদা পোশাক ও মেকআপ কিট নিয়ে আসেনি, টুকটাক দরকারি মেয়েলি জিনিস এনেছে—আর আছে বেডিং, সাতদিন চলার মতো জিন্স ও রাগবি শার্ট। কেবিনটা প্রায় খালিই বলা চলে।

কেবিনের সামনের প্যাসেজে পুরুষ কণ্ঠ শুনতে পেল জুডি, অদ্ভুত শব্দে কাতরাচ্ছে; যেন মৃত্যু যন্ত্রণার আক্ষেপ। গোঙানির আওয়াজটা পুরোপুরি জাগিয়ে দিল ওকে। চট করে বুঝে ফেলল ওটা কীসের শব্দ, এবং কী করতে হবে ওকে। বাইরে চেঁচামেচি হচ্ছে—মানুষ মরছে, গোলাগুলি চলছে। কানে এলো আরও কয়েকজনের অন্তিম-চিৎকার।

একমাস হলো এমভি অ্যাভালাঞ্চ জাপান সাগরে ঘুরছে। রিসার্চাররা অনেকদিন ধরে এ-সাগরের রহস্যময় স্রোতগুলোকে বুঝতে চাইছেন।

রয়েল জিওগ্রাফিক সোসাইটি জাহাজের সবাইকে সাবধান করেছে, জাপান সাগরে জলদস্যুদের অত্যাচার বেড়ে গেছে। গত পাঁচ সপ্তাহে চারটে জাহাজকে আক্রমণ করা হয়েছে। আন্দাজ করা হচ্ছে, জলদস্যুরা লুটপাটের পর জাহাজগুলো ডুবিয়ে দিচ্ছে। অনেক সার্চ করেও কোনও লাইফবোট পাওয়া যায়নি। বাধ্য হয়ে মেনে নিতে হয়েছে, দস্যুরা কাউকে বাঁচতে দেয়নি। এরপর গতকাল খবর এসেছে, কাছাকাছি এলাকায় একটা কণ্টেইনার জাহাজ উবে গেছে। আক্রমণ আসতে পারে ভেবে নাবিকরা ব্রিজের আর্মস লকারে দুটো শটগান আর একটা পিস্তল রেখেছে। অস্ত্র মানে এ-ই! কিন্তু জানা কথা, নাবিকরা অ্যাসল্ট রাইফেল আর সাব-মেশিনগানের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারবে না। রিসার্চাররা অকাতরে মারা পড়বেন, কোনও কাজে আসবেন না।

একমুহূর্ত দ্বিধায় ভুগল জুডি। লড়ব, না পালাব? সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হলো না, চট্ করে বিছানা ছেড়ে নেমে পড়ল। বেরিয়ে কোথায় যাবে ও? কী করবে? দস্যুরা প্যাসেজে। আওয়াজ বলে দিল, একটার পর একটা কেবিনে ঢুকছে তারা, কাউকে পেলে নির্দ্বিধায় গুলি করছে। দরজাটা খুললে মরতে হবে। পালানোর পথ নেই। কেবিনে এমন কিছু নেই যেটা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

পোর্টহোল দিয়ে পূর্ণিমার স্নিগ্ধ আলো আসছে। পাশের খালি বিছানাটা দেখল জুডি, হঠাৎ করেই একটা বুদ্ধি খেলল—একটানে বিছানার চাদর-কম্বল তুলে নিল

ও, ওগুলো কটের নীচে ভরে রাখল। এরপর লকার খুলে জামা-কাপড়গুলো কটের তলায় রেখে আস্তে করে কেবিনের দরজা খুলে দিল। মনে মনে বলল, প্লিজ, তোমরা ধরে নাও আমি এখানে নেই! কোথাও নেই!

এখন আর বাথরুমে গিয়ে টয়েলেট্রিজ সরানোর সময় নেই। হামাগুড়ি দিয়ে কটের নীচে ঢুকে পড়ল জুডি, এককোনায় সরে গিয়ে কম্বল-চাদর-জামাকাপড় দিয়ে নিজেকে আড়াল করল।

এবার টের পেল, ভয়ে থরথর করে কাঁপছে ও। শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করতে চাইল। ডাগর নীল চোখে অশ্রু জমল। ফুঁপিয়ে উঠতে গিয়ে পাথর হয়ে গেল। লাথি দিয়ে খোলা হলো দরজাটা। কেউ একজন কেবিনের ভিতরে ফ্ল্যাশ লাইট তাক করল। ক্যাথির ম্যাট্রেসে গিয়ে পড়ল আলো, তারপর দেখা হলো জুডির কট। এবার খালি লকার দুটোও দেখল সে।

জলদস্যুর পা দুটো দেখা গেল। কালো কমব্যাট বুট, কালো প্যান্ট। বুটের মধ্যে প্যান্টের নীচটা গুঁজে রেখেছে। ঘরে ঢুকল লোকটা, লাথি দিয়ে বাথরুমের দরজা খুলল, কেউ আছে কি না দেখার জন্যে শাওয়ার কার্টেন সরাল। জুডির সাবান-শ্যাম্পু-কণ্ডিশনার খেয়াল করেনি, অথবা ব্যাপারটায় গুরুত্ব দেয়নি। লোকটা চারপাশ আরেকবার দেখে নিয়ে নিশ্চিত হলো কেবিনে কেউ নেই। যাওয়ার পথে দরজা ভিড়িয়ে দিয়ে গেল।

চুপচাপ পড়ে থাকল জুডি। কাতর স্বরগুলো মিইয়ে গেল, তারপর ধীরে ধীরে থেমে গেল। কয়েকজনের উচ্চ কণ্ঠ দূরে চলে গেল। নীরবে কাঁদল জুডি। জাহাজে ওরা মাত্র তিরিশজন ছিল। তাদের বেশিরভাগই ঘুমাচ্ছিল। এত গভীর রাতে ইঞ্জিনটা অটোমেটিক মোড-এ রাখা হয়। ব্রিজে মাত্র দু'জন নাবিক ছিল। ওর কেবিনটা করিডোরের প্রায় শেষ মাথায়—জুডির মন বলল, এরা সবাইকে মেরে ফেলেছে!

ফুঁপিয়ে উঠল জুডি। অ্যাভালাঞ্চের সবার সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, বন্ধুত্ব হয়েছিল। নিজেকে সাবধান করল ও, এ-নিয়ে আর চিন্তা করবে না, নইলে পাগল হয়ে যাবে। ওকে বাঁচতে হবে। এরা জাহাজ লুট করতে কতক্ষণ লাগাবে? অ্যাভালাঞ্চে তেমন কিছু নেই যে ডাকাতি করবে। দামি ইকুইপমেন্ট আর সায়েন্টিফিক গিয়ারগুলো সবই বড়সড়, চট্ করে চুরি করার জিনিস নয়। আণ্ডার-ওয়াটার প্রোবগুলো দামি, কিন্তু ওগুলো শুধু সায়েন্টিফিক কমিউনিটি ব্যবহার করে। ...কয়েকটা টেলিভিশন আর কম্পিউটার ছাড়া নেয়ার মত আর কিছুই নেই।

চলে যাওয়ার আগে জাহাজটা ভাল করে খুঁজে দেখবে। তাতে অন্তত আধঘণ্টা লাগবে। তারপর? এরা কি অ্যাভালাঞ্চের সি-কক খুলে দেবে? জাহাজ ডুবিয়ে দিলে আর কোনও প্রমাণ থাকবে না। ঘড়ি দেখল জুডি। বারবার করে বলল, আমি ভয় পাব না... ভয় পাব না। রোলেক্স-এর লিউমিনিয়াস কাঁটা আর ফসফোরেসেন্ট বিন্দুগুলোর আলোয় সম্মোহিত হয়ে থাকল ও।

পনেরো মিনিট পর টের পেল, জাহাজের দুলুনি বদলে গেছে। সাগর কি আরও শান্ত হয়ে গেল? অ্যাভালাঞ্চ আগের মত নড়ছে না। যেন ভারী হয়ে গেছে।

ওরা কি সি-কক খুলে দিয়েছে? জাহাজ ডুবিয়ে দেবে? যুক্তি খুঁজল জুডি। এত তাড়াতাড়ি পুরো জাহাজ দেখা হয়ে গেল? সব লুট করা শেষ? ওর অন্তর বলল, এরা ডাকাতি না করেই অ্যাভালাঞ্চকে ডুবিয়ে দেবে!

হাঁচড়ে-পাঁচড়ে কটের তলা ছেড়ে বেরিয়ে এল ও, দৌড়ে গিয়ে পোর্টহোলে দাঁড়াল। প্রথমে ওর মনে হলো নিচু একটা দ্বীপ দেখেছে, তারপর বুঝতে পারল দূরে ওটা অদ্ভুত একটা প্রকাণ্ড জাহাজ। ওটার সামনে আরেকটা জাহাজ। দুই জাহাজে সংঘর্ষ হবে? না, চাঁদের আলোয় ওরকম লাগছে। অ্যাভালাঞ্চের পিছন দিকে বড়সড় একটা ইনফ্লেটেবল ক্রাফট্ দেখতে পেল ও। ওটার আউটবোর্ড ইঞ্জিন গর্জন করে উঠল। যান্ত্রিক ভেলাটা সরে গেল জাহাজের গা থেকে, তারপর গতি তুলে মিলিয়ে গেল দূরে। পিশাচগুলো স্বচ্ছন্দে হাসতে হাসতে চলে যাচ্ছে ভাবতেই রাগে কাঁপতে শুরু করল জুডি।

পোর্টহোলে আর তাকাল না, এক দৌড়ে কেবিন ছেড়ে বেরিয়ে এল। প্যাসেজওয়ে খালি, কোনও লাশ নেই। ডেকে অজস্র গুলির খোসা। বদ্ধ বাতাসে কী যেন একটা কেমিকেলের জোরাল গন্ধ। দু'পাশের দেয়ালে রক্ত। জোর করে চোখ সরিয়ে নিল জুডি, কেবিনে না ফিরে এগিয়ে চলল। একটা টি-শার্ট ছাড়া শরীরে আর কিছু নেই ওর। খালি পায়ে ধাতব ডেকের শীতল স্পর্শ। একহাতে স্তনগুলো সামলে দৌড়াতে শুরু করল জুডি। প্রথমদিন এসে জাহাজ ঘুরে দেখেছে ও, অ্যাভালাঞ্চের বো-র কাছে যোডিয়াক লাইফ রাফট্ আছে। ওই রাফটে সারভাইভাল সুট পাওয়া যাবে।

স্টিলের সিঁড়ি বেয়ে মেইন ডেকে উঠে এল ও। সামনে সরু করিডোর। শেষমাথায় দরজা, ওটা পেরলেই বাইরে যাওয়া যাবে। একটা লাশ হ্যাচের সামনে পড়ে আছে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল জুডি, ফোঁপাতে ফোঁপাতে এগোল আবার। লাশটা উপুড় হয়ে পড়ে আছে। কালচে শার্টে রক্ত আরও গাঢ় দেখাচ্ছে। ডেকে এখনও সচল, তাজা রক্ত।

মানুষটার আকৃতি বলে দিল, সে সেকেণ্ড ইঞ্জিনিয়ার। জর্জি হাসিখুশি মানুষ ছিল, মিষ্টি মিষ্টি কথায় বুঝিয়ে দিয়েছিল, ও রাজি হলে ব্যাপারটা বিয়েতে গড়াবে। ...এত রক্ত! বেঁচে নেই ও! লাশটা স্পর্শ করবার সাহস পেল না জুডি। করিডোরের ঠাণ্ডা দেয়ালে সেঁটে গেল ও, তারপর পায়ে পায়ে এগোল।

হলওয়ের শেষে ছোট্ট পোর্টহোল দিয়ে বাইরে তাকাল ও। প্রায়ান্ধকার ফোরডেক-এ কেউ নেই। হ্যাচের হ্যাণ্ডেলে চাপ দিল, লেভারটা নড়ল না। গায়ের জোরে দু'হাতে চাপ দিল। আবারও! বোধহয় হ্যাণ্ডেলের মেকানিজম জ্যাম হয়ে গেছে। হ্যাচ খুলছে না!

কয়েকবার শ্বাস নিয়ে নিজেকে শান্ত করল জুডি। ভয়ের কিছু নেই। বেরোনোর চারটে পথ আছে। উইঙের দরজাগুলো যদি বন্ধ থাকে? সমস্যা নেই। ব্রিজের জানালার কাঁচ ভেঙে বেরোনো যাবে।

মেইন ডেকের দরজাগুলো খুলবার চেষ্টা করল জুডি। সব বন্ধ। সিঁড়ি ভেঙে ব্রিজের কাছে উঠে এল ও। জানালা ভেঙে বেরোতে হবে। কমাণ্ড ডেকে পৌঁছে হঠাৎ ভয় লাগল ওর। দস্যুরা সবাইকে খুন করেছে, তারপর সি-কক খুলেছে।

কেন? ওরা কি চেয়েছে জাহাজটা সবার জন্য কফিন হোক? সব হ্যাচ বন্ধ কেন? ব্রিজে যাওয়ার হ্যাচও আটকে দিয়েছে?

আস্তে করে ব্রিজের দরজার নবটা ধরল জুডি। ওর দীর্ঘ আঙুলগুলো কাঁপতে শুরু করল। আস্তে করে নব ঘোরাল। ঘুরছে!

নব ঘুরিয়ে এগোতে চাইল ও, নিরেট ইস্পাতের দরজাটা নড়ল না। সুপারস্ট্রাকচারে এমন কোনও বড় পোর্টহোল নেই যেখান দিয়ে বেরোনো যায়। জুডি মরণ-ফাঁদে আটকে ডুকরে কেঁদে উঠল। পাগলের মত দরজায় থাবা দিল, বারংবার চেঁচিয়ে সাহায্য চাইল।

অনেকক্ষণ পর ব্যথা পেয়ে থামল, ওর দু'হাতে কালসিটে পড়ে গেছে। দরজার সামনে বসে পড়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফোঁপাতে শুরু করল।

হঠাৎ অ্যাভালাঞ্চ দুলে উঠল। বাতিগুলো নিভু নিভু হয়ে আবারও দপ করে জ্বলল। নীচের কোনও কম্পার্টমেন্টে পানি ঢুকেছে। জাহাজটা আরেকবার নড়ে উঠতেই আঁৎকে উঠল জুডি, বিড়বিড় করে বলল, 'ঈশ্বর!'

অ্যাভালাঞ্চের সি-কক আটকাতে পারলে হাতে সময় পাবে ও। চিন্তা-ভাবনা করলে নিশ্চয়ই কোনও না কোনও পথ বেরিয়ে যাবে। মনে পড়ল, ওয়ার্কশপে কাটিং টর্চ থাকবে। ওটা খুঁজে পেলেই... হ্যাচের লক কাটতে বেশিক্ষণ লাগবে না।

ফিরতি পথে দৌড়াতে শুরু করল জুডি। মেইন ডেকে নেমে এসে ক্রু কোয়ার্টার্স পেরোল, সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল ইঞ্জিনিয়ার্স স্পেসে। মুখে শীতল বাতাসের স্পর্শ পেল। ওকে কাঁপিয়ে দিল প্লাবনের আওয়াজ। জাহাজে হড়-হড় করে পানি ঢুকছে!

জুডি ছোট একটা অ্যান্টিচেম্বারে আছে, সামনেই সিঙ্গেল ওয়াটার টাইট ডোর। ধাতব দরজাটা খুললেই ইঞ্জিন-রুম। লেভারে হাত রাখল। ডিজেল ইঞ্জিনের গরমে হ্যাণ্ডেলটা এখনও তপ্ত। দরজার নীচের দিকে হাত রাখল। বরফের মত ঠাণ্ডা। আগে কখনও ইঞ্জিন-রুমে আসেনি জুডি, লেআউট দেখেনি, কিন্তু আজ ঢুকতে হবে। যদি সি-কক বন্ধ করা যায়...

বিড়বিড় করে বলল জুডি, 'আর দেরি করব না আমি।' ল্যাচে মোচড় দিল ও। দরজাটা খুলতেই গোড়ালি-সমান পানির স্রোত ঢুকল অ্যান্টিচেম্বারে। বরফের মত ঠাণ্ডা! কয়েক সেকেণ্ডেই জুডির হাঁটু ডুবে গেল। দ্রুত বাড়ছে পানি। ইঞ্জিন-রুম এখনও আলোকিত। ইঞ্জিনগুলো অর্ধেক ডুবে গেছে। সাগরের পানি জেনারেটারের গায়ে আলতো চাপড় মারছে।

সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল জুডি, পাঁচ ধাপ নামবার পর মেঝে পেল। বুক পানিতে দাঁড়িয়ে চারপাশ দেখে নিল। তাপমাত্রা পঁয়ষট্টি ডিগ্রির নীচে হবে না, কিন্তু শীতে থরথর করে কাঁপল। ইঞ্জিন-রুমটা প্রকাণ্ড একটা গুহার মত। জুডি অর্ধেক হাঁটা আর অর্ধেক সাঁতারের ভঙ্গিতে এগোল। কী করবে ভেবে বের করেনি এখনও, তবে জাহাজের সি-কক বন্ধ করতে হবে।

পানির গভীরতা বাড়ছে। স্রোতের টানে দাঁড়ানো গেল না। এক ঢোক পানি গিলে ফেলল ও, তাড়াতাড়ি সাঁতরে ভেসে উঠল। বুঝে গেল, এখানে ওর কিছু

করবার নেই। সি-ককগুলো কীভাবে অপারেট করে? জানে না ও। এখন আর জানবার উপায় নেই।

বাতিগুলো নিভে গেল। বুকের ভিতরে ধক্ করে উঠল জুডির। তারপর বাতি আবারও জ্বলে উঠল, তবে আগের চেয়ে অনেক অনুজ্জ্বল। ওটা যেন কোনও সঙ্কেত, ওকে বলে দিল, এবার তুমি চলে যাও!

বাতি নিভে গেলে এই গুহা ছেড়ে বেরোতে পারবে না ও। ফিরতি পথে সাঁতার কাটতে শুরু করল জুডি, দু'মিনিট পর সিঁড়ির রেলিঙের কাছে পৌঁছে গেল। রেইলিং ডুবে গেছে। সাঁতার কেটে অ্যান্টিচেম্বারে চলে এল। এখানেও কোমর পানি!

দরজাটা বন্ধ করতে সমস্ত শক্তি ব্যয় করল ও। মনে মনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করল, অ্যাভালাঞ্চ যেন না ডোবে। ঈশ্বর, আর কোনও জাহাজ যেন দেখতে পায় ওদের ডুবন্ত জাহাজটা!

ওয়ার্কশপে আর যাওয়া হলো না। পানিতে ডুবে গেছে। শীতে কাঁপতে কাঁপতে সেকেণ্ড ডেকে উঠে এল ও, প্রায় দৌড়ে ঢুকে পড়ল ওর কেবিনে। তোয়ালে দিয়ে শরীর মুছে পোশাক পাল্টে নিল। আবহাওয়া হঠাৎ করেই ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। ভারী সোয়েটার পরল। বাথরুমের আয়নায় দেখল ঠোঁটের কোণে রক্ত গড়াচ্ছে। ইঞ্জিন-রুমে ঠোঁট কেটেছে। নিজেকে দেখল। সাগর-নীল চোখে ফাঁকা চাহনি। ফ্যাকাসে চেহারাটা দেখে মনে হচ্ছে একটু পরেই ওকে ফাঁসি দেয়া হবে। বিড়বিড় করে বলল, 'কিছুতেই সাহস হারাবো না আমি! কিছুতেই না!'

আয়না ছেড়ে পোর্টহোলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও। পূর্ণিমার চাঁদটা আর দেখা গেল না। আকাশটা মনে হচ্ছে গাঢ় অন্ধকার। পাইরেটদের বোটটা দেখা যাচ্ছে না আর। অনেক দূরে যে বিশাল জাহাজটা দেখেছিল, সেটাও চলে গেছে। চুপ করে অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকল জুডি। সরতে পারছে না পোর্টহোলের সামনে থেকে।

গ্রিজ বা তেল মাখলে পোর্টহোলের ভিতর দিয়ে গলে যাওয়া যাবে? মেস হলের পোর্টহোলগুলো আরেকটু বড়। চেষ্টা করলে তো দোষ নেই। ঘুরে দাঁড়াতে গেল জুডি, কিন্তু বাইরে কালো কী যেন দেখতে পেল। মনোযোগ দিয়ে দেখতে চেষ্টা করল।

অ্যাভালাঞ্চের দশ ফুট দূরে ওটা কী? কোনও নৌকা? কোনও পাখি? পরিষ্কার বোঝা গেল না, কিন্তু মনে হলো ওটা কোনও উড়ন্ত পাখি!

জিনিসটা দ্রুত ভেসে এল, তারপর পুরো পোর্টহোল দখল করে নিল। জুডি আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠে পিছাল—ওটা একটা বিরাট ধূসর মাছ! হলুদ চোখ দিয়ে দেখছে ওকে, বার বার মস্ত হাঁ করে আবার মুখ বন্ধ করছে! কেবিনের আলো ওকে আকর্ষণ করছে। দেখা শেষ, ওটা পাখনা নেড়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

জুডি দেখতে পেল না এমভি অ্যাভালাঞ্চের ডেক ভেসে গেছে। বো'র কার্গো হ্যাচে সাগরের ঢেউ খেলছে। কিছুক্ষণ পর ব্রিজটা ডুবে যাবে, ক্রেনও। তারও একটু পরে, শান্ত সাগর অ্যাভালাঞ্চের ফানেল গিলে নেবে, থাকবে না কিছুই!

অ্যাভালাঞ্চ যেখানে রয়েছে, সেখানে জাপান সাগরের গভীরতা প্রায় দুই মাইল। একসময় এমভি অ্যাভালাঞ্চ সাগরের মেঝে স্পর্শ করবে।

তিন

তাইওয়ানিজ সিক্রেট সার্ভিসের দুই এজেন্ট দরজায় টোকা দিয়ে ভিতরে ঢুকল। সামনের লোকটা হাতের ইশারা করল, 'আসুন।'

দ্বিতীয়জন কোটের বোতাম ঠিক করবার ছলে তার ডানহাতটা শোল্ডার হোলস্টারের কাছে রেখেছে।

রানা আর আতাসি পকেটে রেখে দিল তাওরাত। সোহেল পিস-কিপারের স্পেক শিট ব্রিফকেসে রেখে সঙ্গীদের পিছু নিল।

দি আফ্রিকান স্টার একসময় যাত্রীবাহী জাহাজ ছিল, এখন ওটা কন্টেইনার শিপ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। জাহাজের ভিতরে নতুন রং করা হয়েছে। এ-গলি ও-গলি ঘুরে এগোল ডেলিগেশন। দুই এজেন্ট ছাড়া আর কাউকে দেখা গেল না।

ওরা মেইন ডেকে চলে এল। সামনে হ্যাচওয়ে। প্রথম এজেন্ট একটা হ্যাচ খুলল। ভিতরটা ছোটখাটো একটা ইনডোর স্টেডিয়ামের মত। অন্ধকার। নাকে এল ময়লা পানির দুর্গন্ধ আর পুরনো ধাতুর ঘ্রাণ। সামনের তাইওয়ানি পটাপট সুইচ টিপতে ওভারহেড লাইটগুলো জ্বলে উঠল। ফ্লুওরোসেন্ট আলোয় মোটা প্লাস্টিক শিট মোড়ানো মিসাইলগুলো দেখা গেল। ওগুলো এখন দশটা শহরের মৃত্যু মাথায় নিয়ে যার যার ক্রেডলে শুয়ে আরাম করছে।

ওগুলো মিডিয়াম রেঞ্জ ব্যালিস্টিক মিসাইল। মিডল ইস্টের জন্যে এর বেশি কিছু লাগবে না। পিস-কিপার মিসাইল বোইং মার্টিন ম্যারিয়েটার টিআরডাব্লিউ অ্যাণ্ড ডেনভার অ্যায়ারোস্পেসের তৈরি। একেকটার দাম সত্তর মিলিয়ন। দৈর্ঘ্য একাত্তর ফুট ছয় ইঞ্চি। ডায়ামিটার সাত ফুট সাত ইঞ্চি। ওজন পৌনে সাতানব্বই টন। পারমাণবিক বোমা থাকায় ওজন খানিকটা বেড়েছে।

ধাতব সিঁড়ি বেয়ে কার্গো হোল্ডে নেমে এল রানা, সোহেল ও আতাসি। তিনজনের এই ছোট্ট দলে সোহেল মিসাইল এক্সপার্ট হিসেবে ভান করছে, কাজেই গট-গট্ করে প্রথম মিসাইলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও। তাইওয়ানিজ সিক্রেট সার্ভিসের দু'জন হ্যাচওয়ের কাছে দাঁড়িয়ে পড়েছে, হাতের ইশারায় তাদের ডাকল সোহেল, পরমুহূর্তে ওর গলা দিয়ে বাঘের মত ধমক বেরল: 'অ্যাই যে, ওখানে দাঁড়িয়ে কী হচ্ছে! প্লাস্টিকের শিট সরান!'

লোকগুলো বিরক্ত চেহারায় সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে কাজে লেগে পড়ল।

পাঁচ মিনিট পর জেনারেল পিয়েং এলেন। সোহেল ততক্ষণে সামনের মিসাইলের অ্যাক্সেস প্যানেল খুলে ফেলেছে, সার্কিট টেস্টার দিয়ে সব পরীক্ষা করছে!

রানা আর আতাসির পাশে এসে দাঁড়াল পিয়েং, 'আপনাদের নতুন খেলনা

www.downloadpdfbook.com

পছন্দ হয়েছে?'

'চলে,' অনাগ্রহ নিয়ে বলল রানা। 'এই জিনিস আপনারাও একদিন পাবেন।'

আতাসি মনে মনে বলল, আজকেই পাবেন, একটু পরেই!

সোহেল নিজের কাজে ব্যস্ত, প্রফেসর সিমন কাউচ ওরফে আতাসিকে ডাক দিল ও, কী যেন দেখাবে।

আতাসির মত রানাও ওর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। তারের জঙ্গল দেখাল সোহেল, কী যেন বলল। ঝুঁকে মনোযোগ দিল ওরা। তারগুলো দেখে নিয়ে নিচু স্বরে আলাপ শুরু হলো। দশ মিনিট পেরিয়ে গেল।

লোকগুলো কথা শেষ করছে না, জেনারেল পিয়েং অস্বস্তিতে পা বদলালেন। আরও কিছুক্ষণ পর বললেন, 'কোনও সমস্যা?'

ঘাড় ফেরাল না রানা, 'না, মনে হচ্ছে ঠিকই আছে।'

তারের জট আর সার্কিট দেখা চলতে থাকল। দেখতে দেখতে আরও পনেরো মিনিট পেরিয়ে গেল। সোহেল মাঝে মাঝে মিসাইলের প্ল্যানগুলো দেখছে। বাকি দু'জন মূর্তি হয়ে গেছে।

বিরক্তির শেষপ্রান্তে পৌঁছে জেনারেল জানতে চাইল, 'পরীক্ষা করা কী খুবই জরুরি, কর্নেল পেরন?'

ঘুরে দাঁড়ানোর আগে একবার বিপজ্জনক গোঁফজোড়া স্পর্শ করে দেখে নিল রানা, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'দুঃখিত, জেনারেল। ফ্রয়েশম্যান সব দেখে নেবে। তবে মনে হয় প্রথমটা দেখা শেষ হলে অন্যগুলোর দিকে কম মনোযোগ দিলেও চলবে।'

পিয়েং কব্জি ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখলেন। 'আমি কিছু পেপার-ওয়ার্ক সারতে ক্যাপ্টেনের কেবিনে যাচ্ছি, আপনাদের ইন্সপেকশন শেষ হলে আমাকে ওখানেই পাবেন। আমাদের লোক থাকল, দরকার হলে যে-কোনও সাহায্য করবে।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, জেনারেল।' মিসাইলের দিকে ফিরল রানা।

জেনারেল চলে গেলেন।

দশ মিনিট পর রানা-সোহেল-আতাসি দ্বিতীয় মিসাইলের পাশে গিয়ে থামল। দুই এজেন্ট সিঁড়ির উপর বসে পড়েছে। তাদের একজন একটার পর একটা সিগারেট ধ্বংস করছে। অন্যজন নিষ্পলক চোখে মিসাইল এক্সপার্টদের দেখছে। সুট-জ্যাকেটের বোতাম খুলে রেখেছে ওরা, দরকার পড়লে একটানে পিস্তল বের করবে।

জেনারেল পিয়েং বিরক্ত হয়ে চলে গেলেও এতক্ষণে পরিষ্কার বোঝা গেছে, এরা নড়ার বান্দা নয়।

উর্বশীর সঙ্গে নির্দিষ্ট সময়ে দেখা না হলেও চলবে। সব ঠিক চললে উর্বশী মিনি-সাব নিয়ে জাহাজের স্টার্নের কাছে আসবে, প্যাসিভ সোনার চালু রেখে অপেক্ষা করবে। ওরা পানিতে পড়লেই আওয়াজটা পেয়ে যাবে।

ভোর হতে এখনও আড়াই ঘণ্টা বাকি। মনে মনে আরেকবার হিসাব কষল রানা। হোল্ড ছেড়ে বেরিয়ে মিনিসাব-এ ওঠা, নান-আও নেভাল বেইস ত্যাগ করা... তারপর দ্য মার্ভেল অভ গ্রিসে গিয়ে ওঠা, এবং ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন।

জাহাজটার ম্যাগনেটো-হাইড্রোডাইনামিক ইঞ্জিনের উপর বিশ্বাস রাখা যায়। রানা মৃদু হেসে ফেলল, বিড়বিড় করে বলল, 'কপাল ভাল যে ইঞ্জিনের নামটা মুখে বলতে হচ্ছে না, নইলে দু'চারটা দাঁত খসে পড়ত!'

ইঞ্জিনটা সাগরের পানি থেকে অবমুক্ত করা ফ্রি ইলেকট্রন ব্যবহার করে চলে। এখনও এক্সপেরিমেন্টাল পর্যায়ে আছে। ওটার ক্রাইও-কুল্ড্ ম্যাগনেট পাম্পগুলো প্রচণ্ড শক্তি যোগান দেয় জাহাজের চারটে পাল্স্ অ্যাকুয়া জেটকে। বলা উচিত, জলে চলে না, প্রায় আকাশে উঠে পড়ে ওটা।

আতাসি ফিসফিস করে বলল, 'বিড়বিড় করে কী সব বলছেন, বস্?'

'না। কিছু না।' রানা চট্ করে দুই তাইওয়ানিজকে দেখে নিল। টের পেল শিরদাঁড়ায় শীতল অনুভূতি। ওর প্রতিটি কাজে ভয়-বিপদ-শিহরন আর মৃত্যুর হাতছানি আছে বলেই বেঁচে আছে ও! সোহেল আর আতাসিও একই কথা বলবে, বলবে দ্য মার্ভেল অভ গ্রিসের প্রত্যেকে।

ঘড়িতে কয়েকটা টোকা দিল ও। ওটাই সিগনাল। সোহেল আর আতাসি এখন জানে কাজে নামতে হবে।

সোহেলকে একটু আড়াল দিল আতাসি, সেই সুযোগে সোহেল ব্রিফকেসের ভিতরের এক সেট লক খুলল। সিগারেট-খোর এজেন্টের দিকে তাকাল রানা, হাতের ইশারায় একটা সিগারেট চাইল।

লোকটা হাসিহাসি ভাব করে কোটের পকেটে হাত ভরল, তুবড়ে যাওয়া সিগারেটের প্যাকেট বের করল।

তার দিকে এগোল রানা।

দুই এজেন্ট রানার দিকে মনোযোগ দিয়েছে, সুযোগটা নিল সোহেল, ব্রিফকেস খুলে বোমাটা বের করে নিল। জিনিসটা দেখতে পঁচিশ টাকার কিট-ক্যাট চকলেটের মত। শক্তি প্রায় ক্লেমোর মাইনের সমান। ওটার ভিতরে ডেটোনেটারও আছে।

সিঁড়ির পাঁচ ফুটের মধ্যে চলে গেছে রানা, ধূমপায়ী এজেন্ট নেমে এল ডেক-এ। বিরক্ত হলো রানা, লোকটা আগের জায়গায় বসে থাকলে ভাল হতো। ও নিজে ল্যাণ্ডিঙে উঠতে পারলে ওদের একইসঙ্গে বাগে পেত। এখন আর সেই সুযোগ নেই। লোকটা সিগারেট বাড়িয়ে দেয়ায় নিল। ব্যাটা লাইটার জ্বেলে নাকের কাছে ধরল।

নাক বাঁচিয়ে শলাটা ধরিয়ে নিয়ে জোরেসোরে একটা টান দিল রানা, সঙ্গে সঙ্গে বেদম কেশে উঠল। মনে হলো কড়া তামাকের ধাক্কায় চমকে গেছে। লোকটা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে ঘাড় ফিরিয়ে সঙ্গীকে কী যেন বলতে গেল, কিন্তু শুরু করতে পারল না—চোয়ালে রানার প্রচণ্ড ঘুসি খেল সে। বদ্ধ হোল্ডে হাড় ভাঙবার কড়াৎ! শব্দ হলো। পরমুহূর্তে মেঝেতে শুয়ে পড়ল সে। অজ্ঞান!

রানা ভাবতেও পারেনি দ্বিতীয় এজেন্ট এত দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখাবে। আরে ব্যাটা, দুটো সেকেণ্ড তো দিবি! না। এক লাফে উঠে দাঁড়িয়েই সিঁড়ি বাইতে শুরু করল সে, উঠে যাচ্ছে উপরে, সেই সঙ্গে হাত ভরে দিয়েছে কোটের ভিতর। একেক বারে তিন-চার ধাপ টপকে ল্যাণ্ডিঙে পৌঁছল রানা, ততক্ষণে হোলস্টার

থেকে একটা কোল্ট অটোমেটিক বের করে ফেলেছে এজেন্ট। ওখান থেকে ঝাঁপ দিয়ে লোকটার গোড়ালি ধরে হ্যাঁচকা টান দিল রানা। লোকটা সিঁড়ির ধাপে পিছলে গড়িয়ে নীচের ল্যাণ্ডিঙে এসে থামল। পিস্তলটা হাত থেকে খসে রয়ে গেল উপরের ল্যাণ্ডিঙেই।

পিছলে গেছে রানাও। ল্যাণ্ডিঙে থুতনি দিয়ে পড়ল ও, ব্যথায় চোখে আঁধার দেখল। দেরি করবার সময় নেই, লোকটা পিস্তল পেলে সর্বনাশ! তার তাক করতে হবে না, গুলি করলেই জেনারেল পিয়েং সাবধান হয়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত গার্ড ছুটে আসবে। বামহাতে থুতনির রক্ত মুছে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা।

এদিকে ক্ষিপ্র তাইওয়ানি রানার আগে উঠে পড়েছে, আবার দ্রুত সিঁড়ি ভাঙছে। এক লাফে তার পাশে পৌঁছে গেল রানা, বাম কনুই দিয়ে ওর পাঁজরে জোরে গুঁতো মারতে চাইল।

লোকটা অসম্ভব চালু, শরীর মুচড়ে সরে গেল। পাঁজরের বদলে রানার কনুই গিয়ে পড়ল রেইলিঙের প্লেটে। সঙ্গে সঙ্গে হাত অবশ হয়ে গেল। উপরের প্ল্যাটফর্মে প্রায় একইসঙ্গে পৌঁছল দু'জন। তাইওয়ানি উবু হয়ে পিস্তল তুলে নেবে—তার হাতটা ধরতে চাইল রানা। সরু সিঁড়িতে ধাক্কাধাক্কি শুরু হলো। হাতে সাড় নেই বলে একহাতে সুবিধা করতে পারল না রানা। লোকটার আঙুল এখন পিস্তলের গ্রিপের দু'ইঞ্চি দূরে!

ওদিকে সোহেল ব্যস্ত হয়ে বোমাটা মিসাইলের ওয়ারহেডে বসিয়ে দিয়েছে। আতাসি জোরদার ভাঁজে স্টিলেটো রেখেছে, ওটা বের করে সিঁড়ির দিকে দৌড়ে এল। স্পষ্ট বুঝল, ঠিকসময় পৌঁছাতে পারবে না।

তাইওয়ানি এজেন্ট ডানহাতে রানাকে ধাক্কা দিয়ে সরাল, বামহাতে ধরতে চাইল পিস্তল। রানার বামহাত একেবারেই অসাড়, ডানহাতে লোকটাকে বাধা দিতে চাইল—শরীর মুচড়ে বামহাত তুলল, লোকটার মাথায় ধাক্কা দিল। মুহূর্তের জন্য থামল সে, চট্ করে ল্যাং মারল। পড়তে পড়তে সামলে নিল রানা।

লোকটা পিস্তল তুলে নিল, চরকির মত পাশ ফিরল। কিন্তু গুলি করবার সুযোগটা পেল না, ডানহাতে খপ করে তার কব্জি ধরে ফেলল রানা, মোচড় দিয়ে রেইলিঙে দমাদম বাড়ি দিতে শুরু করল—ছেঁচে দিতে চাইছে আঙুলগুলো। লোকটা তীব্র ব্যথায় ছেড়ে দিল পিস্তল।

সিঁড়ির কাছে পৌঁছে গেছে আতাসি, নীচে গিয়ে পড়বার আগেই পিস্তলটা লুফে নিল সে, কয়েক লাফে উঠে এসে প্রচণ্ড বেগে লোকটার মাথায় পিস্তল নামিয়ে আনল। একবার, দুইবার, তিনবার। এতক্ষণে লোকটার চোখ উল্টে গেল, জ্ঞান হারিয়ে ল্যাণ্ডিঙে গিয়ে পড়ল।

মুখ কুঁচকিয়ে ব্যথা সামলাতে চাইল রানা, সোজা হয়ে দাঁড়াল। আতাসি বলল, 'ঠিক আছেন তো, বস্?'

মিসাইল ফেলে দৌড়ে এল সোহেল, দ্বিতীয় ল্যাণ্ডিঙে উঠে বলল, 'চল্, হাতে সময় নেই! যে-কোনও সময় এখন হাজির হবে ইজরায়েলি জাহাজ!'

বোমার রিমোট কন্ট্রোল ডিভাইসটা রানার হাতে দিল সোহেল। হোল্ডের হ্যাচ

খুলে বেরিয়ে এল ওরা, তাড়াহুড়ো না করে চলে এল মেইন ডেকে।

অন্তত দশজন লোক ডেকের রেলিং ধরে উপসাগরের দিকে চেয়ে আছে। বিশাল এক জাহাজ তরতর করে ঢুকছে বন্দরে! দু'পাশে ঢেউয়ের মাথায় ফেনা। ইজরায়েলিদের ট্র্যান্সপোর্টেশন। পিছন থেকে লোকগুলোকে দেখল রানা, তাদের মধ্যে জেনারেল নেই। ইজরায়েলি জাহাজের ক্যাপ্টেন নোঙর ফেলার পর বেরিয়ে আসবে বোধহয়।

হাতের ইশারা করল রানা। ওরা স্টার্নের দিকে চলেছে। একবার থামল, চারপাশ দেখে নিল। এদিকে কোনও প্রহরী নেই। সব সুনসান। বন্দরের মুখে দূরে ডেস্ট্রয়ারটা ভাসছে। ওটার ডেকে কেউ নেই। একশো এমএম কামানগুলো উপসাগরের দিকে তাকিয়ে।

ওরা পিছনের ডেক পেরিয়ে রেলিঙের পাশে থামল। একবার ঘড়ি দেখল রানা, তারপর রিমোট কন্ট্রোল ডিভাইসের লাল বাটন টিপেই ফেলে দিল ওটা সাগরে।

এবার ওরা নিজেরাও রেলিং টপকে খসে পড়ল সাগরে।

পানি বেশ ঠাণ্ডা, কুলকুচি করে বিরক্ত হলো আতাসি, থুহ্-থুহ্ করে ফেলে দিল। পানিতে কেরোসিনের গন্ধ। জোব্বা খুলে ফেলল, সাঁতার কাটতে শুরু করল। বুট খুলে ওর পিছু নিল রানা ও সোহেল। জাহাজের খোলের ভাঁজে গিয়ে থামল ওরা। ডেক-এ এখন কেউ এলেও দেখতে পাবে না ওদের।

উর্বশী নিশ্চয়ই বত্রিশ ফুটি সাব-মারসিবলটা নিয়ে অপেক্ষা করছে। নাকি আসেনি ও? সেক্ষেত্রে মারা পড়বে ওরা! ভাল হতো উর্বশী পানির নীচে অপেক্ষা করলে। ওরা ডুব-সাঁতার দিয়ে এয়ার-লক পেরিয়ে সাব-মারসিবলে ঢুকতে পারত। কিন্তু ওতে অনেক সময় নষ্ট হবে। এখন দ্রুত সরে যেতে হবে। উর্বশী ভেসে উঠলে সাব-মারসিবলের পিঠের হ্যাচ খুলে নেমে পড়বে ওরা। এতে বড়জোর তিরিশ সেকেণ্ড লাগবে। কেউ যদি দেখেও ফেলে, কিছু করবার নেই। দি আফ্রিকান স্টারের প্রপেলার আর খোলে ঢেউয়ের চাপড় লেগে যে শব্দ হচ্ছে, সাব-মারসিবল তারচেয়ে অনেক কম আওয়াজ করবে। তাইওয়ানিজ ডিটেকশন গিয়ার তারপরেও যদি ওটাকে ধরে ফেলে, তা হলে ওদের কপাল খুবই মন্দ।

পুরো একমিনিট পার হলো না, ওরা জাহাজের স্টার্নে একগাদা বুদ্বুদ দেখল। মিনি-সাবের চুরুট সদৃশ কাঠামো দেখবার আগেই রওনা হয়ে গেল ওরা। ঢেউ ভেঙে উঠে এল ওটা। ঝরঝর করে ঝরে গেল পানি। কালো তিমির পিঠে আগে উঠল আতাসি, দ্রুত হ্যাচ কাভার ঘোরালো। হ্যাচ সিল খুলে যাওয়ায় ভুস্ করে বাতাস বেরিয়ে গেল। সিঁড়ি বেয়ে অন্ধকারে নেমে গেল আতাসি। ওর পর সোহেল ও রানা। হ্যাচটা আবার সিল করে দিল রানা। মিনি-সাব ডিসকভারি-৯৯৯-এর ভিতরে ইলেকট্রনিক্স গ্যাজেট ম্লান আলো ফেলছে, সেই আলোয় ওরা যার-যার সিটের দিকে এগোল।

উর্বশী বাল্কহেডের একটা সুইচ টিপল, জ্বলে উঠল ব্ল্যাকআউট লাল বাল্ব্। ডিসকভারি-৯৯৯ সাধারণত বড়জোর একশো ফুট গভীরে নামে। চব্বিশ ঘণ্টা পর ব্যাটারিগুলো রিচার্জ করতে হয়, বদলাতে হয় CO_2 ফিল্টার। যাত্রীদের জন্য

আটটা সিট থাকে, কিন্তু এই অপারেশনে চারটে সিট সরিয়ে নেয়া হয়েছে। সেই জায়গা নিয়েছে র‍্যাক ভরা ব্যাটারি, ফিল্টার, উর্বশীর খাবারের কার্টন, আর একটা কেমিকেল টয়লেট। ফ্লোরে পড়ে আছে খাবারের খালি প্যাকেট। সাব-মারসিবলের ভিতর বাতাস ভারী ও গুমোট।

চারদিন আগে দ্য মার্ভেল অভ গ্রিস ছেড়েছে উর্বশী, নান-আও বন্দরে এসে ঢুকেছে। কাজটা অত্যন্ত কঠিন। তাইওয়ানিজ নেভি নিয়মিত পানির নীচে কান পেতেছে, অ্যাক্টিভ সোনার দিয়ে ঝাড় মেরেছে। এরা আমেরিকার দোসর ইজরায়েলের জন্য নান-আও বন্দর দুর্গ বানিয়ে ছেড়েছে। ভাটার সময় স্রোত উর্বশীকে আস্তে আস্তে সাগরে টেনে নিয়েছে, আবার জোয়ারে পৌঁছে দিয়েছে বন্দরে। ইলেকট্রিক মোটর ইচ্ছা মত চালু করবার পথ ছিল না। কোনও জাহাজ বা প্যাট্রল বোট সাগরে বেরিয়ে গেলে, উর্বশী সেই সুযোগে আগের জায়গায় ফিরেছে।

উর্বশীর ডানপাশের সিটে বসল রানা। ওটা কো-পাইলটের সিট।

গ্রীবা ফেরাল অপরূপা উর্বশী। সুন্দর মুখটা একটু ম্লান। পুরো চারদিন এই কফিনে আটকে আছে ও। 'সব ঠিক আছে, রানা?'

'এখন পর্যন্ত,' ঘড়ি দেখল রানা। 'এগারো মিনিট পর জিরো টাইম।'

সাব-মারসিবল নীচে নামছে। ডিসকভারি ৯৯৯-এর একমাত্র প্রপেলারটা পানিতে কামড় দিল। এখন আর শব্দ নিয়ে চিন্তা করছে না ওরা। বোমার শক-ওয়েভ পানিতে দ্বিগুণ জোরে আছড়ে পড়বে, আওতার মধ্যে সাবটাকে পেলে চুরমার করে দেবে। জাহাজটা পিছনে ফেলে দ্রুত সরে যেতে হবে এখন। ওদের মাথার উপর দিয়ে যাবে ইজরায়েলি জাহাজটা। অথবা, যাবে না কোথাও!

সোনারের দিকে চোখ রাখল রানা। আধ মিনিটও পার হলো না, যা ভেবেছে, তা-ই—তাইওয়ানিজ নেভি টের পেয়ে গেছে। গম্ভীর হয়ে গেল রানা।

ওর ঘাড়ের কাছে মুখ নিয়ে জানতে চাইল সোহেল, 'অবস্থা কী?'

'শব্দের সিগনাল অ্যানালাইজ করছে কম্পিউটার।'

'আগেই দেখেছি আমি,' বলল উর্বশী। 'দক্ষিণ কোরিয়ার সিনপো-ক্লাস প্যাট্রল বোট। ক্রু বারোজন। ওদের দুটো থারটি-সেভেন এমএম অটোক্যানন আছে। র‍্যাকে ডেপথ্ চার্জ। ইচ্ছে করলে স্পিড চল্লিশ নট পর্যন্ত তুলতে পারবে, কিন্তু এখন বিশ নট-এ আসছে।'

সোহেল বিড়বিড় করল, 'আহা, কী মধুর সংবাদ যে শোনালেন আপনি, উর্বশী! আমার মন ভাল হয়ে গেল!'

'এটাই এদের রুটিন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

মাথা দোলাল উর্বশী। 'হ্যাঁ, আমার অভিজ্ঞতা তা-ই বলে। আন্দাজ দুই ঘণ্টা পরপর পুরো বন্দর টহল দেয়। ওরা কোর্স না পাল্টালে আমাদের মাথার উপর দিয়ে যাবে।'

'ওদের সোনার আছে?' জিজ্ঞেস করল সোহেল।

'জানি না।' রানার দিকে তাকাল উর্বশী, গলায় কোনও কম্পন নেই, জিজ্ঞেস করল, 'কী করতে চাও? আমরা আরও নীচে গিয়ে থামতে পারি। ওরা চলে গেলে

আবার এগোব?'

চট্ করে ঘড়ি দেখল রানা। ওরা মাত্র সিকি মাইল পেরিয়েছে। আরও অনেক দূরে সরে যেতে হবে। মাথা নাড়ল ও, 'থেমো না। ওরা আমাদের ডিটেক্ট করলে গতি কমিয়ে ঘুরে আসবে, ততক্ষণে আমরা বেশ অনেকটা সরে যেতে পারব। যদি পারে তো আমাদের খুঁজে বের করুক। হাতে ছয় মিনিট পেলেই চলবে।'

ইঞ্জিন আর প্রপেলারের আওয়াজ শুনতে পেল ওরা। পানি খলবল করছে। প্যাট্রল বোট দ্রুত আসছে। শব্দ আরও বাড়ল, তারপর ওদের মাথার উপর দিয়ে চলে গেল। টানটান উত্তেজনায় অপেক্ষা করল ওরা, আশা করল বোট আর আসবে না। ওটা দূরে চলে গেল।

আতাসি ফোঁস করে আটকানো শ্বাস ফেলল।

রানার চোখ স্ক্রিনে আঠার মত আটকে গেছে। দশ সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকল ও, তারপর নিচু স্বরে বলল, 'ওরা ঘুরছে। মনে হয় আরেকবার দেখবে। আতাসি, রেডিয়ো চেক করো। ওরা ট্র্যান্সমিট করতে পারে।'

দ্য মার্ভেল অভ গ্রিসের কমিউনিকেন্স ডিভিশন চালায় আতাসি, রেডিয়োর ব্যাপারে সত্যিই জাদু দেখাতে পারে।

দ্য মার্ভেল অভ গ্রিসের কম্পিউটারগুলো প্রতি সেকেণ্ডে এক হাজার ফ্রিকোয়েন্সি অ্যানালাইজ করে। যে প্রোগ্রামগুলো আছে, তাতে সুপার কম্পিউটার একশো বিশটা ভাষায় আলাপ চালাতে পারে। যে-কোনও শ্রোতা বোকা বনে যাবে, বুঝতেই পারবে না কম্পিউটারের সঙ্গে আলাপ করছে। কিন্তু ডিসকভারি ৯৯৯-এ ইলেক্ট্রনিক্স অনেক কম। এই মুহূর্তে আতাসির জন্য যে-কোনও ব্রডকাস্ট ধরা প্রায় অসম্ভব। তাইওয়ানিজ ভাষ্যকার হয়তো ডেপ্থ্ চার্জ ফেলতে চায়, কিন্তু ভাষার কারণে কিছুই বোঝা যাবে না।

একমিনিট চুপ করে শুনল আতাসি, তারপর বলল, 'রেডিয়ো কোনও আওয়াজ করছে না।'

প্যাট্রল বোট আবার চলে এল। ওটার ইঞ্জিনের আওয়াজ বদলে গেল। মনে হলো থেমে দাঁড়িয়েছে।

'আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে,' বলল উর্বশী।

সাব-এর শক্তিশালী সোনার পানিতে ছোট দুটো আওয়াজ ধরল। ডেপ্থ্ চার্জ হতে পারে না। রানা হঠাৎ বুঝে ফেলল ওটা কী। দেরি না করে বলল, 'শক্ত করে কিছু ধরো! গ্রেনেড!'

সম্ভবত আমেরিকার দেওয়া কোনও হাই-এক্সপ্লোসিভ গ্রেনেড। ওগুলো সাধারণত চার আউন্স হয়। এসব বিস্ফোরক পানির নীচে অনেক বেশি ভয়ঙ্কর। গ্রেনেড দুটো ডিসকভারি ৯৯৯-এর পিছনে পড়ে বিস্ফোরিত হলো। ধাক্কা খেয়ে সাব লেজ উপরে তুলল। আতাসি ছিটকে গিয়ে র‍্যাক-ভরা ব্যাটারির সঙ্গে ধাক্কা খেল। উর্বশী সাব-এর নাক তুলতে ব্যস্ত হলো। অ্যাক্রিলিক ভিউ পোর্টে বাইরে দেখা গেল—বিস্ফোরণের ফলে পানি ঘোলাটে হয়ে গেছে।

কানের ভিতর ঝনঝন করছে বলে শুনতে পেল না ওরা, প্যাট্রল বোট দ্বিতীয়বারের মত গ্রেনেড ফেলেছে। ওগুলো সাব-এর মাথার বেশ কিছুটা উপরে

ফাটল। উর্বশী বহুকষ্টে সমতল প্ল্যাটফর্মে ফিরেছিল, আচমকা বিস্ফোরণে সাবটা নীচের কাদায় গেঁথে গেল। পোর্টহোলে শুধু কালি-গোলা অন্ধকার! পরমুহূর্তে অত্যুজ্জ্বল আলো চোখ ধাঁধিয়ে দিল! একদম হতভম্ব হয়ে গেল ওরা। দু'সেকেণ্ড পর বুঝল, কোনও কিছু বিস্ফোরিত হয়নি। ওটা ছিল একটা স্ফুলিঙ্গ। ঝাঁকিতে ভিতরের কোথাও বৈদ্যুতিক তার ছিঁড়েছে। সাব-এর ভিতর গাঢ় অন্ধকার!

গতি পাওয়ার জন্য থ্রটল খুলল উর্বশী। নড়ল না সাব। একটা বাতিও জ্বলল না। এখানে থাকলে পরেরবার মাথায় গ্রেনেড পড়বে!

ওদিকে আতাসি অন্ধকার হাতড়াচ্ছে, নিজের সিটে ফিরতে পারলে রেডিয়োতে কান পাতবে।

ডানপাশের কেবিনেট ঘাঁটল রানা, খুঁদে টর্চটা খুঁজে পেয়ে জ্বালল। চেয়ার ছেড়ে ব্যাটারির র‍্যাকের পাশে চলে এল, টর্চ ঘুরিয়ে চারপাশ দেখল। কিন্তু ক্ষতি যা হওয়ার হয়ে গেছে। পোর্টহোলের ভিতর দিয়ে নীলচে আলো উপরে গেছে! রাতের আঁধারে গভীরের ওই বিদঘুটে আলো প্যাট্রল বোটের যে-কেউ চিনবে!

এইমাত্র নিজের সিটে ফিরেছে আতাসি, ধরা স্বরে বলল, 'আমাদের ধরে ফেলেছে! ওরা কী যেন বলছে! সংক্ষিপ্ত মেসেজ। বস্, এবার লুকোচুরি শেষ!'

সোহেল জিজ্ঞেস করল, 'পারবি তুই, রানা?' ওর কণ্ঠ শুনে মনে হলো পুরোপুরি নিরুদ্বিগ্ন।

চাপা স্বরে বলল রানা, 'পারতে হবে।' আতাসিকে বলল, 'তীরের ওরা কিছু বলে?'

'না। মনে হয় প্যাট্রল বোটের কথা শুনে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে!'

আধমিনিট পর মূল সমস্যাটা ধরতে পারল রানা। দ্রুত হাতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যাটারিগুলো বাইপাস করল। 'ঠিক আছে, উর্বশী, স্টার্ট দাও।'

কন্ট্রোল প্যানেলের সবচেয়ে বড় বাটনটা টিপল উর্বশী, সঙ্গে সঙ্গে ডিসপ্লে-স্ক্রিন জীবন ফিরে পেল।

কো-পাইলটের সিটে বসে পড়ল রানা। 'তিমিটা ওপরে তোলো।'

আপত্তি জানাল উর্বশী, 'ওরা অপেক্ষা করছে!'

তিক্ত হাসল রানা। 'জানি।'

বিড়বিড় করে বলল উর্বশী, 'রানা, গেল সাব-এর ওয়ারেন্টি! তোমার বসের দোস্ত কাঁদবে!' ব্যালাস্ট বাটন টিপল ও, সাব-এর ট্যাঙ্কে কম্প্রেস্‌ড্ এয়ার ঢুকছে, বদলে পানি বেরিয়ে যাচ্ছে। মনে হলো কেউ ওদের টান দিয়ে তুলে নিচ্ছে। দ্রুত উঠছে ওরা। ডেপ্‌থ্ গেজ দেখছে উর্বশী, সারফেসের বিশ ফুট বাকি থাকতে কাউন্ট ডাউন শুরু করল, '...পনেরো ফুট... বারো... আট... ছয় ফুট!'

ডিসকভারি আর পাঁচ ফুট উঠলে ভেসে উঠবে উপরে। ওরা চেয়ারের হাতল ধরে শক্ত হয়ে বসল।

মিনি-সাবের পিঠ লাগল প্যাট্রল বোটের তলায়। সাব অতিদ্রুত উঠে এসেছে, ফলে প্রচণ্ড গুঁতো মারল। দুই জলযান বিকট আওয়াজ তুলল। সংঘর্ষের আওয়াজে কানে তালা লেগে গেল। তুলনায় প্যাট্রল বোটের ওজন খানিকটা বেশি, তবে ওটা স্টার-বোর্ডে পুরোপুরি কাত হয়ে গেছে। মুহূর্তে বোটের রেইলিং পানির নীচে ডুবে

গেল। ডেকে গড়াল ডিজেলের ড্রাম। ওগুলোর একটা এক ক্রুর ডান পা চুরমার করে দিল।

উর্বশীর দিকে ঝুঁকল রানা, সোহেল ও আতাসি মুহূর্তের জন্য ভাবল, মেয়েটাকে চুমু দেবে ও। কিন্তু এক সেকেণ্ড পর বোঝা গেল ওর অন্য মতলব আছে—সাব-এর আপার ডেক ভেসে উঠবার আগেই কন্ট্রোল প্যানেলে পটাপট কয়েকটা বাটন টিপল রানা।

সবাইকে ডোবাতে চায় ও!

ব্যালাস্ট ট্যাঙ্কগুলো মাত্র পনেরো সেকেণ্ডে ভরে গেল। ডিসকভারির ক্র্যাশ ডাইভ শুরু হলো। জলযানটা ভারী পাথরের মত নামছে!

'আপাতত ওরা অন্যদিকে তাকাবে না,' বলল সোহেল।

আতাসি আরও নিশ্চিত হতে চাইল, 'আর সেই সুযোগে চম্পট দেব আমরা?'

'হাতে আড়াই মিনিট পেলে টিকে যাব,' বলল রানা। 'ঠিক আছে, সবাই ইয়ারফোন পরে সিট-বেল্ট বেঁধে নাও।'

ওরা সবাই ভারী ইয়ারফোন পরে নিল, প্লাগ লাগাল একটা ইলেক্ট্রনিক্স গ্যাজেটে। বিসিআই-এর টেকনিক্যাল ডিপার্টমেন্টের ডক্টর শামশের আলী বানিয়েছেন। এ দিয়ে যে-ফ্রিকোয়েন্সির আওয়াজ আসবে, সেটাকে অ্যামপ্লিফাই করে আবার ফেরত পাঠানো হবে। এর ফলে দুটো আওয়াজ একে অন্যকে থামিয়ে দেবে—কানে কোনও চাপ পড়বে না। পাগলা ডক্টর আফসোস করে বলেছেন, তিনি এখনও পুরোপুরি সফল হননি, মাত্র নিরানব্বুই পার্সেন্ট ডেসিবেল ঠেকাতে পারছেন। আশা করছেন, কিছুদিন পরেই পাওয়া যাবে নিঃশব্দ ভ্যাকিউম ক্লিনার, ডেন্টিস্টদের ড্রিল ইত্যাদি!

দুই তাইওয়ানিজ স্পাই দি আফ্রিকান স্টারের হোল্ডে পড়ে আছে। তাদের একজন হঠাৎ চোখ খুলল। একপলকে তার সব মনে পড়ে গেল। ভাঙা চোয়ালের ব্যথা সহ্য করে সঙ্গীকে পরীক্ষা করল।

গাধাটার মাথা ফেটে গেছে। কতবড় সাহস, এখনও অজ্ঞান!

লোকটা দেরি না করে হোল্ড ছেড়ে বেরিয়ে এল। ড্রিউটি তো ডিউটিই! চোয়ালের ব্যথা ভুলে প্রাণপণে চেঁচাতে শুরু করল সে, দৌড়ে মেইন ডেকে উঠে এল, ব্রিজের পিছনের করিডোরে এসে একটার পর একটা দরজা খুলল—দেড় মিনিট পরে ক্যাপ্টেনের কেবিন খুঁজে পেল। এক সেকেণ্ড ভাবল দরজায় নক করবে কি না, কিন্তু সিদ্ধান্ত পাল্টে ফেলল—নাটকীয় ভঙ্গিতে হুড়মুড় করে কেবিনে ঢোকাই ভাল!

জেনারেল হো পিয়েং টেলিফোনে কথা বলছেন: 'আর তারপর? আমার আরও কী কী করবে তুমি, শ্বেতপদ্ম? আমি কিন্তু গরম হয়ে উঠছি!' রোমান্টিক ভঙ্গি নিয়ে বুকে বামহাত রেখে রক্ষিতাকে আরও কিছু বলতে যাবেন, কিন্তু এমনসময় দরজাটা দড়াম করে খুলে গেল। জেনারেল চমকে গিয়ে চেয়ার ছেড়ে মেঝেতে পড়তে পড়তে সামলে নিলেন, লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, ষাঁড়ের মত চেঁচিয়ে উঠলেন: 'অ্যাই! কী হচ্ছে!'

ধূমপায়ী এজেন্ট হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'জেনারেল! ইজরায়েলিরা হামলা করেছে! আমাদের অজ্ঞান করে... ওরা এখন হোল্ডে নেই! আমার মনে হয় পালাচ্ছে!'

'পালাচ্ছে? পালাবে? কোথায়? কেন?' প্রশ্ন ছুঁড়বার এক সেকেণ্ড পর পিয়েং বুঝে গেলেন জবাবটা কী হবে। কোনও কথা না বলে ফোনের লাইন কেটে দিলেন তিনি, তীরের অপারেটরের সঙ্গে কথা বলতে রিসেট লিভার টিপলেন। জবাব দিল না কেউ। জেনারেলের মুখ দিয়ে গালি বেরুল, 'হারামজাদা ধর! ...রানির পোলা! কই তুই!' চোয়াল ভাঙা গুপ্তচরকে বলল, 'আরে শালা, ওরা ইজরায়েলি না! হোল্ড সার্চ করো! ওখানে বোমা আছে!'

এবার টেলিফোনে ঘুম-ভরা একটা কণ্ঠস্বর 'হ্যালো' বলল।

পিয়েং অঙ্কের হিসাব কষে ফেলেছেন—তিনি হয়তো বাঁচবেন না, কিন্তু নকল ইজরায়েলিদের ধরতে পারলে তাঁর দেশ উপকৃত হবে। হয়তো আমেরিকার চড় খেতে হবে না। 'রেড অ্যালার্ট! সবাইকে অ্যালার্ট করো! আমি দি আফ্রিকান স্টার-এ জেনারেল পিয়েং...'

সোহেলের বসানো বোমাটা আর দেড় সেকেণ্ড পর ফাটবে।

'আমি চাই...'

মিসাইলের ভিতর সোহেলের পাতা বোমাটা ফাটল। এক মিলি-সেকেণ্ড পরে সেকেণ্ডারি এক্সপ্লোশন ঘটল ওয়ারহেড-এ! হোল্ডের ভিতরে প্রচণ্ড চাপের সৃষ্টি হলো। চার টন ওজনের হ্যাচগুলো কামানের গোলার মত ছিটকে উড়ে গেল অন্ধকার রাতে। কমলা-লেবুর খোসার মত জাহাজের খোলের প্লেটিংগুলো ছিঁড়ে গেল। হোল্ডের সামনে রাখা মিসাইল ফিউল এবার বিস্ফোরিত হলো।

দি আফ্রিকান স্টার স্রেফ উবে গেল। সেইসঙ্গে গেল আশপাশে নোঙর ফেলা চারটে প্যাট্রল বোট ও লঞ্চ।

সাতশো ফুট কংক্রিট ডকের ওয়েজ চুরমার হলো, বিরাট খণ্ডগুলো চারদিকে ছুটল। প্রকাণ্ড লোডিং ক্রেন দুটো কাত হয়ে পানিতে পড়ল। বন্দরের সামনের সমস্ত কাঁচের জানালা ঝন-ঝন করে ভেঙে পড়ল চৌচির হয়ে। এইবার শুরু হলো শক-ওয়েভের প্রতিক্রিয়া। আট শ' ফুটের মধ্যে যত ওয়্যারহাউস ছিল, সব তাসের ঘরের মত শুয়ে পড়ল মাটিতে। আরও দূরেরগুলোর দেওয়াল খসে গিয়ে খাড়া থাকল কঙ্কালের মত, শুধু স্টিলের ফ্রেম। দূরের স্টাফ কোয়ার্টারগুলোর জানালার কাঁচ চুরচুর হয়ে ভাঙল। অফিসার ও নাবিকদের পরিবার-পরিজন মেঝেতে শুয়ে ভাবল, প্রলয় শুরু হয়েছে! উপকূলের প্রথম ছয় ফুট পানি সরে গিয়ে একটা দেয়াল তৈরি করল, তারপর বিশাল ঢেউ হয়ে ছুটল জলোচ্ছ্বাস। নোঙর করা ডেস্ট্রয়ারকে প্রবল এক ধাক্কা দিয়ে প্রথমে ওটার কীল ভাঙল, তারপর ফেলে দিল কাত করে। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই ডুবে গেল জাহাজটা। এক পলক পর ইজরায়েলি বিশাল জাহাজে জলোচ্ছ্বাসের ধাক্কা লাগল। লাফিয়ে উঠল ওটা, পরমুহূর্তে নাক সোজা হলো সাগর-তলের দিকে, রওনা হয়ে গেল কবরস্থানে। অতবড় জাহাজটার চিহ্নমাত্র রইল না!

গভীর রাত মুহূর্তে ফকফকা দিনে পরিণত হয়েছে। আগুনের বিশাল একটা

ছাতা এগারোশো ফুট উপরে উঠল। জ্বলন্ত মিসাইল-ফিউল বৃষ্টির মত ঝরল চারপাশে, নেভি ইয়ার্ডে নতুন করে আগুন ধরল। দি আফ্রিকান স্টার টুকরো টুকরো হয়ে শ্র্যাপনেলের মত ছড়িয়ে পড়েছে চতুর্দিকে, আশপাশের গাড়িগুলো সব ধ্বংস হয়ে গেল। শ্র্যাপনেলগুলো দূরের কয়েকটা দালান ধসিয়ে দিল।

পেট্রল বোট ডিসকভারির গুঁতো খেয়ে টলমল করছে, এমনি সময়ে শক-ওয়েভ ওটাকে খপ্ করে ধরল। উঁচু পাহাড়ি ঢালে গাছ কেটে ছেড়ে দিলে কাণ্ডটা যেমন ভাবে গড়িয়ে নেমে আসে, বোটটা সেইভাবে গড়াল সাগরের উপর। পাঁচ সেকেণ্ডে ওটার সামনের কামান উধাও হলো, গেল পিছনের .৫০ ক্যালিবারের মেশিনগান। ছোট্ট কেবিনটা ছিঁড়ে আলাদা হয়ে গেল। শেষপর্যন্ত থাকল কেবল বোটের খোলটা—সাগরের অশান্ত ঢেউয়ে দুলছে।

এয়ারপ্লাগ থাকা সত্ত্বেও সাগরতলে ওদের মনে হলো, ডিসকভারি-৯৯৯ চার্চের ঘণ্টার মত কাঁপছে। শক-ওয়েভ যেন আপনমনে ওটাকে নিয়ে খেলছে—সাব-মারসিবল লাফ দিয়ে সামনে ছুটছে, পরমুহূর্তে পাকা রাস্তায় যেন হার্ড ব্রেক করে থেমে দাঁড়াচ্ছে। চার যাত্রী সিট-বেল্ট না বাঁধলে ছিটকে পড়ে মরত। স্ট্র্যাপগুলো বারবার ছিঁড়তে গিয়েও ছিঁড়ল না। স্টোরেজ বিনের ইকুইপমেণ্টগুলো চারপাশে গিয়ে পড়ল। ডক্টর শামশের আলীর কাউণ্টারফ্রিকোয়েন্সি গ্যাজেট না থাকলে ইয়ারফোন কোনও কাজে আসত না, চিরদিনের জন্যে কালা হয়ে যেত ওরা শব্দের ধাক্কায়।

শক-ওয়েভ চলে যাওয়ার পর ইয়ারফোন খুলল ওরা। কে কেমন আছে জানবার জন্য কথা বলতে শুরু করে টের পেল রানা, রীতিমত চেঁচাতে হচ্ছে ওকে। উর্বশী আর সোহেল ঠিক আছে, একটা ব্যাটারি আতাসির মাথায় পড়েছে। চাঁদি ফুলে গেছে—আর কিছু না।

স্বস্তির শ্বাস ফেলে রানা বলল, 'উর্বশী, এবার বাড়ি চলো।'

ওরা বন্দর থেকে দুই মাইল সরে যাওয়ার পর হেলিকপ্টারের আওয়াজ পেল। ওগুলোর গতি ও উচ্চতাই বলে দিল এএসডাব্লিউ কপ্টার নয়—অ্যান্টি সাবমেরিন ওয়ারফেয়ারের জন্য তৈরি নয়। অতি দ্রুত চলেছে। সম্ভবত নান-আও নেভাল বেজে মেডিকেল সাপ্লাই আর ডাক্তার পৌঁছে দিতে চলেছে।

দ্য মার্ভেল অভ গ্রিস আঠারো মাইল দূরে অপেক্ষা করছে। ওখানে পৌঁছাতে আন্দাজ আড়াই ঘণ্টামত লাগবে। সূর্য তার অনেক আগেই উঠবে, তাইওয়ানিজ নেভি-এয়ারফোর্স ওদের খুঁজতে পারে, তাই সে-সুযোগ দেবে না—দেরি হয় হোক, পানির অনেক নীচ দিয়ে যাবে ওরা।

পৌনে তিন ঘণ্টা পর সাগরের নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছল ওরা। উর্বশী আশি ফুট উঠে এল। দ্য মার্ভেল অভ গ্রিসের তলায় রেড অ্যান্টিফাউলিং পেইণ্ট আছে, মিনি-সাব ওটার নীচে পৌঁছে গেল। উর্বশী রিমোট কন্ট্রোল তুলে নিল, জাহাজের তলা তাক করে বাটন টিপল।

কীল-এর তলায় চওড়া দরজা খুলছে—ওটার দৈর্ঘ্য আশি ফুট, প্রস্থ পঞ্চান্ন ফুট। দরজার দু'কপাট নীচে ঝুলে গেল। জাহাজের উজ্জ্বল আলো নীচে নেমে এল। সাগরের অনেকখানি জায়গা ফরসা হলো। উর্বশী ডিসকভারির থ্রাস্টার

DOWNLOADPDFBOOK.COM

নাড়ল, একইসঙ্গে ব্যালাস্ট নিয়ন্ত্রণ করল। জাহাজের খোলা দরজায় থামল। দু'জন স্কুবা ডাইভার আসমান ছেড়ে নেমে এল। এরা সঙ্গে দুটো মোটা কেবল এনেছে, ওগুলো সাব-এর সামনে-পিছনে আটকাল।

উর্বশী সাব নিয়ে নিজেই মুন পুল-এ উঠতে পারত, কিন্তু সেটা সাব-এর জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।

বিসিআই চিফের বন্ধু অবশ্য বারবার করে বলেছেন, সাব-মারসিবল নিয়ে চিন্তা নেই। বিলিয়নেয়ার চ্যাগ্রো পাপাগোপালা আরও বলেছেন, কিছু লাগলে রানা যেন চাইতে দ্বিধা না করে।

এক স্কুবা ডাইভার সাব-এর পোর্টহোলে এল, হাতের ইশারায় জানিয়ে দিল, এবার মোটর থামাতে হবে।

উর্বশী বাটন টিপে মোটর বন্ধ করল। দু'সেকেণ্ড পর নড়ে উঠল সাব, মসৃণ ভাবে উপরে উঠল। সাব-মারসিবলটা মুন পুল-এ তুলে নেয়া হলো। এবার উর্বশী ব্যালাস্ট ট্যাঙ্কের ভাল্‌ভ্ খুলে দিল। পরবর্তী পঁচিশ সেকেণ্ডে সাব-এর পেটের সব পানি বেরিয়ে গেল।

ওভারহেড ক্রেন সাবটা তুলে নির্দিষ্ট ক্রেডল-এ, ডিসকভারি-১০০০-এর পাশে নামিয়ে রাখল। বাংলাদেশ নেভির এক নাবিক সাব-এর উপরে উঠল। হ্যাচ খুলেই হাঁ হয়ে গেল সে, খপ করে মুখ বন্ধ করল—তার আগেই বলে ফেলেছে, 'আরেহ্ শালা, এই অবস্থা হলো কী করে! গন্ধ কীসের!'

উর্বশী রেগে গিয়ে বলল, 'চারদিন ওটার মধ্যে থাকো না তুমি!'

ওরা একে একে বেরিয়ে এল। জাহাজের মেডিকেল অফিসার ফারা রাইনার দু'জন আর্দালি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটা ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে আছে, সবাই সুস্থ দেখে মিষ্টি হাসল।

ফারা রাইনার হল্যাণ্ডের মানুষ, ডাক্তার না হলে নামকরা সুপার-মডেল হতে পারত। তবে রানাকে বেশি টানে ওর বেগুনী চোখ। ওই দুই চোখে অদ্ভুত মায়া আছে। ফারা আফগানিস্তানে দেড় বছর ছিল, যারা ইংল্যাণ্ড-আমেরিকার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, তাদের চিকিৎসা করেছে তখন। রানা একটা কথা কখনও ভুলবে না—সেদিন ফারা না থাকলে গুরুতর আহত সোহেল মারা যেত।

অনুরোধ জানানোয় ফারা জাহাজের মেডিকেল অফিসার পদ নিয়েছে।

সোহেল-আতাসি-উর্বশী দাঁড়িয়ে পড়েছে, মৃদু মাথা নাড়ল রানা। 'আমার একটু দেরি হবে।'

'আমি গোসলে চললাম।' একবার আড় চোখে ফারাকে দেখে নিয়ে চলে গেল উর্বশী।

সোহেল-আতাসি নিজেদের কেবিনের দিকে রওনা হয়ে গেল।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে এক নাবিক, রানা তাকে বলল, 'দরজা বন্ধ করার ব্যবস্থা নাও। মিস্টার গগলকে খবর দাও, উনি যেন কণ্ট্রোল রুমে চলে যান। আমরা সোজা উত্তর-পুবে যাব। গতি বিশ নট।'

'ইয়েস, সার!' স্মার্ট ভঙ্গিতে স্যালুট জানাল নাবিক, ছুটল ইণ্টারকমের খোঁজে।

মৃদু হাসল রানা। মুহূর্তের জন্য অতীতে ফিরল।

ভিনসেন্ট গগল দ্য মার্ভেল অভ গ্রিসের নাম শুনেছে, ছবি দেখেছে—ওটা ওর স্বপ্নের জাহাজ। ও কল্পনা করত, একদিন ওরকম একটা জাহাজ হবে ওর। গগল একবার বলেওছে রানাকে, ওটা যদি চালাতে পারতাম!

দেড় মাস আগে রানা কথায় কথায় বলেছিল, 'তুমি ইচ্ছে করলে দ্য মার্ভেল অভ গ্রিসের ক্যাপ্টেন হতে পারো।'

গগল ফালতু কথার লোক নয়, বলেছিল, 'রানা, আমি সত্যি ওটার ক্যাপ্টেন হওয়ার যোগ্যতা রাখি। কিন্তু ও-জিনিস কেনার সাধ্য নেই। জাহাজের কথা বাদই দাও, ওটায় যা-যা ইকুইপমেন্ট আছে, তার অর্ধেকও জোগাড় করতে পারব না আমি।'

রানা শুধু বলেছে, 'ধরে নাও তুমিই ওটার ক্যাপ্টেন।'

গগল ভেবেছে: রানা কি ওর স্বপ্ন নিয়ে ঠাট্টা করছে? একটু রেগে গিয়ে বলেছে, 'রানা, তোমার সঙ্গে আমার ঠিক এরকম সম্পর্ক না! তুমি কী বদলে গেছ?'

এরপর রানা গগলকে পাকড়াও করে, সোজা নেপল্‌স্ বন্দরে এনে দ্য মার্ভেল অভ গ্রিসে তুলে দেয়। পরের কয়েকদিনে জাহাজের চেহারা পাল্টে যায়। বেশ কিছু নতুন অস্ত্র যোগ করা হয়। বদলে যায় ক্রু। এরপর রওনা হয় দ্য মার্ভেল অভ গ্রিস।

গগল কথা রেখেছে। ও ইউরোপ, আফ্রিকা পার হয়ে মাত্র তেরো দিন পর চিন সাগরে হাজির হয়েছে। রানার দলের সবাই স্বীকার করেছে—এই জাহাজ যেমন সত্যি জাদু দেখায়, এর ক্যাপ্টেনও অদ্ভুত মানুষ—দক্ষতায় তার তুলনা নেই।

ফারা রাইনারের দিকে এগিয়ে গেল রানা। মেয়েটা জরুরি কিছু বলবে, ওর চোখ তা-ই বলে।

এদিকে জাহাজের তল-দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। পাম্প ব্যস্ত হয়ে উঠল, মুন পুলের পানি বের করে দিচ্ছে। ডেক-হ্যাণ্ডরা গর্তটা গ্রিল দিয়ে ঢেকে দিল। চ্যাঙ্গো পাপাগোপালার দেয়া টেকনিশিয়ানরা ডিসকভারি ৯৯৯-এর ক্ষতি পরীক্ষা করে দেখছে। আরেকটা ছোট দল ব্লিচের গ্যালন নিয়ে হাজির হয়েছে, সাব-এর ভিতরটা ধুয়ে পরিষ্কার করবে।

রানা দাঁড়ানোয় শ্রাগ করল ফারা, 'বিস্ফোরণের আওয়াজ পেয়েছি। আন্দাজ করছি কী ঘটেছে। হত্যাকাণ্ড।'

'মিথ্যা নয়, তবে আর কোনও উপায় ছিল না।'

আবার শ্রাগ করল ফারা। 'তোমাকে বিশ্বাস করি আমি। রানা, আমি হাঁপিয়ে উঠেছি অন্য কারণে। মনে হচ্ছে এখানে আমার কোনও কাজ নেই। তুমি নেহায়েত দয়া করে চাকরি দিয়েছ আমাকে।'

মৃদু হাসল রানা, 'এখানে এখন পর্যন্ত সবাই সুস্থ আছে বলে তোমার ভাল লাগছে না? আমি তো ভাবতাম যে-কোনও ভাল ডাক্তার চায় সবাই সুস্থ থাকুক!'

'অবশ্যই!' জোরেশোরে পা ঠুকল ফারা। 'কিন্তু কোনও হাসপাতালে জয়েন

করলে কাজ থাকত।'

'আমরা চেয়েছি এই জাহাজে তোমার মত একজন দক্ষ ডাক্তার থাকুক,' বলল রানা। 'অপেক্ষা করো, ফারা, তোমার কাজের অভাব থাকবে না। তখন হাঁপিয়ে উঠবে কাজের চাপে!'

চার

বিসিআই হেডকোয়ার্টার, মতিঝিল, ঢাকা।

বসের অফিস। মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানের কাঁচা-পাকা ভ্রূ-দুটো কুঁচকে আছে। বাঘের দৃষ্টিতে সামনে বসা দুই এজেন্টকে দেখলেন কয়েক সেকেণ্ড, তারপর ধমকে উঠলেন: 'কী বুঝলে, শোনা যাক এবার। প্রথমে তুমি, সোহেল।'

'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না, সার,' মিনমিন করে বলল সোহেল। 'লোকগুলোকে বৈধ ভাবেই পাঠানো হয়েছে বিদেশে। কাগজপত্র, ভিসা, পাসপোর্ট—কোথাও কোনও গোলমাল নেই। বিদায় নিয়ে হাসিমুখে প্লেনে বা জাহাজে উঠছে, তারপর হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে বেমালুম। দু-তিনটে ধাপ পর্যন্ত ট্রেস করা যাচ্ছে, তারপরেই গায়েব।'

'ব্যুরো অভ ম্যান পাওয়ার, এমপ্লয়মেন্ট অ্যাণ্ড ট্রেইনিং থেকে মিনিস্ট্রিকে জানানো হয়েছে গত আট মাসে সাড়ে চার হাজার বাঙালি হারিয়ে গেছে। মিনিস্ট্রি আমাদের কাছে সাহায্য চেয়েছে।'

'আগে আমাদের জানানো হয়নি, সার,' বলল সোহেল। 'কর্তৃপক্ষের হুঁশ হয়েছে খবরের কাগজে নিকটাত্মীয়দের আহাজারি দেখে। খোঁজ-খবর নিতে গিয়ে যখন দেখেছে একটা জায়গায় পৌঁছে আর এগোনো যাচ্ছে না, খুন হয়ে যাচ্ছে একের পর এক তদন্ত-অফিসার; তখন মিনিস্ট্রিকে ধরেছে আমাদের সাহায্য...'

'আমরা দুই-দুইজন এজেন্ট হারানো ছাড়া আর কী সাহায্যে আসতে পেরেছি এ পর্যন্ত?'

জবাব নেই চিফ অ্যাডমিন-এর মুখে। চোখ নামাল।

এতক্ষণ গভীর মনোযোগে একটা ফাইল দেখছিল রানা, চোখ তুলে প্রথমে সোহেল, তারপর বৃদ্ধের দিকে চাইল।

'গভীর জলের মাছ, সার,' বলল ও।

'মানে?' সোহেলকে ছেড়ে এবার রানাকে ধরলেন বৃদ্ধ।

'আমি খানিকটা খোঁজ-খবর নিয়েছি, সার। শুধু বাংলাদেশই নয়, ভারত-বার্মা থেকে শুরু করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার থাইল্যাণ্ড-মালয়েশিয়া-লাওস-ক্যাম্বোডিয়া-ভিয়েতনাম-ফিলিপাইন, এমনকী খোদ চিন থেকেও প্রচুর লোক হারিয়ে গেছে বিদেশে ভাগ্য গড়তে গিয়ে। ওদের বেশিরভাগেরই গন্তব্য ছিল দক্ষিণ কোরিয়া,

জাপান বা যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম ক্যালিফোর্নিয়ার মত ধনী, শিল্পোন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ।'

'গন্তব্য না হয় জানা গেল, কিন্তু খোয়া যাচ্ছে কোত্থেকে?'

'একেক দেশের লোক একেক জায়গা থেকে, সার। বোঝা যায় যারা এ-কাজ করছে, তাদের বিরাট নেট ওঅর্ক রয়েছে। ওদের মোকাবিলা করতে হলে ক্ষতিগ্রস্ত সবক'টি দেশের একসঙ্গে মিলে কাজ করতে হবে। কয়েকটি দেশের পরিচিতদের সঙ্গে এ-নিয়ে আমি নিজেই যেচে আলাপ করেছি, সার।'

'ওরা তোমার সঙ্গে কাজ করতে রাজি হয়েছে?'

'জিজ্ঞেস করিনি, সার,' বিনীত কণ্ঠে বলল রানা। 'তবে মনে হলো আমরা যদি কিছু করতে চাই, ওদেরকে সঙ্গে পাওয়া যাবে। এই সমস্যা নিয়ে ওদের সরকারও খুবই বিব্রতকর অবস্থায় রয়েছে।'

'কীভাবে এগোতে চাও?' মনে হলো এক ইঞ্চি কমেছে বুড়োর মেজাজ। সামান্য একটু নরম হয়েছে গলার স্বর।

'সার, আমি তো... কাজটার দায়িত্ব কি আমাকে দিতে চাইছেন, সার? আমার তো নিউ ইয়র্কে...'

'এটা আগে। হ্যাঁ, তোমাকেই দায়িত্ব দিতে চাই। অর্ধেক দুনিয়া জুড়ে যারা অপারেশন চালাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে যাকে-তাকে তো আর... মানে, মোটামুটি উপযুক্ত কাউকে পাঠানোই দরকার।'

'ঠিক আছে, সার। সোহেল আর আমি মিলে...'

'ওকে আবার কেন? ও অ্যাসাইনমেন্টে গেলে এখানকার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চলবে কী করে?'

'ও তো দু'জন সহকারী তৈরি করে রেখেছে, সার। তাদের একজনকে টেস্ট করার এই তো সুযোগ।'

'আচ্ছা, সেটা দেখা যাবে। এখন শোনা যাক, কীভাবে এগোতে চাও; আর সেজন্যে ওর স্ট্যাণ্ডার্ডের একজন... মানে...'

খুক করে কেশে লজ্জা ঢাকল সোহেল। মানে খুঁজছে বুড়ো! কারও সামনে কিছুতেই প্রশংসা করবে না!

'আমার ধারণা, ব্যাপারটা সাগরে ঘটছে, সার,' বলল রানা। 'কী যেন করছে সংঘবদ্ধ একটা দল। বিরাট কিছু। এদের মোকাবিলা করতে হলে একটা জাহাজ আর নিজস্ব ক্রু লাগবে আমার। সেই জাহাজের ক্রু ও লজিস্টিকস ম্যানেজ করার জন্যে সোহেলকে দরকার। দক্ষিণ চিন সাগর থেকে আমার পরিচিত এক কার্গোশিপ টাইকুনের বেশ কয়েকটা জাহাজ খোয়া গেছে। যোগাযোগ করলে হয়তো তার সাহায্য পাব আমরা।'

রাহাত খান চুরুট ধরালেন। এয়ারকুন্ড ঘরে ঘামছেন। 'আমি আবিদ খন্দকার আর জয়নাল পাটোয়ারিকে জাকার্তায় পাঠিয়েছিলাম। ওরা তিনদিন আগে খুন হয়ে গেছে, রানা।' কথাটা নালিশের মত শোনাল রানার কাছে।

থমকে গেল রানা। হাসিখুশি ছেলে দুটো আর নেই?

মাথা নিচু করে বসে আছে সোহেল। একই কথা ভাবছে দুই বন্ধু, *'আমরা এই হত্যার প্রতিশোধ নেব। যারা ওদের প্রাণ নিয়েছে, নিজেদের প্রাণ দেবে*

তারা।'

একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল রানা, 'আমরা এখন উঠি, সার? জাহাজের ব্যবস্থা হয়ে গেলে কাজে নেমে পড়ব।'

'জাহাজের ব্যবস্থা হয়েই আছে, ধরে নাও। পাপাগোপালার কথা মনে আছে তোমার? গ্রিসের সবচেয়ে বড় শিপইয়ার্ডের মালিক, চ্যাপ্রো পাপাগোপালা। কার্গো ও প্যাসেঞ্জার শিপ মিলিয়ে দেড় হাজার জাহাজের বহর আছে ওর। বিরাট ব্যাপার। আমি বললে ও সাধ্যমত সাহায্য করবে। তুমি এথেন্সে চ্যাপ্রোর সঙ্গে দেখা করে কেমন জাহাজ দরকার ওকে বুঝিয়ে বলবে। ঠিক আছে? এবার...' ইন-ট্রে থেকে একটা ফাইল টেনে নিলেন বৃদ্ধ।

দুই বন্ধু নিঃশব্দে চেয়ার ছাড়ল, বাঘের খাঁচা ছেড়ে বেরিয়ে গেল পা টিপে। বাঘের ঠোঁটের সস্নেহ হাসিটা দেখতে পেল না।

দু'দিন পর এথেন্স এয়ারপোর্টে নেমে ট্যাক্সি নিল রানা। ইন্টারকনে রুম বুক করাই ছিল, রেজিস্টারে সই করে ব্যাগ-ব্যাগেজ এগারো তলায় ওর কামরায় পাঠিয়ে দিয়ে জুপিটার রোডে চলে এল। একটা বহুতল বিল্ডিঙের সামনে থামল ট্যাক্সি। দু'জন ইউনিফর্ম্ড গার্ড রানার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল, তারা ওকে ক্যাপসুল লিফটে তুলে দিল। ওটা আড়াই মিনিটে বিরাশি তলায় উঠে গেল। দরজা খুলে যেতে প্রকাণ্ড একটা কামরায় ঢুকল ও।

চ্যাপ্রো পাপাগোপালা একটু খুঁড়িয়ে হাঁটেন। রানা শুনেছে, পায়ে সমস্যা থাকায় গ্রিক আর্মি যুদ্ধে নেয়নি তাঁকে । জেদ করে একাই জার্মান বাহিনীর সঙ্গে যথাসাধ্য লড়াই করেছেন।

ওর প্রতীক্ষায় ছিলেন তিনি, চেয়ার ছেড়ে টেবিল ঘুরে এগিয়ে এসে ওর হাত ধরলেন। 'ওয়েলকাম, সান! এসো,' রানাকে পাকড়ে নিয়ে সেক্রেটেরিয়েট টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলেন। একটা গদিমোড়া চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বললেন, 'প্রথমেই শোনা যাক আমাদের চির-নবীন মেজর খানের কথা। থুড়ি, মেজর তো নয়—মেজর জেনারেল। কেমন আছেন তিনি?'

'ভাল, সার,' বলল রানা। 'তিনি আপনাকে আন্তরিক রিগার্ডস জানিয়েছেন।'

'না-না-না! ওঁর আবার অন্তর আছে নাকি? খালি লেফট-রাইট লেফট-রাইট, অ্যাটেনশন! আর আছে হুকুম ঝাড়া! এখনও আগের মতই আছেন তো?'

হাসল রানা। বলল, 'এক্কেবারে!'

হেসে উঠলেন পাপাগোপালা।

মানুষটা তিনি মাঝারি আকৃতির, বেশ মোটাসোটা, দেখে বোঝা যায় শরীরে প্রচণ্ড শক্তি রাখেন। কাঁধ দুটো অতি চওড়া, বুক ঠেলে বেরিয়ে রয়েছে। লোমশ, পেশিবহুল হাত দুটো লক্ষ করবার মতই। ওর হাত যখন চেপে ধরেছিলেন, রানার মনে হয়েছিল আরেকটু চাপ দিলেই আঙুলের সবকটা হাড় পাট-কাঠির মত মট্ মট্ করে ভেঙে যাবে।

ও শুনেছে, ইনি প্রিস্ট হতে গিয়েছিলেন। তা আর হয়ে ওঠেনি। যুদ্ধের পর পাঁচ হাজার টনের একটা গ্রিক কার্গোশিপ কেনেন, শুরু হয় ব্যবসা। ওঁর আর

ফিরে তাকাতে হয়নি। এখন তিনি গ্রিসের প্রথম সারির ধনীদের অন্যতম। ছোট-বড় মিলিয়ে তাঁর অন্তত দেড় হাজার জাহাজ ও পঁচিশটা সুপারট্যাঙ্কার আছে।

রানার জন্য কফি ও স্ন্যাকসের অর্ডার দিয়ে নিজের চেয়ারে বসলেন বৃদ্ধ, টেবিলে কনুই রেখে চিবুক রাখলেন দুই হাতের তালুর উপর। খানিকটা ঝুঁকে এলেন সামনে।

'এবার বলো তো, বাবা, ঠিক কী চাও তুমি, আর কেন।'

সব খুলে বলল রানা। চুপচাপ শুনলেন কোটিপতি। বেয়ারা এসে কফি ও কেক-বিস্কিট রেখে বেরিয়ে যাওয়ার পরেও চুপ করে থাকলেন। বিশ মিনিট পর রানার বক্তব্য শেষ হতে মস্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

'তোমার কথা শুনতে শুনতে আমি আমার প্রথম যৌবনে ফিরে গিয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল শুনছি, মেজর রাহাতের আক্রমণের প্ল্যান।' মস্ত মাথাটা ঝাঁকালেন পাপাগোপালা। 'ঠিক কী ধরনের আর কত বড় জাহাজ দরকার তোমার?'

'অত্যাধুনিক, দ্রুতগামী, মাঝারি আকার, আক্রান্ত হলে পাল্টা আক্রমণ করার উপযোগী। পঁচিশ-তিরিশজন ক্রু নিয়েই যেটা চালানো যায়।'

হাসি ফুটল বৃদ্ধের মুখে।

'ঠিক এমনি একটা জাহাজ তৈরি করিয়েছিলাম আমি আমার নিজের জন্যে। চলো, দেখা যাক, তোমার পছন্দ হয় কিনা।'

ধবধবে সাদা মস্ত লিমাযিনে চড়ে জাহাজ দেখতে গেল রানা পাপাগোপালার সঙ্গে। দ্য মার্ভেল অভ গ্রিস। ঠিক যেমনটি চেয়েছিল রানা। জাহাজটা একপাক ঘুরে দেখে সবকটা দাঁত বেরিয়ে পড়ল ওর।

রানার পছন্দ হয়েছে টের পেয়ে জাহাজের প্রতিটি বিশেষত্ব ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন বৃদ্ধ। তারপর জানতে চাইলেন, 'ঠিক কবে কোথায় জাহাজটা বুঝে নিতে চাও, রানা?'

'ঠিক দেড় মাস পর। নেপলসে। সম্ভব?'

মাথা ঝাঁকালেন বৃদ্ধ। সম্ভব।

তারপর ডেকের রেলিং ধরে সাগরের দিকে চোখ রেখে নিজের সমস্যার কথা জানালেন ওকে।

'আমার ট্যাঙ্কারগুলো একের পর এক উধাও হয়ে যাচ্ছে, রানা। সাগরের বুক থেকে। গত চারমাসে ছয়টা গেছে। ক্রুদের কেউ আর ফিরছে না। ছেলেদের লাশও কোথাও পাওয়া যায়নি।'

'আমার এক জাপানি বন্ধুরও গেছে কয়েকটা জাহাজ,' বলল রানা। 'কানাঘুষা চলছে, একদল দুর্ধর্ষ জলদস্যু নাকি চিন সাগর দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। এমনও হতে পারে: একই দল গায়েব করছে মানুষ ও জাহাজ।'

'অথচ কোনও দেশের নেভি এদের ধরতে পারছে না।' ডেক চেয়ারে বসে পড়লেন পাপাগোপালা। 'বুড়ো হয়ে গেছি, রানা। না হলে লোকজন নিয়ে বেরিয়ে পড়তাম সাগরে। একহাত দেখে নিতাম শয়তানের বাচ্চাদের।' মাথা নিচু করে বললেন, 'এভাবে চলতে থাকলে শীঘ্রি আমার তৃতীয় হার্ট অ্যাটাকটা হয়ে যাবে। ...যাক ওসব কথা। তুমি তো ওদিকেই যাচ্ছ, তা-ই না, রানা?'

'আমি চোখ-কান খোলা রাখব, সার।'

'তা হলে ঠিকই দেখতে পাবে ওদের,' মৃদুকণ্ঠে বললেন পাপাগোপালা। 'আর যদি দেখতে পাও, ওদের ওষুধই খাইয়ে দিয়ো ওদের! কিল দোয বাস্টার্ডস্, রানা। কিল দেম অল।'

রানা একটা হাত রাখল বৃদ্ধের বাহুতে। 'যদি ওদের ধরতে পারি, যা বললেন ঠিক তা-ই করব আমি, সার।'

'থ্যাঙ্কিউ, মাই সান।' হাসি ফুটল বৃদ্ধের কোঁচকানো গালে। 'আর একটা কথা: দ্য মার্ভেল অভ গ্রিসে যদি আরও কোনও সফিস্টিকেটেড গ্যাজেটের প্রয়োজন হয়, বলতে দ্বিধা কোরো না। যত টাকা লাগুক, আমি খরচ করব। ঠিক আছে?'

হাত মেলাল দু'জন অসমবয়সী দুর্ধর্ষ যুবক।

ঠিক দেড় মাস পর সন্ধ্যার ফ্লাইটে নেপ্‌ল্‌স্-এ পৌঁছাল রানা, গগলের সঙ্গে যোগাযোগ করল।

কেবিনের দরজায় জোরে টোকা দিল কেউ।

একটু আগে অ্যাটাচ্‌ড্ বাথরুমের কপার য্যাকুযি টাব ছেড়েছে রানা, দ্রুত হাতে সুতি ট্রাউজার্স ও ওপেন-নেক শার্ট পরে বেরিয়ে এল ও। 'কাম ইন।'

ভিতরে ঢুকল উর্বশী, দু'হাতে ক্লিপবোর্ড বুকে ধরে রেখেছে। রানার শার্টের বুক-খোলা দেখে চট্ করে চোখ সরিয়ে নিল, চোখ রাখল রানার নিষ্পলক চোখে।

রানার মনে হলো ওই দৃষ্টিতে নালিশ আছে। হাতের ইশারায় একটা চেয়ার দেখাল ও। 'বোসো।' উর্বশী বসতেই নিজের চেয়ারে বসল। 'হঠাৎ তলব কেন?'

'তলব? তোমাকে? কই?' শ্লেষের হাসি হাসল উর্বশী। 'উল্টো আমিই তো এসেছি! ...তবে একটু আগে যেন মনে হলো ফারা রাইনার তলব করেছে তোমাকে!'

'গুরুজনরা বলেছেন, কোনও সুন্দরী ডাকলে দেরি না করে ছুটে যাবে,' মিষ্টি একটু হাসল রানা, 'তাঁদের কথা তো আর ফেলা যায় না... যেমন তুমি একবার ডাকলেই আমি...'

'চাপাবাজ!' বিড়বিড় করল উর্বশী। 'তোমার তো একশোটা মেয়ের সাথে ভাব! কিন্তু বিয়ে করবে না!' ক্লিপবোর্ডে চোখ নামাল ও: 'মিস্টার গগল জানিয়েছেন আমরা তাইওয়ানিজ নৌ-বাহিনীর আওতার বাইরে চলে এসেছি। থাকল শুধু ওদের এয়ারফোর্সের সেরা ফাইটার-বম্বারগুলো।'

'ওরা কী করছে?'

'কমিউনিকেশন ইন্টারসেপ্ট করে জানা গেছে ওরা স্ক্র্যাম্বল করেনি। একটু পরে আমরা ওদেরও রেঞ্জের বাইরে চলে যাব।'

'গুড!' টেবিলে পড়ে থাকা সিগারেটের প্যাকেট তুলে নিল রানা, একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'তা হলে আর কোনও সমস্যা নেই।'

'আছে। তোমার বন্ধু নাকিমুচি দু'দিন ধরে খুঁজছে তোমাকে।'

নাকিমুচি মাসিদা অক্সফোর্ডে রানার সঙ্গে লেখাপড়া করেছে। ও ছিল

ভার্সিটির সবচেয়ে ভদ্র ছেলে। একরাতে ক্যাম্পাসে একদল মস্তান ওকে ধরে, পিটিয়ে কেড়ে নেয় টাকা-পয়সা। রানা সে-সময় হোস্টেলে ফিরছিল। আর্তচিৎকার শুনে ছুটে যায় ও, নিজের প্রাণের পরোয়া না করে ঝাঁপিয়ে পড়ে পাঁচ মস্তানের বিরুদ্ধে। প্রথম চোটে রানার ঘুসি-লাথি খেয়ে দু'জন পালায়। বাকি তিন মস্তান পরের সাত মিনিটে হাত-পা ভেঙে শুয়ে পড়ে মাটিতে। রানা ওদের হাসপাতালে পৌঁছে দেয়। নিজের শরীর থেকেও ছোরার আঘাতে রক্ত গড়াচ্ছিল তখন রানার। এরপর মাসিদার সঙ্গে বন্ধুত্ব গাঢ় হয়ে ওঠে। সব শুনে ওর বাবা হাবাগোবা নিকুচিও নিজে এসে রানার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন।

নাকিমুচি মাসিদা ডক্টরেট শেষে পারিবারিক ব্যবসার হাল ধরেছে, অল্পদিনেই জাহাজ মালিকদের একটা বড় কনসোর্টিয়াম গড়ে তুলেছে।

'ওয়্যারলেসে যোগাযোগ করেছে নিশ্চয়ই?' বলল রানা। 'ওকে বলেছি আমাকে ফোনে পাবে না। ...কী বলেছে?'

'সোজা কথায় সাহায্য চেয়েছে। তার আরেকটা জাহাজ গেছে। "টায়ে-টায়ে"। এটাও কন্টেইনার শিপ।'

'আগেরগুলোর মত ওটাও উধাও? এবারও কোনও ক্রু ফেরেনি?'

'না।' উর্বশী চট করে ক্লিপবোর্ড দেখে নিল। 'জানিয়েছে, তার জাহাজগুলো জাপান-সাগরে যেভাবে উধাও হয়েছে, সেটার দূরত্ব হিসাব কষে মনে হয়, ডাকাতরা অন্তত চারটে ট্রলার কাজে লাগিয়েছে। একই সঙ্গে বিভিন্ন এলাকায় হামলা হয়েছে।'

'আক্রমণগুলো কীভাবে এসেছে, সেসব জানিয়েছে?'

'ডিটেইলস-এ? বলেছে যত দ্রুত সম্ভব জানাবে।'

'জানাক, আমরা আমাদের সাধ্যমত করব। এসব জাহাজে এরপরে আবার কখন হামলা হবে, তা বোঝার জন্যে অনিল একটা কম্পিউটার প্রোগ্রাম তৈরি করছে। ওটা শুধু মিস্টার পাপাগোপালার নয়, ওটা নাকিমুচিরও কাজে লাগবে। এদিকে সোহেলের সঙ্গে বসে একটা কাভার-স্টোরি বানাব আমি। এমন কিছু হতে হবে, যেটার লোভে জলদস্যুরা ধারেকাছে আসবে।'

'তারপর...' আর কিছু বলল না উর্বশী। 'অনিল বলেছে এদের পজিশন বের করা যাবে।'

অনিল জাহাজের ওয়েপন্স স্পেশালিস্ট হিসেবে কাজ করছে।

'হয়তো খানিকটা সময় লাগবে, কিন্তু আমরা ওদের ঠিকই পাব,' বলল রানা।

'মিস্টার গগলকে পজিশনটা জানালেই কোর্স সেট করে রওনা হয়ে যাবে,' চেয়ার ছাড়ল উর্বশী, দরজা খুলে বেরিয়ে যাওয়ার আগে বলল, 'একটু পর লাঞ্চ দেবে।'

সিগারেট শেষে আপার ডেক-এ বেরিয়ে এল রানা, জাহাজের চারপাশটা ঘুরে ঘুরে দেখল। জাহাজের জ্যাকস্টাফে ঝুলছে আধময়লা একটা গ্রিসের পতাকা।

গোটা জাহাজে নানান ধরনের কারিগরি ফলানোয় এখন যে-কেউ দ্য মার্ভেল অভ গ্রিসকে দেখে বলবে: বহু পুরনো—উচিত ছিল অনেক আগেই ওটা ডক-ইয়ার্ডে নিয়ে ভাঙা।

জাহাজটা দৈর্ঘ্যে পাঁচশো ষাট ফুট, চওড়ায় পঁচাত্তর ফুট। ওজন কমবেশি সাড়ে এগারো হাজার টন। জাহাজে তিনটে ক্রেন। সব ক'টা জং ধরা। তার মধ্যে দুটো কাজ করে, অন্যটা খামোকা বসে আছে। মরচে ধরা ডেক, তাতে জায়গায় জায়গায় নানান রং। দেখলে মনে হয় ডেকটা কতকাল রং করা হয়নি, কে জানে! রেইলিং বাঁকা হয়ে গেছে বাইরের দিকে। ভয় হয়, হাতের ধাক্কায় পড়ে যাবে পানিতে। কয়েকটা কার্গো হ্যাচের মুখ হাঁ হয়ে আছে। আশপাশে যে-কটা হ্যাচ দেখা গেল, সবগুলো সাগরের লোনা পানিতে নষ্ট হচ্ছে।

হুইল-হাউজের সামনে একগাদা ড্রাম। ড্রাম থেকে তেল চুইয়ে পড়ছে ডেকে। ওখানে ভাঙা উইঞ্চ থেকে শুরু করে টায়ার-ফাটা সাইকেলও পাওয়া যাবে। চারপাশ বিশ্রী রকমের নোংরা।

জাহাজের খোলে স্টিলের প্লেট দিয়ে নানান জায়গায় পট্টি মারা হয়েছে। যে-কেউ বুঝে নেবে, ওয়েল্ডিং না করলে এই মাল আর চলত না। জাহাজের গায়ে লেপ্টে আছে সবুজ পেইন্ট। দেখলে মনে হয় অনেক আগে নীল রং করা হয়েছিল, এখন সবুজকে ঠেলে বেরিয়ে আসছে।

ইন্সপেক্টর, বন্দর-কর্মকর্তা বা পাইলটরা এই জাহাজে বেশিক্ষণ টিকবে না, তাড়াতাড়ি নেমে পড়বে। এত পুরনো, বাজে একটা জাহাজে কে থাকতে চায়। ভাল! খুবই ভাল!

মৃদু হাসল রানা।

হঠাৎ ঠং-ঠং করে একটা ঘণ্টি বেজে উঠল। বাংলাদেশ নেভির পাখোয়াজ বাবুর্চি জানিয়ে দিল, এবার আপনারা খেতে আসতে পারেন।

'চল্। তোর সঙ্গে কথা আছে।'

কানের কাছে সোহেলের কণ্ঠ শুনে ঘুরে দাঁড়াল রানা। 'চল্। যাই।'

হঠাৎ তীক্ষ্ণ একটা আওয়াজ শোনা গেল। শব্দটা জাহাজের ওয়াটার লাইনের কাছে।

রেইলিঙের পাশে চলে গেল ওরা, সাবধানে ঝুঁকে নীচে তাকাল। জাহাজের খোলে কয়েকটা স্পেশাল ট্যাঙ্ক আছে, ওগুলো প্রাণপণে পানি গিলছে। ওয়েক লাইন দেখল ওরা। কিছুক্ষণ পর জাহাজের নড়াচড়া ধীর হয়ে যাবে, মনে হবে হোল্ড ভারী মালে পূর্ণ। দ্য মার্ভেল অভ গ্রিসের কোর্স একটু পাল্টে গেছে। গগল জাহাজ নিয়ে উত্তর-পুবে রওনা হয়েছে।

'তোকে বলতে এসেছিলাম, কোথায় খাপ পেতে অপেক্ষা করতে হবে সেটা খুঁজে বের করেছে অনিল,' সোহেল বলল, 'আমরা খুঁটিতে বাঁধা ছাগল হবো।'

রানা মাথা দোলাল। 'জলদস্যুরা মনে করবে ওরা বাঘ।'

কে বলবে এই জাহাজে আছে অত্যাধুনিক সব মারণাস্ত্র, সেইসঙ্গে আছে একদল হাইলি ট্রেইণ্ড কমাণ্ডো—যারা সবাই তৈরি থাকবে।

গগল পরদিন সন্ধ্যায় নির্দিষ্ট গ্রিডে পৌঁছে গেল। নাকিমুচি এরইমধ্যে যোগাযোগ করেছে, জানিয়েছে শেষ কয়েকটা আক্রমণ কোথায় এবং কীভাবে হয়েছে। জানা গেছে ওর জাহাজগুলো থেকে আজ পর্যন্ত মাত্র তিনজন নাবিক বেঁচে ফিরেছে।

অনিল চ্যাটার্জি ও লিউ ফু-চুং আবহাওয়া, চাঁদের অবস্থান, জাহাজগুলোর আকৃতি, কার্গোর পরিমাণ, ক্রু-সংখ্যা ছাড়াও আরও এক ডজন ফ্যাক্টর নিয়ে কাজ করেছে। ওরা দ্য মার্ভেল অভ গ্রিসকে যেখানে নিয়ে এসেছে, তাতে জলদস্যুদের আক্রমণ আসা উচিত।

ওরা জাপান সাগরে ফুকুওকার কাছে চলে এসেছে। গত একমাসে নাকিমুচি এখানে দুটো জাহাজ হারিয়েছে।

রানা ও সোহেলের কথায় অনিল ডেটা বেজে ঢুকে প্রচুর ভুয়া তথ্য ছড়িয়েছে। যে-কেউ একটু কষ্ট করলেই জানবে, এক নামকরা আমেরিকান লেখক দুনিয়া ঘুরতে বেরিয়েছেন এই জাহাজে। সত্যিই অ্যাডলি কাস্টার দুনিয়া চষে বেড়াচ্ছেন, নতুন বইটা শেষ করছেন একটা সুপার-ট্যাঙ্কারে। কিন্তু তথ্য এখন বলছে, তিনি আছেন এই জাহাজে। তাঁকে কিডন্যাপ করলে অন্তত পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার মুক্তিপণ পাওয়া যাবে। যদিও এটা ওদের লাইন নয়, জলদস্যুদের লোভ না হওয়ার কোনও কারণ নেই।

সকাল থেকে ফু-চুঙের সঙ্গে কাজ করছে অনিল। এর ফলে ওরা আরও ভালভাবে ডেটা বেইস হ্যাক করতে পেরেছে। এখন কে বলবে দ্য মার্ভেল অভ গ্রিস আসলে দারুণ লোভনীয় একটা মার্চেন্ট শিপ নয়। কথা ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে, এই জাহাজের সেফ-এ আছে ওদের কোম্পানির স্যালারির কয়েক লাখ ডলার। আরও লেখা হয়েছে, জাহাজটা নিগাটা থেকে দামি টিম্বার আর ইলেকট্রনিক গুড্‌স্ নিয়ে আসছে।

রানা-সোহেল-অনিল-ফু-চুং-উর্বশী আন্দাজ করছে, নামকরা লেখক, সিন্দুক ভরা ডলার আর লোভনীয় কার্গো জলদস্যুদের টেনে আনবে।

সাগরে রক্তলাল সূর্য ডুবছে, বিদায় নেওয়ার আগে গাঢ় লালিমা ছড়িয়ে দিল মেঘে। বহুদূরে, সেই কামচাটকা পেনিনসুলায় একটা আগ্নেয়গিরি খেপে উঠেছে, দু'হাতে ছাই আকাশে ছড়িয়ে দিচ্ছে। রক্তিম চাঁদ দিকচক্রবাল টপকাল, সেইসঙ্গে উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলো ম্লান হয়ে গেল। শান্ত সাগর, তাতে চাঁদের হলুদ প্রতিচ্ছবি ভূতুড়ে দেখাচ্ছে।

রাত এগারোটায় কমাণ্ডোরা জাহাজের ব্যাটল স্টেশনে জমায়েত হলো।

ফারা রাইনার ওর দুই আর্দালি নিয়ে মেডিকেল বে-তে অপেক্ষা করছে—ওরা ক্রুদের সাধারণ কাটাছেঁড়া থেকে শুরু করে গুরুতর যে-কোনও জখমের জন্য তৈরি।

সন্ধ্যায় জাহাজের আর্মামেন্ট আরেকবার পরীক্ষা করা হয়েছে।

জার্মানি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যেসব কে-বোট ব্যবহার করত, দ্য মার্ভেল অভ গ্রিস ঠিক সেভাবেই আক্রমণ করতে সক্ষম। জাহাজের দু'পাশের খোল খানিকটা নেমে যাবে, বেরিয়ে আসবে কয়েকটা একশো বিশ এমএম কামান। অটো ক্যাননের ফায়ার কন্ট্রোল ও রেঞ্জিং সিস্টেম বসানো হয়েছে এম-ওয়ানএওয়ান অ্যাব্রাম্‌স্ ট্যাঙ্কের অনুসরণে।

জাহাজে আরও আছে তিনটে বিশ এমএম রেইডার-কন্ট্রোল্ড মালটি-ব্যারেল গ্যাটলিং গান। ওগুলোর প্রতিটি এক মিনিটে তিন হাজার রাউণ্ড গোলা-বর্ষণ

করতে পারে। গ্যাটলিং সাধারণত মিসাইল ঠেকাতে ব্যবহৃত হয়, তবে ওটা বিমানও ফেলে। এই জাহাজের গ্যাটলিং গান আরেকটা কাজে সক্ষম—শত্রু জাহাজের যে-কোনও দিকে গুলিবর্ষণ করতে পারে, ফলে জাহাজের খোল ঝাঁঝরা করা যায়। গ্যাটলিং গানের আক্রমণে যে-কোনও মাঝারি জাহাজ দু'মিনিটে ডুবে যাবে।

এছাড়া রয়েছে বেশ কয়েকটা লুকানো মেশিনগান। ওগুলোতে আছে থারমাল-আইআর সাইট। গানার ইচ্ছে করলেই অপারেশন্স সেন্টারে বসে ভিডিও ডিসপ্লে দেখে টার্গেট নির্ধারণ করতে পারবে।

সামনের একটা হ্যাচ সরিয়ে দিলে চারটে ফ্রেঞ্চ শিপ টু শিপ এক্সোসেট মিসাইল লঞ্চ করা যাবে। আরেকটু দূরে রয়েছে আরেকটা হ্যাচ, ওটা লুকিয়ে রেখেছে দুটো রাশান ল্যাণ্ড অ্যাটাক ক্রুজ মিসাইল। ওগুলো অনিল ইণ্ডিয়ান আর্মির কাছ থেকে যোগাড় করেছে। জাহাজে আরও আছে দুটো টিউব সহ মার্ক-৪৮ অ্যাডক্যাপ টর্পেডো। চোরাই মার্কেটে ওগুলোর দাম আঠারো লাখ ডলার। গগল এক আমেরিকান ভাইস অ্যাডমিরালকে তেরো লাখ ডলার ঘুষ দিয়ে কিনেছে।

রানা ঠিক রাত সাড়ে এগারোটায় অপারেশন্স সেন্টারে ঢুকল। ব্যাটল-স্টেশনের লাল আলোয় সবাইকে অদ্ভুত লাগল। সবার সামনে ডিসপ্লে স্ক্রিন জ্বলছে।

সোহেল অপারেশন্স সেন্টারে অপেক্ষা করছে। সামনের বাল্কহেডে ওয়ার্ক-স্টেশনে বসেছে। পিছনে বসে আছে আতাসি ও উর্বশী।

আতাসি কমিউনিকেশন গিয়ারগুলো মনিটর করছে। উর্বশী রেইডার ও ওয়াটার-ফল সোনার ডিসপ্লে দেখছে। ওর ক্রুরা প্রস্তুত, জাহাজে কোথাও আগুন ধরলে নেভাবে।

একটু আগে ফু-চুং এসেছে। জাহাজে শত্রুদল উঠলে ট্যাকটিকাল ট্রুপ নিয়ে বাইরে গিয়ে লড়াই করবে ও।

জাহাজের ওয়েপন্স স্পেশালিস্ট অনিল অপেক্ষা করছে। ওর কাজ রিমোট কন্ট্রোল্ড অস্ত্রগুলো চালানো। ওর আরেকটা কাজ ফায়ার অ্যাণ্ড ড্যামেজ কন্ট্রোল নির্ধারণ করা। কাছেই ছোট্ট একটা দল অপেক্ষা করছে, তারা অনিলের অস্ত্রের গোলা ফুরিয়ে গেলে অ্যামো যোগান দেবে।

গগল ইঞ্জিন রুমের সঙ্গে কথা বলল। একটু পরে নিচু স্বরে বলল, 'বোর্ডে সব গ্রিন দেখাচ্ছে। মার্ভেলের প্রপালশন সিস্টেম ঠিকই আছে। ওভার।'

উর্বশী কিছুক্ষণ আগে সবাইকে সতর্ক করেছে। ত্রিশ মাইল দূরে একটা ট্রলার হঠাৎ করেই কোর্স পাল্টেছে। এখন ওটা মার্ভেলকে লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছে। কোনও কারণ ছাড়া তেল খরচ করবে না কেউ। জানতে হবে ওরা কী চায়।

কমাণ্ড-স্টেশনে নিজের চেয়ারে বসল রানা, একবার চারপাশ দেখে নিল। চ্যাপ্রো পাপাগোপালা নিজের জন্য রাজকীয় চেয়ার বসিয়েছেন। মনে হয় টিভিতে স্টার-ট্রেক মুভি দেখতেন। জাহাজের কমাণ্ড রুমটা ঠিক আকাশযান এণ্টারপ্রাইজের কমাণ্ড রুমের অনুকরণে বানিয়েছেন। সামনে বিশাল একটা স্ক্রিন, ওটা দিয়ে বাইরের পরিস্থিতি দেখা যায়।

স্ক্রিন ছেড়ে রানার দিকে তাকাল না উর্বশী। 'কন্ট্যাক্ট ও-সেভেনটিন ডিগ্রি, রানা। সোজা আসছে আমাদের দিকে। গতি বিশ নট। দূরত্ব একুশ মাইল।' আর সবার মত কালো ব্যাটল ফেটিক পরেছে ও, কোমরে সিগ সাওয়ার অটোমেটিক পিস্তল।

ডিসপ্লে দেখল রানা। 'আর কিছু?'

'ওটার দৈর্ঘ্য সত্তর ফুট। ইঞ্জিন একটা মাত্র প্রপেলার চালায়। চার নটে চলছিল আমাদের দেখার আগে। ওটার কীল দেখে মনে হচ্ছে আগে মাছ-ধরা ট্রলার ছিল।'

'রেডিয়ো কিছু বলে, আতাসি?'

'ওদের কোনও কথা নেই, বস। তবে আমাদের গ্রিডের অনেকটা দূরে দুটো বাল্ক ক্যারিয়ার আলাপ করছে।'

মার্ভেলের হ্যাঙার বে-তে যোগাযোগ করল রানা। 'রানা স্পিকিং। পাইলটকে বলে রাখুন পাঁচ মিনিটের নোটিশে রবিনসন টেকঅফ করাতে হবে।' বাটন টিপে মার্ভেলের ওপেন চ্যানেলে কথা বলল ও, 'রানা স্পিকিং। আমরা সম্ভবত টার্গেট পাচ্ছি। মনে রাখবেন, ওদের দিয়ে কথা বলাতে চাই। রিপিট করছি, আমাদের বন্দি দরকার। তবে কেউ অতিরিক্ত ঝুঁকি নেবেন না। ওভার।'

আরেকবার চারপাশ দেখে নিল রানা। সবাই যার যার কাজ করছে। কারও চোখে-মুখে কোনও উত্তেজনা নেই। শীতল, প্রফেশনাল। ওরা অপেক্ষা করছে, পরের চালটা ওই দূরের ট্রলারের ক্রুরা সম্ভবত চালবে।

কিছুক্ষণ পর রানা বলল, 'গগল, গতি সামান্য বাড়াও। যেন ওদের উপস্থিতি টের পেয়ে পালাতে চাও। ওরা ভাবুক, এত সহজ টার্গেটকে ছাড়া যায় না। ব্যালাস্ট পাম্প তৈরি রাখো, দরকার হলে যেন ওজন কমিয়ে সরে পড়তে পারি।'

'ওকে, রানা।'

আরও পনেরো মিনিট পর রানা জিজ্ঞেস করল, 'রেঞ্জ কত, উর্বশী?'

'দুই মাইল,' থমকে গেল উর্বশী, স্ক্রিনে কী যেন দেখল আবারও। 'আরেহ্! ওটা কী?' আর কিছুই বলছে না।

রানা বলল, 'আমাদের একটু শোনাও শুনি।'

ডিসপ্লে ছেড়ে রানার দিকে তাকাল উর্বশী। 'অবিশ্বাস্য! ট্রলারের নীচে সোনার কন্ট্যাক্ট পাচ্ছি। ডেপ্থ্ সত্তর ফুট। ...ট্রলারের নীচে ওরা একটা সাবমেরিন লুকিয়ে রেখেছে!'

পাঁচ

উর্বশীর বক্তব্য চুপচাপ হজম করল রানা। পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছে সবাই। শুধু অনিল বোমা ফাটাল, 'এইমাত্র ট্রলার মিসাইল ছুঁড়েছে! সাতচল্লিশ সেকেণ্ড পর ইমপ্যাক্ট! গ্যাটলিং লাইনে আনছি!'

এক সেকেণ্ড পর সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠল। ওরা জানে এরকম পরিস্থিতিতে কী করতে হবে। দেরি না করে রানা বলল, 'অনিল, আমার সিগনাল না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর্। আমাদের ওয়েপন্স রেডি রাখ, আমরা পাল্টা হামলা করব। ডেপথ্ চার্জ তৈরি রাখ। ...গগল, পাম্প চালু করে ট্যাঙ্ক খালি করো। হয়তো আমাদের ইঞ্জিনের পুরো শক্তি লাগবে।'

'সাবটা চুপচাপ পড়ে আছে,' বলল উর্বশী। 'কোনও প্রপালশান নেই। আক্রমণ করবে বলে মনে হয় না।'

'অনিল, মিসাইল ইমপ্যাক্ট কখন?'

ডিসপ্লে দেখছে অনিল। 'আর তিরিশ সেকেণ্ড।'

অপেক্ষা করল রানা। টের পেল, মার্ভেলের ব্যালাস্ট ট্যাঙ্ক খালি হয়ে যাচ্ছে। ম্যাগনেটোহাইড্রোডাইনামিক ইঞ্জিন কয়েক সেকেণ্ডে সর্বোচ্চ গতি তুলতে পারবে। জাহাজের দৈর্ঘ্য পেরোতে বড়জোর আড়াই সেকেণ্ড লাগবে। ওর পরিকল্পনা যদি কাজ না-ও করে, তবুও মিসাইল আঘাত হানবে না।

'সোনার?'

মাথা নাড়ল উর্বশী। 'আমি বাতাস বেরিয়ে যাওয়ার আওয়াজ পাচ্ছি। অথচ সাবমেরিন ডুবছে না।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। সাবমেরিন এখনও কোনও বিপদ ঘটায়নি। আরও কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করল ও। মিসাইলটা আরও কাছে আসুক, তারপর উড়িয়ে দেবে ওরা। এর ফলে জলদস্যুরা ধরে নেবে জাহাজে বিস্ফোরণ ঘটেছে। 'ঠিক আছে অনিল, ইমপ্যাক্ট দশ সেকেণ্ড বাকি থাকতে গ্যাটলিং চালু করিস। ...গগল, গতি কিছুটা কমাও। কিন্তু বললেই থ্রটল খুলে লাফ দিয়ে এগোবে।'

একটা ক্যামেরা বাইরের অবস্থা দেখাচ্ছে। অনিল মেইন স্ক্রিন দেখল। হঠাৎ অন্ধকারে কী যেন ঝিলিক দিয়ে ছুটে এল। ওটা সাগর-সমতলের বারো ফুট উঁচু দিয়ে আসছে। এত দ্রুত ছুটছে যে বোঝা যায় ওটার গতিবেগ ঘণ্টায় অন্তত এক হাজার মাইল। একটু বাঁকা পথে আসছে, লাগবে ঠিক মার্ভেলের স্টার্নে। জলদস্যুরা স্টিয়ারিং গিয়ার ও প্রপেলারে আঘাত হানতে চায়। জাহাজের গতি স্তব্ধ হলে খেলা দেখাবে তারা। জাহাজ লুটপাট করতে, বা কাউকে কিডন্যাপ করতে হলে বুদ্ধিটা ভাল।

অনিল এগারো সেকেণ্ড বাকি থাকতে গ্যাটলিঙের সেফটি ট্রিগার সরাল। ওটার ইলেকট্রনিক মগজ রেইডার সিস্টেমকে নির্দেশ দিল। মাইক্রোসেকেণ্ডের মধ্যেই হিসাব কষে বুঝে নিল মিসাইলের ট্র্যাজেকটোরি, উইণ্ডেজ, হিউমিডিটি ও আরও শতখানেক বিষয়।

মার্ভেলের মাস্টার রেইডার প্রথমেই ছুটন্ত মিসাইল ডিটেক্ট করেছে, সঙ্গে সঙ্গে দু'পাশের গান এমপ্লেসমেন্ট নামিয়ে দিয়েছে। এবার গ্যাটলিং গান এইম করল। ওটার ইলেকট্রিক মোটর ছয় ব্যারেল ঘোরাল। কম্পিউটার ও রেইডার একইসঙ্গে বুঝে নিল ওদের সামনে একটা টার্গেট রয়েছে। মুহূর্তে একফুট দৈর্ঘ্যের বিশ-মিলিমিটার ইউরেনিয়াম শেলগুলো ব্রিচে ঢুকে গেল। পরমুহূর্তে তপ্ত রাউণ্ডগুলো মিসাইলের সঙ্গে দেখা করতে ছুটল।

গ্যাটলিং থেকে বিশ্রী আওয়াজ বের হলো, মনে হলো কোনও কারখানায় করাত চলছে। পাঁচ সেকেণ্ড বর্ষণ শেষে থামল ওটা। মিসাইল মার্ভেলের চল্লিশ গজ দূরে থাকতে গোলার দেয়ালে বাধা পেল। বিস্ফোরণটা সাগরে আগুন ছড়াল। মনে হলো মার্ভেলের একপাশে ছোট্ট একটা সূর্য উঠেছে। মিসাইলের টুকরোগুলো পানিতে অগভীর নালা তৈরি করল। অল্প কিছু ছিটকে এসে পড়ল জাহাজের গায়ে।

'গগল, মার্ভেলকে সাতানব্বুই ডিগ্রি ঘোরাও,' রানা বলল, 'লেফটেন্যান্ট আফতাবকে বলো আমরা একটা ধোঁয়ার আড়াল চাই। ...আতাসি, তুমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ইমার্জেন্সি ফ্রিকোয়েন্সিতে মে-ডে পাঠাবে। তবে রেডিয়োর পাওয়ার কমিয়ে রাখবে, শুধু যেন আমাদের বন্ধুরা শুনতে পায়।'

ইঞ্জিন রুমে যোগাযোগ করল গগল। 'মিস্টার অ্যাফট্যাভ, আমাদের একটা স্মোক স্ক্রিন দরকার। এমন কিছু হতে হবে, যেটা বলে দেবে আমরা শীঘ্রি ডুবছি।'

'আই-আই, সার, এক্ষুণি পেয়ে যাবেন,' বলল আফতাব। রানা ওকে বাংলাদেশ নেভি থেকে পিক করেছে।

উর্বশীর দিকে তাকাল রানা। 'সাবমেরিনটা কী করছে?'

'কিছুই না। সোনার চুপ। আমরা ঘুরে যাওয়ায় ওটা এখন আমাদের পেছনে আছে। কোনও যন্ত্রপাতি নড়ছে না। শুধু বাতাস ছাড়ার আওয়াজ পাচ্ছি।'

'ওটার আকৃতি কীরকম?'

'অদ্ভুত। লম্বায় একশো তিরিশ ফুট, চওড়ায় পঁয়ত্রিশ ফুট। খাটো আর মোটা, সাধারণত সাবমেরিন এরকম হয় না।'

'কম্পিউটার ওটার সঙ্গে কোনও সাবমেরিন মেলাতে পারছে না?'

'না। মন বলছে ওটা আগে থেকে ওখানে বসে আছে।'

'ঠিক আছে, একটা চোখ রেখো। পরে দেখব কী করা যায়। আমরা এখন ট্রলারের দিকে মনোযোগ দেব।' চুপ হয়ে গেল রানা।

আতাসি মে-ডে পাঠাল। দুর্দান্ত অভিনয় করল। যেন সত্যিই ভয়ংকর বিপদে পড়েছে। ওর কথা শুনে মনে হলো, বেচারা এইবার শেষই হয়ে গেল!

খসখসে স্বরে জবাব এল, 'মোটর ভেসেল দ্য মার্ভেল অভ গ্রিস, আমরা ট্রলার শিরি-ফোর। মে-ডে কেন পাঠাচ্ছ জানাও। তোমাদের সমস্যা কী?' ট্রলারের ট্র্যান্সমিশন দুর্বল ভাবে শোনা গেল। ওরা সম্ভবত লো পাওয়ারে জবাব দিচ্ছে। উচ্চারণ শুনে বোঝা গেল না কোন্ দেশি লোক।

'শিরি-ফোর, দ্য মার্ভেল অভ গ্রিস থেকে বলছি। আমাদের স্টিয়ারিং গিয়ারে বিস্ফোরণ ঘটেছে। হেলম একদম কাজ করছে না। আমরা স্রোতে ভেসে যাচ্ছি। আরও কী ক্ষতি যে হয়েছে...'

'মার্ভেল, শিরি-ফোর বলছি। আমরা ছয় মাইল দূরে আছি। ম্যাক্সিমাম স্পিডে আসছি। অপেক্ষা করো।'

'হুঁ!' বিড়বিড় করল আতাসি। মাইকে বলল, 'ধন্যবাদ, শিরি-ফোর। ভাগ্যিস আপনারা কাছে আছেন। আল্লাহ্ মেহেরবান! আমরা স্টার-বোর্ডে সিঁড়ি নামাচ্ছি।

দয়া করে সঙ্গে ফায়ার-ফাইটিং ইকুইপমেন্ট নিয়ে আসবেন।'

'শিরি-ফোর টু দ্য মার্ভেল অভ গ্রিস। ঠিক আছে। আউট!'

মাইক রেখে দিল আতাসি।

রানা বলল, 'তা হলে শুরু হলো।'

'আমরা চললাম,' উঠে দাঁড়াল ফু-চুং। ট্যাকটিকাল ট্রুপ নিয়ে বাইরে গিয়ে লড়াই করবে।

এলিভেটরে চড়ে পাঁচ সঙ্গী নিয়ে সুপারস্ট্রাকচারের প্যাসেজ-ওয়েতে চলে এল ও। কালো ফেটিগের কারণে ওদের ভূতের মত দেখাল। সবাই ফেটিগের তলায় কেভলার আর্মার পরেছে। চোখে থার্ড জেনারেশন চিনা নাইট ভিশন ভাইজর। প্রত্যেকের সঙ্গে একটা করে সাউণ্ড-সাপ্রেস্‌ড্ এমপি-ফাইভ মেশিন-পিস্তল আর সিগ সাউয়ার অটোমেটিক। আর্মারি থেকে কম ক্ষমতাশালী বুলেট নিয়েছে ওরা। বুলেটগুলো যে-কাউকে আহত করবে, কিন্তু দেহ ছিন্নভিন্ন করবে না। ওদের কোমরে ঝুলছে ফ্ল্যাশ-ব্যাঙ গ্রেনেড, সঙ্গে দশ মিনিট লড়াই করবার মত স্পেয়ার ম্যাগাজিন।

ফু-চুং আগেই আলাপ সেরে রেখেছে, সবার আগে থাকবে ও। দুটো ভেস্ট পরেছে। ডাকাতরা গুলি করতে করতে উঠে এলে খানিকটা সময় পাবে। হয়তো সরে যেতে পারবে। নিজেকে মুলোর মত ঝোলাবে ও, জাহাজে যত বেশি পারে শত্রু তুলবে। তারা ডেক-এ উঠে এলে ওর সঙ্গীরা গুলি শুরু করবে। ওর কাছে একটা সিগনাল পিস্তলও আছে, ওটা রেখেছে পিঠে ঝোলানো ছোট্ট ব্যাগে। প্রয়োজনে ডাকাতদের সিগনাল দিয়ে টেনে আনবে।

জলদস্যুরা একটু পরে পৌঁছে যাবে। এইমাত্র স্টার-বোর্ডের পাশে সাগরে সিঁড়ি নামানো হলো।

ইয়ারফোনে রানার কথা শুনতে পেল ওরা।

'স্ক্রিনে তোমাদের দেখতে পাচ্ছি। আমি হলে অন্তত আটজন নিয়ে জাহাজে উঠতাম। ব্রিজের জন্যে দু'জন, ইঞ্জিন রুমের জন্যে দু'জন, আর চারজন চারপাশে নজর রাখবে। আতাসি বলেছে আমরা জাহাজে পঞ্চাশজন আছি।' একটু থেমে বলল, 'ফু-চুং, তুই কী আরও কয়েকজন সঙ্গে নিবি?'

'লাগবে না। তুই আসতে চাস নাকি?'

'সোহেলও।'

'উঁহুঁ। দরকার পড়বে না। আমরা তৈরি। ডেক-এর মেশিনগানগুলো কাজ করলে আর সমস্যা হবে না। আমরা শুধু অফিসারদের ধরব।'

'যোগাযোগ রাখবি। ওদের দেখলেই জানাবি।'

অপারেশন্স টিম অপেক্ষায় থাকল।

কিছুক্ষণ পর ট্রলারটা দেখা গেল। মার্ভেলের একটা ক্রেনের মাথায় বসে আছে ক্যামেরা, সেটার মাধ্যমে দেখা গেল। আগে দু'চারজন নাবিক জলদস্যুদের হাত থেকে বেঁচে ফিরেছে, তাদের বর্ণনা মিলে গেল। ট্রলারটা দৈর্ঘ্যে বড় জোর পঁচাত্তর ফুট। বো-টা ভোঁতা। পিছনে অনেকখানি খোলা ডেক, তারপর লম্বা একটা A-ফ্রেম ডেরিক। পাইলট-হাউজের পিছনে মস্ত একটা কার্গো কন্টেইনার

বেঁধে রেখেছে। দেখলে মনে হয় ট্রলারের বয়স হয়েছে, বলা যায় ওটা মার্ভেলের আপন ছোট ভাই।

ফু-চুং রানার কণ্ঠ শুনল, 'ওরা আমাদের মতই বুদ্ধি খেলিয়েছে। ওই মাল অত পুরনো না।'

'ওরা আমাদের স্টার-বোর্ডের বিশ গজ দূরে,' বলল ফু-চুং। 'ডেক-এ বারো-চোদ্দজন। বেশির ভাগ হাফ-প্যান্ট আর জিন্স পরা। মনে হচ্ছে সবার হাতে কোনও না কোনও ইকুইপমেন্ট আছে। আন্দাজ করছি, ওগুলো দিয়ে অস্ত্র ঢেকে রেখেছে।'

'আফতাব,' ডাকল রানা, 'ধোঁয়া দেয়া বন্ধ করো।'

মার্ভেল এখনও অল্প-স্বল্প সামনে এগোচ্ছে। ঘন ধোঁয়া ডেক-এ পাক খাচ্ছে। ওগুলো বিপদে ফেলে দিতে পারে। নাইট ভিশন ভাইজর দিয়ে চারপাশ দেখা কঠিন হবে। অনিলের সঙ্গীরা হয়তো মেশিনগানগুলো ব্যবহার করতে পারবে না।

আধমিনিট পর এক 'জেলে' বুল-হর্ন মুখে তুলল।

ফু-চুং অপেক্ষা করছিল, এবার ধোঁয়া আর ছায়া থেকে বেরিয়ে এসে গ্যাঙওয়ের মুখে চলে এল, সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল—এক ফোঁটা ঘাম ওর গলা বেয়ে বুকে পড়ল, সরসর করে নেমে গেল পেট বেয়ে। ওর কণ্ঠে ভয় আর নিশ্চিন্তি ফুটে উঠল, 'এসেছেন বলে অনেক ধন্যবাদ!' খেয়াল করল ধোঁয়ার চাদর পাতলা হচ্ছে। 'আমরা আগুনটা নেভাতে পেরেছি, কিন্তু স্টিয়ারিং গিয়ারে কী যেন হয়েছে বোঝা যাচ্ছে না।'

লোকটার কথায় টিটকারির সুর বাজল, 'আমরা সাহায্য করতে পারব।'

মার্ভেল ও শিরি-ফোর পাশাপাশি হলো। ট্রলারের খালাসিরা মার্ভেলের গ্যাংওয়ের সঙ্গে শিকল আটকাল, দু'জাহাজে দড়ি বেঁধে দিল। দুই জলদস্যু সিঁড়ি বেয়ে উঠছে, ফু-চুং মনে মনে বলল, গুলি করলে এখনই করবে। টানটান উত্তেজনায় অপেক্ষা করল ও। ওর পিস্তল আগেই হোলস্টার ছেড়েছে, ওটা এখন কোমরের আড়ালে ধরেছে।

পরের কয়েক সেকেণ্ডে কয়েকটা ঘটনা ঘটল। হঠাৎ দপ করে জ্বলে উঠল ট্রলারের সার্চ-লাইটগুলো। উজ্জ্বল সাদা আলোয় মার্ভেলের চারপাশ জ্বলজ্বল করল। ক্রুরা মুহূর্তে নাইট ভিশনের সুবিধা হারাল। প্রথম জলদস্যু ডেক-এ উঠবার আগেই এক ঝটকায় পিস্তল বের করল। সে পরপর দু'বার ফু-চুঙের বুকে গুলি করল, হাতের ইশারায় সঙ্গীকে আসতে বলল। দু'জন ছুটে গেল গ্যাংওয়ে ধরে, বিকট চিৎকার ছাড়ল। সঙ্গে সঙ্গে পাইলট-হাউজ ছেড়ে বেরিয়ে এল বারো-চোদ্দজন, দৌড়ে এসে সিঁড়ি টপকাল।

ফু-চুঙের মনে হলো বিরাট কোনও হাতুড়ি ওর বুক ভেঙে দিয়েছে। প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে পিছিয়ে গেছে ও, শরীর অবশ হয়ে গেল। পিস্তলটা পড়ে যেতে শুনল ও। অবাক হয়ে ভাবল, ওটা হাত থেকে পড়ে গেল কেন?

ফু-চুঙের দলের কেউ নড়বার আগেই আরও চার দস্যু ডেক-এ উঠে এল। এবার কমাণ্ডোরা গোপন জায়গা থেকে গুলি করল। দস্যুদের সামনের দু'জন গুলি খেয়ে পড়ে গেল। কিন্তু তাদের জায়গা নিল আরও পাঁচজন, এরা লাফিয়ে ডেক-এ

উঠল। গুলির মুখে পড়ে মুহূর্তের জন্য তারা বেসামাল হলো, এক সেকেণ্ড পর উন্মাদের মত লড়াই করতে চাইল। পরের কয়েক সেকেণ্ডে পাঁচ কমাণ্ডোর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেল পাঁচগুণ দস্যু। প্রতিটি ক্ষণ যেন অস্বাভাবিক ধীর হয়ে গেল। লেজার সাইটের লাল বিমগুলো ধোঁয়ার মধ্যে অন্ধকার কাটাকাটি করল, শত্রুদের খুঁজল। মনে হলো সবাই মিলে পাগলামি করছে।

এদিকে ট্রলারের সার্চ-লাইট জ্বলে ওঠায় মার্ভেলের অপারেশন্স সেন্টারের স্ক্রিন ধবধবে সাদা হয়ে গেল। রানা চট্ করে বুঝে গেল জলদস্যুরা কী করতে চায়। আমেরিকা ইরাকে দ্বিতীয়বার হামলা করবার সময় এই কৌশল করেছিল—প্রথম কিছুক্ষণ চারপাশে গোলমাল তৈরি করো, শত্রুকে দ্বিধায় ফেলে দাও, ওরা পালাবে। এর ফলে যুদ্ধে জেতা অনেক সহজ হবে।

সাধারণ কোনও মার্চেন্ট ভেসেল-এ সবাই হঠাৎ উজ্জ্বল আলো দেখে থমকে যাবে, সেইসঙ্গে হইচই-চিৎকার-গুলির আওয়াজ তো আছেই—একদল মারকুটে লোক হঠাৎ আক্রমণ করলে থতমত খাওয়ারই কথা, কেউ বুদ্ধি করে মে-ডে পাঠাবে না।

কৌশলটা নিরস্ত্র লোকের বিরুদ্ধে কাজে লাগে।

ফু-চুংরা নাইট ভাইজরের সুবিধা পাচ্ছিল, কিন্তু ওগুলো এখন মুল্যহীন। ডেকে এখনও ধোঁয়া পাক খাচ্ছে। তার উপর উজ্জ্বল সার্চ-লাইটগুলো চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। এই অবস্থায় ইনফ্রারেড সিস্টেম কোনও সুবিধা দেবে না। মেশিনগানাররা অনেক দূরে অপেক্ষা করছে, ওরা এখন কিছুই করতে পারবে না।

লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়ল রানা, সামনের একটা বাল্কহেড হাতড়ে নাইট ভিশন গগল্স্ তুলে নিল। চট্ করে একবার দেখে নিল, কেউ খেয়াল করছে না। একটা এমপি-ফাইভ নিয়ে কোমরে গুঁজল ও, চলে এল এলিভেটরের সামনে, বাটন টিপে ভিতরে ঢুকে বলল, 'আমি ব্রিজে পৌঁছে গেলে এলিভেটর বন্ধ করতে হবে। ...সোহেল, তোরা এদিকটা দেখ্!'

এলিভেটর পাঁচতলা উঠতে ষোলো সেকেণ্ড লাগাল। তুমুল গোলাগুলির আওয়াজ শুনল রানা। ছেলেরা লড়াই করছে, কিন্তু ওদের হারতে হবে। শত্রু অনেক বেশি। উইং ব্রিজে বেরিয়ে এসে নীচে তাকাল ও। অন্তত বিশজন দস্যু মার্ভেলের সামনের ডেকে অবস্থান নিয়েছে। আড়াল পেয়ে গেছে তারা, সুপারস্ট্রাকচার লক্ষ্য করে গুলি করছে।

গ্যাংওয়ের মুখে কে যেন ক্রল করছে, খেয়াল করল রানা। ওয়ালথার তুলেও থেমে গেল ও, ওটা ফু-চুং। ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। হঠাৎ এক জলদস্যু একটা উইঞ্চের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল, ফু-চুঙের মাথা লক্ষ্য করে একে-ফরটিসেভেন তুলল।

সময় নষ্ট না করে গুলি করল রানা। লোকটার রক্তাক্ত মুখটা উধাও হলো। আরেক লোকের বুকে পরপর দু'বার গুলি করল ও। এবার গুলির তোড়ে রেইলিঙের আড়ালে বসে পড়তে হলো ওকে। বুলেট মাথার উপর দিয়ে ভীমরুলের মত গুঞ্জন তুলে চলেছে, ঠকাঠক লাগছে স্টিলের প্লেটে। ওয়ালথার রেখে সিলেক্টর টিপে এমপি-ফাইভটা অটোতে নিয়ে এল রানা, রেইলিঙের উপর

দিয়ে ব্যারেল বের করে গুলি করল। মুহূর্তে পনেরোটা গুলি ডেকে গিয়ে আছড়ে পড়ল। শত্রুদের লুকিয়ে পড়বার সুযোগটা নিল রানা, উঠে দাঁড়িয়ে সিলেক্টর সিঙ্গেল বুলেটে এনে ট্রলারের সার্চ লাইট লক্ষ্য করে গুলি করল।

পরপর দু'বার মিস করল ও, এবার শ্বাস নিয়ন্ত্রণ করে আবারও দু'বার গুলি করল। সার্চ-লাইটগুলো বিস্ফোরিত হলো। চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল কাঁচ। নামল গাঢ় অন্ধকার।

সঙ্গে সঙ্গে মেশিনগানের খ্যাটখ্যাট-খ্যাটখ্যাট আওয়াজ উঠল। জলদস্যুদের দিকে .৩০ ক্যালিবারের বুলেট ছুটে গেল। গুলির খোসা ইজেক্ট হচ্ছে, ডেকে গিয়ে খটাখট পড়ছে। মেশিনগানাররা তাদের কাজ শুরু করেছে।

মেশিন-পিস্তলের ম্যাগাজিন পাল্টে নিল রানা, গগল্‌স্‌ পরে নিল। চারপাশে বিদ্‌ঘুটে সবুজ আলো। বুলেটের ঝিলিক দেখে মনে হয় ওগুলো আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়া কোনও বোকা পতঙ্গ। মানুষ যেন সবজেটে কোনও ভূত। ফু-চুঙের দিকে খেয়াল দিল রানা।

ও খোলা জায়গায় পড়ে আছে, এত ধীরে নড়ছে যে মনে হলো আহত হয়েছে। তবে পিছনে রক্তের ধারা রেখে আসেনি। ভেস্ট ওকে বাঁচিয়েছে। অভিজ্ঞতা বলে, ভেস্ট পরলেও বুলেট প্রচণ্ড আঘাত হানে। অন্তত একঘণ্টা ভাল ভাবে শ্বাস নিতে পারবে না ফু-চুং। কয়েক মিনিট পার হলো। এক জলদস্যু বেরিয়ে এসেছে, রানার গুলি কানের পাশ দিয়ে যাওয়ায় লুকিয়ে পড়ল। তিলতিল করে ক্রল করছে ফু-চুং, হ্যাচওয়েতে পৌঁছে গেল। দুটো হাত সুপারস্ট্রাকচারের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল, ওকে টেনে নিল।

করডাইটের ঝাঁঝাল গন্ধে শ্বাস আটকে যায়। বুলেটের ধোঁয়া ইংল্যাণ্ডের কুয়াশার কথা মনে পড়িয়ে দেয়। ফু-চুং সরে যাওয়ায় রানা টার্গেটের দিকে মন দিতে পারল। ওদের পাঁচ কমাণ্ডো এখন ভাইজর দিয়ে দেখতে পাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে যুদ্ধের ফলাফল ওদের দিকে ঝুঁকল।

রানা উপর থেকে দেখছে। বন্দি পাওয়ার আশা ছাড়তে হলো। ডেকে রক্তের স্রোত বইছে। ফু-চুঙের ছেলেরা খেপে গেছে। সম্ভবত ওদের কেউ আহত হয়েছে। ওদের দিকে দৌড়ে এগিয়ে গেল তিন জলদস্যু। সামনে ক্রেন পেয়ে আড়াল নিল এরা। একজন ন্যাপস্যাক থেকে কী যেন বের করল। ওটা স্যাচেল চার্জ! লোকটা নড়বার আগেই ওর মাথায় গুলি করল রানা। লাশটা ধুপ করে পড়ল, বুকের তলায় আটকা পড়ল স্যাচেল চার্জ।

অন্য দু'জন সুপারস্ট্রাকচারের দিকে দৌড় দিল। রানা মেশিন-পিস্তল তুলল, কিন্তু মেশিনগানার দেখেছে, সে-ই আগে গুলি করল। পেটে গুলি খেল লোক দুটো, প্রায় দু'টুকরো হয়ে গেল।

দৃশ্যটা ভয়ঙ্কর। জলদস্যুদের মন দমে গেল। ছুটল ওরা গ্যাংওয়ে ধরে। এখন আর লড়াই চায় না তারা, বাঁচতে চায়। কিন্তু কমাণ্ডোরা সুপারস্ট্রাকচার থেকে গুলি করছে। একটু আগে চুপচাপ ছিল ওরা, এমন ভান করেছে—যেন ওরা ওখানে নেই। ডাকাতরা ফাঁদে পড়েছে। তাদের তিনজন গুলি-বর্ষণে ছিটকে গিয়ে ডেকে পড়ল। আগেই মারা গেছে।

শিরি-ফোরের বিরাট ডিজেল ইঞ্জিন গর্জে উঠল। ট্রলারটা মার্ভেলের কাছ থেকে সরে যেতে চাইল। যারা ওখানে আছে, তারা নিজেদের জান বাঁচানোর চিন্তা করছে। মেশিন-পিস্তল দিয়ে ট্রলারের ডেকে গুলি করল রানা। কাউকে দেখা গেল না। সামনে কোনও টার্গেট নেই।

ট্রলারের শিকল মার্ভেলের গ্যাংওয়ের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে। জোরে টান খেয়ে ট্রয়ের মাউন্ট উপড়ে এল। দড়িগুলো ছিঁড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সরল ট্রলার। মার্ভেলের গ্যাঙওয়ে ব্রিজের মত ওটার ডেকে বসে আছে। সিঁড়িটার ওজন আঠারোশো পাউণ্ড, ওটা খসে পড়ল সাগরে। যারা সিঁড়িতে ছিল পানিতে পড়ল তারা। সাঁতরে ভেসে উঠল। কিন্তু একমুহূর্তের জন্য। ট্রলারের টানাটানিতে দুলছে মার্ভেল, লোকগুলোর উপরে চেপে বসল। মুহূর্তে চিঁড়ে-চ্যাপটা হয়ে গেল তারা।

মার্ভেলে যারা এখনও রয়ে গেছে, শিরি-ফোর তাদের পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিল, কাঁপতে কাঁপতে দিক পাল্টাল ট্রলার। গগল অপারেশন্স সেন্টারে দাঁড়িয়ে দেখছে, ও ম্যানুভারটা চিনল। দেরি না করে মার্ভেলকে খানিকটা গতি দিল, জাহাজটা পোর্টে সরিয়ে নিল।

জলদস্যুরা রেইলিং টপকে পালাচ্ছে। তাদের একজন শিরি-ফোরের প্রধান উইঞ্চে পড়ল। রানা উপরের উইং ব্রিজে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট শুনতে পেল, লোকটার হাড়গোড় সব মটমট করে চুরমার হলো। দেহটা পুতুলের মত নীচের ডেকে গিয়ে পড়ল। আরেক লোক ট্রলারের হাল-এর গুঁতো খেয়ে সাগরে পড়ল। তাকে আর দ্বিতীয়বার দেখা গেল না। বাকি ছয়জন দুই জাহাজের মাঝখানের সরু জায়গাটা পার হতে চাইল।

শিরি-ফোরের সারেং হয়তো জানে না কী ঘটছে। মার্ভেলের দিকে সরছে সে। গগল বো থ্রাস্টার দিয়ে ট্রলারকে সরিয়ে দিতে চাইল। কিন্তু মার্ভেলের প্রপেলারের শাফট ট্রলারের অনেক সামনে। হালকা ঢেউ উঠল, কিন্তু কাজ হলো না—দুই জাহাজে জোরেশোরে ধাক্কা লাগল। ইস্পাতে ইস্পাতে গা শিউরানো কান ফাটানো আওয়াজ হলো। যে-ক'জন জলদস্যু পানিতে ছিল, মুহূর্তে হাড়-মাংসের লালচে দলা হয়ে গেল। দুই জলযান সরে যাওয়ার পর ঢেউ কিমাগুলো ধুয়ে সরিয়ে নিল।

হুইল হাউজে এসে ঢুকল রানা, একটা ড্রয়ার টেনে ওঅকি-টকি নিয়ে বলল, 'অনিল, ট্রলারের ওয়াটার-লাইনে ফুটো করতে হবে। ওরা বুঝুক, পালাতে পারবে না।'

'দাঁড়া ব্যবস্থা করছি।' ব্যস্ত হয়ে উঠল অনিল।

দ্রুত দুই নৌযানের মাঝে দূরত্ব তৈরি হচ্ছে। শিরি-ফোরের ডেকে এক খালাসিকে দেখল রানা। লোকটা এ-ফ্রেম ডেরিকে কেব্‌ল্ লাগিয়েছে, কেবলের আরেক মাথা ট্রলারের শেষে নিয়ে গেল, কেব্‌ল্ দিয়ে কন্টেইনারটাকে আটকে দিল।

লোকটাকে লক্ষ্য করে গুলি করল রানা, জানত এত দূর থেকে লাগাতে পারবে না। জোয়ারের ঢেউ ট্রলার নিয়ে খেলছে। রানা নিজেও দুলছে, আবারও গুলি করল। খালাসি নিজের কাজে ব্যস্ত, গুলি কানের কাছ দিয়ে গেলেও লক্ষ

করছে না।

কোথাও লুকিয়ে আছে এক উইঞ্চ-ম্যান, সে ডেরিক চালু করল। এ-ফ্রেমের হাত উঠল উপরে, ট্রলারের পিছনে চলে গেল। এবার দেখা গেল ওটা কন্টেইনারটাকে টানছে। জিনিসটা অত্যন্ত ভারী। তক্তার ডেকে দগদগে ঘায়ের মত দাগ হলো। কন্টেইনারের এক কোনা একটা বোলার্ড-এ আটকে গেল। ডেরিকের ড্রাম তবুও কেবল টানছে। কন্টেইনার কাত হয়ে গেল, তারপর প্রচণ্ড ধাতব শব্দে আছড়ে পড়ল। উইঞ্চ-ম্যান বাক্সটা হিড়হিড় করে ক্রেনের তলায় নিয়ে এল। কন্টেইনারটা শূন্যে তুলে ডেকের উপর থেকে সরাল সে, সাগরের উপরে নিয়ে গেল। ক্রেনের ব্রেক সরিয়ে নেওয়া হলো, ঝপাস করে কন্টেইনারটা পড়ল সাগরে। পানি ঢুকছে ভিতরে। প্রকাণ্ড বাক্সের মত দুলল, তারপর আস্তে আস্তে ডুবতে শুরু করল।

উইঞ্চ-ম্যান কেবলগুলো সরিয়ে নিয়েছে। ট্রলার গতি বাড়াল। কন্টেইনারে যা-ই থাকুক, সেগুলো বে-আইনী কিছু। রানা জানে, তাড়াতাড়ি ট্রলার ঠেকাতে হবে। এদিকে কন্টেইনারের লাইনগুলো ডুবে যাওয়ার আগেই ধরতেও হবে।

কিছু বলতে হলো না রানার, পরমুহূর্তে বোঝা গেল, অনিল কাজে নেমেছে। এক সেকেণ্ড পর পর গ্যাটলিং গান গুলি বর্ষণ শুরু করল। পঞ্চাশটা ইউরেনিয়াম বুলেট গিয়ে ঢুকল শিরি-ফোরের ওয়াটার-লাইনে। বুলেটের গর্তগুলো পাইলট হাউসের আগে গিয়ে থামল। ওখানে কোথাও ফিউল ট্যাঙ্ক আছে।

অনিল চায় না ওখানে বিস্ফোরণ ঘটুক। কিন্তু জলদস্যুরা ওই গর্তের খুব কাছে অস্ত্র-শস্ত্রের গুদাম বানিয়েছিল। প্রথম বিস্ফোরণটা হালকা ভাবে শোনা গেল। মনে হলো কয়েকটা আগ্নেয়াস্ত্র গর্জে উঠল। তারপর আবারও বিস্ফোরণ ঘটল। খোড়লের পেট থেকে বেরিয়ে এল কমলা রঙের শিখা। আকাশ চাটল আগুনের জিভ।

গ্যাটলিং গান আরেকবার চালাল অনিল। ডেকের নীচের দিকে তাক করেছে, খোলের একটা বড়সড় অংশ উড়ে গেল। ওখান দিয়ে গলগল করে বেরিয়ে এল লেলিহান আগুন ও ধোঁয়া। ট্রলারে যেন একগাদা কামানের গোলা পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ডেক ডেবে গেল। পরমুহূর্তে আবার বিস্ফোরণ। অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল রানা। ট্রলারের পাইলট-হাউজটা গিলে নিল আগুন, একইসঙ্গে কেবিনটা হাজার টুকরো হলো। সামনের ডেকে ফিউল ট্যাঙ্ক ছিল, ওটা এবার বিস্ফোরিত হলো। ট্রলারের স্টার্ন নীচে নামল, উঁচু হলো বো।

শ্র্যাপনেলগুলো মার্ভেলের গায়ে এসে আছড়ে পড়ল। রেইলিঙের আড়ালে লুকাল রানা। ট্রলারের স্টার্নের উইঞ্চ উড়ে এসে মার্ভেলের পিছনের ডেকে পড়ল। চাঁদের আলোয় কেবলগুলো মাকড়সার জালের মত দেখাল। বিস্ফোরণে শিরি-ফোরের কীল দুর্বল হয়ে গেছে, চাপ সহ্য করতে না পেরে এবার দু'টুকরো হয়ে গেল। বো-টা ধপ্ করে সাগরে পড়ল। দু'সেকেণ্ড পর হুশ্‌হুশ্ শব্দ করে স্টার্ন ডুবে গেল। আরেকবার বো লাফিয়ে উঠল, তারপর ঢেউ ওটাকে টেনে তলিয়ে দিল।

ঘড়ি দেখল রানা। বিশ এমএম রাউণ্ডগুলো আঘাত হানবার পর মাত্র উনিশ সেকেণ্ড হয়েছে!

উঠে দাঁড়াল ও, ঘাড়ে রক্ত চটচট করছে। তপ্ত কোনও ধাতু যাওয়ার পথে ঘাড় কেটে দিয়েছে। হাতের তালুতে রক্ত মুছে ফেলল, ঘুরে তাকাল। ট্রলারটা সাগরের যেখানে ছিল, সেখানে কয়েকটা পোড়া তক্তা ভাসছে। ঢেউয়ের মাথায় তেল জ্বলছে। বিস্ফোরণের আওয়াজ দূর থেকে দূরে মিলিয়ে গেছে। মার্ভেলের ডেকে তাকাল রানা। আহত কেউ নেই। সাগর শান্ত। কেউ ভাসছে না।

দশ সেকেণ্ড চুপ করে থাকল রানা, তারপর একটু দূরের কন্টেইনারটা দেখল। দ্রুত ডুবছে ওটা। হয়তো এখনও উদ্ধার করা যাবে। এদিকে মার্ভেলের নাবিকরা কাজে নেমে পড়েছে। কন্টেইনারে কেব্‌ল্ আটকাচ্ছে।

ওঅকি-টকিতে বলল রানা, 'ডেক পার্সোনেল, কার্গো তোলার জন্যে তৈরি হও। ফোরডেকে কেব্‌ল্ আটকাও। খুঁজে দেখো কেউ বেঁচে আছে কি না।' কথা শেষে সিঁড়ি ভাঙল ও, একেকবারে চার ধাপ করে নামল। সুপারস্ট্রাকচার পার হলো, নেমে এল অ্যাফ্‌ট্ ডেকে।

খালাসিরা ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। কন্টেইনার কেবলের টান খেয়ে স্থির হয়েছে। পুলি কেব্‌ল্ নিয়ে ঘুরছে, কন্টেইনারের ওজন নিল। কেব্‌ল্ আরও টানটান হলো। এবার কেব্‌ল্ ডেকের উপর দিয়ে ফিরল। ওগুলো ডেক তপ্ত করে দিল, রং যা ছিল, মুহূর্তে পুড়ে ধোঁয়া হয়ে গেল।

একটা ডেরিকের সামনে থেমে শেকল দু'হাতে তুলল রানা, কেবলের দিকে এগিয়ে গেল। রেইলিঙের সামনে দাঁড়িয়ে শেকল দিয়ে কেব্‌ল্‌টা পেঁচাল ও, শেকলের আরেক মাথা লাগাল একটা উইঞ্চে। জং ধরা উইঞ্চটা দেখে মনে হয় নষ্ট, কিন্তু বাটন টিপতেই গর্জে উঠল টু-সিলিণ্ডার ইঞ্জিন। লেভার পিছাল রানা, সঙ্গে সঙ্গে শেকলগুলো কেব্‌ল্ শক্ত করে ধরল। ধাতুর সঙ্গে ধাতুর সংঘর্ষে বিশ্রী নাক জ্বালানো গন্ধ বেরল। খালাসিরা কেব্‌ল্ হাতে পেয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে একটা ক্যাপস্টেনে প্যাঁচ পরিয়ে দিল। প্রচণ্ড ওজনে কেব্‌ল্‌গুলো থরথর করে কাঁপল, কিন্তু ছিঁড়ল না।

পরবর্তী পাঁচ মিনিট যেন মুহূর্তে শেষ হয়ে গেল। খালাসিরা ব্যস্ত হয়ে ক্রেনের সঙ্গে কেব্‌ল্ আটকাল। এরপর মার্ভেলের অ্যাফট ডেকের ক্রেনটা চালু হলো, কন্টেইনার টেনে তুলছে। রানা অপেক্ষা করল। একটু পরে কন্টেইনার উঠে আসবে।

ফু-চুং আর উর্বশী বেরিয়ে এল ডেকে। ফু-চুঙের মুখ ফ্যাকাসে, টলছে একটু একটু, ডানহাত বুকের উপরে রেখেছে। রানার পাশে এসে দাঁড়াল ওরা।

পায়ের আওয়াজ পেয়ে ঘুরে তাকাল রানা। 'কী রে, কী অবস্থা তোর?'

খুব সাবধানে শ্রাগ করল ফু-চুং। 'আর কোনও সমস্যা ছিল না, কিন্তু হাসতে গেলে বুকে ব্যথা পাচ্ছি!'

সান্ত্বনা দিল রানা, 'কিছুক্ষণ পর ব্যথা কমে যাবে।' অন্য প্রসঙ্গে সরে গেল ও, 'ওখানে কী অবস্থা?'

'ভাল। আমিই একমাত্র ধরা খাওয়া পাবলিক। ওদের একজন কপাল ঠুকে ব্যথা পেয়েছে, আরেকজনের হাত ছড়েছে।'

'আর ডাকাতরা?'

জবাবটা জানাল উবর্শী, 'তেরোজন মারা গেছে, দু'জন গুরুতর আহত। ফারা বলছে ওরা আধঘণ্টাও বাঁচবে না।'

মাথা নাড়ল ফু-চুং। 'কপাল মন্দ, আমরা ওদের হাতে পেলাম না। হয়তো ফরেনসিক অটপ্‌সি করলে কিছু বেরবে।'

'ওদের বয়স দেখে কিছু জানা যেতে পারে,' বলল রানা। 'কোন্ জাতি বোঝা যাবে। কিন্তু এখন আর জানা যাবে না কারা আক্রমণের পেছনে ছিল।'

এক খালাসির চিৎকারে ঘুরে তাকাল ওরা। 'রেইলিঙের কাছ থেকে সরে যান, সার! কণ্টেইনার আসছে!'

ঘুরে দাঁড়িয়ে ক্রেনের কাছে চলে এল ওরা। কিছুক্ষণ পর রেইলিং পার হয়ে উঠে এল কণ্টেইনার। ওটার চারপাশে ড্রিলের অজস্র ফুটো, সেখান থেকে পানি বেরুচ্ছে। ক্রেনের চালকের দাঁতের ফাঁকে লম্বা জিভ দেখে মনে হলো সে ডিমের বাক্স নামাচ্ছে। কণ্টেইনার সাবধানে ডেকে নামিয়ে দিল।

এক নাবিক রানার হাতে একটা বোল্ট কাটার দিল। প্রচুর শক্তি ব্যয় করে কণ্টেইনারের দরজার প্যাডলক কাটল রানা।

চারপাশের সবাই এসেছে, দেখতে চায় কণ্টেইনারে কী লুকানো আছে। কেউ কেউ ভাবছে জলদস্যুরা ওদের গুপ্তধন নিজেদের সঙ্গে রাখত। আঠারো শতকে কোনও কোনও জলদস্যু তা-ই করত। এইবার দেখা যাবে ভিতরে কী আছে!

কণ্টেইনারের দরজার বোল্ট খুলল রানা, দু'কপাট খুলে গেল। ভিতর থেকে যা বেরিয়ে এল, তার জন্য তৈরি ছিল না ওরা কেউ। হাঁ হয়ে গেল সবার মুখ।

রানা শ্বাস আটকে ফেলল, গলায় বমির টক টক ভাব এল।

কণ্টেইনারের ভিতরে এখনও অনেক পানি, বেরিয়ে আসছে দ্রুত—সঙ্গে এল তিরিশটা নগ্ন দেহ!

ছয়

মাউন্ট পিলাটাসের একটা সবুজ উপত্যকায় শ্যাতোটা, লুসার্নের একটু দক্ষিণে। জুরিখ ছেড়ে সামান্য পথ ট্রেনে এলেই এখানে পৌঁছুনো যায়। এই শ্যাতো অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্যের সঙ্গে এমনভাবে মিশে আছে যে, যে-কেউ বলবে এটা এখানে কয়েক শতাব্দী ধরে আছে। কিন্তু বাস্তবে ওটা তৈরি করা হয়েছে মাত্র পাঁচ বছর আগে! টালি বসানো ঢালু ছাদ, অসংখ্য গেইব্‌ল্ আর চিমনি নিয়ে ওটা যেন কোনও রূপকথার বই ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। শ্যাতোর চওড়া ড্রাইভওয়ে বিরাট একটা শ্বেত-পাথরের ফোয়ারার সামনে দিয়ে গেছে। ফোয়ারার চারপাশে কিশোরী দেবীদের শ্বেত-মর্মর মূর্তি। দু'সারি দেবীর মাঝ দিয়ে বইছে নীল জলের স্রোত, মিশেছে গভীর পুল-এ। ওখান থেকে ফিরছে ফোয়ারায়।

শ্যাতোর দু'পাশে রয়েছে কয়েকটা পাথরের বাড়ি। এস্টেটে ওগুলোর কাজ

ভাবমূর্তি তৈরি করা, যেন মনে হয় কিছুদিন আগেও এটা একটা খামার-বাড়ি ছিল। মাঠে নেমেছে সাদা-হলুদ জার্সি পরা ব্রোঞ্জের ঘণ্টিওয়ালা একপাল গরু—মাঠ পরিষ্কার করছে, একইসঙ্গে চলছে সার দেয়ার কাজও।

গ্যারাজের পাশে পার্কিং অ্যানেক্স-এ অতিথিদের গুরুত্ব অনুযায়ী সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লিমোযান। পিছনে রয়েছে নিচু দেয়াল-ঘেরা একটা ছোট্ট মাঠ। ওখানে গ্যাঁট মেরে বসে আছে দুটো অ্যারোপ্যাশিয়াল গেজাল হেলিকপ্টার। ওগুলোর দুই পাইলট এগজেকিউটিভ চপারের একটায় বসে থারমোস কফি পান করছে।

জুরিখে ইউরোপিয়ান সামিট মিটিং চলছে, কিন্তু মিনিস্টাররা ক্ষুব্ধ, মিডিয়া মোটেই তাঁদের মনোযোগ দিচ্ছে না। সবাই জেনে গেছে তাঁরা যা-ই বলুন না কেন, সহজে বিশ্ব-মন্দা কাটবে না। অবশ্য এই শ্যাতোয় যাঁরা উপস্থিত হয়েছেন, তাঁরা অতি জরুরি বিশ্ব-অর্থনীতি নিয়ে কাজ করবেন। এখন সবাই ঘুরে দেখছেন প্রকাণ্ড ডুপ্লেক্স হল। চারপাশে ওক কাঠের কারুকার্য খচিত প্যানেল, দেয়ালে ঝুলছে সুইস বুনো শুয়োর আর স্ট্যাগ-এর করোটি। বিশাল ফায়ার-প্লেসের উপরে বসে রয়েছে সুইস ষাঁড়ের এক জোড়া বিরাট শিং। একটু আগে এখানে এসে তাঁরা মনে মনে স্বীকার করে নিয়েছেন, সত্যি শ্যাতোর মালিকের রুচি আছে।

সুইটযারল্যাণ্ড দুনিয়ার সেরা ব্যাঙ্কিং সেন্টার, কাজেই এই পনেরোজন ব্যাঙ্কার এদেশে আসতেই পারেন। তাঁরা ইউরোপ আর আমেরিকার সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্কগুলো চালান। তবে আজকে তাঁদের সঙ্গে আছেন আরেকজন।

টেবিলের শেষমাথায় বসে আছেন ফ্রেডারিখ বাউয়ার। তাঁর বাবা ক্যাথোলিক ধর্মরীতি অনুযায়ী ছেলেকে মানুষ করতে চেয়েছেন, সবসময় কড়া শাসনে রেখেছেন, ছেলেকে শিখিয়েছেন কী করে ভালভাবে ব্যাঙ্ক চালাতে হয়। কিন্তু ফ্রেডারিখ বাউয়ার কিশোর বয়সে বুদ্ধি খোলার পর চট করে ধর্ম পাল্টেছেন। তাঁর একমাত্র ধর্ম ধন-সম্পদ অর্জন। তিনি স্বীকার করেন, অর্থই তাঁর আসল ঈশ্বর।

ফ্রেডারিখ বাউয়ারের রক্তে মিশে আছে পারিবারিক ব্যবসা—ব্যাঙ্কিং। এ-কথা মিথ্যা নয় যে, এখন তিনি বিশ্বের সেরা বিত্তবানদের একজন। তাঁর মত যাঁরা আছেন, তাঁরা পৃথিবীর ফিন্যান্স নিয়ন্ত্রণ করেন। বেশিরভাগ সময় সরকার তাঁদের কথামত ওঠে ও বসে। ফ্রেডারিখ বাউয়ার প্রতিদিন শত শত কোটি ডলার নিয়ে খেলেন, দিন শেষে হিসাব কষে দেখা যায়, তাঁর ব্যাঙ্ক আরও সম্পদ অর্জন করেছে, আরও বিত্তবান হয়েছেন তিনি। তিনি কখনও কাজে ভুল করেন না, প্রতিটি পা ফেলেন মেপে, যে-কারণে বড় ব্যাঙ্কাররা মনে মনে তাঁকে ভয় পান।

ফ্রেডারিখ বাউয়ার বিয়ে করেছেন, কারণ একটা বউ থাকাই নিয়ম। তাঁর তিন ছেলে-মেয়ে পৃথিবীতে এসেছে কারণ তিনি দয়া করে স্ত্রীর সঙ্গে ছয়-সাতদিন শুয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করেন ওসব ব্যাপার মানুষের পেশায় খুব খারাপ প্রভাব ফেলে। কেউ কখনও বলতে পারবে না তিনি ছেলে-মেয়েদের জন্মদিনে উপস্থিত থেকেছেন। তিনি নিশ্চিত নন যে তাঁর ছোট ছেলের বয়স বাইশ কি না, তবে আন্দাজ করতে পারেন ছেলেটা সরবোন-এ লেখাপড়া করছে। কাজেই বলা যায়, তাঁর দামি চশমার পিছনের তীক্ষ্ণ ধূসর চোখ দুটো সবই দেখে।

ফ্রেডারিখ বাউয়ার প্রতিদিন সকাল ছয়টায় জুরিখের ব্যাহোনহোফ্‌স্‌স্ট্রাস-এ অফিসে যান, রাত আটটায় অফিস ছেড়ে বেরোন। শুধু রবিবার বা অন্য ছুটির দিনে বারো ঘণ্টা বাসায় থাকেন। তিনি মদ্য পান করেন না, ধূমপান করেন না, জুয়া খেলেন না। ক'দিন আগে ষাট বছরে পা রেখেছেন। আস্তে আস্তে ভুঁড়ি হচ্ছে। চুলগুলো পেকে গেছে আগেই। তাঁর মণির রং সাবান মেশানো নোংরা পানির মত। সবসময় সুট পরেন ধূসর রঙের। সাদা শার্ট পরেন, কিন্তু ওটা কারও মনে ছাপ ফেলে না, শুধু চোখের ধূসর মণির ছাপটা মনে রয়ে যায়।

যাঁরা তাঁর সঙ্গে কাজ করেন, তাঁরা কখনও ফ্রেডারিখ বাউয়ারকে হাসতে দেখেননি। কোনও ভয়ঙ্কর ফিনানশিয়াল সমস্যা তৈরি হলে তাঁর ঠোঁটের কোণ একটু বেঁকে যায়। এ-পর্যন্তই।

ওঁর চারপাশে আছেন দুনিয়ার সেরা পনেরোজন ব্যাঙ্কার, গম্ভীর হয়ে আছেন তাঁরা। সম্পদ অর্জনে এঁরা ফ্রেডারিখ বাউয়ারের মতই, প্রয়োজন হোক বা না হোক, টাকার জন্য লোভী হয়ে ওঠেন। এঁরা পৃথিবীর সেরা ব্যাঙ্কগুলোর প্রেসিডেন্ট—এঁদের সিদ্ধান্তে বিলিয়ন ডলার এখানে-ওখানে যায়; এঁদের সিদ্ধান্ত লাখ লাখ মানুষের জীবন পাল্টে দেয়। এঁরা এখানে মিটিং করতে এসেছেন, কারণ তাঁরা এখন জানেন, সত্যিই বিশ্ব-অর্থনীতি এবার মুখ থুবড়ে পড়বে।

ফ্রেডারিখ বাউয়ারের সামনে কালো একটা কাপড়—ওটা দিয়ে চার-কোনা কী যেন ঢেকে রাখা হয়েছে। জিনিসটা বড় কিছু নয়। ব্যাঙ্কাররা টেবিলের চারপাশে বসে পড়লেন, অ্যাটেণ্ডেন্টরা তাঁদের পাশে পানি ঢেলে দিয়ে চলে গেল। এবার বাউয়ার কাপড় টান দিয়ে সরিয়ে তলার জিনিসটা দেখালেন।

সাধারণ মানুষ এই জিনিস দেখলে কাছ থেকে দেখতে চায়, লোভী হয়ে ওঠে, দরকারে হামলে পড়ে, কিন্তু ব্যাঙ্কারদের চেহারায় স্পষ্ট কোনও ছাপ পড়ল না। বাউয়ার অবশ্য খেয়াল করলেন, ব্যাঙ্কারদের চোখে আবছা আবেগের ছাপ পড়েছে। তাঁদের কয়েকজন আস্তে করে শ্বাস ফেলতে চাইলেন। একজন চিবুকে টোকা দিলেন। আরেকজন মুহূর্তের জন্য চোখ বিস্ফারিত করলেন, চারপাশের সবাইকে দেখলেন—মনে হলো সবার কথায় বুঝে নিয়েছেন পোকার খেলায় কী জুয়া ধরা হয়েছে।

আয়তাকার টুকরোটার ওজন সাতাশ পাউণ্ড—অনেকে ওটাকে বলেন লণ্ডনের চমৎকার ডেলিভারি। শ্যাতোর প্রকাণ্ড হল-এ মিষ্টি মৃদু আলো জ্বলছে, সেই আলোয় ওটার তেলতেলে গা থেকে হলদেটে আভা বেরোল। জিনিসটা নিরানব্বুই পয়েন্ট নয়-নয় পার্সেন্ট পরিশোধিত। দাম আনুমানিক এক লাখ ষাট হাজার ডলার।

'জেন্টলমেন, আমরা ভয়ঙ্কর একটা বিপদে পড়েছি,' নিখুঁত ইংরেজিতে মুখ খুললেন ফ্রেডারিখ বাউয়ার। 'আপনারা জানেন শীঘ্রি বিশ্বের সমস্ত সোনা ফুরিয়ে যাচ্ছে। অনেক আগে থেকেই যোগানের তুলনায় চাহিদা বেশি ছিল। আর এখন এটা বলা যায়, আপনাদের অনেকে অতিরিক্ত লোভী হয়ে উঠে সর্বনাশটা ঘটিয়েছেন।

'এক দশক আগে আপনারা যার যার দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে লাভজনক

একটা প্রস্তাব দেন। সে-সময় সবাই ধারণা করে এর ফলে সমস্ত পক্ষ সুবিধা পাবে। আপনারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক থেকে পয়েন্ট দুই পাঁচ পার্সেন্ট সুদে সোনা ধার নিতে চান। সে-সময় সবাই বলেছিল সোনাগুলো খামোকা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ভল্টে পড়ে আছে, অথচ চালাচালির মধ্যে থাকলে ওগুলোর মূল্য অনেক বাড়বে। আপনারা বলেন, পয়েন্ট সিকি পার্সেন্ট সুদ পেলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলো এত-এত টাকা পাবে, এর আগে কখনও যেটা চিন্তাও করা যায়নি।

'ওখানেই যদি চিন্তাটা বন্ধ হতো, তা হলে আজকে এই মহাবিপদ আসত না। কিন্তু আপনারা থামেননি, সরকারকে চাপ দিয়ে সোনাগুলো নিয়ে বছর বছর সুদ দিয়ে যেতে থাকলেন। সবই ঠিক চলছিল, সরকারও খুশি সুদ পেয়ে ...কিন্তু তারপর? তারপর এটাকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ধরে নিয়ে আপনারা সোনাগুলো মুক্ত বাজারে ছেড়ে দিলেন, সেই টাকায় বিরাট সব ব্যবসা শুরু করলেন। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে: কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলো শুধু ধারই দিয়েছে, কখনোই বিক্রি করার অনুমতি দেয়নি। চুক্তি অনুযায়ী তারা যখন-তখন সোনাগুলো চেয়ে বসতে পারে। আপনারা ধরে নেন কোনও দেশ হঠাৎ করে তাদের সোনা চেয়ে বসবে না, আর যদি চায়ও, মুক্ত বাজার থেকে কেনা যাবে। আপনারা ধরে নেন, ব্যাঙ্কগুলো সামান্য পরিমাণে সোনা ফেরত চাইতে পারে। তাতে কোনও সমস্যা ছিল না। আপনারা বিপদে পড়তেন না।

'সোজা কথায় বলতে হয়, লোভ আপনাদের মস্তিষ্ক দখল করল। এখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলোর হিসাবের খাতা বলছে, তাদের কাছে রয়েছে বারো হাজার টন সোনা। ওগুলোর দাম ধরা হয়েছে আনুমানিক এক ট্রিলিয়ন ইউরো। ...বাস্তবে বলতে পারবেন ওগুলো কোথায় গেছে? ওগুলো হয়ে গেছে অলঙ্কার—সারা দুনিয়ার মহিলারা চুড়ি, দুল, আঙটি, নেকলেস ইত্যাদি গহনা বানিয়ে নিয়েছে! আপনারা ওগুলো আর উদ্ধার করতে পারবেন না এখন।

'কয়েকটা সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক ভাল করেই জানে কী ঘটেছে। তারা সোনার মূল্যের পয়েন্ট সিকি পার্সেন্ট সুদ নিচ্ছে, কিন্তু এটাও জানিয়ে দিয়েছে, তাদের সোনা নিয়ে যা খুশি করা চলবে না, চাওয়ামাত্র ফেরত দিতে হবে। দু'বছর আগে ফ্রেঞ্চ ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক তাদের কিছু রিজার্ভ বিক্রি করতে চায়, তখন আমরা সবাই মিলে সোনা কিনে ট্রেজারিতে দিই। এর ফলে আপাতত উদ্ধার পাওয়া যায়। আপনারা নিশ্চয়ই মনে রেখেছেন, সে-সময় ব্যবসায়ীরা বুঝে যায় কী ঘটছে। তখন মাত্র কয়েক সপ্তাহে সোনার দাম পঞ্চাশ ইউরো বেড়ে যায়। ওই সময় ফ্রেঞ্চ ব্যাঙ্কাররা সোনার দাম স্থির রাখার জন্যে সোনার স্টক বিক্রি করে। তখন বাজার আবারও শান্ত করতে আমাদের খরচ হয়েছিল প্রায় এক বিলিয়ন ইউরো। আমরা আমাদের স্টক-হোল্ডারদের বলেছিলাম আর কখনও এভাবে মুনাফা কমবে না। কিন্তু বাস্তব কথা হচ্ছে, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কগুলো তাদের সোনা চাইলে আবারও বিপদে পড়ব আমরা।'

নিউ ইয়র্কের এক ব্যাঙ্কার টিটকারির সুরে বললেন, 'ফ্রেড, আপনি কি আমাদের ইতিহাসের ক্লাস নিচ্ছেন নাকি? একটু খেয়াল করলে কিন্তু দেখবেন আমাদের বেশ কয়েকজন এখানে নেই। ওরা বোর্ড অভ ডিরেক্টর্স নিয়ে মিটিঙে

ব্যস্ত। আপনার কী মনে হচ্ছে না, আমাদেরও একই কাজ করা উচিত?'

'আপনি যা বললেন, সেটা এই মুহূর্তে আমাদের চিন্তার বিষয় নয়, মিস্টার ওয়েলার।' ফ্রেডারিখ বাউয়ার আমেরিকান ব্যাঙ্কারকে কড়া চোখে দেখলেন। এর ফলে কেউ ট্যাঙ্ক ওয়েলারের অনুসরণ করবার সাহস পেলেন না।

'ব্যাঙ্ক বিশ্বাসের ওপরে ব্যবসা করে,' আবার শুরু করলেন বাউয়ার, 'শ্রমিক কাজ শেষে চেক পায়, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনে, আর বাকি টাকা ব্যাঙ্কে জমা রাখে। এর ফলে কী হয় সেটা সে জানে না, জানতে চায়ও না। সে শ্রমকে মূলধনে রূপান্তর করে, আশা করে আমরা ওই মূলধন যতটা পারি বাড়াব। আমরা ওই মূলধন উদ্যোক্তাদের জোগান দিই, তারা নতুন ব্যবসা খোলে। ওখানে আরও শ্রমিক কাজ পায়, তারা শ্রম দিয়ে আরও মূলধন বাড়ায়। এই চক্র প্রক্রিয়া শতশত বছর ধরে চলেছে।

'কিন্তু শ্রমিকের বিশ্বাস যদি নষ্ট হয়ে যায়, তা হলে কী ঘটে? আমরা জানি কখনও কখনও ব্যাঙ্ক শ্রমিকের বিশ্বাস ধরে রাখতে পারেনি। কিন্তু এবার যা ঘটবে সেটা আগে কখনও হয়নি—হবেও না আর। এককথায় বলব, বিশ্বাসহীনতার যে-পরিমাণ আমরা দেখব, সেটা মুখে বলে কাউকে বোঝানো যাবে না। দেশের সোনার রিজার্ভ না থাকায় সরকার বলতে পারবে না যে-কেউ ইচ্ছে করলে অর্থের বদলে সোনা নিতে পারে। এর ফলে সরকার জনতার বিশ্বাস হারাবে, ইচ্ছে করলেও আই.ও.ইউ. ফেরত দিতে পারবে না। এখন বাস্তব কথা হচ্ছে, আমরা চাইলেও প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের রিজার্ভ ফিরিয়ে দিতে পারব না। যদি আমাদের কাছে ওই পরিমাণ টাকা থাকত, তবুও মুক্ত বাজারে এত সোনা নেই যে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কগুলোকে সন্তুষ্ট করতে পারতাম।'

এক ইংরেজ ব্যাঙ্কার বললেন, 'আমরা গোল্ডের প্রোডাকশান বাড়াতে পারি, এতে খানিকটা সময় হাতে পাব।' ভদ্রলোকের পরনে স্যাভিল রোও সুট।

এক বেঁটেমত ভদ্রলোক এককথায় জানিয়ে দিলেন, 'একদম সম্ভব নয়।' তাঁর উচ্চারণে বোঝা যায় তিনি কোনও প্রাক্তন ব্রিটিশ উপনিবেশের লোক।

ফ্রেডারিখ বাউয়ার আস্তে করে মাথা দোলালেন, 'মিস্টার স্যাণ্ডার্স, একটু খুলে বলবেন?'

বেঁটে ভদ্রলোক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। অন্যরা রোদে না বেরিয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছেন, তিনি নন। সর্বক্ষণ নীল চোখগুলো কুঁচকে রেখেছেন। হাতের পাঞ্জা অস্বাভাবিক বড়, আঙুলের গাঁটগুলো ফোলা। বোঝা যায় সম্পদ অর্জনের জন্য গায়ের জোর খরচ করেন তিনি, ব্যাঙ্কার নন।

'আমি এখানে সাউথ আফ্রিকান মাইনিং সোসাইটিকে রিপ্রেজেন্ট করছি,' বললেন ন্যাট স্যাণ্ডার্স, 'মিস্টার বাউয়ার আমাকে জানিয়েছেন এখানে কী আলাপ হবে, কাজেই আগেই আমার লোকদের সঙ্গে আলাপ করেছি আমি। আশা করি আমি নিখুঁত তথ্য দিতে পারব। গত বছর সাউথ আফ্রিকা তিন হাজার চারশো টন সোনা উৎপাদন করে। এতে প্রতি আউন্সে খরচ হয় দুশো আশি ডলার। আমরা আশা করছি এ-বছর একই পরিমাণ সোনা উৎপাদন হবে। এতে প্রতি আউন্সে খরচ পড়বে তিনশো আঠারো ডলার। ট্রেড-ইউনিয়নের কারণে শ্রমিকদের বেতন

বাড়াতে হয়েছে, ইউনিয়ন চায় আমরা আরেকটা চুক্তি করি। ওটা হলে সোনার দাম আরও বেড়ে যাবে।'

'চুক্তি করবেন না,' তাড়াতাড়ি করে বলে উঠলেন হল্যাণ্ডের সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট।

তাঁকে কড়া নজরে দেখলেন ন্যাট স্যাণ্ডার্স। 'হার্ড রক মাইনিং কোনও ফ্যাক্টরির সাধারণ কাজ নয়। এই কাজে দক্ষ হতে বছরের পর বছর লাগে। এখন ওখানে ধর্মঘট চলছে বলে আমরা হাত গুটিয়ে বসে আছি। ইউনিয়ন জানে আমাদের কিছু করার নেই। ওরা এটাও জানে খনিগুলো প্রতি আউন্স সোনা পাঁচশো ডলারে বিক্রি করছে, বেতন বাড়ালে খনি-মালিকের ক্ষতি হবে না।'

টেবিলের অপর পাশে বসে থাকা এক ব্যাঙ্কার জিজ্ঞেস করলেন, 'উৎপাদন বাড়ানো যায় না?'

'আমাদের খনি ইতিমধ্যে দু'মাইল নীচে নেমেছে। আমরা যত নীচে যাব আমাদের খরচ জ্যামিতিক হারে বাড়বে। একে অনেকটা স্কাই-স্ক্র্যাপারের সঙ্গে তুলনা করতে পারেন। মাথার উপরে আরেকটা তলা তুললেই হবে না, আগে ভিত শক্ত করতে হবে, সেইসঙ্গে বিম-কলাম শক্ত করতে হবে। এলিভেটর সেখান পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে, বাড়তি মানুষের জন্য পানি ও সুয়্যারেজের ব্যবস্থা রাখতে হবে। আর্কিটেক্টরা বলেন মাথার ওপরে আরেকটা তলা বানানো যতটা কঠিন, তার চেয়ে হাজার গুণ বেশি কঠিন তৈরি বিল্ডিঙের নীচে আরেকটা তলা তৈরি করা। তেমনি আমাদের গভীর খনিগুলোকে যদি আরও নীচে পৌঁছুতে হয় তা হলে খরচ দুই থেকে তিনগুণ বেশি পড়বে। সোনা আমরা ঠিকই ওখান থেকে উদ্ধার করতে পারব, কিন্তু মুনাফার বদলে উল্টো লোকসান দিতে হবে।'

'তা হলে আমাদের সোনার অন্য কোনও উৎস দরকার। রাশা? ওখানে? ক্যানাডা, বা ইউনাইটেড স্টেট্স্?'

ফ্রেডারিখ বাউয়ার বললেন, 'ওসব জায়গায় এত প্রচুর নেই যে আমাদের এই বিপুল চাহিদা মিটবে। তা ছাড়া নর্থ আমেরিকায় পরিবেশ স্বাভাবিক রাখার জন্য প্রতি আউন্সে তিরিশ থেকে চল্লিশ ডলার বাড়তি খরচ করতে হবে।'

'আমরা নতুন কোনও খনি আবিষ্কার করে নিই না কেন? তা ছাড়া ব্রাজিলের সোনার খনিতে সর্বক্ষণ গোলমাল চলছে, ওদের গোলমাল মিটিয়ে দিলেই ওরা উৎপাদন বাড়াতে পারে।'

'যেসব দামি যন্ত্রপাতি লাগবে, তাতে... আর ম্যানেজমেন্ট তৈরি করা... তা ছাড়া ব্রাজিলের সোনার খনিতে যে শিরা পাওয়া যায়, তাতে এক বছরে বড়জোর একটা আর্মার্ড কার ভরা যাবে।' মাথা নাড়লেন স্যাণ্ডার্স। 'বিশ্বে অনেক সোনার খনিতে ভাল শিরা পাওয়া যায়, কিছু কিছু জায়গা আমরা ঘুরেও দেখেছি। কিন্তু আমলাতন্ত্রের কারণে ওগুলো নিয়ে কাজ করতে সময় লাগবে। ধরে নিতে পারেন, ফাইল নড়তে অন্তত এক বছর। এরপর আপনারা খনিতে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করবেন। তারপর সোনা তুলতে লাগবে বহু দিন। কিন্তু আপনারা তো হঠাৎ চাইছেন হাজার হাজার টন সোনা।'

ন্যাট স্যাণ্ডার্সের কথা শেষে হল-এ থমথমে নীরবতা নামল। কিছুক্ষণ পর

এক ফ্রেঞ্চ ব্যাঙ্কার বললেন, 'তা হলে একটাই পথ আছে। আমরা সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ককে জানাব হুট্ করে রিজার্ভ যেন না চেয়ে বসে। ওরা বুঝবে। দরকার হলে দ্বিগুণ সুদ দেব।'

'আপাতত হয়তো ব্যবস্থা হলো, কিন্তু সমস্যাটা তো রয়েই গেল,' বললেন নিউ ইয়র্কের আরেকজন ব্যাঙ্কার। 'আমরা আমাদের দায়িত্ব এড়াতে পারছি না।'

'কিন্তু আমরা সোনাগুলো সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের ভল্টে ফেরত দিতে পারলে বাজার-মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারব,' বললেন ফ্রেঞ্চ ব্যাঙ্কার। 'আমার দেশে যা ঘটেছে, সেটা চট করে আবারও ঘটবে না।'

'কিন্তু যখন *ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল* এই খবরটা প্রকাশ করবে?' মাথা নাড়লেন নিউ ইয়র্কার, বিরক্ত হয়ে বললেন, 'এই খবর জানা মাত্র সরকারের গলা টিপে ধরে পাবলিক বলবে, *তোমরা বলেছ সোনার রিজার্ভ ঠিক আছে। দেখাও দেখি আমাদের সোনা কোথায় রেখেছ!* আমেরিকার পাবলিক সত্যি মনে করে ফোর্ট নক্স-এ একটা সোনা ভরা ভল্ট আছে। ওরা যদি জেনে যায় ওখানে আছে কয়েকটা মূল্যহীন কাগজ, সবাই খেপে উঠবে। স্রেফ পাগল হয়ে যাবে পাবলিক। সরকার আগে কখনও এরকম ভয়ানক মিথ্যা বলেনি, ডলার আগে কখনও মূল্যহীন কাগজ ছিল না।'

'জেন্টলমেন, এই জন্যেই বক্তব্যের শুরুতে আমি বলেছি, আমরা একটা ভয়ঙ্কর বিপদে পড়েছি,' বললেন বাউয়ার। 'আমরা ধনতন্ত্রের আসল ভিত্তিটা সরিয়ে নিয়েছি। জনতা যখন সোনা উধাও হওয়ার খবর জানবে, সব দেশের সমস্ত প্রক্রিয়া স্তব্ধ হয়ে যাবে—সবকিছু তাসের বাড়ির মত খসে পড়বে।'

সুইস ব্যাঙ্কার থামলেন, চারপাশ দেখলেন। সবার তিক্ত চেহারা দেখে বুঝতে পারছেন, সম্পূর্ণ মনোযোগ পেয়েছেন। তাঁরা এখনও জানেন না তিনি কী বলবেন, কিন্তু আন্দাজ করবার চেষ্টা করছেন। গ্লাস তুলে এক চুমুক পানি খেলেন বাউয়ার, তারপর গ্লাস রেখে বললেন, 'গত ছ'বছর ধরে জার্মানি অর্থনৈতিক ভুল পলিসির কারণে বারবার ব্যর্থ হয়েছে। ওরা ইউরোপের সবচেয়ে বড় শিল্প-কারখানাগুলো চালাত, কিন্তু নিজেদের ওয়েলফেয়ার স্টেট বানাতে গিয়ে কী হয়েছে? ওদের উৎপাদন কমেছে, বেকারের সংখ্যা হয়েছে আকাশচুম্বি—এখন সরকার অতিরিক্ত ভাতা দিতে গিয়ে ফতুর হয়ে যাচ্ছে। এককথায় বলা যায়, এভাবে চললে জার্মানি দেউলিয়া হয়ে যাবে। দু'সপ্তাহ আগে আমি জেনেছি, ওরা ওদের সোনার মজুদ বিক্রি করবে।'

চট করে শ্বাস আটকে ফেললেন সবাই। পরিষ্কার বুঝতে পারলেন এরপর কী আসছে।

'জেন্টলমেন, তার মানে ছ'হাজার টন। সাউথ আফ্রিকার দু'বছরের উৎপাদনের প্রায় সমান। বার্লিন আর বন-এ ওরা রিজার্ভ রেখেছে মাত্র দু'হাজার টন। অর্থাৎ বুঝতেই পারছেন, বাকি চার হাজার টন আমাদের জোগাড় করে দিতে হবে।'

'কবের মধ্যে দিতে হবে?' জানতে চাইলেন ফ্রেঞ্চ ব্যাঙ্কার। বরাবর ভদ্রতা করে বাউ করেন তিনি, কিন্তু এখন ভুলেই গেছেন।

'এখনও জানি না,' বললেন বাউয়ার। 'তবে মনে হয় ওরা বাজার-মূল্য স্থির রাখতে খানিকটা সময় নেবে।'

বিড়বিড় করে বললেন নিউ ইয়র্কার, 'খানিকটা সময়, যথেষ্ট সময় নয়।'

'আরেকটা কথা মনে রাখবেন,' বললেন বাউয়ার, 'যদি সুবিধাবাদী ব্যবসায়ী-চক্র টের পায় যে আমরা সোনা জোগাড় করছি, এমনও হতে পারে দাম বেড়ে যাবে দুই থেকে তিন গুণ।'

হল্যাণ্ডের ব্যাঙ্কার আফসোস করে বললেন, 'আমরা শেষ হয়ে যাব! সবাই ফতুর হয়ে যাব! জার্মানি কাগজের নোট নিলেও দিতে পারতাম না! সবাই সোনা বিক্রি করে ওই টাকা ধার দিয়েছি। যত ঋণ দিয়েছি এখন সব ফেরত চাইতে হবে! ডাচ অর্থনীতি একেবারে ধসে পড়বে!'

'শুধু আপনাদের অর্থনীতি নয়,' বললেন ট্যাঙ্ক ওয়েলার। 'আমরা বিশ বিলিয়ন ডলারের সোনা কেনা-বেচা করেছি, ওগুলোর বড় একটা অংশ গেছে ডট-কম বিস্ফোরণের পরের ধাক্কায়। যারা সঞ্চয়ী হিসাবে টাকা জমা রেখেছে, তাদের মূলধন থেকে এখন ঋণ শোধ করতে হবে। আমেরিকান ব্যাঙ্কে ছোটাছুটি করবে সবাই। তার মানে অকল্পনীয়, বিশাল মন্দা আসবে।'

আবারও থমথমে নীরবতা নামল। যা আলাপ হয়েছে সেগুলো নিয়ে ভাবছেন সবাই। উনিশশো বিশ ও ত্রিশের দশকে যা ঘটেছে দেখেননি এঁরা, কিন্তু দাদা-নানার কাছে শুনেছেন। তখন বিশ্ব জুড়ে মহা মন্দা আসে। কিন্তু এবার আরও ভয়ঙ্কর কিছু ঘটবে, দেশগুলো এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি পরস্পর নির্ভর। ব্যাঙ্কারদের কয়েকজন নিজস্ব ক্ষতি বা নিজের দেশ নিয়ে চিন্তা করছেন না, ভাবছেন গোটা বিশ্বে কী ঘটবে তা-ই নিয়ে। উন্নত দেশগুলো নিজেদের মানুষের খাবার জোগাড় করতে ব্যস্ত হয়ে পড়বে, ফলে আন্তর্জাতিক সাহায্য বন্ধ হয়ে যাবে। স্বল্পোন্নত দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ না খেতে পেয়ে মারা যাবে।

কেন?

কারণ, এই টেবিলে যাঁরা বসে আছেন, তাঁরা নিজেদের মুনাফা বাড়ানোর জন্য সমস্ত সোনা বিক্রি করে দিয়েছেন!

এ-মুহূর্তে সব ব্যাঙ্কার ফ্রেডারিখ বাউয়ারের মত ধূসর চিন্তা করছেন।

কিছুক্ষণ পর একজন বললেন, 'জার্মান সরকারকে ঠেকানো যায় না?'

'চেষ্টা করা যায়,' জবাবে বললেন আরেকজন। 'কিন্তু ওদেরই খুঁজে বের করতে হবে কীসে লাভ। ওরা ওদের সোনাগুলো চাইছে ইনসলভেনসি থেকে বাঁচতে। নইলে ওদের ওখানে রায়ট হবে, কু-ও হতে পারে।'

সবাই মিলে নিজেদের রক্ষা করতে চাইছেন—নিজেদের ব্যাঙ্ক আর বিশ্বটা উদ্ধার করতে চাইছেন। কিন্তু একসময় তাঁরা হাল ছেড়ে দিলেন। আসলে এই বিপদ থেকে বাঁচা যাবে না। ফ্রেডারিখ বাউয়ার সবার কথা শুনেছেন, একসময় তাঁরা থেমে গেলে তিনি আফ্রিকান মাইনিং সোসাইটির রিপ্রেজেন্টেটিভকে একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসতে বললেন।

হল-এর দরজা খুলল, বন্ধ হয়ে গেল আবার। ব্যাঙ্কাররা ফ্রেডারিখ বাউয়ারের দিকে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিলেন। তিনি ঠিক করেছেন প্রশ্ন আসার আগ পর্যন্ত চুপ

করে থাকবেন।

এবার সবাই মিলে ধরে বসলেন, জানতে চাইলেন উনি কোনও পথ দেখাতে পারবেন কি না।

'এই সমস্যা থেকে বেরোনোর পথ আছে?' জানতে চাইলেন দুনিয়ার ষষ্ঠ ব্যাঙ্কের সিইও, এক ইংলিশম্যান।

'হ্যাঁ, পথ আছে,' এবার বললেন বাউয়ার। সবাই তাঁকে দেখছেন। তিনি পিডিএ-তে মৃদু টোকা দিয়ে মেসেজ দিলেন। কয়েক সেকেণ্ড পর আবারও হল-এর দরজা খুলে গেল। যিনি ঘরে ঢুকলেন তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস ঝরে পড়ছে। ব্যাঙ্কাররা কখনও স্বীকার করবেন না যে তাঁরা ক্ষমতাবানদের ভঙ্গি নিলেও নিজেদের লুকিয়ে রাখেন আড়ালে, আসলে অনিশ্চয়তা তাঁদের কুরে কুরে খায়—কিন্তু এই লোক অন্য ধাতু দিয়ে তৈরি। সাবলীল ভঙ্গিতে এলেন তিনি, মাথা উঁচু করে হাঁটেন। বয়স পঞ্চাশ বা বায়ান্ন। হয়তো ব্যাঙ্কারদের সমানই হবেন। মুখে কোনও ভাঁজ পড়েনি, তবে চোখ যেন বলছে ওঁর মনের বয়স আরও অনেক বেশি। মাথায় বাদামি চুলের চেয়ে ধূসর চুলই বেশি। বেশিরভাগ ব্যাঙ্কার বিত্ত আর প্রতিপত্তির নকল আত্মতৃপ্তি দিয়ে নিজেকে সন্তুষ্ট রাখেন, কিন্তু ইনি তা করেন না। দরকার পড়ে না। তিনি যেন একটা আশ্চর্য শক্তি সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। হল-ঘরে কী যেন একটা ঘটেছে, তাঁকে কথা বলতে হলো না, সবার মনোযোগ পেয়ে গেলেন।

ভদ্রলোককে পাশে বসালেন বাউয়ার, 'জেন্টলমেন, ইনি ভ্লাদিমিয়ার সরোকিন। আগে সোভিয়েত ব্যুরো অভ ন্যাচারাল রিসোর্সেস-এ ছিলেন। এখন কনসালট্যান্সি করেন।'

কেউ কোনও কথা বললেন না। আন্দাজ করতে চাইলেন এই লোকের এখানে আসবার কারণ।

'আমি জানতাম এরকম কিছু ঘটবে, তাই অনেক আগেই গোপনে পরিকল্পনা করেছি,' বললেন বাউয়ার। 'এখন আপনাদের যা বলব সেটা নিয়ে কোনও তর্ক বা আপত্তি তুলবেন না। আমাদের কাছে এই একটাই রাস্তা আছে, কাজেই আপনারা দয়া করে কথাগুলো খেয়াল করে শুনবেন। মিস্টার সরোকিন এখন আমাদের পরিকল্পনা আপনাদের খুলে বলবেন।'

ভ্লাদিমিয়ার সরোকিন উঠে দাঁড়ালেন না, চেয়ারের ঘাড়ে ডানহাত রেখে বক্তব্য শুরু করলেন। ব্যাঙ্কাররা শুনলেন কী ভাবে উদ্ধার পাওয়া যাবে। ভ্লাদিমিয়ার সরোকিন পুরো দশ মিনিট কথা বলে গেলেন। তাঁর কথা শেষে ব্যাঙ্কারদের চেহারায় আতঙ্ক, রাগ, ও ঘৃণার ছাপ পড়ল। ডাচ ব্যাঙ্কারকে দেখে মনে হলো যে-কোনও মুহূর্তে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়বেন। ফ্রেডারিখ বাউয়ার জানেন নিউ ইয়র্কের ব্যাঙ্কারদের একজন ভিয়েতনামে লড়াই করেছেন, তিনিও ফ্যাকাসে হয়ে গেছেন।

'জেন্টলমেন, আমাদের আর কিছু করার নেই,' বললেন বাউয়ার। কেউ মুখে কিছু বললেন না। বাউয়ার একে একে সবার চোখে তাকালেন, তাঁদের চোখই কথা বলল। তাঁরা চোখ সরিয়ে নিলেন, বা মৃদু মাথা দোলালেন। রইল ডাচ

ব্যাঙ্কার। কীসে রাজি হয়েছেন ভেবে গুঙিয়ে উঠলেন তিনি, চোখ নামিয়ে হাতের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

উপসংহারে বাউয়ার বললেন, 'আমি চুক্তিপত্রের ব্যবস্থা করছি, এখুনি আপনারা সবাই সম্মতিস্বাক্ষর দেবেন। পরে আর কখনও আমাদের এভাবে সাক্ষাৎ হবে না।'

শুধু নিউ ইয়র্কের ব্যাঙ্কার ট্যাঙ্ক ওয়েলার বললেন, 'পরে সাক্ষাৎ ঠিকই হবে—নরকে!'

সাত

কয়েক পা পিছিয়ে গেল মাসুদ রানা।

কন্টেইনারে সব বয়সের মানুষ আছে, তবে বেশির ভাগের বয়স বিশ থেকে পঁচিশ। কিছু দেহে বিষক্রিয়ার কালচে-নীল ছোপ। লাশগুলো আগেই পচে গেছে। কয়েকটা লাশের পেটে গ্যাস জমেছে, বেঢপ ফুলে উঠেছে। সম্ভবত অন্যরা সামান্য আগে মারা গেছে। জলদস্যুরা যখন কন্টেইনার সাগরে ফেলে, তখন ডুবে মারা গেছে। ডেক-এর আলোতে তাদের দেহ ফ্যাকাসে, অসুস্থ দেখাল। লাশগুলো পরস্পরকে জাপ্টে ধরে পড়ে আছে। মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের সংখ্যা অনেক বেশি। এরা সবাই এশিয়ান—চাইনিজ, ইন্দোনেশিয়ান, লাওশান, বার্মিজ। কয়েকটা লাশ নীরবে বলল, ওরা সার্ক অঞ্চলের মানুষ।

চোখ সরিয়ে অন্ধকার সাগরের দিকে তাকাল রানা, তা হলে এদেরই মত একদল পাষণ্ডের খপ্পরে পড়ছে সোনালি ভবিষ্যতের আশায় পাড়ি দেওয়া মানুষগুলো! বুকের ভিতরে ফুঁসে উঠছে প্রচণ্ড রাগ। শিরি-ফোর যেখানে ছিল, সেখানে এখনও ঢেউয়ের মাথায় তেল জ্বলছে।

রানার পাশে এসে দাঁড়াল ফু-চুং ও উর্বশী। ফু-চুং নিচু স্বরে বলল, 'ওই ট্রলারের ওরা ছিল স্নেকহেডের শিকার।'

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা, চুপ করে থাকল।

এশিয়ায় বেশ কয়েক বছর ধরে ঘটছে এটা। যারা বুঝে নিচ্ছে দেশে উন্নতি হবে না, তারাই যেতে চাইছে উন্নত দেশে। আর সেই সুযোগটা নিচ্ছে স্মাগলাররা, হাজার হাজার ডলার নিয়ে মানুষ পাচার করছে এরা। যারা টাকা দিল, তারা বেঁচে গেল, কিন্তু গরীব মানুষ অত টাকা কোথায় পাবে? কাজেই স্মাগলাররা অন্য ব্যবস্থা রেখেছে—তুমি চুক্তি করো, আমরা তোমাকে কোরিয়া, জাপান, ইউরোপ বা আমেরিকায় পাঠিয়ে দেব। শর্ত থাকবে, যতদিন টাকা ফেরত না দাও, আমাদের দেওয়া চাকরি ছাড়তে পারবে না। একবার ওসব দেশে বে-আইনী ভাবে ঢুকলে আর পালাবার পথ থাকছে না—স্নেকহেড বা সর্দারের কথা মত চলতেই হবে। বেতন এত কম দেয়া হয় যে বছরের পর বছর পার হয়ে যায়, টাকা শোধ দেয়া যায় না। আর কেউ যদি পালায়? দেশে তার আত্মীয়-স্বজনের

উপর নেমে আসে অত্যাচারের চাবুক। টাকা ফেরত না দিলে খুন করা হয়। সবচেয়ে করুণ অবস্থা হয় মহিলাদের। সাধারণত তাদের ম্যাসাজ পার্লার নামের পতিতালয়ে কাজ দেয়া হয়।

শুধু লাল-চিন থেকেই প্রতি বছর হারিয়ে যাচ্ছে দশ হাজার লোক। বোকা মানুষগুলো জানেও না বিদেশে কপাল ঠুকতে গিয়ে জীবনভর দাসত্বের শেকল পায়ে বাঁধছে। এই একই পরিণতি হচ্ছে আশিয়ান হোক, বা সার্ক—সব দরিদ্র বা উন্নয়নশীল দেশের সাধারণ মানুষের।

এসব দেশের ইন্টেলিজেন্স কিছুদিন আগেও ভেবেছে ওই মানুষগুলোর বেশিরভাগ যায় কোরিয়া, জাপান, ইউরোপ, আমেরিকায়। কিন্তু এখন আর কেউ অতটা নিশ্চিত নয়।

কন্টেইনারে যে-মানুষগুলো ছিল, তাদের গন্তব্য কোথায় ছিল? বিষ খাওয়ানো হয়েছে কেন?

'চল্, রানা, ফু-চুং আয়, এসো উর্বশী,' হঠাৎ পিছনে সোহেলের গলা শুনতে পেল ওরা। 'ফারা রাইনারের সঙ্গে কথা হয়েছে। অটপসি করলে হয়তো বেরিয়ে আসবে ওদের সবার দেহে বিষ এল কেন, কোত্থেকে।'

ঘুরে দাঁড়াল ওরা।

এক আর্দালিকে ডাকল রানা, 'মোস্তাফা, তোমরা কন্টেইনার খালি করো। খেয়াল রেখো কোনও আইডি বা আর কিছু পাওয়া যায় কি না। লাশ বের করে কন্টেইনার সাগরে ফেলে দেবে।'

'ইয়েস, সার,' চলে গেল মোস্তাফা।

'আমি থাকছি, ফারার কাজে সাহায্য করব,' বলল উর্বশী।

রানার সঙ্গে সুপারস্ট্রাকচারের দিকে এগোল সোহেল ও ফু-চুং। ওরা অপারেশন্স সেন্টারে ফিরে এল। কেউ মুখ তুলে ওদের দিকে তাকাল না, থমথম করছে সবার মুখ। গগল হেল্‌ম্-এ দাঁড়িয়ে। অতিরিক্ত ব্যস্ত হয়ে ওয়েপন্স পরীক্ষা করছে অনিল।

'অনিল,' মৃদু ডাকল রানা।

ঘুরে তাকাল ভারতীয় এজেন্ট। ওর চোখ দুটো লাল। চোয়াল শক্ত হয়ে আছে। ও-ই শিরি-ফোর ডুবিয়ে দিয়েছে। নিজেকে দায়ী করছে এখন। ভাবছে, ওর কারণে বন্দি পাওয়া গেল না, কন্টেইনারের মানুষগুলো মারা গেল।

'তুই খামোকা নিজেকে দোষ দিচ্ছিস,' বলল রানা। 'আমিও শিরি-ফোরের ঠিক ওখানেই আঘাত হানতাম। একইকাজ করত অন্যরা, ইচ্ছে করলে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারিস।'

'এর পরেরবার ওদের ধরব আমরা,' বলল ফু-চুং।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে অস্ত্রের দিকে মনোযোগ দিল অনিল।

গগলের দিকে তাকাল রানা। 'গগল, আমরা তিরিশ নট-এ ফিরতি পথ ধরব। সাবমেরিনটার উপরে যাব।'

উর্বশী ডেকে ফারাকে সাহায্য করছে, কাজেই আতাসির পাশে বসল রানা, প্যাসিভ সোনারে চোখ রাখল। রহস্যময় সাবমেরিনের উপরে পৌঁছুনো পর্যন্ত

কোর্স আর স্পিড বলল ও।

ওরা একঘণ্টা আগে সাবমেরিনটা ডিটেক্ট করেছে। ওটা এখনও আগের জায়গাতেই আছে। পঁচাত্তর ফুট নীচে। অ্যাকুস্টিক সিগনাল পেল রানা, অদ্ভুত শব্দগুলো কম্পিউটারের মাধ্যমে কমিয়ে নিল। থাকল শুধু বাতাস বেরিয়ে যাওয়ার শব্দ। বোঝা গেল না সাবমেরিন ঘাপটি মেরে পড়ে আছে, না কোনও সমস্যায় পড়েছে। কোনও বিপদে থাকলে অ্যালার্ম ক্ল্যাক্সোন বাজত, প্রেশার্ড টিউবের ভিতরে ক্রুদের নড়াচড়ার আওয়াজ থাকত। আছে শুধু বাতাস বেরুনো আর ধীরে ধীরে সাব-এর ডুবে যাওয়া।

কম্পিউটারে এদিকের সাগরের চার্ট দেখল রানা। সাগর এখানে প্রায় দুই মাইল গভীর। এই হারে নামলে সাবমেরিন তলায় ঠেকতে কয়েকদিন লাগত, কিন্তু তার অনেক আগেই ওটা চারপাশের পানির প্রচণ্ড চাপে চিঁড়ে-চ্যাপটা হয়ে যাবে।

নিজের চেয়ারে ফিরে এল রানা, মুন পুল-এ ইন্টারকম করল, 'ডাইভ মাস্টার, মাসুদ রানা বলছি। হাল ডোর খুলুন, কম পানির রোভটা রেডি করুন। দু'জন ডাইভার ওখানে থাকুক, আমার কিছু গিয়ার লাগবে।'

পনেরো মিনিট পর মুন পুলে, রোভ-এর পাইলটের পিছনে দাঁড়াল রানা, বাম হাতে গগল্‌স্‌-এর স্ট্রিপ। আস্তে করে রওনা হলো প্রোব, নামতে শুরু করল। সাবমেরিন দেখতে যে-কাউকে পাঠানো যেত, কিন্তু ওখানে বিপদ থাকতে পারে বলে নিজেই দেখতে চেয়েছে রানা।

আণ্ডারওয়াটার প্রোবটা দেখতে ছোটখাটো একটা টর্পেডোর মত। প্রপেলারের গতি তিন ধাপে বাড়ানো-কমানো যায়, প্রোবটা এদিক-ওদিক সরিয়ে নেওয়া যায়। গম্বুজের মত নাকে বসে আছে একটা হাই রেযোলিউশন ভিডিও ক্যামেরা। পিছনের দিকে রয়েছে শক্তিশালী বাতি। ওই আলো অতিরিক্ত নোংরা পানিও ভেদ করতে পারে, চারপাশের দশ ফুট একদম পরিষ্কার দেখা যায়। মুন পুলে দু'জন ক্রু অপেক্ষা করছে, প্রোবের কেইবল-এ প্যাঁচ লেগে গেলে ছাড়িয়ে দেবে।

একবার উপরের দিকে তাকাল রানা। মার্ভেলের বিরাট কবাট হাঁ করে আছে। ওখানে আণ্ডারওয়াটার উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক বাতি দেখা যাচ্ছে। চারপাশে সবুজ আলো ছড়িয়ে পড়ছে। মুন পুল-এর উপরে দেখা গেল মিনি-সাব ডিসকভারি-১০০০-এর ছায়া, যেন কোনও ডুবে যাওয়া বিধ্বস্ত প্লেন। ওটা অপেক্ষা করছে, কিছু টেনে আনতে হলে শক্তিশালী হাতসহ নেমে আসবে।

'পঞ্চাশ ফুট পার হচ্ছি,' বলল পাইলট। খুব মনোযোগ দিয়ে স্ক্রিন দেখছে সে। রোভ-এর ক্যামেরা চারপাশ দেখাচ্ছে। নীচে শুধু গাঢ় অন্ধকার!

'ষাট ফুট।' দুই আঙুলে প্রোবের জয়স্টিক দুটো নাড়ছে সে।

'ওই যে,' আঙুল দিয়ে দেখাল রানা।

ধীরে ধীরে নীচে কী যেন দেখা দিল। ওটার দিকে নেমে চলেছে রোভ। ওরা সাবমেরিনের পিছনে আছে। উজ্জ্বল আলোয় প্রপেলারটা ব্রোঞ্জের মত চকচক করল। এবার রেইডার দেখা গেল। আগে কখনও এরকম সাবমেরিন দেখেনি রানা। ইয়ারফোনে বলল, 'আবার পাঁচ ফুট ওপরে ওঠো, তারপর দশ ফুট এগিয়ে

যাও।'

নির্দেশ পালন করল ইন্দোনেশিয়ান নেভির সাব লেফটেন্যান্ট মুর্তোজা। প্রপেলারের দিক থেকে সরে গেল ক্যামেরা। স্টিলের প্লেট দেখতে পেল ওরা। কিন্তু ওগুলো দেখে মনে হলো না ওটা সাবমেরিনের গা। চুরুটের মত নয়। উর্বশী সোনারে দেখে বলেছিল, জিনিসটা খাটো আর মোটা। সাবমেরিন এরকম হয় না।

হঠাৎ কালো হাল-এ সাদা এইচএএম লেখাটা দেখতে পেল ওরা। রানা বলল, 'একটু পিছিয়ে যাও।'

খুদে সাগর-রোবোট পিছিয়ে গেল। এবার লেখাটা পরিষ্কার দেখা গেল–**UTHAMPTO.**

ডাইভারদের একজন বলল, '**UTHAMPTO**-র মানে কী?'

'মানেটা জরুরি নয়,' বলল রানা। 'প্রশ্ন ওটা এখানে কেন। সাউথহ্যাম্পটন তো ইংল্যাণ্ডে।'

কয়েক সেকেণ্ড পর বোঝা গেল ওটা ভেসেলের হোম পোর্ট। একইসঙ্গে দেখা গেল নাম–***AVALANCHE.***

অ্যাভালাঞ্চ কোনও সাবমেরিন নয়। ওটা একটা জাহাজ।

প্রোবের স্ক্রিনে দেখছে রানা। ওরা জাহাজের স্টার্ন রেইলিং পার হলো, চলে এল অ্যাফ্‌ট্ ডেকে। কয়েকটা মাছ জঞ্জালের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

'মনে হয় শিরি-ফোরের খুনিদল এখানে হামলা করেছে,' বলল রানা।

'ওরা আমাদের রেইডারের একটু দূরেই ছিল,' বলল দ্বিতীয় ডাইভার, 'বাঁচাতে পারলাম না।'

ব্রিজে অনিলের সঙ্গে কথা বলল রানা।

কম্পিউটারে ব্যস্ত হয়ে ব্রিটিশ জাহাজটার নাম খুঁজল অনিল।

'মাসুদ ভাই, আমরা কিন্তু ওদের কোনও এসওএস ধরতে পারিনি,' বলল প্রথম ডাইভার।

'হয়তো শিরি-ফোর অ্যাভালাঞ্চের রেডিয়ো জ্যাম করে,' বলল রানা। 'এমনও হতে পারে হঠাৎ করে ওদের উপরে চড়াও হয়েছে, ওরা আর সাহায্য চাইতে পারেনি।'

'রানা,' ভেসে এল অনিলের কথা। 'অ্যাভালাঞ্চ রয়েল জিওগ্রাফিক সোসাইটির ভেসেল। সাগরে নামে উনিশশো বিরাশিতে। দৈর্ঘ্যে একশো তিরিশ ফুট, চওড়ায়...'

কথা শেষ করতে দিল না রানা, জিজ্ঞেস করল, 'শেষবার ওটা কোথায় দেখা গেছে?'

'রয়েল জিওগ্রাফিক সোসাইটির প্রেস রিলিজে বলা হয়েছে ওটা চারদিন আগে হারিয়ে গেছে। ওকিনাওয়া থেকে আমেরিকান সার্চ অ্যাণ্ড রেসকিউ টিম এদিকে আসে, কিন্তু কিছু খুঁজে পায়নি।'

'আশ্চর্য!' আপনমনে বলল রানা। মাইক্রোফোনে ওর কথা শোনা গেল। 'ধরলাম খুনিরা ওদের রেডিয়ো জ্যাম করেছে। কিন্তু সার্চ অ্যাণ্ড রেসকিউ টিম ওদের দেখল না কেন?'

গগলের সঙ্গে কী যেন আলাপ করল অনিল। গগলের চাঁছাছোলা গলা শোনা গেল, 'হয়তো পাইরেটরা ওটা আগেই ডুবিয়ে দিয়েছে?'

'চারদিন ধরে ডুববে?' বলল রানা। 'একটা কারণ তো থাকতে হবে! কেউ ভেতরে পানি ঢোকা থামিয়েছে।'

'তবুও ডুবেছে,' বলল গগল। 'লোকটা বাঁচতে পারেনি। ওটা একবার বয়্যান্সি হারিয়েছে, আবার ফিরে পেয়েছে, তবে শেষে একদম তলায় নেমে যাবে।'

'ওটার ভেতরে বাতাস আটকে আছে,' বলল রানা। ব্যাখ্যা দিল, 'এমনও হতে পারে ওটা কোনও হ্যালোক্লাইনে আটকেছে।'

'হতে পারে,' মেনে নিল গগল। 'সাগরে আগেও অতিরিক্ত লবণের স্তর দেখেছি আমি। অনেকটা ডেড সি'র মত। চেষ্টা করলেও ডোবা যায় না।'

'তবে বাতাস বেরিয়ে যাচ্ছে,' বলল রানা। 'আস্তে আস্তে ডুবছে।'

'আপাতত বয়্যান্সি ঠিক আছে, কিন্তু যে-কোনও সময় পাথরের মত নেমে যাবে,' বলল গগল। 'সরে পড়ো। হতে পারে তোমাদেরকেও সঙ্গে নিয়ে যাবে।'

'ব্যাটা খালি ভয় দেখায়,' মনে মনে বলল রানা। মুখে বলল, 'কেউ বেঁচে আছে কি না দেখতে চাই।'

চুপ হয়ে গেল সবাই। প্রোবটা নিঃশব্দে নিমজ্জিত জাহাজের উপর দিয়ে ভেসে চলল। বাইরে হামলার ছাপ নেই। কোনও বুলেটের দাগ বা ফুটো দেখা গেল না। অ্যাভালাঞ্চে কোনও বিস্ফোরণ ঘটেনি। মনে হলো জাহাজের লোকগুলো কোনও প্রতিবাদ না করেই স্বেচ্ছায় ডুবে গেছে।

অ্যাভালাঞ্চের বো'র সামনে পৌঁছে গেল প্রোব। সাব লেফটেন্যান্ট মুর্তোজাকে সুপারস্ট্রাকচার দেখাল রানা। 'ওখানে চলো। পোর্টহোলে উঁকি দেব।'

'মাসুদ ভাই, ভাবছেন ওখানে কেউ বেঁচে আছে?' জিজ্ঞেস করল মুর্তোজা।

'না,' এককথায় জানিয়ে দিল রানা। একটু আগে চিন্তা করেছে ও—জলদস্যুর হামলার পরে কেউ বাঁচবে না। তাদের আক্রমণ দেখেছে ও। পিঁপড়ের মত মানুষ খুন করবে, সাক্ষী রাখবে না। ও নিজে নিমজ্জিত জাহাজে আটকা পড়লে মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করত। নানারকম আওয়াজ করত, প্রাণপণে চেঁচাত। কেউ যদি সোনারে শব্দটা পায়, দেখতে আসে। কিন্তু সোনারে শুনেছে ও, অ্যাভালাঞ্চে কোনও প্রাণের আওয়াজ নেই।

অ্যাভালাঞ্চের ডেকের উপর দিয়ে ভেসে চলেছে রোভ। ব্রিজের দিকে চলেছে। বৈদ্যুতিক আলোয় প্রকাণ্ড জানালাগুলো দেখা গেল। ওখানে কোনও কাঁচ নেই।

হাতের ইশারায় ওদিকটা দেখাল রানা। 'প্রোব নিয়ে ভেতরে চলো। দেখব।'

সাবধানে একটা জানালা টপকে ভিতরে ঢুকল মুর্তোজা, খেয়াল রাখল যেন লাইফ লাইনে প্যাঁচ না পড়ে।

ঘরের ছাদে স্বচ্ছ স্ফটিক দেখা গেল। পানিতে বাতাস জমে আছে। মেঝেতে একটা বুলেটের গর্ত। ওখান থেকে বাতাস উঠছে, জমছে গিয়ে সিলিঙে।

ব্রিজে আক্রমণের সুস্পষ্ট ছাপ। ঘরের চারপাশে অজস্র গুলির দাগ। ডেকে পড়ে আছে বুলেটের খোসা। ঘরের এক কোণে একটা মোড়ানো কার্পেট পড়ে

আছে—না, ওটা একটা লাশ!

'মুর্তোজা, আইডি থাকতে পারে,' বলল রানা।

আরেকটু এগোল রোভ, কিন্তু ওটা দিয়ে লাশ সরানো গেল না। মোটাসোটা মানুষটা অতিরিক্ত ভারী। অবশ্য কয়েক মিনিটের চেষ্টায় কাত হলো। দেখা গেল ছোট ছোট মাছ লাশের চোখ দুটো খেয়ে নিয়েছে।

'সুপারস্ট্রাকচারে ঢোকা যায় কি না দেখব,' বলল রানা।

ব্রিজের পিছনের দরজাটা ধাতব বার দিয়ে আটকানো।

সিদ্ধান্ত পাল্টাল রানা, 'খুলব না। ফিরে চলো, পোর্টহোলে উঁকি দেব।'

ব্রিজ থেকে বেরিয়ে অ্যাভালাঞ্চের পোর্ট-সাইডে চলে গেল রোভ। একটার পর একটা পোর্টহোলে উঁকি দিল ওরা। ভিতরে কিছু দেখা যায় না, শুধু গাঢ় অন্ধকার।

স্টার্ন ঘুরে স্টার-বোর্ডে চলে এল ওরা। আলোটা জাহাজের গায়ে গোল বৃত্ত তৈরি করল। পোর্টহোল যেন কোনও মণিরত্ন, ঝিকমিক করছে। একটা পোর্টহোলে আলো পড়তেই ওরা ধাতব আওয়াজ শুনল—ইস্পাতে ইস্পাতে বাড়ি লাগছে! কেউ জাহাজের প্লেটিঙে টোকা মারছে!

আলো আবার তাক করল মুর্তোজা। এক মহিলা! তার বড়বড় দুই চোখে আতঙ্ক। চেঁচাচ্ছে। মাঝখানে পানির দেয়াল থাকায় কোনও আওয়াজ পাওয়া গেল না।

'বেঁচে আছে, মাসুদ ভাই!' অবাক হয়ে বলল মুর্তোজা।

পাশের বেঞ্চ সিটে সরে গেল রানা, দ্রুত হাতে জোড়া ট্যাঙ্কের স্ট্রিপ পিঠে আটকাল, গলায় পরে নিল বয়্যান্সি কন্‌পেনসেটার। এবার কোমরে ওয়েট বেল্ট পরল। পরবর্তী দু'মিনিটে অন্য দুই ডাইভারও পানিতে নামবার প্রস্তুতি নিল। তিনজন ফিন আর শক্তিশালী ফ্ল্যাশ-লাইট সঙ্গে নিল।

'ফারাকে তৈরি থাকতে বলো,' শরীরে ষাট পাউণ্ড ওজন নিয়ে রোভের মুন পুলের দিকে রওনা হলো রানা। মাস্ক পরে এয়ারফ্লো পরীক্ষা করল, তারপর ফিন পরে নেমে পড়ল পানিতে। মুহূর্তে ও তলিয়ে গেল। ওর চারপাশে বুদ্বুদ উঠল। মাস্কের ভিতরে খানিকটা পানি ঢুকেছে, বের করে দিল।

পানি অতিরিক্ত ঠাণ্ডা নয়। কিছুক্ষণ পর ওয়েট সুটের ভিতরে আটকা পড়া পানি গরম হয়ে উঠল। অন্য দুই ডাইভার নেমে পড়বার পর আর দেরি করল না রানা, অন্ধকারে রওনা হলো।

অবাক লাগছে ওর, মেয়েটা বেঁচে আছে কী করে? মাছগুলো ব্রিজে পড়ে থাকা লাশটার যা অবস্থা করেছে, তা থেকে বোঝা যায় জলদস্যুরা জাহাজে উঠে সময় নষ্ট করেনি, যাত্রীদের গুলি করে মেরেছে। অন্য একটা চিন্তা এল ওর—অ্যাভালাঞ্চের খোলে কতটুকু বাতাস আছে? মেয়েটা কতক্ষণ টিকবে? ওকে বের করা যাবে তো?

নীচে প্রোবের ঝলমলে বাতি দেখল রানা, অ্যাভালাঞ্চের গায়ে ফ্যাকাসে আলো পড়ছে। জাহাজের হাল-এ কয়েকটা আঘাতের দাগ দেখল। ওসব জায়গায় বাতাস বেরোচ্ছে। মেইন ডেকে নেমে এল রানা, ডাইভ কম্পিউটার বলে দিল

তিরাশি ফুট। আগের চেয়ে দ্রুত নামছে অ্যাভালাঞ্চ। হাতে বেশি সময় নেই!

ফিন নেড়ে রোভ-এর কাছে নেমে এল রানা, নির্দিষ্ট পোর্টহোলে তাকাল। গোলাকৃতি জানালায় ওকে দেখে ভয়ে চমকে উঠল মেয়েটা, পিছিয়ে গেল। পরমুহূর্তে বুঝল, বিপদ হবে না। আবার এগিয়ে এল। দুটো মুখের মাঝখানে থাকল এক ইঞ্চি পুরু কাঁচ। এই দূরত্ব দূর করতে হবে। রানা মাথা খেলাচ্ছে। বারবার মন গাইছে, যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে?

মেয়েটা কয়েকটা সোয়েটারের উপরে দুটো জ্যাকেট চাপিয়েছে। মাথা ঢেকে রেখেছে উলের ওয়াচম্যান ক্যাপ। ভিতরে তাপমাত্রা নিশ্চয়ই বাইরের পানির সমান? রানা চট্ করে ডাইভ কম্পিউটার দেখল—একান্ন ডিগ্রি। মেয়েটার বড়বড় চোখ দুটো সাগর নীল রঙের। এখন আর চোখে উন্মাদনা নেই, বদলে আছে বাঁচার আকুতি। মাথা ঠাণ্ডা রেখেছে, রানার দিকে কৌতুকের দৃষ্টিতে তাকাল, টোকা দিয়ে ঘড়ি দেখাল, যেন বলছে, 'সময় হয়েছে, এবার আমাকে বের করো।'

মেয়েটার সাহস প্রশংসা করবার মত। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে আছে, ওগুলো শীতে নীল হয়ে গেছে। চেহারা একদম ফ্যাকাসে সাদা। সর্বক্ষণ থরথর করে কাঁপছে। কেবিনের ভিতরে তাকাল রানা। ভিতরে পানি ঢুকেছে। একটা ম্যাট্রেস ভাসছে। মেয়েটা আছে আরেকটা কটে। দু'হাঁটু গেড়ে ম্যাট্রেসে ওজন রেখে বসেছে। ম্যাট্রেসটা আগেই ভিজে গেছে, পোশাকও একদম চুপচুপে ভেজা। যেখানে হাঁটু রেখেছে, ওখানে সাগরের পানি একটু নড়ছে। মেয়েটা কতক্ষণ এভাবে অপেক্ষা করছে, কে জানে! যে-কোনও সময় ওকে ধরে বসবে হাইপোথারমিয়া।

রেগুলেটর সরিয়ে মুখ নাড়ল রানা, যেন বলল, 'কী অবস্থা?' মুখে সাগরের লবণাক্ত পানি নিল ও। আগে যা ভেবেছে, তা-ই মনে হলো এখন। অ্যাভালাঞ্চ অনেক আগেই সাগর-তলায় নেমে যেত, আটকে গেছে শুধু অতিরিক্ত লবণের স্তরে।

রানার চোখে তাকাল মেয়েটা, যেন বলছে, 'এই অবস্থায় ভাল থাকি কী করে?' মাথা নাড়ল, বোঝাল ও আহত নয়।

ওর দিকে একটা আঙুল তাক করল রানা, তারপর অন্য আঙুলগুলো দিয়ে জাহাজের চারপাশ দেখাল।

মেয়েটা চট্ করে বুঝে নিল, আস্তে করে মাথা নাড়ল।

জাহাজে ও ছাড়া আর কোনও জীবিত মানুষ নেই। একটা আঙুল উপরে ওঠাল মেয়েটা, কোথায় যেন চলে গেল। কিছুক্ষণ পর আবার ফিরে এল। হাতে একটা প্যাড আর কালো মার্কার। ওর হাত এত কাঁপছে যে লেখাগুলো পড়া কঠিন।

'আমিই একমাত্র জীবিত মানুষ। আমাকে এখান থেকে বের করতে পারো?'

মাথা দোলাল রানা, ওকে বের করে আনতে পারবে। তবে আসলে জানে না, তা কী করে সম্ভব। এই জাহাজের সঙ্গে মার্ভেলের ক্রেনগুলো আটকাতে পারে ওরা। কিন্তু তাতে এটা তোলা যাবে না। ওদের দুটো ক্রেন এত ওজন নেবে না। কিন্তু ওরা যদি কেব্‌ল্ দিয়ে অ্যাভালাঞ্চ বাঁধে? একটু এদিক-ওদিক হলে ভারসাম্য

হারাবে অ্যাভালাঞ্চ, দ্রুত নামতে শুরু করবে। তবে মার্ভেল কিছুক্ষণ ওজন ধরে রাখতে পারবে।

অন্য দুই ডাইভার চলে এসেছে। স্লেটে নির্দেশ লিখল রানা। একজনের হাতে ধরিয়ে দিল। ছুটল সে মার্ভেলের দিকে। পোর্টহোলে তাকাল রানা, চোখ টিপল।

মেয়েটা প্যাডে কিছু লিখেছে, কাঁচের সামনে ধরল। 'তুমি কে?'

স্লেটে নিজের নাম লিখল রানা।

হতাশ চোখে তাকাল মেয়েটা। লিখল, 'তুমি কি নেভিতে আছ?'

মনে মনে বলল রানা, 'তোমাকে কী করে বলি আমি কে, বা কী করি!' লিখল, 'আমি একটা সিকিউরিটি কোম্পানিতে কাজ করি। আমাদের কাজ জলদস্যুদের ঠেকানো।'

মনে হলো মেয়েটা সন্তুষ্ট হয়েছে।

রানা জানতে চাইল জাহাজের কোথায় কোথায় পানি নেই।

মেয়েটা লিখল—ব্রিজে পানি আছে, ইঞ্জিন রুমেও। গত বারো ঘণ্টায় পানি এখানে উঠে এসেছে।

রানা লিখল, 'বাইরের দিকে এমন কোনও দরজা আছে, যেখানে ছোট ঘর বা অ্যান্টিচেম্বার আছে? এমন কোথাও, যেখানে পানি ঢুকলে জাহাজের অন্য জায়গা ডুববে না।'

মেয়েটা লিখল, ও কিছুই জানে না।

হঠাৎ বিছানায় পড়ে গেল। সেখানে পাক খেল ঢেউ। ওর কাঁধ ডুবে গেল, খেয়াল করছে না। হয়তো ধরে নিয়েছে আসলে বাঁচবার পথ নেই।

ফ্ল্যাশ-লাইটের তলা দিয়ে কেবিনের পাশে কয়েকবার জোরে টোকা দিল রানা। ঘুমিয়ে পড়লে মৃত্যু!

আবার চোখ মেলল মেয়েটা, মনে হলো আবছা ভাবে রানাকে দেখেছে। জ্ঞান হারাচ্ছে ও। ফ্ল্যাশ-লাইট দিয়ে গায়ের জোরে খোলে বাড়ি দিল রানা।

ধীরে ধীরে উঠে বসল মেয়েটা, পোর্টহোলের সামনে এসে তাকাল। সাগর-নীল চোখে ভাসা-ভাসা অদ্ভুত দৃষ্টি। শীতে থরথর করে কাঁপছে চোয়াল।

ওর সাহায্য পেতে হবে, না হলে কিছুই করতে পারবে না রানা। মেয়েটা হয়তো পাঁচ মিনিটের মধ্যে জ্ঞান হারাবে।

স্লেটে লিখল রানা, 'তোমার নাম কী?'

বোকার মত লেখাটা দেখল ও, যেন জানে না ওগুলো কী। তারপর মুখে কী যেন বলল।

স্লেট নাড়ল রানা, মনে করিয়ে দিতে চাইল কীভাবে যোগাযোগ করতে হবে।

বিশ সেকেণ্ড পর মেয়েটা প্যাডে লিখল, 'জুডি।'

'জুডি, তোমার জেগে থাকতে হবে! ঘুমিয়ো না! ঘুমালে মরে যাবে! বাইরের দিকে এমন কোনও দরজা আছে, যেখানে ছোট কোনও ঘর বা অ্যান্টিচেম্বার আছে? সিল করতে পারবে?'

মনে হলো প্রশ্নের জবাব দেয়ার সাধ্য নেই জুডির। কিন্তু হঠাৎ সোজা হয়ে বসল, চোয়াল দৃঢ় হলো। ঘনঘন মাথা ঝাঁকাল কয়েকবার, তারপর লিখতে শুরু

করল। লেখা শেষে কাঁচের পাশে ধরল। বারবার লেখাটা সরিয়ে নিল, শব্দ কেটে আবার অন্য কোনও শব্দ লিখছে।

অপেক্ষা করল রানা।

মেয়েটার হাত অসম্ভব কাঁপছে। ঠিক যেন নতুন লিখতে শেখা বাচ্চাদের হাতের মত। হাতের লেখা বোঝা যায় না।

জুডি লিখেছে, 'উপ... উপরে পো পোর্টে দরজা... এক ডেক উপরে খোল খোলে... সিঁড়ি ওখানে ঘর সিল করা যা...'

হাতের লেখা বুঝতে চার মিনিট লাগল রানার। পোর্ট-এ এক ডেক উপরে সিঁড়ির কাছে একটা ঘর আছে, ওটা সিল করা যাবে।

রানা লিখল, 'তুমি ওখানে চলে যাও, দরজা সিল করবে। যা-ই হোক, ওখান থেকে নড়বে না। আমার ওপর বিশ্বাস রাখো।'

মাথা দোলাল জুডি, কট ছেড়ে নেমে পড়ল হাঁটু পানিতে। চেহারায় তীব্র কষ্টের ছাপ পড়ল। রানা পরিষ্কার বুঝল, ওর পায়ের পেশিতে প্রচণ্ড খিঁচ ধরেছে, ব্যথায় স্থির হতে পারছে না। এগোতে গিয়ে ভারসাম্য হারাল, একটা বাঙ্কহেড ধরতে চাইল, কিন্তু পারল না, ধপ করে পড়ে গেল পানি-ভরা মেঝেতে।

রানার মনে হলো, যদি পারত, পোর্টহোল গলে মেয়েটাকে দু'হাতে তুলে নিত। নীরব দর্শকের মত দেখছে ও। সময় পার হচ্ছে। উঠছে না জুডি। তারপর খুব ধীরে ধীরে উঠল। একই জায়গায় কয়েক সেকেণ্ড টলল, তারপর একবারও পিছনে না তাকিয়ে পা বাড়াল। সিনেমার যোম্বির মত নড়ছে। পায়ে পায়ে দরজার ওপাশে চলে গেল।

জুডি চোখের আড়াল হতেই সাঁতার কাটতে শুরু করল রানা। মেয়েটা যে-দরজার কথা লিখেছে, সেখানে যাবে। রেইলিং টপকাল ও, দূরে চারজন ডাইভারকে দেখতে পেল—ওরা আণ্ডারওয়াটার সার্চ লাইট সঙ্গে নিয়ে আসছে। দেরি না করে অ্যাভালাঞ্চের স্টার্নের দুই বোলার্ডে কেবল আটকাল ওরা। রানা জানে, বো-তে একই কাজ করছে আরও চার ডাইভার। ডাইভ কম্পিউটারে দেখল, অ্যাভালাঞ্চ এখন একশো ফুট গভীরে। আগের চেয়ে দ্রুত নামছে। তবে কেবল আটকাতে পারলে জাহাজটা আপাতত নামবে না। আশা করা যায়, মার্ভেল ওজনটা সইতে পারবে।

গভীরতা এখন বড় সমস্যা নয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, জুডি কতক্ষণ টিকবে?

ডুবুরিদের জন্য অ্যাভালাঞ্চ একেবারেই অপরিচিত জাহাজ। ওখানে বিল্জ থেকে মেইন ডেক পর্যন্ত হোল্ড রয়েছে, চওড়ায় প্রায় পুরো জাহাজ। ওখানে হয়তো পানি ঢোকেনি। আজকাল হ্যাচ যত্ন করে বানানো হয়। সার্ভো-কণ্ট্রোল্ড লুভার ভেন্টিলেটারগুলো নিখুঁত থাকে, বেশিরভাগ সময় বাতাসও ঢোকে না। সার্ভে জাহাজ দ্রুত না ডোবার বড় কারণ ওই নিখুঁত হ্যাচ ও ভেন্টিলেটার।

ভ্রূ কুঁচকে দরজাটা দেখছে রানা। খেয়াল করল পানির অতিরিক্ত চাপে একটা ভেন্টিলেশন ডাক্ট বেঁকে গেছে। দুটো লুভারের মাঝখানে ছিটকে উঠছে পানি, সূক্ষ্ম কণাগুলো হোল্ডে ঢুকছে। লুভারের ধাতব দেহে সরু একটা ফাটল তৈরি হয়েছে। প্রতি মিনিটে হোল্ডে বড়জোর দু'তিন গ্যালন পানি ঢুকছে। খুব ধীরে, কিন্তু ফাটল

বাড়ছে। একটা সময় আসবে যখন লুভার হঠাৎ করেই ধসে পড়বে। সঙ্গে সঙ্গে হোল্ডে সগর্জনে ঢুকবে তিন বর্গ-ফুট কলামের পানির স্তম্ভ।

জুডি এই দরজার আড়ালে আসবে। দরজায় শক্তপোক্ত হিঞ্জ রয়েছে। কেউ পালাবে জলদস্যুরা সেই সুযোগ রাখেনি, একটা স্টিলের বার দিয়ে কবাট বন্ধ করেছে। ইচ্ছে করলে ওটা ফেলে দিয়ে দরজার হ্যাণ্ডেল টেনে খুলতে পারবে? না। বাধা দেবে বাইরের পানির প্রচণ্ড চাপ।

আগে ভিতরের পানির চাপ বাইরের সমান হতে হবে।

জুডি অ্যান্টিচেম্বারে ঢুকেছে? ওদিকের দরজাটা আটকেছে? রানা জানে, মেয়েটা ভীষণ ভয় পাবে, কিন্তু ওর সত্যিকার কোনও বিপদ হবে না। ওকে চট করে বের করে আনবে ও। ডাইভাররা আগে থেকে বাড়তি স্কুবা ট্যাঙ্ক নিয়ে তৈরি থাকবে।

এক ডাইভারকে কাছে ডাকল রানা, স্ল্যাবে লিখল কী চায়। ইন্টিগ্রেটেড কমিউনিকেন্স হেলমেট পরে আছে ডাইভার, সহজেই মার্ভেলের ডাইভ মাস্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করল।

রানা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল, আশা করল জুডি এরইমধ্যে অ্যান্টিচেম্বারে চলে এসেছে। সময় যেন খুব ধীরে কাটছে। মনে হলো অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেল, তারপর মার্ভেল থেকে বাস্কেট ভরা যন্ত্রপাতি আর ডাইভ ইকুইপমেন্ট নামানো হলো। কিন্তু জুডি ওপাশের ঘরে এখনও এল না। রানার মনে আশঙ্কা এল, মেয়েটা বোধহয় আসতে পারেনি, কোথাও অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে।

পচে ওঠা লাশের মধ্যে দিনের পর দিন কাটিয়েছে ও। প্রচণ্ড মানসিক চাপ তো আছেই। ও জানে, পানির অনেক গভীরে ডুবে যাওয়া জাহাজে আটকা পড়েছে। ডুবছে আরও। ও যে কেন অনেক আগেই পাগল হয়ে যায়নি, সেটাই আশ্চর্যের ব্যাপার। ভীষণ ভয় পেয়েছে ও, ঠাণ্ডা পানিতে ভিজে হাইপোথারমিয়া শুরু হয়েছে।

অ্যান্টিচেম্বারে আসতে পারবে মেয়েটা? ওর মনে থাকবে তো ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করতে হবে?

রানা জানে, সুপারস্ট্রাকচারের কোনও দরজা খুললে সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ পানিতে ভরে উঠবে। মেয়েটাকে খুঁজে বের করবার আগেই ডুবে মরবে। ওকে উদ্ধার করবার মাত্র একটাই পথ আছে। ওকে ওই অ্যান্টিচেম্বারে ঢুকতে হবে।

ইয়ার-ফোন পরল রানা। দরজায় কান পাতল। ফ্ল্যাশ-লাইট দিয়ে খোলের গায়ে টোকা দিল। বারবার। কিছুক্ষণ পর মনে হলো ওপাশে আওয়াজ হচ্ছে। কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করল রানা, নিশ্চিত হতে চাইল। সত্যিই ওপাশে টোকার আওয়াজ হচ্ছে। ট্যাপ-ট্যাপ। দুটো বিট।

পৌঁছে গেছে জুডি।

ডাইভ ইকুইপমেন্ট পরীক্ষা করল রানা, তারপর বাস্কেট থেকে ড্রিল নিল। ওটা শক্তি যোগান পাবে কমপ্রেসড্ এয়ার সিলিণ্ডার থেকে। ড্রিলের মাথা টাইটানিয়াম দিয়ে তৈরি, পুরো শক্তি খরচ করলে যে-কোনও দরজা কয়েক সেকেণ্ডে ফুটো করা যায়। ঘুরে তাকাল রানা, স্টার্নের ডাইভাররা কেব্‌ল্

আটকানোর কাজ শেষ করেছে। ওদের দু'জন বো-এর ডাইভারদের সাহায্য করতে গেছে। অন্য দু'জন ওর সাহায্যে এগিয়ে এল।

ভারী বাস্কেটে পিঠ দিয়ে বসল রানা, একটু ঝুঁকে ড্রিলের মাথা ঠেকাল দরজার নীচের দিকে, তারপর ট্রিগার টিপল। নিজেকে ওর দাঁতের ডাক্তার মনে হলো, কোনও রোগীর দাঁতের বিশ্রী ক্যাভিটিতে ড্রিল করছে। আওয়াজটা এতই তীক্ষ্ণ যে কানের পর্দায় তীব্র ব্যথা শুরু হলো। পাত্তা দিল না রানা, জেদ নিয়ে লেগে থাকল। ড্রিলের ঘসায় ধাতব দরজায় রূপালী সুতো উঠল। সুতোগুলো পানির আলোড়নে ভেসে সরে গেল। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড, তারপর ড্রিলের মাথা ওপাশে চলে গেল। যন্ত্রটা সরিয়ে নিল রানা। পানি আর ধাতব টুকরোগুলো মুহূর্তে দরজার ওপাশে গিয়ে ঢুকল। অ্যান্টিচেম্বারের আকৃতি কেমন, বা কখন পানিতে ভরে উঠবে, জানবার পথ নেই। রানা জানে, অপেক্ষা করতে হবে। দু'দিকের পানির চাপ কাছাকাছি না হলে দরজা খোলা যাবে না।

একটা ধাতব প্রাই বার দিয়ে দরজায় টোকা দিল ও, চাইল জুডি জানুক ও এপাশে আছে, চলে যায়নি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সাড়া পাওয়া গেল। মনে হলো মেয়েটা রেগে গেছে, দুঃস্বপ্নেও ভাবেনি ওকে এভাবে পানিতে চুবিয়ে উদ্ধারের চেষ্টা হবে।

চার মিনিট পেরিয়ে গেল। দরজার হ্যাণ্ডেল টানল রানা, প্রাই বার দিয়ে টান দিল। দরজা একটুও নড়ল না। আবার কাজে লেগে পড়ল ও। আরও দুটো ফুটো করল। কিছুক্ষণ পর পরীক্ষা করে দেখল, দরজা নড়ে না। আরও কয়েকটা ফুটো দরকার।

আবার কাজে নামবে, এমনসময় হঠাৎ সুপারস্ট্রাকচারের সামনের দিকে বুদ্বুদের বিস্ফোরণ ঘটল। ওদিকের লুভার আচমকা ধসে গেল, সঙ্গে সঙ্গে হোল্ডে ঢুকল হাজার হাজার গ্যালন পানি। আটকা বাতাস একসঙ্গে বেরতে চাইল, ধাক্কা দিল মেইন ডেকের ইন্সপেক্শন হ্যাচকে। ছিটকে খুলে গেল ওটা। অ্যাভালাঞ্চের বো-তে কাজ করছিল ছ'জন ডাইভার, ওরা বুঝবার আগেই জোরাল বাতাসের ধাক্কা গেল। উল্টোপাল্টে চিমনি পার হয়ে গেল ওরা। ওদের একজন দ্রুত আলোর বৃত্তে ফিরল, একহাতে গলা কাটার ভঙ্গি দেখাল। ওরা সামনের কেবল সিকিওর করতে পারেনি।

আধমিনিটও পার হলো না, অ্যাভালাঞ্চের মাথাটা নীচে নেমে গেল। জাহাজটা পোর্টে কাত হয়ে গেল। ডুবুরিরা শুধু স্টার-বোর্ডের বোলার্ডে কেব্‌ল্ পরাতে পেরেছে। অ্যাভালাঞ্চ এখন মার্ভেলের সঙ্গে তিনটে কেবল-এ আটকে আছে। কিছুক্ষণ পর মনে হলো জাহাজটা স্থির হয়েছে। কিন্তু এমন ভাবে কাত হয়েছে যে হুড়হুড় করে চারপাশে পানি ঢুকছে। মার্ভেলের দুই ক্রেন অপারেটর নিশ্চয়ই গগলের কথা মত কাজ করে চলেছে। ওরা চাইবে অ্যাভালাঞ্চকে স্থির রাখতে। সবাই জানে, ওরা হারা খেলায় সময় নিচ্ছে।

রানা বাতাস আর স্রোতে ভেসে উঠেছিল, ডেকে নেমে এল, দরজায় দাঁড়াল। বাস্কেট ভরা যন্ত্রপাতি চলে গেছে ডেকের আরেকদিকে। এক ডুবুরিকে হাতের ইশারায় বাস্কেট দেখাল রানা, ওটা নিয়ে আসতে বলল। নিজে হ্যাচটা খুলবার

চেষ্টা করল।

জাহাজের পাগলামি জুডিকে নিশ্চয়ই ছিটকে দিয়েছে। দরজাটা এখন যেখানে আছে, তাতে ওকে পানি ঠেলে এগিয়ে আসতে হবে। রানা জানে, দরজাটা তাড়াতাড়ি খুলতে হবে। হাতে খুব অল্প সময় আছে। বো-র একটা বোলার্ডে কেবল আটকানো আছে, কিন্তু সেটাও বেরিয়ে গেলে?

পানি সামনের হোল্ডে হুড়মুড় করে ঢুকছে। কেবলে চাপ বাড়ছে। ওটা যে-কোনও সময় বোলার্ডের মাথা গলে বেরিয়ে যাবে।

রানার মনে হলো, ও বলেছে বলেই সত্যিই কেবলটা বেরিয়ে গেল। অ্যাভালাঞ্চের বো ঝাঁকি খেল, আরও নীচে নামছে। মার্ভেলের ক্রেনে প্রচণ্ড চাপ পড়ছে। ওটা মাত্র ষাট টন তোলার জন্য তৈরি। এখন অন্তত তিনগুণ চাপ পড়ছে। যে-কোনও সময় কেবল ছিঁড়ে যাবে, বা ক্রেন ভেঙে পড়বে।

পানির বাধার কারণে অ্যাভালাঞ্চের বো নামতে তিন সেকেণ্ড লাগল, ততক্ষণে দরজার হ্যাণ্ডেল ধরে ফেলল রানা। পাঁচ সেকেণ্ড পর জাহাজটা নব্বুই ডিগ্রি সোজা হলো। বো-র মাথাটা তাক হয়ে গেল অতলের দিকে। ডেক মুহূর্তে মেঝে থাকল না, হয়ে গেল দেয়াল। অ্যাফ্‌ট্ বাল্কহেড হয়ে গেল মেঝে। ভয়ানক জোরে আওয়াজ উঠল, কিঁচকিঁচ করল ধাতব কিছু। শিউরে উঠল রানা। ওর মনে হলো চারপাশে সবকিছু ছিঁড়ে যাচ্ছে, ভেঙে যাচ্ছে। পানির মধ্যে আওয়াজটা চারপাশ থেকে আসছে। উৎস বুঝবার জন্য চট্ করে ঘুরে তাকাল ও। ডাইভাররা ডেকে সার্চ লাইটের টাওয়ার বসিয়েছিল, ওগুলো এখন নীচের দিকে খসে পড়ছে। বাতিগুলো দপ করে নিভে গেল। চারপাশে নামল গাঢ় অন্ধকার। আওয়াজটা কান ফাটানো, বাড়ছে আরও। একটা লাইফবোট ডেভিট ছেড়ে খসে পড়েছে, ডেক ঘেঁষে সোজা নেমে আসছে! ছিটকে সরে গেল রানা। ওর পাশ দিয়ে গেল বোট। পানিতে আলোড়ন উঠল। জোর টান খেয়ে নীচের দিকে রওনা হয়ে গেল রানাও। তারই মধ্যে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল ওর ডুবুরিরা ছুটন্ত বোটের গতিপথ থেকে সরে গেছে কি না। ডেভিটের মোটা দড়িগুলো এবার লাইফবোটের পিছনে এল। একটা দড়ি রানার মাথায় চাবুকের মত লাগল। সঙ্গে সঙ্গে ওর মাস্ক খুলে গেল।

ব্যথা! কয়েক সেকেণ্ড বুঝতে পারল না রানা, ও কোথায়। ওর মাস্ক চলে যাচ্ছে নীচে! চোখ জ্বলে উঠল। আগে কখনও এত লবণাক্ত পানি চোখে লাগেনি। ওর হাতের পাশ দিয়ে নেমে যাচ্ছে কমলা রঙের মাস্ক। ওটা খপ্ করে ধরল, পরে নিল আবার। ভিতরে পানি আছে, মুখ উঁচু করে রেগুলেটর দিয়ে বাতাস ছাড়ল। বেরিয়ে গেল পানি। ফিরে এল ও দরজার সামনে। ডাইভ কম্পিউটারে দেখল, প্রতি মিনিটে অ্যাভালাঞ্চ দশ ফুট করে নামছে। যে-কোনও সময় গতি আরও অনেক দ্রুত হবে। গগল হাল ছাড়বে না, প্রতিটি ইঞ্চি কেবল অতি ধীরে ছাড়বে। কিন্তু গভীরতা ওদের বাধা দেবে, সীমার বাইরে কম্প্রেস্‌ড্ বাতাস কাজে লাগবে না। ইচ্ছে করলেও নীচে নামতে পারবে না ওরা, নইলে মরতে হবে।

অ্যাভালাঞ্চ একটু আগে খেলা দেখিয়েছে, ডুবুরিরা কে কোথায় আছে কে জানে! একটু দূরে দুই ডাইভারকে দেখল ও। পাশে এসে থামল ওরা। যন্ত্রপাতির বাস্কেট রেইলিঙের ধারে জ্যাক স্টাফের পাশে বসে আছে। ড্রিলের কথা ভুলে

যেতে হবে এখন, বাড়তি এয়ার ট্যাঙ্ক ও ডাইভ ব্যাগটা দরকার। হাতের ইশারায় দেখাল রানা।

ডুবুরিরা জানে ও কী চায়, একজন দেরি না করে চলে গেল, দেড় মিনিট পর ফিরে এল। এদিকে রানা ও দ্বিতীয় ডুবুরি দরজা খুলবার চেষ্টা করছে। এবার তিনজন মিলে প্রাই বার-এ চাপ বাড়াল। এক মিনিট পার হয়ে গেল, তারপর মুহূর্তের জন্য দরজায় একটা সূক্ষ্ম চিড় তৈরি হলো। বেরিয়ে এল অক্সিজেনের একগাদা বুদ্বুদ। দরজাটা আবার পানির চাপে আটকে গেল। তিনজন প্রাণপণে চাড় দিল। রানার মনে হলো পিঠের পেশি ছিঁড়ে আসবে। চোখ বুজে ফেলল, মনে হলো মাথার ভিতরে অনেকগুলো নক্ষত্র বিস্ফোরিত হচ্ছে। বাহু টন-টন করছে ওর। আর পারা যায় না। এবার কী হাল ছেড়ে দেবে? পা বদলে দাঁড়াবে? ঠিক তখনই দরজাটা খুলে গেল। কামরায় যতটুকু পানি বাকি ছিল, সেটা ভরে গেছে!

অ্যাফ্‌ট্‌ ডেকে বসানো বাতিগুলো আগেই উধাও হয়েছে। ডাইভ টর্চের আলোয় দেখতে হবে। রানা ঘরে ঢুকল, টর্চের আলো ফেলল। ঘরটা মাঝারি। আরেক মাথায় নেমে গেছে একটা সিঁড়ি। নীচে একটা পেটমোটা হ্যাচ। ডানপাশে আরেকটা দরজা। ওটা দিয়ে মেইন ডেকে যাওয়া যেত। এখন বন্ধ। এবার জুডিকে দেখতে পেল ও। অচেতন? হাত-পা নাড়ছে না। ঢেউ ওকে পুতুলের মত এদিক-ওদিক নিতে চাইছে। চুলগুলো খোলা, চারপাশে নড়ছে।

সাঁতরে পাশে চলে গেল রানা। মেয়েটার মুখ হাঁ হয়ে আছে। নিজের রেগুলেটর জুডির মুখে গুঁজে দিল রানা, বাতাসের গতি বাড়াল। প্রথম ডুবুরি ঢুকেছে, ডাইভ ব্যাগ খুলে কেমিকেল ওয়ার্মিং প্যাক বের করল। ওগুলো বারংবার ঝাঁকি দিল রানা। কেমিকেলের রিয়্যাকশন শুরু হলো। প্যাকগুলো নিয়ে মেয়েটার গেঞ্জি ও প্যান্টের ভিতরে গুঁজে দিল রানা। এতে শীত খানিকটা কমবে।

ও জানে, আপাতত আর কিছু করবার নেই। চেষ্টা করলেও মেয়েটাকে তুলতে পারবে না। কয়েক ধাপে ডিকমপ্রেশন করতে হবে।

রেগুলেটরটা নিয়ে একবার শ্বাস নিল রানা, তারপর আবারও মেয়েটার মুখে গুঁজে দিল। কোথাও বাড়ি খেয়ে কপাল কেটে গেছে জুডির। ফুলে উঠেছে।

দ্বিতীয় ডুবুরি বাড়তি এয়ার ট্যাঙ্ক ও ডাইভ হেলমেট নিয়ে ভিতরে ঢুকল। মেয়েটাকে হেলমেট পরিয়ে দিয়ে স্টারনাম-এ ধাক্কা লাগাল রানা। বেচারী কেশে উঠল, মুখ থেকে পানি বেরোল, জমল গিয়ে হেলমেটের নীচের অংশে। এবার চোখ মেলল, কয়েকবার কাশল।

রেগুলেটর দিয়ে হেলমেটের ভিতরের পানি বের করে দিল রানা। ওর চোখে চোখ রাখল জুডি, আস্তে আস্তে হুঁশ ফিরছে। গম্ভীর হয়ে গেল রানা। মেয়েটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে বাধ্য হয়ে ওর গেঞ্জি আর প্যান্টে হাত ভরেছে ও।

অন্য সবাই চলে এসেছে। ওরা টর্চ জ্বেলে পথ দেখাল। জুডিকে নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল রানা। একজন ওর ট্যাঙ্ক পরীক্ষা করে দেখল। ওরা জানে রানাই সবচেয়ে আগে এসেছে, অতিরিক্ত পরিশ্রম করেছে। হিসাব বলে দিল, ওর দ্বিতীয় ডিকমপ্রেশনের সময় নতুন ট্যাঙ্ক লাগবে।

ঝুলন্ত অ্যাভালাঞ্চের কাছ থেকে সরে গেল ওরা। হেলমেটধারী ডুবুরি

মার্ভেলের সঙ্গে যোগাযোগ করল, জানিয়ে দিল, ওদের অক্সিজেন ট্যাঙ্ক লাগবে, এখন কেবল্‌গুলো ছেড়ে দেয়া যায়।

দশ সেকেণ্ড পর কেবল খুলে গেল, অ্যাভালাঞ্চ অতল গহীনে রওনা হলো। দ্রুত গতি বাড়ছে ওটার। কেবলগুলো স্টিলের অক্টোপাসের মত পিছনে ছুটল। কয়েক মুহূর্ত পর জাহাজটা হারিয়ে গেল অন্ধকারে।

ডুবুরিরা রানা-জুডিকে ঘিরে উঠে চলেছে। তবে কয়েকবার থামতে হবে। দু'বার থামবার পর ডুবুরিদের একটা দল অক্সিজেনের ট্যাঙ্ক নিয়ে এল। পনেরো মিনিট পর মার্ভেলের মুন পুলে পৌঁছে গেল সবাই। ডেক-হ্যাণ্ডরা ওদের টেনে তুলল।

মাস্ক খুলে শ্বাস নিয়ে রানার মনে হলো, একেই বলে বেঁচে থাকা। মুন পুলে মোবিলের গন্ধ, যন্ত্রপাতির ধাতব ঘ্রাণ, কিন্তু মনে হলো ও আছে পাহাড়ি ভোরের তাজা হাওয়ায়।

ফারা রাইনার আর্দালি নিয়ে অপেক্ষা করছে, দেরি না করে জুডিকে মেডিকেল বে-তে নিয়ে গেল।

সোহেল দাঁড়িয়ে আছে, একটু আগে এসেছে। হাতে কফির মগ। চট করে একবার দেখল, ফারা চলে গেছে। মগ বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'নে, খা! জানি খুব শীত লাগছে তোর, কিন্তু ডাক্তার বলে দিয়েছে, রক্তের নাইট্রোজেন দূর হওয়ার আগে কড়া কোনও ড্রিঙ্ক চলবে না।'

সন্দেহ নিয়ে মগটা ঠোঁটের কাছে তুলল রানা, কিন্তু কফিতে চুমুক দিয়ে কৃতজ্ঞ চোখে তাকাল। সোহেল ওর প্রাণের কথা জানে। কফির সঙ্গে অনেকখানি ব্র্যাণ্ডি ঢেলেছে।

রানার পাশে বসে পড়ল সোহেল, বলল, 'আশা করা যায় মেয়েটা সুস্থ হয়ে উঠবে।'

রানা অতি ক্লান্ত, তবুও ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল। একটা প্রাণ ঝরে যায়নি। একটু দূরে দু'জন ডেক-হ্যাণ্ডকে দেখল ও। ওরা প্রিমিয়াম আইসক্রিম খাচ্ছে।

সোহেল বলল, 'ফারা রাইনার আমাদের বড় ফ্রিযারটা কেড়ে নিয়েছে।'

দু'জনই জানে, কেন নিয়েছে। অন্যদিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। ফারা মৃতদেহ ফ্রিযারে রেখেছে। ওরা মানুষগুলোকে বাঁচাতে পারেনি।

আট

সারা শরীরের ব্যথা নিয়ে ঘুম ভাঙল জুডি স্টিভেনসনের। ব্যথা! খুব ব্যথা! হাঁটু আর কপাল যেন ছিঁড়ে যাবে। অন্য জায়গায় অতটা ব্যথা নেই, টিসটিস করছে। চোখ খুলল, বারবার পাতা নেড়ে ঘুম-ঘুম ভাব দূর করতে চাইল। মাথার উপরে উজ্জ্বল ফ্লুরোসেন্ট বাতি জ্বলছে। কাছেই পোর্টহোল, ওখান দিয়ে আলো আসছে। তিনজন মানুষ ওর দিকে ঝুঁকে আছে। কেন যেন মনে হলো এরা ওর ক্ষতি করবে

না। মহিলার গায়ে ডাক্তারের সাদা কোট, চোখ দুটো বেগুনী। লোক দু'জন একই বয়সী, একজনের হাত নকল। তার পাশের লোকটাকে চেনা-চেনা লাগছে। কেন? তাকে নিষ্ঠুর মনে হয়, আবার একইসঙ্গে চোখে এত মায়া! গাঢ় কালো চোখ দুটো ওকে দেখছে। সচেতন হয়ে উঠল জুডি।

সাদা কোট পরা মেয়েটা বলল, 'ফিরলে তা হলে।' ও ডাক্তার। উচ্চারণ বলছে ও ইংরেজ নয়। 'কেমন লাগছে এখন?'

জবাব দিতে চাইল জুডি, গলা দিয়ে কর্কশ একটু আওয়াজ বেরল। নিষ্ঠুর লোকটা কাপ আর স্ট্র নিয়ে ঝুঁকল, ঠোঁটে স্ট্র ধরল।

ওর মনে হলো জিভ মরুভূমি হয়ে গেছে, পানিটুকু প্রথম বৃষ্টির মত পড়ল। লোভীর মত চুমুক দিল জুডি। পানি এত মিষ্টি হয়? চোঁ-চোঁ করে কাপ শেষ করল। এবার বলল, 'আমার মনে হয়...' বেদম কাশি ওকে থামিয়ে দিল। দশ সেকেণ্ড পর খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে বলল, 'এখন ভাল লাগছে। কিন্তু খুব শীত!'

এবার খেয়াল করল, ওর উপরে কয়েকটা কম্বল চাপানো হয়েছে। সবচেয়ে নীচেরটা ইলেকট্রিক ব্ল্যাঙ্কেট। ওটার কারণে ত্বকে কেমন যেন চিড়চিড়ে অনুভূতি।

'তোমাকে যখন আনা হয়, তখন তোমার কোর টেমপারেচার বলছিল তুমি বাঁচবে না,' বলল ডক্টর রাইনার, 'কপালের জোরে বেঁচে গেছ।'

কেবিনের চারপাশ দেখল জুডি।

নীরব প্রশ্নের জবাবে বলল ফারা, 'এটা জাহাজের ইনফারমারি। আমি ফারা রাইনার। এঁরা মাসুদ রানা ও সোহেল আহমেদ।' রানাকে দেখাল। 'উনিই তোমাকে উদ্ধার করেছেন।'

অবাক হয়ে রানার দিকে তাকাল জুডি। 'উদ্ধার?'

'আপনার কিছু মনে নেই?' জিজ্ঞেস করল সোহেল।

স্মৃতি হাতড়াল জুডি। 'হামলা হয়েছিল। ঘুমাচ্ছিলাম। গোলাগুলির আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। কেবিনে লুকিয়ে ছিলাম। তারপর...' চিন্তায় পড়ে চুপ হয়ে গেল।

'সময় নিন,' বলল রানা।

'আপনার ওপর দিয়ে অনেক ধকল গেছে,' বলল সোহেল।

'মনে পড়ছে হামলার পর জাহাজে একা ঘুরে বেড়িয়েছি।' দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল জুডি। সান্ত্বনা দেবার জন্য কাঁধে হাত রাখল রানা, এর ফলে সামলে নিল মেয়েটা। 'জাহাজে পড়ে ছিল লাশ। ক্রুরা সবাই মারা গেছে। ...তারপর আর কিছুই মনে নেই!'

'এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই,' বলল ফারা। 'মানুষের মগজে ডিফেন্স মেকানিজম আছে, ওটা এ-ধরনের ট্রমা ঠেকায়।'

'জলদস্যুরা আপনাদের জাহাজে উঠে সবাইকে মেরে ফেলল,' বলল রানা, 'আমরা যখন ওখানে যাই, তখন অ্যাভালাঞ্চ সাগরের সত্তর ফুট নীচে।'

'তার কয়েকদিন আগে জাহাজটা ডুবে গেছে,' বলল সোহেল। 'আপনাদের জাহাজ একটা অতিরিক্ত লবণের স্তরে আটকা পড়ে।'

'কয়েকদিন আগে ডুবে গেছে?' শিউরে উঠল জুডি।

'নিজেকে তুমি নতুন জোনাহ্ বলতে পারো,' মৃদু হাসল ফারা। 'তবে তিমির পেট থেকে নয়, জাহাজের পেট থেকে বের করা হয়েছে তোমাকে।'

জুডির চোখ বিস্ফারিত হলো। 'এখন মনে পড়ছে!' রানার দিকে তাকাল। 'আমি আপনাকে আমার পোর্টহোলের ওপাশে দেখেছি! আপনি সাঁতার কাটছিলেন!'

শ্রাগ করল রানা। ভাব দেখে মনে হলো এটা কোনও বড় ব্যাপার নয়।

'আপনিই আমাকে অ্যাফট হ্যাচওয়েতে যেতে বলেন। দরজা আটকে রাখতে বলেন। আপনিই হ্যাচে ড্রিল করেন। আমার মনে হয়েছিল আমাকে মেরে ফেলবেন। আরেকটু হলে দৌড়ে গিয়ে আমার কেবিনের দরজা বন্ধ করে দিতাম। পরে বুঝলাম, আপনি ভেতরের পানির চাপ সমান করতে চাইছেন। তখন খুব ভয় পেয়েছি। কেবিনে আস্তে আস্তে পানি ঢুকছে! ভয়ে সিঁড়ি বেয়ে ব্রিজের কাছে চলে গেছি! তারপর পানি উঠে এল। দেখলাম, পালাবার পথ নেই।' শিউরে উঠল জুডি। মনে হলো আবার ওই শীতল পানিতে পড়ে গেছে। 'তারপর পানি বুক পার হয়ে গেল। মনে হলো হাজার বছর ওখানে থাকলাম। ঈশ্বর জানেন, ওখানে এত শীত! আগে কখনও এত শীত করেনি। দাঁতে দাঁত খটাখট বাড়ি খাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল দাঁতগুলো পড়ে যাবে।' বিছানার পাশে দাঁড়ানো মানুষগুলোকে দেখল ও। 'তারপর তো একটু আগে ঘুম ভাঙতেই দেখি আপনারা এখানে।'

'আপনাদের জাহাজ দ্রুত ডুবতে লাগল,' বলল রানা। 'হোল্ডে পানি ঢোকায় বো-টা নেমে গেল। সে-সময় ছিটকে পড়ে মাথায় ব্যথা পেয়েছেন। আমরা ঘরে ঢুকে দেখি আপনি অচেতন হয়ে পড়ে আছেন।'

এক হাতে কপাল স্পর্শ করল জুডি। কপাল জুড়ে পুরু ব্যাণ্ডেজ।

'রয়েল জিওগ্রাফিক সোসাইটির সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে আমাদের,' বলল সোহেল। 'তাঁরা আপনার আত্মীয়দের জানিয়েছেন, আপনি ভাল আছেন। আমরা জাপানের রেঞ্জে পৌঁছে গেলে আপনার জন্যে একটা হেলিকপ্টার পাঠানো হবে।'

'আপনি শিওর তো যে হামলার ব্যাপারে আর কিছু জানেন না?' নরম স্বরে বলল রানা। 'জরুরি কিছু বাদ পড়েনি তো?'

ভ্রূ কুঁচকে ভাবল জুডি। 'নাহ্। আর কিছু তো মনে পড়ছে না!' ডাক্তারের দিকে তাকাল। 'আপনি ঠিকই বলেছেন, ওই ট্রমার কারণে কিছু মনে পড়ছে না।'

'গতরাতে আপনি যখন এখানে আসেন তখন আমাদের এক অফিসার উর্বশী দাশার সঙ্গে কথা বলেন,' বলল রানা। 'ওর সঙ্গে যা বলেছেন, মনে পড়ে?'

'না।' জুডির কথা একটু তপ্ত শোনাল। 'তখন নিশ্চয়ই কোনও ঘোরে ছিলাম।'

ফারা চোখের ইশারায় রানাকে চুপ করতে বলল। পাত্তা দিল না রানা, 'আপনি ওকে বলেন আপনি রয়েল জিওগ্রাফিক সোসাইটির রিসার্চার। জলদস্যুদের আক্রমণের কথা বলছিলেন। তখন আপনি কেবিনে লুকিয়ে ছিলেন, দেখেন এক লোক কালো ইউনিফর্ম পরে ঘরে ঢুকেছে। পায়ে কমব্যাট বুট ছিল।'

'তা-ই যদি বলে থাকি, তা হলে নিশ্চয়ই তা-ই। কিন্তু কিছুই মনে পড়ছে না।'

'আপনি আরও বলেন দুটো জাহাজ দেখতে পান। ওগুলোর একটা এত বড় যে দ্বীপের মত মনে হয়েছে। ওটা প্রায় চারকোনা। অন্য জাহাজটা অনেক ছোট। মনে হয়েছে দুটোর সংঘর্ষ হবে।'

'হামলার পরে কী ঘটেছে বলতে পারব না।' মাথা নাড়ল জুডি। 'চার দিন অ্যাভালাঞ্চে আটকে ছিলাম সেটাও মনে নেই!' ফারার দিকে তাকাল। 'ডক্টর, আমি এখন একটু ঘুমাতে চাই।'

'নিশ্চয়ই!' চট্ করে রানার দিকে তাকাল ফারা, বলল, 'আমার অফিস তোমার ঘরের ওপাশে, জুডি। কিছু দরকার হলে ডাক দিয়ো।'

'ধন্যবাদ, ডক্টর।' রানাকে দেখল জুডি, কয়েক সেকেণ্ড অস্বস্তিকর সময় পেরল, তারপর বলল, 'আমাকে বাঁচানোর জন্যে ধন্যবাদ।'

'ইউ আর ওয়েলকাম,' মৃদু হাসল রানা।

ওরা কেবিন থেকে বেরিয়ে এল। ফারা নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল।

মেডিকেল বে ছেড়ে বেরিয়ে এল রানা-সোহেল। পাশে হাঁটতে হাঁটতে সোহেল বলল, 'মেয়েটা দেখতে দারুণ!'

'মিছেকথায় কেমন?' বলল রানা।

'চ্যাম্পিয়ান!'

তিক্ত হাসল রানা। 'উর্বশী ওর পেটের সব কথা বের করতে পারেনি। আমার তখনই ওর সঙ্গে কথা বলা উচিত ছিল।'

'তুই অতিরিক্ত ক্লান্ত ছিলি। নিজের কেবিন চিনে ফিরেছিস, সেটাই বেশি। আর আমিও ভাবিনি মেয়েটা জেগে উঠে মুখে তালা মারবে।'

'আমরা উর্বশীর কাছে শুনেছি জুডি জলদস্যুদের ইউনিফর্ম দেখেছে। আমার ধারণা, ও কোনও মিলিটারি ট্রেইনিং পেয়েছে।'

মাথা দোলাল সোহেল। 'আমার বিশ্বাস ও রয়েল জিওগ্রাফিক সোসাইটির রিসার্চার নয়, ওরা যা-ই বলুক। ভেতরে প্যাঁচ আছে। এই মেয়ে মনে রেখেছে, চারদিন আগে হামলা হয়েছে। আমরা কেউ এ-ব্যাপারে কথা বলিনি। কিন্তু দিন-ক্ষণ বলে দিচ্ছে।'

'মিথ্যা বলছে কেন জানা দরকার।'

'আটকে তো রাখতে পারব না,' বলল সোহেল। 'তিন ঘণ্টা পর রয়েল জিওগ্রাফিক সোসাইটির চপার আমাদের হেলি-প্যাডে নামবে ওকে নিয়ে যেতে।'

মনে হলো রানা নিজের সঙ্গে আলাপ করছে, 'ইউনিফর্ম। জুডি বলেছে জলদস্যুরা কালো ইউনিফর্ম পরে। কিন্তু গতকাল যাদের সঙ্গে টক্কর লাগল, ওদের পরনে ছিল টি-শার্ট, জিন্স আর হাফপ্যাণ্ট। দুটো হামলা কিন্তু মোটেই মিলছে না।'

'সম্ভবত আলাদা দুটো দল,' বলল সোহেল।

অপারেশন্স সেণ্টারে ঢুকল ওরা। ডিউটিতে আছে উর্বশী। ওদের দেখে বলল, 'মেয়েটা কী বলল?'

'বলছে এখন আর কিছুই মনে পড়ছে না,' বলল রানা। 'ইউনিফর্ম বা জাহাজের কথা ভুলে গেছে।' নিজের সিটে বসল ও। সোহেল গিয়ে নিজেরটায়।

'ভীষণ মিথ্যুক মেয়ে তো!' বলল উর্বশী। 'গতকাল বলেছে বিরাট একটা

চারকোনা জাহাজ দেখেছে।'

'ওর ডাহা মিথ্যা বলার পিছনে কোনও কারণ আছে,' বলল সোহেল।

ভ্রূ কুঁচকাল উর্বশী। 'আমাকে যখন বলছিল, মনে হচ্ছিল ও কোনও কেস অফিসারকে রিপোর্ট করছে।'

'তখন ভেবেছে আর বাঁচবে না,' বলল সোহেল, 'উপায় না দেখে বলেছে আপনাকে।'

মাথা দোলাল উর্বশী। 'আমারও তা-ই মনে হয়েছে। জুডি স্টিভেনসন সাধারণ কোনও মেরিন রিসার্চার নয়, ওর অন্য কোনও পরিচয় বা উদ্দেশ্য আছে।'

'মার্ভেলের মুন পুল দেখেছে ও?' জিজ্ঞেস্ করল রানা।

'না,' বলল সোহেল। 'জ্ঞান হারাচ্ছে তখন। ফারা পানি থেকে তুলে তোয়ালে পেঁচিয়ে নিয়ে গেছে। দেখার পথ ছিল না ওর।'

'মেডিকেল বে-তে নিয়ে শরীরে তাপ দিল ফারা,' বলল উর্বশী। 'জে পাখির মত নীল ছিল তখন, জোর হাওয়ায় বাঁশ পাতা যেমন কাঁপে, সেরকম কাঁপছিল। তবে জাহাজটার কথা বলতে ভোলেনি।'

'সাধারণ কেউ অ্যাভালাঞ্চে একা থাকলে পাগল হয়ে যেত,' বলল সোহেল। 'কিন্তু সামলে নিয়েছে।'

'চায় কী ও?' বলল উর্বশী।

অন্য প্রসঙ্গে সরে গেল রানা, 'ধরে নিই এদিকের পানিতে দু'দল জলদস্যু আছে। একটা দল আমাদের সঙ্গে জুটে যায়, আরেক দল চারদিন আগে অ্যাভালাঞ্চে হামলা করে। ওরা ছিল ট্রেইণ্ড কমাণ্ডো। জুডি বলেছে, ওরা দেরি করেনি, সবাইকে খুন করে জাহাজ ডুবিয়ে দিয়ে চলে যায়। তখন রহস্যময় জাহাজটা ওখানে ছিল। আমাদের জানতে হবে এখানে আমাদের ভূমিকা কী।'

'আমরা বে-আইনী আদম-ব্যাপারির খোঁজ করছি,' বলল সোহেল, 'জুডি মুখ খুললে হয়তো জরুরি তথ্য পাওয়া যেত। এমন কিছু, যেটা থেকে বোঝা যায় মানুষগুলো কন্টেইনারে কেন।'

এসবের জবাব ওদের জানা নেই। অপারেশন্স সেন্টারে নীরবতা নামল।

রানা বুঝতে পারছে না জুডি স্টিভেনসন কেন সহযোগিতা করছে না। ওকে উদ্ধার করবার আগে ডাইভ স্লেটে লিখেছে ও, ওরা একটা সিকিউরিটি কোম্পানিতে কাজ করে। ওদের কাজ জলদস্যুদের ঠেকানো। তখন কিন্তু মেয়েটা পরিষ্কার পড়েছে, বুঝেওছে। কিন্তু এখন সব কথা এড়িয়ে যাচ্ছে। মেয়েটা কিছুর সঙ্গে জড়িত। সেটা কী?

রানা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, যত দ্রুত সম্ভব মেয়েটাকে বিদায় দেবে।

'কী খবর তোদের?' অনিল চ্যাটার্জি অপারেশন্স সেন্টারে ঢুকেছে, নিজের সিটে গিয়ে বসল।

'তুই তো রিসার্চ করতে ভালবাসিস,' বলল রানা। 'বল্ দেখি এমন একটা জাহাজ আছে, যেটা দেখলে মনে হয় দ্বীপের মত বিশাল। ওটা চারকোনা। পারবি?'

'ঠাট্টা করছিস?'

'না। জরুরি।'

কম্পিউটার অন করল অনিল। 'আরও তথ্য ছাড়।'

'চারদিন আগে ওটা এদিকে ছিল।'

'আর কিছু তথ্য তো ছাড়বি? ওটা কন্টেইনার শিপ, সুপার ট্যাঙ্কার, নাকি এয়ারক্র্যাফট ক্যারিয়ার?'

'এয়ারক্র্যাফ্‌ট্‌ ক্যারিয়ার বলে মনে হয় না।'

মার্ভেলের যে-কোনও স্টেশন থেকে মেইনফ্রেম কম্পিউটারের সাহায্য পাওয়া যায়। মেরিটাইম ডেটা বেইস-এ ঢুকল অনিল, সী অভ জাপানে উঁকি দিল।

'রিসার্চারদের কপ্টার কখন আসবে, উর্বশী?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ইটিএ তিন ঘণ্টা,' জানাল উর্বশী।

মার্ভেলের শক্তিশালী রেইডার একশো মাইল কাভার করে। সবকটা জাহাজ ধরা পড়ল। এদিকের সাগরে পাঁচটা আছে। ইচ্ছে করলেও মার্ভেলের ইঞ্জিনের পুরো ক্ষমতা ব্যবহার করা যাবে না। ওরা তো এখন একটা ঝক্‌কর মারা স্টিমার, বিশ নটে এগিয়ে চলেছে। ইচ্ছা হলেও এগিয়ে গিয়ে চার্টার্ড হেলিকপ্টারের সঙ্গে দেখা করা যাবে না।

চেয়ার ছাড়ল রানা। 'আমি কেবিনে থাকব। নাকিমুচিকে জানাব একদল জলদস্যু আর ওদের বিরক্ত করবে না। অনিল, কিছু পেলে জানাস। উর্বশী, কপ্টার দশ মাইলের মধ্যে এলে জানিয়ো।'

একঘণ্টা হলো নাকিমুচির সঙ্গে যোগাযোগ করেছে রানা। কেবিনে বসে এখন একটার পর একটা সিগারেট শেষ করছে। বারবার জুডির দেয়া তথ্যগুলো মনে পড়ছে, আর ভাবছে—সাগরে হচ্ছেটা কী? একদল কমাণ্ডো অ্যাভালাঞ্চে হামলা করল। কেন? ওরা সম্ভবত চায়নি অ্যাভালাঞ্চের কেউ ওই জাহাজ দুটো দেখে ফেলুক। তাই মেরে ফেলতে হবে? ওখানে এমন কী ঘটছিল? ওই বিরাট জাহাজটা কী এয়ারক্র্যাফট ক্যারিয়ার? ওখানে কোনও গভার্নমেন্ট অপারেশন চলছিল? আমেরিকার? চায়নার? চায়নার হলে ফু-চুং জানত।

জানা কথা এদিকের সাগরে আমেরিকান এয়ারক্র্যাফট ক্যারিয়ার রয়েছে। অ্যাভালাঞ্চ ডুবিয়ে দিয়ে ওদের কী লাভ? জুডি যেটা দেখেছে, সেটা অন্য কোনও ধরনের জাহাজ। একদল কমাণ্ডো অ্যাভালাঞ্চ ডুবিয়ে কী পাবে? যে-সব জলদস্যু মার্ভেলে উঠেছে, তাদের সঙ্গে কাজ করছে ওরা?

ইন্টারকমের মৃদু আওয়াজে চটকা ভাঙল রানার, রিসিভার তুলে নিল।

ফারা রাইনার বলল, 'রানা, আমার অফিসে আসতে পারবে?'

চিন্তার কোনও ফসল নেই, তথ্য ছাড়া শুধু শুধু মাথা খাটানো, বিরক্ত হয়ে উঠেছে রানা, ফারার কথায় বেঁচে গেল। 'আসছি।' সিগারেট অ্যাশট্রেতে ফেলে কেবিন ছেড়ে বেরিয়ে এল ও, চলে এল মেডিকেল বে-তে। ফারাকে ট্রমা রুমে পাওয়া গেল। তাপমাত্রা এখানে পঁয়ষট্টি ডিগ্রি। লাশটা উজ্জ্বল আলোয় একটা গার্নিতে পড়ে আছে। সবুজ সার্জিকাল স্ক্রাব পরে আছে ফারা। গ্লাভ্‌স্‌ রক্তে মাখা। শক্তিশালী ভেন্টিলেটারগুলো পচা লাশের গন্ধ সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তবুও কেমন

একটা বিশ্রী গন্ধ রয়ে গেছে।

লাশের পাশে গিয়ে দাঁড়াল রানা। 'চাইনিজ?'

'না। পাইরেটদের একজন। লাশটা দেখবে?'

কোনও জবাব দিল না রানা। চাদরটা সরিয়ে নিল ফারা। লাশের বুক-পেট কেটে ভিতরের অঙ্গগুলো পরীক্ষা করা হয়েছে। লোকটার বয়স বড়জোর পঁচিশ। হাড়গুলো বেরিয়ে আছে, মনে হয় ভাল খেতে পেত না। মাথা ভরা চুলগুলো নোংরা। হাতে-পায়ে বড়বড় কড়া। পরনে জিন্স। পায়ে ছেঁড়া কেড্স্। কপালে টিপের মত একটা জায়গা, ওখান দিয়ে বুলেট ঢুকেছে। মনে হলো ওটা তৃতীয় নয়ন। ফুটোর চারপাশে হাড়-মাংস থেঁতলে গেছে।

চাদর দিয়ে লাশ ঢেকে দিল ফারা। রানা বলল, 'কী পেলে?'

'এটুকু বলা যায়, এ মারা গেছে।'

'সরি? বুঝলাম না।'

'বুলেট না খেলেও মরত। বড়জোর দু'মাস টিকত।' হাতের ইশারায় ওয়ার্ক স্টেশন দেখাল ফারা।

স্ক্রিনে স্পেকট্রো-গ্রাফের লাইনগুলো কিছুই বুঝল না রানা, ডাক্তারের দিকে তাকাল।

'চুলগুলো অপটিকাল এমিশন স্পেকট্রোমিটারে পরীক্ষা করেছি,' ব্যাখ্যা দিল ফারা। 'দেখলাম ধরা পড়ছে সিগনিফিকেন্ট সিম্পটোম্যাটোলজি। এই লোক কমপ্লিট রেনাল ফেইলারের ঝুঁকিতে রয়েছে—একেবারে শেষ পর্যায়ে। এ লোক রক্তশূন্যতায়ও ভুগছে। মাড়ি ফুলে আছে সিভিয়ার জিনজিভাইটিসে। গোটা ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্টে জখম পেয়েছি, জমাট রক্ত পাওয়া গেছে নাকের ফুটোতেও। বুঝতেই পারছ, সেজন্যেই ওর চুল পরীক্ষা করা।'

মনে মনে বলল রানা, 'আরে ছেমড়ি, আমি এসবের কী জানি?' কিন্তু সমঝদারের মত মাথা ঝাঁকাল। 'তারপর? কী মনে হচ্ছে এখন?'

'এই লোক বহুদিন ধরে বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত ছিল। এর বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে মারকিউরি।'

'মারকিউরি? পারদ?'

'হ্যাঁ। ভারী ধাতুর বেলায় ট্রিটমেন্ট না করলে যা হয়। মারকিউরি এর টিশ্যু আর চুলে জমেছে। এরকম ঘটলে একসময় শরীর পুরোপুরি কলাপ্স্ করে। মারকিউরির ফলে প্রথমে যায় মগজ। মানুষ পাগলামি শুরু করে। পাইরেটদের লড়াইয়ের ভিডিও আছে তোমাদের কাছে, দেখলেই প্রমাণ পেয়ে যাবে—এসব উন্মাদ লোকজন মৃত্যুর চিন্তা না করেই লড়াই করে।'

'ওদের কয়েকজন পালাবার চেষ্টা করেছে,' বলল রানা।

'ওদের মধ্যে হয়তো বিষক্রিয়া কম ছিল।'

'আর কন্টেইনারের মানুষগুলোর কী হয়েছে?'

'আমি মাত্র একজনকে দেখেছি। ওই মেয়েটা ক্লিন ছিল।'

'জলদস্যুরা পারদের বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত?'

হাতের ইশারায় লাশটা দেখাল ফারা। 'ওর দেহে যা আছে তাতে তিনটে

থারমোমিটার ভরতে পারবে। আমি আরও দু'জনকে পরীক্ষা করে দেখেছি—একই অবস্থা।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'আমরা যদি মারকিউরির উৎস বের করতে পারি, জলদস্যুদের খোঁজ পাব। এই তো?'

'তা-ই তো মনে হচ্ছে।' গ্লাভ্স্ খুলে ফেলল ফারা। 'মারকিউরিতে ভরা পানিতে মাছ থাকলে কী হয়? ওগুলো খেলে বিষক্রিয়া হয়। বেশি ক্ষতি হয় শিশু আর মহিলাদের। কিন্তু এখানে যা দেখছি, তাতে মনে হচ্ছে এই লোকগুলো কোনও ইণ্ডাস্ট্রিতে কাজ করত। হয়তো মারকিউরির খনিতে... কিংবা আর কোথাও যেখান থেকে শরীরে ঢুকেছে এই বিষ।'

'এদিকে মারকিউরির খনি...' আনমনে বলল রানা। 'এরা কোন্ দেশের মানুষ?'

'পাইরেটদের পনেরোটা লাশ আছে,' বলল ফারা। 'একেক দেশের মানুষ। দু'জনকে মনে হয় থাই বা ভিয়েতনামি। দু'জন চাইনিজ। তিনজন ককেশিয়ান। অন্যরা উপ-মহাদেশীয়।'

'উপ-মহাদেশীয়?'

'ভারত, পাকিস্তান বা বাংলাদেশের হতে পারে।'

'আর কিছু?'

'আপাতত আর কিছু নেই,' শ্রাগ করল ফারা। 'আগে সব দেখব, তারপর রিপোর্ট দেব। চার-পাঁচ দিন লাগবে।'

'তোমার রোগিণী কী করছে?'

'ঘুমাচ্ছে। অথবা চুপ করে পড়ে আছে। আমার সঙ্গে আলাপ করবে না। মনে হলো, কারও সঙ্গেই কথা বলবে না। ও যত শীঘ্রি সম্ভব মার্ভেল ছেড়ে পালাতে চাইছে।'

'তা-ই?' মৃদু মাথা দোলাল রানা। 'আশ্চর্য! থ্যাঙ্ক ইউ, ডক্টর।' ফারাকে হাসতে দেখে ভুরু কোঁচকালো। 'হাসছ যে?'

'হাসছি তোমার পোড়া কপাল দেখে। এত কষ্ট করে মেয়েটার প্রাণ বাঁচালে, উদ্ধার করে নিয়ে এলে... কিন্তু লাভ হলো না, এখন পালাতে চায়।'

'লাভ? কীসের লাভ?' আরও কুঁচকে গেল রানার ঘন ভুরু।

'না, মানে... এত কিছুর পর তোমার তো কিছু প্রাপ্য হয়...' খিল খিল করে হেসে উঠল ফারা।

এবার রানাও হাসল। 'তোমার যেমন প্রাপ্য হয়েছে সোহেলের কাছে? আফগানিস্তানে নিঃস্বার্থভাবে ওর প্রাণ বাঁচিয়ে এখন ওকে দখল করার...'

হাত মুঠো করে চোখ পাকালো ফারা, 'ভাল হবে না বলে দিচ্ছি! ওর জন্যে আসিনি আমি, এসেছি তোমার কথায়!'

'সোহেল সঙ্গে আছে জানার পরেই তো রাজি হলে, তাই না?'

ডাক্তারকে তেড়ে আসতে দেখে এক লাফে বেরিয়ে গেল রানা কামরা থেকে। চট্ করে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল মুচকি হাসি ফারার ঠোঁটে। নিজের কেবিনে ফিরে এল রানা। আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে ডুবে গেল চিন্তায়। তিন মিনিট পর দরজা

খুলে গেল। অনিল। হাতে সরু একটা ফাইল।

'কী রে, কিছু পেলি?' সোজা হয়ে বসল রানা। সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিল।

মুখোমুখি বসে সিগারেট ধরাল অনিল, 'মনে হয় যা চাই, তা পেয়ে গেছি।'

'বাল্ক ক্যারিয়ার, না কোনও কন্টেইনার শিপ?'

'না, অন্য জিনিস।' ফাইলটা রানার হাতে ধরিয়ে দিল ও।

ভিতরে একটা মাত্র ছবি। তার নীচে অর্ধেক পাতা বিবরণ।

ছবিটা একবার দেখে বন্ধুর দিকে তাকাল রানা। 'তুই শিওর?'

'ওটা জাপানের ওরাটু ছেড়ে তাইওয়ানে চলেছে। একটা আমেরিকান ট্যাঙ্কার ঝড়ে প্রপেলার হারিয়েছে, ওটাকে মেরামত করবে।'

ছবিটা আরেকবার দেখল রানা। ভেসেলটা আটশো ফুট লম্বা, চওড়ায় দুশো চল্লিশ ফুট। জুডি ঠিকই বলেছে, জাহাজটা পুরোপুরি চারকোনা ধরনের। বো বা স্টার্ন—কোনটা যে কী, বোঝা মুশকিল! একটা ঘাসহীন সমতল মাঠ বলা যায়। কিছুই উঁচু হয়ে নেই। বিদ্‌ঘুটে জাহাজটা দুনিয়ার চতুর্থ বড় ভাসমান ড্রাই-ডক। রাশার তৈরি। ব্যবহার করা হতো অস্কার টু-ক্লাস সাবমেরিনের জন্য। বেশ কয়েক বছর আগে ডুবে যাওয়া কুর্স্ক ওরকমই সাবমেরিন। ওগুলো পেটে রেখে মেরামতি করত ড্রাই-ডকগুলো। রাশানরা ড্রাই-ডকটা একবছর আগে জার্মানির এক স্যালভেজ ফার্মের কাছে বিক্রি করেছে। তারা আবার বিক্রি করেছে একটা ইন্দোনেশিয়ান জাহাজভাঙা কোম্পানির কাছে।

রানার বুকের ভিতরে রক্ত ছলকে উঠল।

ওই ড্রাই-ডক আস্ত জাহাজ হাইজ্যাক করতে পারবে। উপযুক্ত কেউ নেতৃত্ব দিলে কাজটা সম্ভব। জিনিসটার প্রকাণ্ড আকৃতি বলে দিচ্ছে, ওটা যে-কোনও জাহাজ হজম করতে সক্ষম!

একদল কমাণ্ডো জাহাজগুলোতে ডাকাতি করে? তারাই কী জলদস্যুদেরকে ব্যবহার করছে? তাদের দিয়ে জাহাজ কাছে আনিয়ে নিয়েছে, এমনসময় অ্যাভালাঞ্চ দেখা দিল? কাজেই রিসার্চারদের খুন করতে হলো? রাতের আঁধার, ভাল আবহাওয়ায় ড্রাই-ডক ব্যালাস্ট কমাবে, হোল্ডের দরজা খুলে দেবে। হোল্ডের মেঝের অনেক উপরে থাকবে জাহাজের কীল। ভাসমান ডকের স্টার্নের বিরাট উইঞ্চগুলো চোরাই জাহাজ টেনে হোল্ডে ভরবে, বো-র ফটক বন্ধ হয়ে যাবে। পাম্পগুলো পেটের পানি বের করে দেবে, টাগ-বোটগুলো ড্রাই-ডক নিয়ে রওনা হবে। চারপাশের কেউ দেখতে পাবে না হোল্ডে একটা জাহাজ আছে। দেখবার একটাই পথ—মাথার উপর দিয়ে প্লেন উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া।

'কী বুঝলি?' অ্যাশট্রেতে সিগারেট ফেলে বলল অনিল। 'ভাল বুদ্ধি! ওরা এগোবে আর আশপাশে জাহাজ পেলে গিলে ফেলবে।'

'কাছাকাছি কোথাও আস্তানা আছে ওদের,' বলল রানা। 'ওরা জাহাজ ডাকাতি করছে, কিন্তু মানুষগুলো কোথায় যাচ্ছে?'

'সম্ভবত খুন করছে,' বলল অনিল। 'জাহাজগুলো ডকে নিয়ে ভাঙছে, বা আকৃতি বদলে নতুন রং করছে, স্টার্নে নতুন নাম লিখে নিজেরাই সাগরে

নামাচ্ছে। অনেক কিছু হতে পারে।'

'ড্রাই-ডকের কোম্পানির ব্যাপারে খোঁজ নিয়েছিস? ড্রাই-ডকের নামটা জানা দরকার।'

'ওটার নাম দ্য চুহা।'

'দ্য চুহা? ছুঁচো?'

'ছুঁচো কিনা কে জানে!' শ্রাগ করল অনিল। 'কোম্পানিটা একশো এগারো বছর ধরে ব্যবসা করেছে। ওরিয়েন্টাল লাইন্স কোম্পানিজ। তবে বছর দশেক আগে থেকে একটু একটু করে ওটার সমস্ত শেয়ার কিনে নিয়েছে এক বা একাধিক লোক। শেল কোম্পানি বলতে পারিস। আপাতত মালিকের কারও আসল নাম পাওয়া যাবে না।'

'যাবে না?'

'না। খোঁজ নিতে গেলে একশোটা কোম্পানির নাম বেরিয়ে আসবে। এনপি অ্যাডভাইজার্স এলএলসি, ফাইন্যানশিয়াল অ্যাসে এলএলসি, কমেট ট্রেডিং এলএলসি... কত চাস?'

'অ্যাসে?' দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা, 'অ্যাসে তো মাইনিং টার্ম। ফারা বলেছে জলদস্যুরা পারদের বিষক্রিয়ায় মরছিল। আমার মনে হয়েছে, ওরা এদিকের পরিত্যক্ত কোনও পারদের খনিতে কাজ করত।'

'হতে পারে। শেল কোম্পানিগুলোর ভেতরে ঢুকব আমি। সময় লাগবে, কিন্তু কিছু না কিছু বেরিয়ে আসবেই। তুই ড্রাই-ডকের খবর চেয়েছিস, তা-ই ওদিকে আর সময় দিইনি।'

'লেগে পড়। আমাদের জানতে হবে দ্য চুহার মালিকটা কে। শেল কোম্পানি দিয়ে কাজ হবে না। বেতন যে দেয়, সেই আসল লোকটাকে দরকার।'

'ড্রাই-ডকের কী করবি? মেয়েটা হয়তো ঠিকই বলেছে, ওটার ভেতরে একটা জাহাজ আছে। হয়তো ক্রুদের জিম্মি করেছে!'

'দুনিয়ার সেরা টাগও দ্য চুহাকে ঘণ্টায় ছ-সাত মাইলের বেশি টানতে পারবে না। আমরা ওদের সহজেই ধরতে পারব।'

'ওটাতে উঠবি ভাবছিস?'

'আমি না,' মাথা নাড়ল রানা। 'আমি অন্য কাজ করব।'

আর কিছু বলল না রানা, চট করে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। ওদের দলকে এখন কয়েকটা ভাগে কাজ করতে হবে। শুধু জাহাজে থাকলে হবে না, মাটিতে নিজেদের লোক দরকার। এমন কোথাও থাকতে হবে, যেখানে চট্ করে প্লেনে ওঠা যায়। এই অ্যাসাইনমেন্ট ওদের কোথায় নিয়ে যাবে, কেউ বলতে পারে না। ইন্দোনেশিয়ায় নিশ্চয়ই ওরিয়েন্টাল লাইন্স কোম্পানির অফিস থাকবে। হয়তো ওখানে যেতে হবে।

চেয়ার ছাড়ল অনিল, ফাইলটা তুলে নিল। 'চললাম, দেখি কী পাই।'

'দ্যাখ্।'

অনিল চলে যাওয়ায় ইন্টারকমে লিউ ফু-চুংকে ধরল রানা। 'তুই ব্যাগ গুছিয়ে নে। সঙ্গে কোনও অস্ত্র রাখতে পারবি না। এয়ারপোর্টে যাতে ধরা না খাস। সঙ্গে

দু'জন নিবি। জুডি স্টিভেনসনের কপ্টারে চড়ব আমরা।'

একটু অবাক হলো ফু-চুং, জিজ্ঞেস করল, 'যাবি কোথায়, সেটা তো বলবি?'

'আপাতত সোজা জাপানে। অনিল একটা কোম্পানির তথ্য ঘেঁটে বের করবে আসল মালিক কে। এরপর ঠিক হবে আমরা কোথায় যাব। ...লাঞ্চের সময় হয়ে এল, খাওয়ার টেবিলে তোদের খুলে বলব সব।'

নয়

ভ্লাদিমিয়ার সরোকিন খুশি হতো মুদাস্‌সর আলী খানের জাকার্তা-অফিসে মিটিং হলে। কিন্তু লোকটা জেদ ধরেছে। ছাড়বে না, তার নতুন কারখানা ঘুরিয়ে দেখাবে। কাজেই সুমাত্রার সুন্দা স্ট্রেইট-এ যেতেই হচ্ছে। লোকটা বলেছে, কষ্ট করে ফেরিতে উঠতে হবে না, সে তার কোম্পানির হেলিকপ্টার পাঠিয়ে দেবে।

তা-ই পাঠিয়েছে। সরোকিন এখন কপ্টারের পিছনের সিটে বসে রয়েছে। হলদেটে প্লেক্সিগ্লাসের ভিতর দিয়ে নীচের নীল সাগর, রুপালি সৈকত আর ঘন সবুজ জঙ্গল দেখছে।

আধুনিক সভ্যতা এখনও পৌঁছেনি এখানে। মাঝে মাঝে নীচে দুয়েকটা গ্রাম দেখা যাচ্ছে। খুদে সব উপসাগরে ছোট ছোট নৌকোর মেলা বসেছে। খোঁজ নিলে হয়তো জানা যাবে, একশো বছর আগে বর্তমান মালিকদের প্রপিতামহরা বানিয়েছে ওগুলো!

বাঁ দিকে বিশাল জঙ্গল। হাজারও-কোটি পাতা একটা সবুজ ছাদ তৈরি করেছে। কোথাও কোনও ফাঁক দেখা যায় না। এখানে গাছ কেটে খামারের জন্য জমি আদায় করেনি কেউ। ডানে দিগন্ত জুড়ে নীল সাগর। দুই মাস্তুলওয়ালা একটা স্কুনার পাল তুলে রাজহংসীর মত চলেছে কোথাও। আরও একটু সামনে পুরনো একটা ফ্রেইটার বাণিজ্য-হাওয়ায় পাল ফুলিয়ে নিয়ে ছুটছে। পরিবেশটা যেন উনবিংশ শতাব্দীর।

অবাক হয়ে ভাবছে সে, এই স্বপ্নঘেরা দ্বীপপুঞ্জের সহজ সরল মানুষ জাকার্তার মত এক কোটি আশি লক্ষ মানুষের একটা নরক বানালো কী করে! রাস্তায় যেখানে সারাক্ষণ লেগে থাকে যানজট, অলিতে গলিতে দারিদ্র্য, ক্ষুধা, অপরাধ; ধুলো-ধোঁয়ায় দম নেয়া যায় না; নিজেদের যা ভাল সেসব পরিত্যাগ করে পশ্চিমাদের সমস্ত খারাপ জড়িয়ে ধরেছে বুকে, মনে করেছে এরই নাম আধুনিকায়ন। ফলে জন্ম নিয়েছে বেনিয়া কালচার, দুর্নীতি, ধর্মীয় ফ্যানাটিসিজমের জগাখিচুড়ি। সরোকিন খবর পেয়েছে এক হাজার মার্কিন সেনা এ অঞ্চলের আর্মিকে শেখাচ্ছে একবিংশ শতাব্দীর যুদ্ধ কৌশল। অর্থাৎ, গেল দেশটা। একেই বলে স্বর্গ হইতে নরকে পতন!

সরোকিনের বাম হাতে টোকা দিল পাইলট, আঙুল তুলে সামনের দিকে তাক করল।

খুব বিরক্ত হলো সরোকিন, নীল সাগরে চোখ রেখে স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ ছেড়ে গন্তব্যের দিকে দৃষ্টি ফিরাল। দেখবার মত কিছু নেই। খানের কমপ্লেক্সটা খুঁজল। দেখা গেল না। ওদিকে পড়ে আছে লম্বাটে একটা পাথুরে সৈকত। সাগরের বিশাল একটা জায়গা স্টিলের ফেন্স দিয়ে ঘেরা হয়েছে। ওখানে অসংখ্য জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে নোঙর ফেলে। দূর থেকে বোঝা যায় জাহাজগুলো পরিত্যক্ত—ওগুলো আর কখনও সাগরে ভাসবে না। বেশ কিছু ট্যাঙ্কার নিজেদের বহন করা তেলে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, ঠিক যেন নিজ রক্তে নাক গুঁজে পড়ে আছে খুন হওয়া লাশ। একটা ট্যাঙ্কার এত পুরোনো যে জং-এর আক্রমণে ভেঙে গেছে কীল, ওটার বো আর স্টার্ন এখন উঁচু হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।

দূরে দূরে বেশ কিছু অয়েল কন্টেইনমেন্ট বুম উপসাগরে হাত বাড়িয়ে রেখেছে, যেন অগ্রসরমান জাহাজ দেখলেই হামলে পড়বে। খোলা সাগরের দিকে জাহাজ ঢুকবার বিরাট এক ফটক। মৃদু হাসল সরোকিন। এখানে কোনও জাহাজ এলে আর কখনও ফেরে না, অন্তত সাগরপথে নয়।

বাঁক নিল কপ্টার, চলে এল খান ব্রেকার্স ইয়ার্ডের উপরে। জোয়ারের ঢেউ আর কয়েকটা প্রকাণ্ড উইঞ্চ এক হাজার ফুটি দুটো সুপার-ট্যাঙ্কারকে ঢালু সৈকতে টেনে তুলেছে। দুই জাহাজে কাজ করছে একগাদা লোক। তাদের হাতে কাটিং টর্চ। ওগুলো জাহাজের গা স্পর্শ করলে উজ্জ্বল আলো চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। সাগরের তীরে একটা বড় ক্রেন রেইল-এ বসে আছে, জাহাজের প্লেটগুলো সৈকতের আরও উপর দিকে পাঠাচ্ছে। ওখানে রয়েছে আরও শ্রমিক, তারা প্লেট কাটছে, আরও ছোট টুকরো করছে। আরেকদল জাহাজের পাইপ, বৈদ্যুতিক তার, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি আলাদা করছে। দেখলে মনে হয় জাহাজগুলো যেন কোনও লাশ, মানুষগুলো পিঁপড়ে, ব্যস্ত হয়ে লাশ খেয়ে শেষ করছে।

জাহাজ টুকরো করে রেইলকার-এ ওঠানো হচ্ছে। ওগুলো চলে যাবে উত্তর দিকের খান স্টিল ওয়র্কস্-এ। ওখানে লোহা গলিয়ে ইস্পাতের বার তৈরি হবে, চলে যাবে ওগুলো দক্ষিণ চিনে।

কয়েক একর জায়গায় তৈরি হয়েছে স্টোরেজ ইয়ার্ড। ওখানে রাখা হয়েছে বয়লার, লাইফবোট, নোঙর থেকে শুরু করে জাহাজের শতখানেক আইটেম। ওগুলো মুক্ত বাজারে বিক্রি করা হবে।

স্টোরেজ ইয়ার্ডের পাশে গড়ে উঠেছে শ্রমিকদের বস্তি। তাদের প্রয়োজনে রেইল-লাইনের ধারে জমে উঠেছে পতিতালয়। পিছু নিয়ে এসেছে একদল বাটপার, চোর, জুয়াড়ী—এরা শ্রমিকদের সামান্য সঞ্চয়টুকু হাতিয়ে নেবে ছলে-বলে-কৌশলে।

সরোকিন খেয়াল করল, জঙ্গল পিছিয়ে গেছে। তা-ই হওয়ার কথা। হাজারো শ্রমিকের রান্নার কাঠ ওখান থেকে জোগাড় করা হয়। তাদের জন্য কোনও বিদ্যুৎ নেই। চারপাশে নোংরা আবর্জনার স্তূপ। বাতাসে ভেসে আছে ধূলি ও ধোঁয়া। যেন এরা বায়ু দূষণে মরলে কিছু যায়-আসে না।

দশ মাইল দূরে স্টিল মিল-এ অন্যরকম ব্যবস্থা, সেখানে কোনও দূষণ নেই—ছিমছাম, পরিষ্কার। ওখানে কয়লা বা তেল দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়

না, কাজ হয় জল-বিদ্যুৎ ব্যবহারের মাধ্যমে।

খান ব্রেকার্স ইয়ার্ডে এখন দারুণ একটা জিনিস এসেছে, মুদাস্‌সর খান সরোকিনকে সেটাই দেখাতে চায়।

সুপার ট্যাঙ্কারগুলোর নাকের কাছে ঝলমল করছে একটা প্রকাণ্ড ধাতব বিল্ডিং। লম্বায় প্রায় জাহাজের সমান। সাগরে পাইলিং শেষে বিল্ডিঙের পিলার তৈরি হয়েছে। পুরো বিল্ডিং পাঁচশো তেত্রিশ ফুট সাগরের ভিতর সেঁধিয়ে আছে। ছাদের মাঝখানে কাঁচের প্যানেল রয়েছে, ওগুলো দিয়ে ভিতরে আলো ঢুকছে। চারটে রেইল-লাইন বিল্ডিঙের ভিতরে ঢুকেছে। কপ্টার উপর দিয়ে যাওয়ার সময় দুটো ছোট ট্রেন দেখল সরোকিন। ডিজেল ইঞ্জিনগুলো জাহাজ থেকে কাটা পাঁচ ফুটি টুকরোগুলো সরিয়ে নিচ্ছে। সরোকিন বুঝতে পারল না কীভাবে ওগুলো ওরকম বাঙ্গির টুকরোর মত করে কাটা হয়েছে।

ব্রেকার্স ইয়ার্ড পেরিয়ে এল কপ্টার। সামনে পড়ল একটা পাথুরে বাঁধ। ওটা দিয়ে আওয়াজ ও পোড়া ধাতুর দুর্গন্ধ ঠেকানো হয়। কপ্টার বাঁধ পেরিয়ে এল, এরপর ঘাসের লন। একটু দূরে দূরে একটার পর একটা বাংলো। ওগুলো ভিজিটর, ক্লার্ক ও দক্ষ কর্মচারীদের জন্য। আরও এগিয়ে কপ্টারটা ধীরে ধীরে হেলি-প্যাডে নামল। একটু দূরে অপেক্ষা করছে একটা ছাদ-খোলা জিপ। ড্রাইভার সরোকিনের লাগেজ নিতে এগিয়ে গেল।

ইন্দোনেশিয়ায় থাকবে না সরোকিন, কাজেই ব্রিফকেস আর একটা লেদার গ্রিপ সঙ্গে রেখেছে। তার লাগেজ পড়ে আছে এয়ারপোর্টের লকারে। ড্রাইভারকে ব্রিফকেসটা জিপের পিছনে রাখতে দিল সে, কিন্তু প্যাসেঞ্জার সিটে বসে গ্রিপটা তুলে নিয়ে দু'হাঁটুর উপরে রাখল।

ব্রেকার্স ইয়ার্ডের দিকে রওনা হয়ে গেল জিপ। অল্পক্ষণেই ভ্লাদিমিয়ার সরোকিনের শ্রবণযন্ত্রের উপর শুরু হলো রাঁদা, জ্যাক-হ্যামার আর জেনারেটরগুলোর তীক্ষ্ণ শব্দের আক্রমণ। ক্রেনটা একটা দশ টনি ধাতব টুকরো সৈকতে ফেলল। ভোঁতা আওয়াজ হলো। ওখানে প্রায়-উলঙ্গ একদল শ্রমিক স্লেজহ্যামার আর ইলেকট্রিক করাত নিয়ে কাজে লেগে পড়েছে। তাদের সারাদেহে তপ্ত লোহার দাগ দেখল সরোকিন। অনেকের এক চোখ, দু'চারটে আঙুল বা পায়ের পাতার অংশ নেই।

হঠাৎ বিরাট ধাতব বিল্ডিঙের ভিতরে ভয়ানক একটা আওয়াজ হলো। সরোকিন চমকে গিয়ে থতমত খেল। ওর মনে হলো যে-কোনও সময় মাথাটা বিস্ফোরিত হবে। চোখের পানি গাল বেয়ে নামল, চিবুক পেরিয়ে শার্টে পড়ল। আওয়াজটা পুরো এক মিনিট ধরে চলল। ড্রাইভার এবার প্লাস্টিকের একজোড়া ইয়ারফোন বাড়িয়ে দিল। ওগুলো কানে পরে নিল সরোকিন। আওয়াজটা আবার শুরু হলো, তবে ইয়ারফোনের কারণে সহ্য করা যায়। শ্রমিকদের ইয়ারফোন দেয়া হয়নি, তারা কী করে সহ্য করছে বুঝতে পারল না সে। লোকগুলো চুপচাপ কাজ করছে। জিপের ড্রাইভারও কোনও ইয়ারফোন পরেনি। আওয়াজটা যেন কিছুই না!

প্রকাণ্ড বিল্ডিঙের সামনে থামল জিপ। একমুহূর্ত পর ভিতরের কর্কশ

আওয়াজটা থেমে গেল। সরোকিন টের পেল, শ্বাস আটকে রেখেছে সে। শ্বাস ফেলে ড্রাইভারের দিকে তাকাল, ইশারায় জানতে চাইল, ইয়ারফোন খুলবে কি না।

মাথা দোলাল ড্রাইভার, ইংরেজিতে বলল, 'কষ্ট হলো বলে আমি দুঃখিত। আমরা আসলে আওয়াজে অভ্যস্ত।'

সরোকিন জিজ্ঞেস করল, 'ওটা কী ছিল?'

'জাহাজের করাত।' দশতলা বিল্ডিঙের একপাশে এলিভেটরটা দেখাল ড্রাইভার। 'আসুন।'

এক শ্রমিক অপেক্ষা করছে ওখানে, তার হাতে বিদেশি সাহেবকে গছিয়ে দিল সে।

শ্রমিক সরোকিনকে প্লাস্টিকের শক্ত একটা হেলমেট দিল। ওটার সঙ্গে আছে ইয়ার প্রোটেক্টার। চট্ করে কান বন্ধ করা যাবে। অতিথিকে নিয়ে লিফটে ঢুকল সে, দরজা বন্ধ করে দিয়ে বাটন টিপল। ঝাঁকি খেয়ে লিফট উঠতে শুরু করল।

কপ্টারে আসবার সময় ব্রেকার্স ইয়ার্ডের গোটা প্রক্রিয়া দেখেছে সরোকিন, কিন্তু তখন বোঝেনি চারপাশে এত কর্মকাণ্ড ঘটছে। সুপার ট্যাঙ্কারগুলোর পর আরেকটা ক্রুজ শিপ কাটা হবে। ওটাকে দেখে মনে হলো পতিতাদের মধ্যে বসে থাকা কুলীন বংশের নববধূ। এরইমধ্যে গায়ে চৌকো একটা গর্ত করা হয়েছে। একটা ভাসমান ক্রেন ওটাকে নিয়ে অপেক্ষা করছে। সময় এলেই বিল্ডিঙের ভিতরে ঠেলে দেবে।

এলিভেটর দশতলায় পৌঁছে গেল। শ্রমিক জোড়া দরজা টেনে খুলে দিল। সরোকিনের নাক জ্বলে উঠল পোড়া ধাতুর গন্ধে। অপেক্ষা করল সে, বিশ সেকেণ্ড পর ভিতরের অন্ধকারে চোখ সয়ে এল। এবার দু'প্রান্তে দুটো দানবীয় দরজা দেখল। বিল্ডিঙের ভিতরে কোনও ঘর নেই। সব মিলে জায়গাটা হয়তো ফাঁকা একটা ছাউনি বলা যেত, কিন্তু ভিতরে বসে আছে প্রকাণ্ড একটা জাহাজ। বা বলা উচিত, জাহাজের অর্ধেক কঙ্কাল।

সরোকিন যে ক্যাটওয়াকে দাঁড়িয়ে আছে, তার ঠিক নীচে জাহাজের ব্রিজ। জাহাজটা ছাউনির ভিতরে ঢোকানোর আগে চিমনি ও মাস্তুল কাটা হয়েছে, নইলে ঢুকত না। সামনের অর্ধেক কাটা হয়ে গেছে। উইঞ্চগুলো এরপর জাহাজের পিছনের দিক টেনে জমিতে তুলবে। ঠিক জায়গায় এনে দেবে, ছাদ থেকে নেমে আসবে করাত, জাহাজের একটা টুকরো কেটে নামিয়ে দেবে। করাতটা দেখতে বিশাল একটা চেইনের মত। ওটার দিকে মনোযোগ দিল সরোকিন। চেইনের গায়ে অসংখ্য ধাতব দাঁত।

'কী বুঝলেন, মিস্টার সরোকিন?' জাহাজের ব্রিজে দাঁড়িয়ে আছে মুদাস্‌সর আলী খান।

চোখ তুলে চাইল সরোকিন। গত দুটো বছরে একটুও বদলায়নি লোকটা। কাঁচা-পাকা দাড়িগুলো নাভি পর্যন্ত নেমেছে। প্রচুর ধূমপানের ফলে দাড়িতে তামাকের দাগ বসে গেছে। মাথায় হেলমেট। ওটা খুলে ফেলায় টুপিটা দেখা গেল। লোকটা জীবনের বেশিরভাগ সময় রোদে কাটিয়েছে, গায়ের রং পোড়া

বাদামী। চোখ দুটো পিঙ্গল, দৃষ্টি দেখলে মনে হয় বদ্ধ উন্মাদ। একবার তাকালে আর চোখের পাতা ফেলে না লোকটা। সরোকিন ছয় ফুট দু ইঞ্চি, বুঝতে পারছে মুদাস্‌সর খান লম্বায় অন্তত পৌনে সাত ফুট। বৃষস্কন্ধ। পিপের মত বুকের খাঁচা। বোঝা যায়, পেটের পেশি এই বয়সেও দড়ির মত প্যাঁচানো। সবটা মিলে প্রকাণ্ড লোকটাকে প্রাচীন কোনও ওকের সঙ্গে তুলনা করা যায়।

খানের বয়স বায়ান্ন, অমানুষ হয়েছে লাহোরের বস্তিতে। শরীর স্বাস্থ্যের কারণে মস্তানীতে শাইন করে। এমন কোনও কুকর্ম নেই যা সে করেনি। ছাব্বিশ বছর বয়সে প্রথম বড় কাজে হাত দেয় সে। যা কামিয়েছিল, পাকিস্তানের একটা ইমপোর্ট-এক্সপোর্ট কোম্পানিতে ইনভেস্ট করে। সে-সময় আফগানিস্তানে ঢুকে পড়েছে সোভিয়েতরা। তাদের ঠেকাতে পাকিস্তানে হড় হড় করে ডলার ঢালছে আমেরিকা। মুদাস্‌সর সুযোগটা নেয়। দু'হাতে যতটা পারে কামিয়ে নেয় আমেরিকান ডলার। সে জানত, যতই গোলমাল চলুক, আফগানিস্তানের পাহাড়ি এলাকায় ওপিয়ামের উৎপাদন কমেনি। এই ব্যবসায়ে জড়াতে অসুবিধে হয়নি ওর। চালানগুলো পাঠাতে শুরু করে সে করাচিতে। সেখান থেকে চলে যায় বিভিন্ন জায়গায়। বিশেষ করে আমস্টারডাম, মার্সেই আর রোমের হেরোইন উৎপাদন-চক্রের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে সে। তার উদ্যমে ওপিয়াম পৌঁছে যায় দুনিয়ার সব কোণে।

মুদাস্‌সর খান জানত আমেরিকা আফগাস্তিানে গৃহযুদ্ধ চাইছে, এরপরে তালিবানরা ক্ষমতায় বসবে। তা-ই হলো, তারা এসে ওপিয়ামের চাষ বন্ধ করে দিল। খান বাধ্য হয়ে অন্যদিকে চোখ সরাল, কিন্তু ততদিনে টাকার পাহাড় গড়ে নিয়েছে সে। ঘুষ দিয়ে মালোয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও নিউ গিনির গাছ কাটার অনুমতি নিল। নিজেই জাহাজের বহর কিনে গাছগুলো বহন করল। নিজের বিরাট এস্টেটে একদল বাঘ আনাল। বড়লোক চাইনিজদের কাছে হান্টিং রাইট বিক্রি করল। এফ্রোডিজিয়াক হিসেবে বিক্রি করা হলো বাঘের হাড়। এমন কোনও ব্যবসা নেই, যেখানে সে নাক গলাল না। লোকটা যে-কোনও ব্যবসায় বে-আইনী কাজ করতে পারলে খুশি হয়ে ওঠে। কিছুদিন আগে তার কোম্পানি তাইওয়ানে চারটে বহুতল অ্যাপার্টমেন্ট ভবন তৈরি করে, ওখানে বাজে মেটেরিয়াল ব্যবহার করা হয়। ভবনগুলো সামান্য ভূমিকম্পে ধসে পড়ে, মারা যায় প্রায় ছয়শো মানুষ। সে তখন ধরাছোঁয়ার বাইরে। মুদাস্‌সর আলী খানের পরিষ্কার কথা, সম্পদ বাড়লেই হলো, কী ভাবে সেটা আসবে, সেটা বড় ব্যাপার নয়।

ক্যাটওয়াকে উঠে এল মুদাস্‌সর আলী খান।

সরোকিন বলল, 'সত্যিই দেখার মত।' করাতের দিকে তাকাল, ঠিক করেছে বাধ্য না হলে ওই সাপের মত ঠাণ্ডা দু'চোখে চোখ রাখবে না।

মুদাস্‌সর খান নো স্মোকিং সাইনের সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল, ভুসভুস করে ধোঁয়া ছেড়ে হাসিমুখে বলল, 'এশিয়ায় এই একটাই আছে। ওগুলোর দাঁতে বৈশিষ্ট্য আছে, এমন কী কার্বন স্টিলও কিছু না, মাখনের মত গলে যায়। জার্মানি থেকে আনিয়েছি। দুনিয়ার সেরা। দশটা জাহাজ কাটার আগে দাঁত বদলাতে হয় না। হ্যামবার্গ থেকে টেকনিশিয়ান এসে আমাদের শিখিয়ে দিয়ে গেছে দাঁত কী

ভাবে বদলাতে হয়। করাতের নাম দিয়েছি আমি: ডেন্টিস্ট।' সরোকিন হাসছে না দেখেও পাত্তা দিল না সে, 'দাঁতের ডাক্তার, বুঝলেন? হাসির ব্যাপার।'

হাতের ইশারায় বিশাল ছাউনি দেখাল সরোকিন। 'আমার সোনাগুলো বুঝি এসবেই খরচ করছেন?'

'না, সব নয়—কিছুটা। ইন্দোনেশিয়ান সরকার বলেছিল আমি আধুনিক করাত বসালে ট্যাক্স কমিয়ে দেবে। ওরা ভাবেওনি যে এটা এসে যাওয়ায় অন্তত এক হাজার লোক চাকরি হারাবে। কাজেই ধরে নিলাম, ওরা ভালর জন্যেই তো বলেছে! একদল বাঁদরকে চাকরিতে রাখতে হবে না। ব্রেকিং ইয়ার্ডে একটা শুয়োর দুর্ঘটনায় মরলে আমাকে এক লাখ রুপি দিতে হয়। গত সপ্তাহে এক হারামজাদা-কাটার বাঙ্কার ফিউল ট্যাঙ্ক উড়িয়ে দিয়েছে, তাতে পনেরোটা গেছে। জাহাজটা লক্ষ টুকরো হয়েছে। লোকসান। পুরোটা লোকসান!

'করাত এসে যাওয়ায় এখন আর বারবার সরকারী ইন্সপেক্শনও হবে না। ইচ্ছে মত জাহাজের অ্যাস্‌বেস্টস্‌গুলো যেখানে খুশি ফেলতে পারব। ঠিক করেছি, স্পেশাল ডাম্পে না ফেলে ওগুলো সাগরেই ফেলব। পুরোনো জাহাজের লোহার দাম অনেক কমে গেছে, এদিকে স্টিলের দাম গেছে বেড়ে, তার ওপর ইন্দোনেশিয়ার এক হাজার বাঁদর ঘাড় থেকে নামছে—দু'বছরে করাতের পয়সা উঠে যাবে। আপনি জানতে চেয়েছেন, অনেক টাকা খরচ হয়েছে কি না—হ্যাঁ। খরচটা আপাতত মেনে নিতে হবে ভবিষ্যতের প্রচুর লাভের জন্যে।' আবার হাসল মুদাস্‌সর আলী খান। 'আমার সবসময় মনে হয়েছে জীবনটা একটা ম্যারাথন, এখানে জোরে দৌড়ে জিততে হবে। বুঝলেন?'

একটা অ্যালার্ম ক্ল্যাক্সোন বেজে উঠল। মুদাস্‌সর খান মুহূর্তে ইয়ার প্রোটেক্টারটা কানে নামিয়ে নিল। তার এক সেকেণ্ড পরে কান বাঁচাল সরোকিন। আট ইঞ্চি পুরু করাত জীবন ফিরে পেয়েছে। মনে হলো চেইনটা বিদ্যুতের গতিতে ঘুরছে। এতই দ্রুত যে, কোনও দাঁত দেখা যায় না। ছাদের সঙ্গে আটকানো বড় দুটো স্প্রকেট-গিয়ার কটকট কটকট করে নড়ছে। র‍্যামগুলো করাত নামিয়ে দিল। করাতটা জাহাজের সামনের আরেকটা অংশ খাবে। প্রতিবার জাহাজের পাঁচ ফুট করে নামিয়ে দেবে। করাতের গতি আরও বেড়েছে, এবার র‍্যামগুলো পিছিয়ে গেল—করাত ঘুরতে ঘুরতে নেমে এল জাহাজের কীল-এ। ধাতব ছাউনির ভিতরে ভয়ঙ্কর আওয়াজটা চারপাশে ধাক্কা খেল। জাহাজের দু'পাশে তাক করা ওয়াটার ক্যানন করাতের বেল্টের দাঁত ঠাণ্ডা রাখছে। তেল গিয়ে তপ্ত লোহা শীতল করছে। করাত কীলে দাঁত বসালেই বাষ্প ছিটকে উঠছে। চোখের সামনে কাটা জায়গায়টা মুহূর্তে পুড়ে গেল, খানিকটা ধাতু বাতাসে মিশে গেল। কড়া গন্ধটা নাকে এসে লাগছে। একবার করাত কীল কেটে ফেললে তুলনামূলক হালকা লোহার প্লেটিং পচা কাঠের মত কাটবে।

চুপচাপ দেখছে সরোকিন, ঘুরন্ত চেইনের করাত নেমে এল, জাহাজের রেইলিং মুহূর্তে কাটল। ডেকের লোহা তপ্ত হয়ে উঠল। করাত নেমে গেল আরও। মাত্র দশ মিনিটে মেইন ডেক কাটল। জাহাজের অংশটা যেন মাখনের তৈরি। একটা টুকরো হঠাৎ আগুনের শিখা ছড়িয়ে খসে পড়ল। সফিস্টিকেটেড ব্রেকিং

সিস্টেম চেইনটা থামাল, ছাদের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। একটা শক্তিশালী ক্রেন জাহাজের টুকরো নিয়ে সামনের দরজার দিকে এগোল। দরজা দিয়ে ঢুকল চারটে খুদে লোকোমোটিভ ইঞ্জিন, ওগুলো টুকরোটা নিল। পিছিয়ে ছাউনি ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

'ওরা টুকরোগুলো ইয়ার্ডে নিয়ে রাখবে,' জানাল খান। 'একদল লোক হ্যাণ্ড-কাটার দিয়ে ওগুলো কাটবে। খণ্ডগুলো চলে যাবে স্টিল প্ল্যান্টে। এই করাত সবই কাটতে পারে, শুধু একটা জিনিস কাটতে পারে না—জাহাজের ডিজেল ইঞ্জিন। ওটা বাকি থাকে, পরে আমরা সরিয়ে নিই। এরকম বড় জাহাজ হাতে কাটতে দু'সপ্তাহ লাগে, তবে করাত আসায় দু'দিনে কাজ শেষ হয়ে যায়।'

আরেকবার বলল সরোকিন, 'সত্যিই দেখার মত।'

রাশানকে নিয়ে এলিভেটরের দিকে এগোল মুদাস্‌সর। 'এবার শোনা যাক আপনার খবরাখবর। কেমন চলছে ওদিকে?'

'আপনার অফিসে চলুন, বলব।'

দশ মিনিট পর মুদাস্‌সর আলী খানের বড় বাংলোয় পৌঁছে গেল তারা। অফিসটা বাংলো সংযুক্ত। অফিসের দেয়ালে লটকে আছে খানের এগারো সন্তানের ছবি। উল্টোদিকের দেয়ালে তার স্ত্রীর বিরাট এক পোর্ট্রেট—অত্যন্ত মোটা এক মহিলা। খান বিয়ার সাধল, মাথা নেড়ে পানি নিল সরোকিন। সে ব্রিফকেস খুলতে না খুলতে খান নিজের জন্য দ্বিতীয় বিয়ারটা খুলল।

'মিটিঙে আমি যা বলেছি, সব মেনে নিয়েছে কনসোর্টিয়াম,' বলল সরোকিন। 'এবার আমাদের সমস্ত কর্মকাণ্ড দশগুণ বাড়াতে হবে।'

'বাহ্, চমৎকার প্রস্তাব!' হাসি-হাসি ভাব করল মুদাস্‌সর খান। 'আমার ভাগও তা হলে বেড়ে যাবে দশগুণ?'

সরোকিন মন্তব্যটা পাত্তা না দিয়ে একটা ফাইল এগিয়ে দিল। 'আগামী বছর আমাদের ওই পরিমাণ লাগবে। যোগাড় করতে পারবেন?'

বুক পকেটে রাখা রিডিং গ্লাস বের করে বিরাট নাকের উপরে বসাল খান, লিস্ট দেখল। বিড়বিড় করে অঙ্ক কষল। 'আপাতত একহাজার লাগবে। এরপরে সামনের দু'মাসে লাগবে দুশো করে। তার পরের দু'মাসে চারশো করে। তারপর থেকে ছয়শো করে।' সরোকিনের চোখে তাকাল খান। 'বাড়ানোর কারণটা কী?'

'রোগ। আমরা ধরে নিতে পারি টাইফয়েড আর কলেরা আরও বাড়বে।'

'ও।'

সরোকিন পরবর্তী আধঘণ্টা তার পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করল। শেষে বলল, 'বুঝতেই পারছেন জার্মানি ছেড়ে দেবে, অন্য দেশও ছাড়তে চাইতে পারে।'

এতক্ষণ শুনেছে খান, মাঝে মাঝে পরিকল্পনায় পরিবর্তন এনেছে। এবার মাথা দুলিয়ে বলল, 'অসুবিধে নেই, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

সরোকিন মনে মনে আরেকবার স্বীকার করে নিল, এই পাকা ক্রিমিনালের মাথাটা ভাল খেলে।

আলাপ শেষ, এবার বিদায় চাইল সরোকিন, জানাল এবার ফিরতে চায়। সূর্যাস্ত এখনও দু'ঘণ্টা বাকি, এখন কপ্টারে রওনা হলে সন্ধ্যার আগেই জাকার্তায়

পৌঁছে যাবে সে। সে ঠিক করেছে, রাতটা ওখানে কোনও হোটেলে কাটাবে, আগামীকাল প্রথম প্লেনে মস্কো ফিরবে।

মুদাস্‌সর আলী খান হ্যাণ্ডশেক শেষে সরোকিনকে বিদায় দিল, লোকটা বেরিয়ে যাওয়ার পর বড় ছেলে আজগার আলী খানের কাছে ফোন করল সে। যে-ধরনের ব্যবসা সে করে, তাতে শুধু নিজের ছেলেদের বিশ্বাস করা যায়, আর কাউকে নয়। মুদাস্‌সর খানের ধারণা, আল্লাহ তাকে শাস্তি দিয়েছেন ছয়টা মেয়ে দিয়ে। ওগুলোর পিছনে খামোকা অনেক টাকা বেরিয়ে গেছে। একটার আবার এখনও বিয়ে হয়নি। ওটার পিছনে অনেক যৌতুক বেরিয়ে যাবে। পাঁচ নম্বর মেয়েটা, নূরজাহান, ওটার মুখ ছিল ঘোড়ার মুখের মত—ওটার পিছনে গেছে পাঁচ লাখ রুপি। ষষ্ঠটা মমতাজ, ওটা দেখতে খারাপ হলেও ব্যবহারটা ভাল। মুদাস্‌সর খান ভেবে রেখেছে, ওটার বিয়েতে পাঁচ লাখের বেশি দেবে।

মুদাস্‌সর ফোনে বড় ছেলে আজগারের গলা শুনল। আজগার সালাম-কুশলাদি শেষে বলল, 'আব্বাজান, দুই দিন ধরে শিরি-ফোরের খবর পাওয়া যাচ্ছে না।'

'এবারের যাত্রায় ওটার ক্যাপ্টেন কে ছিল?'

'লোকমান আলী।'

মুদাস্‌সর আলী খান কাঁচা টাকার ব্যবসাগুলো নিজেই চালায়, ম্যানেজার রাখে না। তার সংগঠনের উপরের পর্যায়ের সবাইকে চেনে সে। সব তার নির্দেশে চলে। লোকমান আলী বাইশ বছর মালাক্কা স্ট্রেইটে জলদস্যুতা করেছে, তারপর দু'বছর হলো তাকে কাজে নিয়েছে খান। ওই লোক ক্ষ্যাপাটে হতে পারে, কিন্তু কখনও কোনও নির্দেশ পালনে দেরি করেনি। সে যোগাযোগ করেনি মানেই বুঝে নিতে হবে, তার খারাপ কিছু হয়েছে। মুদাস্‌সর আলী খান হিসাব কষে ফেলল, শিরি-ফোর আর নেই। সঙ্গে গেছে ক্যাপ্টেন লোকমান আলী আর চল্লিশটা কুত্তা।

'ওর জায়গায় আরও কয়েকজন ক্যাপ্টেন হতে চায়,' ছেলেকে বলল মুদাস্‌সর খান। 'ঠিক আছে, লোক নিয়ে নেব। তুমি তোমার লোকদের বলো, যেন কান খোলা রাখে। জলদস্যুদের জাহাজে হামলা হয়েছে এমন কিছু শুনলে যেন দেরি না করে আমাদের জানায়। যে-ব্যাটা লোকমানের সঙ্গে লড়াই করে জিতেছে, সে গল্প করে বেড়াবে।'

'জ্বী, আব্বাজান। ...একই কথা আমিও ভেবেছি, কান খোলা রাখতে হবে। এখনও হামলার কোনও রিপোর্ট পাইনি।'

'আর সব ব্যবসা ভালই চলছে। ভ্লাদিমিয়ার সরোকিন একটু আগে আমার অফিস ছেড়ে গেছে। আমাদের জোরেশোরে নামতে হবে। যা লাগবে সেগুলোর লিস্ট দিয়ে গেছে। তোমাকে আগেই বলেছি, ওগুলো এখন পাওয়া জরুরি।'

'আপনার নির্দেশে আমি দ্রুত যোগাড় করছি।'

'ভাল। তোমার ছেলেদের কী খবর? ওরা ঠিকসময় কাজে নামতে পারবে তো?'

'নির্দেশের এদিক-ওদিক করবে না ওরা। সরোকিন আর তার ব্যাঙ্কের লোকগুলো বোঝার আগেই আমাদের কাজ শেষ হয়ে যাবে।'

ছেলের কণ্ঠে আত্মবিশ্বাস ঝরে পড়ছে, মুদাস্‌সরের বুকের ভিতরে গর্ব জন্মাল। বড় ছেলেটা একদম তার মতই হয়েছে। আজগার বস্তিতে জন্মালেও নিজের ক্ষমতায় দু'হাতে মাটি খামচে উপরে উঠে আসত। 'তা হলে তো ভাল,' বলল মুদাস্‌সর। 'এদিকে ধলা ব্যাটারা এটাও জানে না যে বিরাট গাড্ডায় পড়েছে।'

'সত্যিই তা-ই, আব্বাজান। আপনি ওদের ভাল নাচিয়েছেন। আতঙ্ক আর লোভের বশে মাথা গেছে ওদের। নাচছে নাচুক। ডুববে।'

জিভ দিয়ে চুকচুক আওয়াজ করল মুদাস্‌সর। 'না, আজগার, আমরা চাই না ওরা ডুবুক। একটা কথা সবসময় মাথায় রাখবি, মরো-মরো গাছের ফল খেতে পারবি, তবে গাছটা সত্যিই মরে গেলে আর কখনও ফল পাবি না। সরোকিন আর তার কাস্টোমাররা সবাই ক্ষতির মধ্যে পড়বে, তবে আমরা কিছু রেখে দেব, যাতে পরে আবার ফল খেতে পারি।'

দশ

'তুই তো হাঁটতে হাঁটতে কার্পেটের চল্টা তুলে ফেললি,' বলল লিউ ফু-চুং। হোটেলের ঘরের কোণে সিঙ্গেল সোফায় বসে আছে ও। 'অন্তত দু'ইঞ্চি ছোট হয়ে গেছিস। এবার একটু বিশ্রাম নে।'

ঘরের অন্য প্রান্তে চলে যাচ্ছে রানা, প্লেট গ্লাসের জানালার সামনে গিয়ে থামছে। বাইরে টোকিয়োর গিন্‌জা ডিস্ট্রিক্টের বৈদ্যুতিক বাতিগুলো ঝলমল করছে, কিন্তু দেখেও কিছু দেখছে না রানা—ভাবছে দ্য মার্ভেল অভ গ্রিসের কথা। ওদের জাহাজটা এখন দ্য চুহা'র দিকে এগিয়ে চলেছে। কিছুক্ষণ পর উর্বশী ওর দল নিয়ে ড্রাই-ডকে উঠবে। রানা জানে, এ মুহূর্তে মার্ভেলের অপারেশন্স সেন্টারে ওর থাকা দরকার ছিল। কিন্তু তার বদলে এখন হোটেলের ঘরে বসে আছে। আরও কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে কে জানে! অনিল ড্রাই-ডকের মালিকের নাম জানলে, তখন কোনও ব্যবস্থা নেয়া যাবে। নিজেকে খাঁচায় বন্দি সিংহ মনে হলো ওর, হোটেলের তিরিশ তলায় আটকা পড়েছে।

চওড়া জানালার ওপাশে এসে আছড়ে পড়ল তুমুল বৃষ্টির ছাঁট। কাঁচের ওপাশে বাতিগুলো আর ভাল দেখা যাচ্ছে না। প্রকৃতি আগে থেকেই অতিগম্ভীর ছিল, এখন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। মেজাজ চড়ছে রানারও।

পাক্কা চব্বিশ ঘণ্টা হলো জুডি স্টিভেনসনকে তুলে নিয়েছে কপ্টার। ওর সঙ্গে ভিড়ে গেছে রানা, ফু-চুং ও দু'জন কমাণ্ডো। জাপানে পৌঁছে হেলি-প্যাডে নেমে এক দাড়িওয়ালাকে দেখেছে রানা। জুডি আর দাড়িওয়ালার চেহারা লক্ষ করে আন্দাজ করেছে, এদের আগে কখনও আলাপ হয়নি। লোকটা নিজের নাম বলেছে, জোনাথন উইলকিন্স। রানাকে কয়েকবার ধন্যবাদ দিয়েছে সে জুডিকে উদ্ধার করেছে বলে। কিন্তু রানার মনে হয়েছে, লোকটা নিজেকে লুকিয়ে রাখছে,

একটু যেন রেগেও আছে।

জুডি অবশ্য উদ্ধার পেয়ে কৃতজ্ঞ। মিস্টার উইলকিন্স একটা অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করেছে, এক আর্দালি একটু দূরে দাঁড়ানো অ্যাম্বুলেন্সটা দেখিয়েছে জুডিকে। হাঁটতে শুরু করবার আগে রানার গালে চুমু দিয়েছে মেয়েটা। অ্যাম্বুলেন্সে উঠবার আগে রানার চোখে সাগর-নীল দু'চোখ রেখে বলেছে, 'গতকাল রাতে আরেকটা কথা মনে পড়েছে। উদ্ধারের ব্যাপারে।'

বলে ফেলো, শুনি, মনে মনে বলেছে রানা।

'আমি যখন কেবিনে আটকে ছিলাম, তখন আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম আপনি নেভিতে আছেন কি না। আপনি বলেছিলেন আপনি একটা সিকিউরিটি কোম্পানির কাজ করেন। আপনাদের কাজ জলদস্যুদের ধরে দেয়া। ...একটু খুলে বলবেন?'

জোনাথন উইলকিন্স ইতিমধ্যে অ্যাম্বুলেন্সের জাম্প সিটে বসে পড়েছে, মনে হয়েছে প্রশ্নের জবাবটা শুনতে চায় সে। একটু ঝুঁকে কান পেতেছে।

লোকটাকে একবার দেখেছে রানা, জুডির চোখে চোখ রেখেছে। 'সত্যি কথা বলিনি।'

'তা-ই কী?' বুকে দু'হাত ভাঁজ করেছে জুডি।

লাজুক হেসেছে রানা। 'মিথ্যে বলেছি। তখন যদি বলতাম আমি একটা জং-ধরা পুরোনো ফ্রেইটারের ক্যাপ্টেন—হঠাৎ করে আমাদের মাছ-ধরা সোনার-এ আপনাকে ধরেছি, আমার ওপর বিশ্বাস রাখতে পারতেন? বিশ্বাস করতেন না যে উদ্ধার পাবেন।'

জুডি স্টিভেনসন দীর্ঘ কয়েক সেকেণ্ড রানার চোখে তাকিয়েছে, সন্দেহে দুলেছে, তারপর একটা ভ্রূ উঁচু করে বলেছে, 'মাছ-ধরা সোনার?'

'আমরা বন্দরে ভিড়লে বাবুর্চি মাঝে মাঝে ওটা দিয়ে মাছের বড় ঝাঁক খোঁজে।'

জানতে চেয়েছে উইলকিন্স, 'তা-ই যদি হয়, তা হলে সাগরের অত গভীরে কী করছিল ওটা?' তার কথায় ছিল অভিযোগ।

ঠোঁটে হাসি লটকে রেখেছে রানা। বলেছে, 'কী আর বলব, কপালটা ভাল ছিল আমার। আমরা চলেছি এমনসময় সোনারটা অ্যাভালাঞ্চের উপর দিয়ে গেল। বাবুর্চি তখন সোনারের সামনে দাঁড়িয়ে, আপনাদের জাহাজের আকৃতি দেখল। ও ভেবেছিল দুনিয়ার সবচেয়ে বড় তিমিটা দেখেছে। ব্রিজে ছিলাম তখন, দৌড়াতে দৌড়াতে এসে তিমির খবর দিল। আমি ঠিক করলাম, একবার দেখেই যাই। ঘুরে ওখানে গেলাম। অ্যাভালাঞ্চ মোটেই নড়ছিল না। শেষে মেনে নিতে হলো, ওটা কোনও দৈত্যাকার তিমি নয়। ঠিক করলাম, অক্সিজেনের ট্যাঙ্ক নিয়ে নীচে নামব।'

'ও,' জোনাথন উইলকিন্স মাথা দোলাতে বাধ্য হলো। রানাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করেনি সে।

রানা আরও নিশ্চিত হয়ে গেল, জুডি আর ওই পিঠ-আড়ষ্ট ইংরেজ মোটেই রয়েল জিওগ্রাফিক সোসাইটির সদস্য হতে পারে না। প্রথমে ভেবেছিল, এরা রয়েল নেভির সদস্য, অ্যাভালাঞ্চ কোনও গুপ্তচর ভেসেল—ওরা উত্তর কোরিয়া বা

রাশার প্রশান্ত মহাসাগরের ফ্লিটের উপরে নজর রাখছিল। কিন্তু পরে চিন্তা করে দেখেছে, কোনও স্পাই শিপে জলদস্যুদের হামলাটা মেলে না। একদল কমাণ্ডো অ্যাভালাঞ্চে উঠেছে, ক্রুদের হত্যা করেছে, তারপর কেউ বুঝবার আগেই চলে গেছে জাহাজ ডুবিয়ে দিয়ে। কেন? অ্যাভালাঞ্চে যারা ছিল, তারা হয়তো রয়েল নেভির প্রাক্তন নাবিক, রয়েল জিওগ্রাফিক সোসাইটির কাছ থেকে ভেসেলটা ধার নেয়া হয়। কোনও ধরনের অ্যাসাইনমেন্টে ছিল।

'তা হলে বাবুর্চিকে আমার ধন্যবাদ পৌঁছে দেবেন,' বলেছে জুডি, অ্যাম্বুলেন্সের পিছনে উঠে বসেছে। আর্দালি দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। আধ মিনিট পর রওনা হয়ে গেছে অ্যাম্বুলেন্স।

রানা, ফু-চুং, বাংলাদেশ ও ইন্দোনেশিয়ান নেভির দু'জন কমাণ্ডো হেলি-প্যাডে দাঁড়িয়ে থেকেছে। ওদের জন্য কোনও গাড়ির ব্যবস্থা নেই। কোনও গাড়িতে লিফট চাইতে হবে, নইলে ট্রেইন-স্টেশন খুঁজে বের করতে হবে। মার্ভেল ছেড়ে যে কপ্টার ওদের এখানে পৌঁছে দিয়েছে, সেটাই ভাড়া করেছে রানা, সোজা চলে এসেছে টোকিয়োতে। সোহেল আগেই চার বেড-রুমওয়ালা একটা সুইট ভাড়া করেছে। ওখানে এসে উঠেছে ওরা। তখন থেকে অপেক্ষায় আছে সবাই। অবশ্য দুই কমাণ্ডো হোটেলের বিশাল ফিটনেস সেন্টারেই কাটাচ্ছে বেশিরভাগ সময়। পায়চারি করে বেড়াচ্ছে রানা, আশা করছে অনিলের ফোন আসবে। একটা মোটা বই নিয়ে বসেছে ফু-চুং, মাঝে মাঝে চোখ তুলে রানাকে দেখছে।

'ভাল লাগছে না কিছু,' জানালা দিয়ে ঝড়বৃষ্টি দেখছে রানা। 'বিশ্রাম?' উদাস শোনাল ওর কণ্ঠ। 'নেব।'

'কখন?' বইটা নামিয়ে রাখল ফু-চুং, নরম স্বরে বলল, 'বুঝি, লাশগুলো দেখার পর মাথায় আগুন জ্বলছে তোর। আমিও একই কথা ভেবেছি, ওরা ছিল সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ। ভাল চাকরির আশায় আদম-ব্যাপারীদের কাছে ভিড়েছে। ওদের নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু যারা এসব করছে, তাদের নিশ্চয়ই পাব আমরা। তখন ওদের মরতে হবে।'

বৃষ্টির ছাঁটের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা, দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। কী যেন বলবে, কিন্তু বুক পকেটে সেল-ফোন বেজে উঠল। কল রিসিভ করল রানা, 'সোহেল, বল্।'

'আমরা এখন দ্য চুহার বিশ মাইল পিছনে,' বলল সোহেল। 'দশ মিনিট পর আমরা আন-ম্যাণ্ড এঅ্যারিয়াল ভেহিকেল আকাশে তুলব, কম আলোর ক্যামেরায় দ্য চুহার হোল্ড দেখব। এদিকে উর্বশী ওর দল নিয়ে অপেক্ষা করছে, দরকার হলে ড্রাই-ডকে উঠবে।'

'এখানে বৃষ্টি হচ্ছে। তোদের ওখানে আবহাওয়া কেমন?'

'ঠিকই আছে। কপাল ভাল যে চাঁদ নেই। সাগরে চার ফুট ঢেউ, হালকা ঝিরঝিরে বাতাস আছে। ...আরেকটা কাজে তোকে ফোন করেছি। তোদের জন্যে কয়েকটা তথ্য আছে।'

শ্বাস আটকে ফেলল রানা। 'অনিল খুঁজে বের করেছে দ্য চুহার মালিককে?'

'না। ওটা নিয়ে কাজ করছে এখনও। ফারা রাইনার চাইনিজদের অটপসি

করতে গিয়ে একটা জিনিস পেয়েছে। এখানেই আছে ও, ওর সঙ্গে কথা বল্।'

'আগে আরেকটা কথা,' বলল রানা, 'ইউএভি'র ফিডগুলো ই-মেইল করে আমার ফোনে পাঠিয়ে দিবি। ড্রোনটা দ্য চুহার ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় কী দেখায় জানতে চাই।'

'ঠিক আছে। ...ফারার সঙ্গে কথা বল্।'

ডক্টর রাইনারের কণ্ঠ শুনল রানা, 'টোকিয়ো আগের মতই আছে তো, রানা?'

'সুশি আগের মত গরম থাকে, আর গেইশারা ঠাণ্ডা,' বলল রানা।

'মেয়েরা একটু ঠাণ্ডাই হয়,' বলল ফারা। চট্ করে কাজের কথায় চলে এল, 'মনে হচ্ছে কয়েকটা লাশের পরিচয় জেনেছি। ওরা সবাই চাইনিজ। একই গ্রামের মানুষ। গ্রামটা ফুজিয়ান প্রভিন্সের, নাম শিচেন। সাতজন সম্ভবত একই একান্নবর্তী পরিবারের।'

অবাক হলো রানা, ফারা এত দ্রুত রিসার্চ করল কী করে? জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ওদের ডিএনএ পরীক্ষা করেছ?'

'না। ওদের একজনের কাছে ডায়েরি ছিল, পড়েছি ওটা। পানিতে ভিজে কয়েকটা পৃষ্ঠা নষ্ট হয়ে গেছে, আর পড়া যায় না; তবে সবকিছু স্ক্যান করে কম্পিউটারে দিয়েছিলাম—যদি ট্র্যান্সলেটার কিছু বোঝে। ডায়েরির মালিকের বংশ—গাওলুং। তার সঙ্গে ছিল ছয় কাযিন। এক আদম-ব্যাপারী ওদের বলে জাপানে পাঠিয়ে দেবে। সেই লোকের নাম—সিয়েন লাউ। এরা শহর ছেড়ে রওনা হওয়ার আগে প্রত্যেকে এই লাউ-এর কাছে পাঁচশো ডলার দিয়েছে। চুক্তিতে ছিল টোকিয়োর বাইরে একটা টেক্সটাইল মিল-এ পৌঁছে দেয়া হবে, তখন বাকি পনেরো হাজার ডলার শোধ করতে হবে।'

'শিরি-ফোরের ব্যাপারে কিছু লিখেছে? ওরা ভেবেছিল ওটাই ওদের জাপানে নিয়ে যাবে?'

'জানি না। হয় অভিযানের ব্যাপারে কিছু লেখেনি, না হলে পানিতে কালি জাবড়ে গেছে।'

'আর কিছু পেলে?'

'বলার মত তেমন কিছু নয়। যুবকের নাম আনজি। নিজের স্বপ্নের কথা লিখেছে, একদিন তার হাতে অনেক টাকা জমবে, জাপানে নিয়ে যাবে প্রেমিকাকে—এসব।'

জানালার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। 'শহরের নামটা কী যেন বললে?'

'শিচেন।'

'শিরি-ফোর বা দ্য চুহা আগে কী করেছে না জানলেও, চিনের ওই শহরে গেলে জানা যাবে মানুষগুলো কোথায় যায়,' চট্ করে ফু-চুঙের দিকে তাকাল রানা। এদিকের সব কথাই শুনেছে ফু-চুং, ওর তীক্ষ্ণ চোখ বলে দিল, বাকিটা আন্দাজ করে নিয়েছে। 'ফারা, পরে তোমার সঙ্গে কথা বলব,' বলে ফোন রেখে দিল রানা।

'এত কড়াকড়ির মধ্যেও আদম-ব্যাপারীরা চিন-এ বসে মানুষ উধাও করছে,' তিক্ত হাসল লিউ ফু-চুং।

'এরা বিরাট একটা দলের সামান্য অংশ,' বলল রানা। 'সাপের মাথাটা কাটতে হবে, নইলে মানুষ পাচার ঠেকানো যাবে না।'

'আমি প্রথম ফ্লাইট ধরে বেইজিঙে ফিরব,' বলল ফু-চুং।

'ফুজিয়ান প্রভিন্সের শিচেন গ্রামে যেতে হবে তোর,' বলল রানা। 'ওখানে আছে সিয়েন লাউ নামের এক পাচারকারী।'

'ফুজিয়ানের বেশিরভাগ মানুষ নিজেদের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে,' বলল ফু-চুং। 'ওখানে গিয়ে চুপচাপ থাকতে হবে। সিয়েন লাউকে খুঁজে বের করে নেব।'

'এদিকে দ্য চুহার ব্যাপারে কী করা যায় দেখব আমরা,' বলল রানা। 'মনে হচ্ছে মানুষ-পাচার আর জলদস্যুতা একইসঙ্গে চলছে।'

'আমারও তা-ই ধারণা,' বলল ফু-চুং, 'দুটো ব্যাপার মিলে মিশে আছে। যেকোনও একটা রহস্যের জট খুলে গেলে পুরো অঙ্ক মিলে যাবে।'

অপারেশন্স সেন্টারের প্রকাণ্ড স্ক্রিনে আঁধার সাগর বিদঘুটে লাগছে। ফেনাগুলো নিচু ঢেউয়ের মাথায় তৈরি হচ্ছে, মনে হচ্ছে সবুজ বিদ্যুৎ-শিখা ঝলসে উঠছে। পরমুহূর্তে কালো জলরাশিতে আলো দূরে ছিটকে যাচ্ছে। দেখলে মনে হয় ক্যামেরার অপটিক্স কোনও ছন্দে সাগরের পাল্‌স্ মাপছে। দৃশ্যটা ঝাঁকি খেল, পাইলট আলম সিরাজ বিড়বিড় করে কী যেন বললেন।

মাসুদ রানা দ্য মার্ভেল অভ গ্রিস বুঝে নেয়ার পর নিজেই পছন্দ মত যোগ্য লোক নিয়েছে। তাদের একজন বাংলাদেশ এয়ার ফোর্স-এর (অবঃ) ক্যাপ্টেন আলম সিরাজ। কলিগরা বলেন, তাঁর যোগ্যতার অভাব নেই, তবে মানুষটা তিনি একটু ক্ষ্যাপাটে। কিছুদিন আগে সত্যিই এই অবিবাহিত ক্যাপ্টেন চাকরিতে রিজাইন করলেন—তাঁর নাকি সত্যিকারের রোমাঞ্চ দরকার, কোনও ট্রলার কিনে একা চলে যাবেন সাগরে। রানা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে, ওর চাহিদা সম্পর্কে জানায়, বলে সাগরে একটা অভিযানে গেলে কেমন লাগবে তাঁর—তাতে সাগরে ঘোরাও হবে, আবার আকাশেও ঘোরা চলবে। ভদ্রলোক ভেবে দেখার সময় নেন, তার দু'দিন পরে মার্ভেলে জয়েন করেন।

মার্ভেলের রবিনসন আর-ফোরটিফোর হেলিকপ্টারটা বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে তাঁকে। তাঁর দায়িত্বে আরও আছে দুটো ইউএভি—আন-ম্যানড্ এঅ্যারিয়াল ভেহিকেল। ওগুলো মার্ভেলের পোর্ট-রেইলের পাশে রেখে আকাশে তুলে দেয়া যায়। আমেরিকান আর্মি তাদের শিকারি ড্রোনের পিছনে অন্তত দুই মিলিয়ন ডলার খরচ করে, কিন্তু সেই একই জিনিস এক লাখ ডলারে তৈরি করে লাল চিন। লো-লাইট ক্যামেরা সহ রিমোট কন্ট্রোল্ড প্লেন—সবই আমেরিকানদের ড্রোনকে টেক্কা মারতে পারবে। ড্রোন দুটো লিউ ফু-চুং জোগাড় করে দিয়েছে, টাকা অবশ্য চ্যাপ্রো পাপাগোপালাই দিয়েছেন। তাঁর অনেক শখ ছিল ওগুলোর, রানার কাজ শেষ হলে ওগুলো তাঁর সংগ্রহে রাখবেন, ঘুড়ির মত উড়িয়ে খেলবেন।

ক্যাপ্টেন সিরাজ এখন অপারেশন্স সেন্টারে একটা কম্পিউটারের সামনে বসে আছেন, একটা ড্রোনের জয়-স্টিক নিয়ে কাজ করছেন। এই ড্রোনটা মার্ভেলের

পনেরো মাইল র‍্যাডিয়াস ঘুরে দেখতে পারে।

ভিডিও লিঙ্ক-এর ফলে ক্যাপ্টেন সামনে ও নীচে দেখতে পাচ্ছেন। চ্যাং-হো ক্যামেরাটা ইউএভি-র নাকে বসে আছে, কিন্তু আপড্রিফট বা ক্রস উইণ্ড জানাতে পারবে না। আন্দাজ করা যাবে না পাঁচ ফুটি প্লেনটা কী অবস্থায় আছে এখন। ড্রোন হঠাৎ জোর বাতাসের টানে পড়ে গেছে। ক্যাপ্টেন সিরাজ জয়স্টিক একটু পিছিয়ে নিলেন, দ্রুত উপরে উঠতে চাইলেন। 'রেঞ্জ কী?' উর্বশীর কাছে জিজ্ঞেস করলেন।

রেইডারের দৃশ্য মনিটর করছে উর্বশী। জানাল, 'আমরা দ্য চুহার চার মাইল পিছনে, তিন মাইল পোর্টে আছি।'

ইউএভি এতই ছোট যে মার্ভেলের শক্তিশালী সার্চ রেইডার ওটাকে খুঁজে পাবে না। তবে রেইডারের রিপিটার স্ক্রিনে মস্ত ড্রাই-ডক আর ওটার দুই টাগ-বোট পরিষ্কার দেখা গেল।

সিরাজ থাম্ব কন্ট্রোল নেড়ে ক্যামেরা প্যান করলেন। সাগরের বুকে অজস্র সবুজ রেখা দেখা গেল। আরও সামনে সাগর অন্ধকার, তারপর আরও দূরে একটা উজ্জ্বল এমারেল্ডের রেখা দেখা গেল।

'ওই যে,' খামোকা বলে উঠল কে যেন।

উজ্জ্বল রেখাটা দক্ষিণে চলেছে। ওটার একটু সামনে রয়েছে দুটো ফুলস্টপ। ওগুলো টাগ-বোট। পিছনে জ্বলছে সার্চলাইট। দুই টাগ-বোট ড্রাই-ডকের পাঁচ হাজার ফুট সামনে, বোঝা টেনে নিয়ে চলেছে। ড্রাই-ডকের দু'পাশে কম উজ্জ্বল সার্চ-লাইট আছে, তবে হোল্ডে কোনও আলো নেই। ওখানে গাঢ় অন্ধকার জমেছে।

'ক্যাপ্টেন সিরাজ, আমাদের নিয়ে চলুন,' শান্ত স্বরে বলল সোহেল। কানে সেল-ফোন ধরল ও। 'রানা, দেখছিস নিশ্চয়ই?'

হোটেলের রুমে বসে আছে রানা, জানাল, 'না দেখার মতই। এক ইঞ্চি স্ক্রিনে পরিষ্কার দেখা যায়?'

'আগে আমি অনেক ওপর দিয়ে যাব,' বললেন সিরাজ। জয়স্টিক নাড়ছেন। 'কিছু না দেখলে ইঞ্জিন বন্ধ করে গ্লাইড করতে হবে।' চট করে সোহেলের দিকে তাকালেন। 'পরে ইঞ্জিন রি-ফায়ার না করলে কিন্তু ইউএভিটা হারাতে হবে।'

'শুনেছি আমি,' বলল রানা। 'কিন্তু এখন আমরা বিস্ময়ের সুযোগটা নষ্ট করব না। পরে আমাদের টিম ড্রাই-ডকে উঠতে পারবে। ঠিক আছে, দরকার হলে উনি সাগরে ইউএভি ফেলে দেবেন।'

বক্তব্যটা শুনেছে সোহেল, ক্যাপ্টেনকে জানিয়ে দিল।

ইউএভির গতি অনেক কমিয়ে আনলেন সিরাজ, তবুও দুটো টাগ-বোট পিছনে পড়ে গেল। উপরে তাকালে খুদে কালো প্লেন দেখা যাবে না। ড্রাই-ডকের অনেক উপর দিয়ে যাবে ওটা। তবে কেউ কান পাতলে ইউএভি-র ইঞ্জিনের তীক্ষ্ণ আওয়াজ শুনতে পাবে। প্লেনটা ঘুরে ড্রাই-ডকের স্টার-বোর্ডের পাঁচশো ফুট উপরে চলে এল। ক্যামেরা প্যান করলেন সিরাজ। দেখতে না দেখতে ড্রোনটা আটশো ফুট পেরিয়ে গেল।

ভেসেলটা দেখে একটা দুর্গ মনে হলো, ওটা যেন কোনও জাহাজ নয়। ওটার চারপাশে স্টিলের উঁচু দেয়াল। বো নেই বললেই চলে। একেকটা টাগ-বোট দৈর্ঘ্যে একশো ফুটের বেশি, কিন্তু ড্রাই-ডকের তুলনায় ওগুলো যেন খেলনা।

ভিডিও ক্যামেরায় যা পাচ্ছে, কম্পিউটারকে দিচ্ছে অনিল। সফটওয়্যার চিত্রগুলোকে বড় করছে, দৃশ্যগুলো পরিষ্কার তুলে ধরছে। কনট্রাস্ট বাড়াচ্ছে অনিল, ইউএভির ইঞ্জিনের কারণে যে কম্পন তৈরি হচ্ছে, সেটা কমিয়ে আনছে।

ক্যাপ্টেন সিরাজ একবার ড্রাই-ডকের উপর দিয়ে গেছেন। ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় ডেটা সংরক্ষণ করা হয়েছে, এবার অনিল মেইন স্ক্রিনে ওগুলো প্রথম থেকে দেখল।

'ওখানে কী দেখতে হবে, সেটা তো বলবি,' সেল-ফোনে বলল রানা।

'কিছুই না!' বিড়বিড় করল সোহেল। বিরাট স্ক্রিনে তাকিয়ে আছে ও।

'ওখানে আছেটা কী,' অধৈর্য হয়ে বলল রানা।

'দ্য চুহার রেইলিঙে যে বাতিগুলো জ্বলছে, সেগুলোর কারণে হোল্ডে কিছু দেখা যায় না,' বলল সোহেল। 'মনে হচ্ছে জাহাজের গায়ে বিরাট একটা কালো গর্ত আছে। আমরা আরেকবার সরাসরি ওটার উপর দিয়ে যাব।'

'আবার প্রায় ঘুরে এসেছি,' জানালেন সিরাজ। জয়স্টিকে ড্রোন নিয়ে কাজ করছেন তিনি, কিন্তু জেট-প্লেন চালিয়ে অভ্যেস হয়ে যাওয়ায় একপাশে কাত হলেন। বাঁক নিচ্ছেন!

কয়েক মিনিট পর ড্রাই-ডকের এক মাইল পিছনে পৌঁছে গেলেন তিনি। প্লেনটা এখন দু'হাজার ফুট উপরে। এবার সিরাজ ঝুঁকি নিলেন, থ্রটল বন্ধ করে ড্রোনটাকে খসে পড়তে দিলেন। মনে হলো প্লেনটা সাগরে গিয়ে পড়বে। সবাই জানে ইউএভিগুলো একটুতেই নষ্ট হয়ে যায়। আকাশে তুলতে হলে আচ্ছামত প্রপেলার ঘোরাতে হয়। নিজের ইচ্ছে হলে ইঞ্জিন দয়া করে চালু হয়।

ওরা দেখল, ওদের ড্রোন দ্য চুহার দিকে ঝাঁপ দিয়েছে। ড্রাই-ডকটা স্ক্রিনে বড় হয়ে উঠছে দ্রুত। সিকি মাইল দূরে থাকতে সিরাজ ইঞ্জিন বন্ধ করে দিলেন। দৃশ্যটা আর ঝাঁকি খেল না। নীরব প্লেন অন্ধকার রাতে নেমে চলেছে ড্রাই-ডকের দিকে। অল্টিমিটার দেখলেন সিরাজ। ড্রোনটা এখন এক হাজার ফুট উপরে। অ্যাঙ্গেল পাল্টালেন তিনি, ড্রোন ঠিক যেন তীরের মত ছুটল—বলা যায়, স্টুকা ডাইভ বোম্বার হয়ে উঠেছে। তবে নীরব।

রেকর্ডার ইমেজ ধরছে, ডিস্কে তুলছে। ইউএভি পেরিয়ে গেল ড্রাই-ডকের ভার্টিক্যাল ট্র্যানসম। সিরাজ ড্রোন সোজা করে নিয়ে এগোলেন জাহাজের কালো অংশের উপর দিয়ে। নিশ্চিত করলেন, ক্যামেরা হোল্ডের নিকষ অংশ দেখিয়েছে।

বো'র পঞ্চাশ ফুট বাকি থাকতে ড্রোনের পিছন দিক নামালেন তিনি; এয়ার স্পিড বাড়াতে চাইলেন। তেত্রিশ ফুট উপরে থাকতে কন্ট্রোলের স্টার্টার টগল টিপলেন। প্লাসমা-স্ক্রিনের মনিটরে সাগর প্রকাণ্ড হয়ে উঠল। স্টার্টার কোনও কাজ করল না, ইঞ্জিন চুপ রইল। বাধ্য হয়ে টগল রিসেট করলেন সিরাজ, আরেকবার চেষ্টা করলেন। প্লাস্টিকের প্রপেলার একবার নড়ল, কিন্তু ইঞ্জিন আর চালু হলো না।

দৃশ্যটা অদ্ভুত। মনে হলো, প্লেন অতি দ্রুত গতিতে নামছে, অথবা সাগর উপরে উঠে এসে খপ্ করে ধরে নামিয়ে নিল ওটাকে। ক্যাপ্টেন সিরাজ চেহারা কুঁচকে ফেললেন। পরমুহূর্তে কালো হয়ে গেল স্ক্রিন।

সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাতের আঙুল ফোটালেন সিরাজ, ভ্রূ কুঁচকে সবাইকে দেখে নিয়ে বললেন, 'একটা কথা কী, সবাই বলে, যে ল্যাণ্ডিং শেষে হেঁটে-চলে সরে যাওয়া যায়, সেটা খুব ভাল ল্যাণ্ডিং।'

সবাই জানে, ক্যাপ্টেনের কিছু করবার ছিল না। একইসঙ্গে ড্রোন চালিয়েছেন তিনি, আবার ক্যামেরাও নিয়ন্ত্রণ করেছেন।

একটু আগে দেখা দৃশ্যগুলো স্ক্রিনে আরেকবার আনল অনিল।

স্যাটালাইট লিঙ্কে রানা জানতে চাইল, 'তোরা কী দেখলি?'

'এক মিনিট, অপেক্ষা কর্,' বলল সোহেল। 'স্ক্রিনে আবারও দেখতে পাবি।'

দ্বিতীয়বারে ইঞ্জিন বন্ধ ছিল, যে-কারণে ক্যামেরা কাঁপেনি—কিন্তু ওরা যা আশা করছে, সেটা দেখতে পেল না। বোঝা গেল, ড্রাই-ডকের পুরো হোল্ড ঢেকে রেখেছে কোনও ধরনের কাপড়। জিনিসটা সম্ভবত একটা প্রকাণ্ড কাভার। শক্ত কিছু নয়। জায়গায় জায়গায় বাতাস কাপড় নাড়িয়েছে। ড্রাই-ডক যা-ই সঙ্গে নিয়ে যাক, সেটা ঢাকা রয়েছে। দেখবার কোনও উপায় ছিল না।

'তোর কী মনে হয়, সোহেল?' জানতে চাইল রানা।

'কালো কাপড় দিয়ে হোল্ড ঢেকে রেখেছে,' বলল সোহেল। 'এখুনি রওনা দিচ্ছে উর্বশী। দেখে আসবে কী আছে ওখানে।'

ইতিমধ্যে কন্ট্রোল রুমের পিছনের দরজায় চলে গেছে উর্বশী, ফু-চুং না থাকলে এ-ধরনের অপারেশনে ওরই নেতৃত্ব দেওয়ার কথা। কালো কমব্যাট ইউনিফর্ম পরে আছে ও, একটু আগে বুলেট ভেস্ট পরে নিয়েছে—লম্বা চুলগুলো ঢাকা পড়েছে কালো ক্যাপে। বেরিয়ে যাওয়ার আগে বলল উর্বশী, 'মিস্টার আহমেদ, রানাকে বলুন, আমরা দেখতে চললাম।'

দ্রুত পায়ে স্টার-বোর্ডের ওয়াটার-লাইনে চলে এল উর্বশী। এ-ধরনের জরুরি সময় তিনজনের একটা টিম তৈরি থাকে। ওরা অ্যাকুয়া গ্যারাজে একটু আগে পৌঁছেছে। ইনফ্লেইটেবল বোট সাগরে নামিয়ে রওনা দেবে।

তিন কমাণ্ডো উর্বশীর জন্য অপেক্ষা করছে। তাদের একজন নেত্রীর হাতে কমব্যাট হার্নেস ধরিয়ে দিল। উর্বশী সাইলেন্সার ফিট করা গ্লক পিস্তলটা পরীক্ষা করল। মুহূর্তের নোটিশে একটানে বের করবে বলে ওর পিস্তলে কোনও সেফটি ক্যাচ নেই। ওরা ভাবছে না ড্রাই-ডকে এত রাতে কোনও গার্ড থাকবে, তবুও সাবধান হওয়া উচিত। থ্রোট মাইক ও ট্যাকটিকাল রেডিয়ো পরখ করল উর্বশী, কানে গুঁজে নিল ইয়ার-পিস। চারজন পরস্পরের সঙ্গে কথা বলল ওরা, আলাপ করল অপারেশন্স সেন্টারে সোহেলের সঙ্গে। কমিউনিকেশন ঠিকই আছে।

গ্যারাজের দরজায় লাল বাতি জ্বলছে। সেই আলোয় উর্বশী কালো ক্যামোফ্লেজ পেইন্ট হাতে-মুখে লাগিয়ে নিল, পরল কালো গ্লাভ্স্। ওদের ইনফ্লেইটেবল বোট যথেষ্ট বড়, আটজন যাত্রী এঁটে যায়। বড়সড় কালো আউটবোর্ড ইঞ্জিনটা শক্তিশালী, ফোর-স্ট্রোক। ওটার পাশেই আছে একটা

ব্যাটারি-চালিত মোটর, ওটা নিঃশব্দে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে—প্রয়োজন হলে প্রায় দশ নট গতি তোলা যায় ওতে। বোটের ফ্লোরবোর্ডে আরও তোলা হয়েছে জরুরি টুকটাক জিনিসপত্র।

এক কার্গো-মাস্টার কমাণ্ডোদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রগুলো পরীক্ষা করে দেখল, তারপর হাতের ইশারায় উর্বশীকে জানিয়ে দিল—সব ঠিক আছে। জবাবে মাথা দোলাল উর্বশী। এবার এক নাবিক বাতি নিভিয়ে দিল। একটা কেব্‌ল্ সিস্টেম জাহাজের গা থেকে দশ-বাই-আট ফুট প্লেটিং সরিয়ে দিল। দরজাটা খুলে যাওয়ায় সামনে সাগর দেখা গেল। হিসহিস করছে সাগর। উর্বশী হাওয়ায় লবণের গন্ধ-স্বাদ পেল। আকাশে চাঁদ নেই বললেই চলে। সামান্য আলো। অন্ধকারে দ্য চুহার দেহ আবছা লাগছে। সামনে জ্বলছে টাগ-বোটের ফ্লাড-লাইট, সেই আলোয় বিরাট জাহাজটা অদ্ভুত লাগছে। ওটার উপরের ডেকে দূরে দূরে সোডিয়াম আর্ক ল্যাম্প জ্বলছে। তাতে অন্ধকার যায়নি।

জোডিয়াক ইনফ্লেইটেবল বোটের পাইলট বাটন টিপে ইঞ্জিন চালু করল। দু'পাশ থেকে বোট টেনে সাগরে নামাল উর্বশী ও দুই কমাণ্ডো, চটপট উঠে পড়ল জলযানে। মার্ভেলের গা ছেড়ে দ্রুত সরে গেল জোডিয়াক।

একটু আগে মার্ভেলের ডেকের ক্যামেরায় দেখেছে ওরা, ওদের জাহাজ ও দ্য চুহার মাঝে অল্প দূরত্ব রয়েছে। কিন্তু সাগরে বেরিয়ে এসে মনে হলো, ওই দুই জাহাজের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। সাগরে বড় ঢেউ নেই, জোডিয়াক সহজেই ঢেউ উতরে এগিয়ে চলেছে। আউটবোর্ড ইঞ্জিনে সাইলেন্সার রয়েছে, তবুও আওয়াজটা উর্বশীর কানে অতিরিক্ত লাগল। যদিও ও জানে এটা ফুলস্পিডে চালালেও এক মাইল দূর থেকে কিচ্ছু শোনা যাবে না।

মার্ভেল ছেড়ে আসবার দশ মিনিটের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ পথ পেরিয়ে এল ওরা। পাইলট এবার আউটবোর্ড ইঞ্জিন বন্ধ করে নিঃশব্দ ইলেকট্রিক মোটর চালু করল। উর্বশীর নির্দেশে অলক্ষে ওঠা যায় এমন অন্ধকার জায়গার খোঁজে দ্য চুহার স্টার্ন ঘুরে স্টারবোর্ড সাইডে চলে এল সে।

ড্রাই-ডক তিন নট গতিতে এগিয়ে চলেছে। জাহাজের স্টেম থেকে শুরু করে স্টার্ন পর্যন্ত—মনে হয় ধূসর স্টিলের কোনও দেয়াল। রেইলিঙের এখানে-ওখানে বাতি জ্বলছে, ওগুলো প্লেটিং আলোকিত করছে। জাহাজের মাঝখানে এসে একটা অন্ধকার জায়গা পাওয়া গেল। রেইলিঙের ওই জায়গায় বাল্‌ব্ নষ্ট হয়ে গেছে। জাহাজের গায়ের কাছে চলে গেল পাইলট। জাহাজে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসছে ঢেউ—দুলছে জোডিয়াক মাতালের মত। মোটরের টগল নিয়ে ব্যস্ত হলো পাইলট, একই জায়গায় রাখতে চাইছে বোটটাকে।

'গ্র্যাপল,' থ্রোট মাইকে জানাল উর্বশী।

কমাণ্ডোদের একজন বিদ্‌ঘুটে একটা অস্ত্র কাঁধে তুলল। জিনিসটা দেখতে রাইফেলের চেয়ে দেড়গুণ বড়। পিস্তল-গ্রিপের সঙ্গে রয়েছে একটা হোস-পাইপ, ওটার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে একটা সিলিণ্ডার। সিলিণ্ডারটা জোডিয়াকের মেঝেতে নামিয়ে রাখা হয়েছে। কমাণ্ডো এবার রাইফেলের বাড়তি অংশের লেজার রেঞ্জ ফাইণ্ডার অ্যাকটিভেট করল, মুহূর্তের জন্য রাইফেলটা আকাশে তাক করল। এবার

দ্য চুহার রেইলিঙের উপরের দিকে সাইট সেন্টারিং হলো।

ফিসফিস করে বলল সে, 'আটষট্টি ফুট।'

তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে আরেকজন, সে পিচ্চি একটা লাল লেন্সওয়ালা ফ্ল্যাশ-লাইট জ্বালল। সিলিণ্ডারের মুখের কাছে লাগানো ভালভ-এ নম্বর ডায়াল করল তারপর শুটারের একহাতে টোকা দিল।

রাইফেলওয়ালা কমাণ্ডো শ্বাস নিয়ন্ত্রণ করল, জোডিয়াকের নড়া অনুভব করল, অপেক্ষা করল। বোট ঢেউয়ের দুলুনিতে উঠুক আগে। জোডিয়াক ঢেউয়ের মাথায় চড়তেই আস্তে করে ট্রিগার চাপল সে।

যতটুকু দরকার, কম্প্রেসড্ নাইট্রোজেন সিলিণ্ডার ছেড়ে বেরল, এর ফলে অস্ত্র ছেড়ে বেরিয়ে গেল বেঁটেমত একটা রাবার-কোটেড তীর। তীরের পিছনে ছোট একটা পুলিতে জড়ানো আছে এক মিলিমিটার পুরু ন্যানো-ফাইবার। গন্তব্যে পৌঁছে তীরের শরীর একটা গ্র্যাপলিং হুক হয়ে গেল। হুকটা রেইলিঙের এক ইঞ্চি পাশ দিয়ে ওপাশে গিয়ে পড়ল। ধাতব ডেকে কোনও শব্দ হলো না।

রাইফেলধারী কমাণ্ডো অস্ত্রটা নিচু করল, সুতো দুটো সাবধানে টেনে ড্রাই-ডকের রেইলিঙে আটকে দিল হুক। ফিসফিস করে বলল, 'ধরেছি মাছ!'

তার সঙ্গী গ্র্যাপলিং গানের ন্যানো-ফাইবার রিলটা খুলে নিল, একটা সুতোর সঙ্গে আটকানো স্ন্যাপ লিঙ্কে শক্ত নাইলন দড়ি বেঁধে দিল। এবার দ্রুত হাতে অপর সুতোটা টেনে ফিরিয়ে আনতে শুরু করল বোটে। ফলে উপরে উঠে যাচ্ছে নাইলনের দড়িটা। তিরিশ সেকেণ্ড পর গ্র্যাপলের গোড়ায় লাগানো পুলির ভিতর দিয়ে ফিরে এল নাইলনের দড়িটা। দড়ির একটা মাথা সে জোডিয়াকের বো'র একটা আংটার ভিতর দিয়ে ঘুরিয়ে আনল। একই কাজ করল পাইলট, সে স্টার্নের আংটার ভিতর দিয়ে ঘুরিয়ে শক্ত করে ধরল দড়ির অপর মাথাটা। এবার পুরুষরা দু'পাশ থেকে গায়ের জোরে দড়ি টানতে শুরু করল। ধীরে ধীরে পানি ছেড়ে উঠে গেল জোডিয়াকটা দুই ফুট উপরে। সবাই মিলে জোডিয়াকটাকে আরেক ফুট উপরে তুলল। একটু বিশ্রাম নিল, তারপর একই কাজ করল আরও তিনবার। এবার দুইপাশের দুই আংটার সঙ্গে শক্ত গিঁঠ দিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় আটকে দিল বোটটাকে। এবার ওরা নিশ্চিত, বড় ঢেউ এলেও ডুববে না জোডিয়াক। এখন আর ঢেউয়ে ঢেউয়ে জাহাজের সঙ্গে ঘষা বা ধাক্কায় রাবারের শরীর ছিঁড়ে যাবে না।

যে-যার পিস্তল পরীক্ষা করে নিল, নিশ্চিত হলো চেম্বারে গুলি আছে, ম্যাগাজিনটাও ভরা। এবার একে একে দড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল। প্রথমজনকে কাভার দেবার পর রেইলিং টপকাল দ্বিতীয়জন। তারপর রওনা হলো উর্বশী। ইয়ারফোনে শুটারের কণ্ঠস্বর শুনল ও, 'অল ক্লিয়ার। আসুন, ম্যাডাম।'

ডেকের কাছাকাছি পৌঁছে নীচে তাকাল উর্বশী। ওর পর আসছে পাইলট। অনেকটা নীচে জোডিয়াকটা দেখা গেল, দ্য চুহার গা ঘেঁষে আছে। ঠিক যেন একটা সীলের বাচ্চা, মায়ের গায়ে মিশে দুধ পান করছে। আরেকটু নীচে দুলছে সাগর।

একজোড়া হাত উর্বশীকে ধরে রেইলিঙের উপর দিয়ে ছেঁচড়ে পার করিয়ে

দিল। স্তনে কোনও বাড়তি চাপ লাগেনি বলে কপালকে ধন্যবাদ দিল উর্বশী। ভারী ফ্ল্যাক ভেস্ট ওকে রক্ষা করেছে। মনে মনে বলল: ফারা রাইনার আটত্রিশ ব্রা পরে, ও হলে বুকে খুব ব্যথা পেত। পরমুহূর্তে হেসে ফেলল:- ও এখানে আসতে যাবে কেন, ও তো ডাক্তার। সে কি ফারা মেয়েটিকে হিংসা করে? কেন? রানা ওর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে, হেসে কথা বলে... তাই?

শেষ কমাণ্ডো রেইলিং টপকানো পর্যন্ত একটা অর্ধচন্দ্র আত্মরক্ষা ব্যূহ তৈরি করল তিনজন। এবার শ্যুটার তার গ্র্যাপলিং হুক থেকে খুলে জোডিয়াক আটকে রাখা দড়িগুলো একটা বিশেষ কাপলিঙে আটকাল। ওরা যখন আবার নেমে যাবে, তখন ওই কাপলিঙের কারণে এক টানে দড়ি খুলে নিতে পারবে।

দ্য চুহার উপরের ডেকে কেউ নেই। অবশ্য ওটাকে ডেক বলা উচিত নয়, বরং বলা উচিত একটা দশ ফুট চওড়া ক্যাটওয়াক। ওই ক্যাটওয়াক পুরো জাহাজ ঘিরে রেখেছে। কর্কশ কাপড় জাতীয় কিছু হোল্ড ঢেকে রেখেছে, সেটা না থাকলে ডেক দেখে মনে হতো ওটা কোনও লৌহ দুর্গের প্যারাপেট। কাভারের দিকে এগিয়ে গেল উর্বশী। ওটা কাপড় কি না, নিশ্চিত হতে পারল না। মনে হলো প্লাস্টিকের ফাইবার দিয়ে তৈরি। বড় কোনও তাঁবুর উপরে ক্যানভাস যেমন করে টাঙানো হয়, জিনিসটা সেভাবে হোল্ডের উপরে শক্ত করে টেনে সেঁটে দেয়া।

কমাণ্ডোদের একজন বুটের খাপ থেকে একটা নীলচে গার্বার ছুরি বের করল, ফ্যাব্রিক কাটবে। হাত তুলে ঠেকাল উর্বশী, ইশারায় শ্যুটার ও তার সঙ্গীকে প্যারাপেট ধরে এগিয়ে অ্যাফ্‌ট্‌-এর দিকে সার্চ করতে বলল। নিজে পাইলটকে নিয়ে এগিয়ে গেল সামনে। হাতের ইঙ্গিতে দুশো চল্লিশ ফুটি হোল্ডের একটা জায়গা দেখাল ও, ওরা চারজন ওখানে মিলিত হবে।

পিস্তলটা বের করে নিল উর্বশী। ডেকে নাইট ভিশন গিয়ারের সাহায্য পাবে না ওরা, সে-তুলনায় আলো অনেক বেশি, আবার এতটা আলো নেই যে সব পরিষ্কার দেখা যাবে। কপাল ভাল যে ক্যাটওয়াকে খুব কম জায়গা আছে, যেখানে সেন্ট্রি থাকতে পারে। কয়েকটা জায়গায় ভেন্টিলেশন ডাক্ট বা মেশিনারিজ হাউজিং আছে। ওখানে আড়াল নেয়া যাবে। স্টার-বোর্ডের রেইলিঙের পাশ দিয়ে নিঃশব্দ পায়ে এগোল উর্বশী। পিস্তল কোমরের পাশে উদ্যত, ওর চোখ সামনের ছায়াগুলো দেখছে। স্বাভাবিক ভাবে শ্বাস নিচ্ছে ও, কিন্তু বুকের মধ্যে লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। হাঁটতে হাঁটতে ভাবল, ওর দলের কমাণ্ডোরা যদি ট্যাকটিকাল রেডিয়োতে বুকের এই আওয়াজ পেত, তা হলে কী হতো! পিছন ফিরে দেখল সতর্ক পায়ে অনুসরণ করছে ওকে জোডিয়াকের পাইলট, হাতের অস্ত্র তৈরি, ওকে কাভার করছে।

বো'র কাছে একটা চৌকো বড় ঘর, সম্ভবত ওখানে ব্যালাস্টের মেশিনারি ও ডোর কন্ট্রোল আছে। প্রথমে মনে হলো ওই ঘরে কেউ নেই, কিন্তু উর্বশী খেয়াল করল, ওখানে কয়েকটা বদ্ধ জানালা রয়েছে—কাঁচগুলো কালো রং করা। সাগরের হাওয়ায় শার্শিগুলো শীতল হয়ে আছে। কান পাতল উর্বশী, গালে ঠাণ্ডা লাগল। ভিতর থেকে কয়েকজনের গলার আওয়াজ শোনা গেল, কিন্তু বক্তব্য বোঝা গেল না। কোন্ ভাষায় কথা হচ্ছে? জানবার উপায় নেই। তবে লোকগুলো যে ভিতরে

আছে, এতে কোনও সন্দেহ নেই। চারজন। পুরুষ। এক হাত উপরে তুলল উর্বশী, চার আঙুল দেখাল পাইলটকে।

মাথা দোলাল সে।

দেরি না করে চৌকো ঘর পার হয়ে গেল ওরা। খেয়াল রাখল একমাত্র দরজাটার দিকে। প্রকাণ্ড একটা ভেন্টিলেশন হুডের আড়ালে চলে এল ওরা। হঠাৎ করে ঘরের দরজা দড়াম করে খুলে গেল। এক লোক বেরিয়ে এল আঁধারে। ঘড়ি দেখল উর্বশী। আড়াইটা বাজে। লোকটা অসময়ে টহল দিতে বেরিয়েছে। এবার বেরিয়ে এল আরেকজন! এদের পরনে কালো ইউনিফর্ম, গলার স্লিঙে ঝুলছে কম্প্যাক্ট সাব-মেশিনগান। অস্ত্রের মডেল চিনতে পারল না উর্বশী, কিন্তু স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র আছে, সেটা বোঝাই যথেষ্ট এখন—গোলাগুলি শুরু হলে মারাত্মক বিপদে পড়বে ওরা। পিস্তল দিয়ে সাব-মেশিনগান সামলানো যাবে না। উর্বশী অনুমান করল, এরা সম্ভবত আর্মিতে ছিল, এখন মার্সেনারি হয়ে গেছে, জলদস্যুদের নেতা এদের টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছে। এরাই অ্যাভালাঞ্চে হামলা করেছে, রিসার্চারদের মেরে জাহাজটা ডুবিয়ে দিয়েছে।

প্রথমে যে-লোক বেরিয়ে এসেছে, সে সঙ্গীকে কী যেন বলল। উচ্চারণ শুনে উর্বশীর মনে হলো, লোকটা রাশান বা কোনও স্লাভিক ভাষা বলছে। রানা এখানে থাকলে বুঝতে পারত। সঙ্গীকে নিয়ে ভেন্টিলেটরের গাঢ় অন্ধকারে সরে গেল ও। লোকগুলো ওদের পাশ কাটিয়ে গেল। দ্রুত হাঁটছে। বামহাতে ধরে রাখা টর্চ। দূরে গিয়ে পড়া আলোর দিকে চোখ রাখছে। ডানহাত খালি, মুহূর্তে সাব-মেশিনগান নামিয়ে গুলি ছুঁড়বে। প্রতি দশ পা এগিয়ে রেইলিঙের পাশে থামছে, ড্রাই-ডকের হাল-এ আলো ফেলছে, তারপর টর্চ ফিরিয়ে হোল্ড ঢেকে রাখা কাভারটা দেখছে। উর্বশী বুঝতে পারছে, লোকগুলো কোনও ভুল করছে না, ধরা পড়তে ওদের খানিকটা সময় লাগবে, কিন্তু ধরা পড়তে হবেই। ড্রাই-ডকের গায়ে ঝুলে থাকা জোডিয়াকটা দেখলেই ঝামেলা শুরু হয়ে যাবে।

প্রহরীরা একটু দূরে চলে যাওয়ায় গলায় আটকানো মাইকে ফিসফিস করল উর্বশী, 'দু'নম্বর টিম, দু'জন গার্ড তোমাদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।'

'ঠিক আছে,' জবাব দিল ওরা।

সোহেল আহমেদ আগেই জানিয়েছে, দ্য চুহায় ওরা উঠেছে তার কোনও প্রমাণ রাখা যাবে না। সিদ্ধান্ত নিল উর্বশী, এখন আর তা সম্ভব নয়। একটু আগে গার্ডরা যখন বেরল, তখন খেয়াল করেছে ও, চৌকো ঘরের দরজা দিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া বেরিয়েছে—এখন দুই গার্ডের একজন অন্তত ধূমপায়ী হলে বাঁচা যায়।

ফিসফিস করল উর্বশী, 'আমরা জোডিয়াক যেখানে ঝুলিয়েছি, তার তিরিশ ফুট সামনে ব্যালাস্ট ট্যাঙ্কের একটা ভেন্ট আছে। ওদের ওখানে ধরব আমরা।'

'ঠিক আছে।'

'কোনও গোলাগুলি চলবে না।'

বো আবারও ঘুরে এগোতে হবে? না—উর্বশী সিদ্ধান্ত নিয়ে হাতের ইশারা করল। ওর পিছু নিল পাইলট।

দু'জন ঝুঁকি নিয়ে কাভার মোড়া হোল্ডের উপর দিয়ে এগোল। কাভারটা যদি কাপড়ই হয়, খুব শক্ত করে প্যারাপেটের সঙ্গে আটকানো হয়েছে। জুতোর তলায় অতি সামান্য দাবছে। বিশ বর্গ-ফুটের কাপড়গুলো সেলাই করে পুরো হোল্ডের কাভার তৈরি করেছে। বিশ ফুট পরপর পুরু তার দিয়ে ফ্যাব্রিক জোড়া দিয়েছে। তবে সেলাইয়ের ফাঁক দিয়ে হোল্ডের ভিতরে তাকানো সম্ভব। যে-কারণেই হোক, লোকগুলো দ্য চুহার হোল্ড ঢাকতে সময় ব্যয় করেছে।

হোল্ড আড়াআড়ি পার হলো ওরা, ভেন্টিলেটরের আড়ালে অন্য দু'জনের সঙ্গে দেখা করল। এই ভেন্টগুলো প্রকাণ্ড ট্যাঙ্ক থেকে বাতাস বের করে, বদলে টেনে নেয় সাগরের পানি—এতে ড্রাই-ডকের ওজন অনেক বেড়ে যায়। হোল্ডের মধ্যে ছোটখাটো একটা সাগর তৈরি হলে সহজেই আরেকটা জাহাজ ভিতরে ভরে নেয়া হয়। এরপর ড্রাই-ডকের পাম্পগুলো চালু হয়। জলযানের দেহে অসংখ্য নাজল রয়েছে, ওগুলো দিয়ে পানি বেরিয়ে যায়।

ওরা প্রহরীদের হাতের টর্চ লক্ষ করছে। ঘুরে এগিয়ে আসছে তারা। উর্বশীর মনে হলো ওরা এখানে সারাজীবন অপেক্ষা করছে। সময় পার হতে চায় না। তারপর লোকগুলো স্টার্ন ঘুরল, এগিয়ে এল স্টার-বোর্ডের দিকে। সোজা ওদের অ্যাম্বুশের দিকে আসছে। তবে অ্যাম্বুশে পড়তে তাদের আরও চারশো ফুট আসতে হবে। অপেক্ষায় থাকল ওরা। উর্বশী টের পেল, ওর মুখের ভিতরটা শুকিয়ে গেছে। জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল, কিন্তু ঠোঁট ভিজল না। অনুভব করল, ওর সঙ্গীরা উত্তেজিত, আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়তে তৈরি।

জোডিয়াকের দশ ফুট পিছনে প্রহরীদের একজন থেমে দাঁড়িয়ে সঙ্গীর কাঁধে চাপড় দিল। দু'জন কী নিয়ে যেন আলাপ করছে, খিকখিক করে হাসল। তারপর বামপাশের লোকটা রেইলিঙের পাশে গিয়ে প্যান্টের চেইন খুলে ঝুঁকে দাঁড়াল। প্রস্রাবের রেখা নীচের দিকে রওনা হওয়ায় নীচের দিকে তাকাল সে।

যা হওয়া উচিত নয়, তা-ই হলো। সাধারণত চলমান জাহাজে বাতাস সামনে থেকে আসে, তাতে প্রস্রাবের ধারাটা পিছনে গিয়ে পড়া উচিত। কিন্তু পিছন থেকে আসছে দশ নট গতির হাওয়া। লোকটা নিজের সৃষ্ট বৃষ্টি দেখতে ঘাড় ফেরাল। সঙ্গে সঙ্গে চমকে গেল—হাত কেঁপে যাওয়ায় আরেকটু হলে তার কাপড়ে প্রস্রাব লাগত। সঙ্গীর উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠল সে, 'আরেহ্, পাবলো!'

ড্রাই-ডকের গায়ে ঝুলে থাকা জোডিয়াকটা দেখেছে লোকটা!

উর্বশী ও তিন কর্মাণ্ডো বুঝে ফেলল, ওদের দ্রুত কাজে নামতে হবে। হাতে আর সময় নেই।

পাবলো নামের লোকটা রেইলিঙের দিকে ঘুরেও তাকাল না, সঙ্গী পানি ছাড়ছে ছাড়ুক, সে টর্চ নিভিয়ে দিয়ে হোল্ডের উপর দিয়ে সোজা ছুটল। মুহূর্তে মিলিয়ে গেল সে ঘন অন্ধকারে। কর্তৃপক্ষ সম্ভবত নির্দেশ দিয়ে রেখেছে—অস্বাভাবিক কিছু দেখলে দুই গার্ডের একজন সরে পড়বে, গার্ড-হাউজে রেডিয়ো করবে।

রেইলিঙের পাশে দাঁড়ানো লোকটার দিকে দ্বিতীয়বার তাকাল না উর্বশী, দ্বিতীয় গার্ডের পিছনে ছুটতে শুরু করে বলল, 'একে ধরুন! আমি হোল্ডে যাচ্ছি!'

সামনের লোকটা শক্ত ফ্যাব্রিক মাড়িয়ে ছুটছে, চারপাশে কম্পন তৈরি হলো। পিছনে প্রাণপণে ছুটল উর্বশী। পায়ের নীচে কাপড়টা দাবছে, দৌড়াতে গিয়ে বারবার হাঁটু মচকে যেতে চাইছে। ও জানে, ওর যা ঘটছে, তা-ই ঘটছে ওই লোকটারও। পিস্তল সহ ওর ওজন একশো নয় পাউণ্ড, কিন্তু সামনের লোকটা অন্তত আশি পাউণ্ড বাড়তি ওজন নিয়ে ছুটছে। তার কাছে মনে হবে আলগা ট্র্যামপোলিনের উপর দিয়ে দৌড়াচ্ছে। সাব-মেশিনগানের চকচকে ব্যারেল দেখতে পেল উর্বশী। লোকটার ফরসা ঘাড়ে চুলের রেখা দেখল। পিস্তলটা উঁচু করল ও।

গার্ড বুঝে ফেলেছে, তার পিছু নিয়েছে কেউ। দৌড়ের ফাঁকে উরুর খাপে থাবা দিল সে, ওয়াকি-টকি বের করবে। তারপর হাল ছেড়ে দিল, ঘুরে দাঁড়িয়ে সাব-মেশিনগান বুক সমান উঁচুতে তাক করল।

উর্বশী ছুটবার গতি না কমিয়েই উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। ওর দেহ পিছলে কাপড়ের উপর দিয়ে এগোল। পিস্তলটা বাড়িয়ে রেখেছে ও, শরীর স্থির হতেই গুলি করল।

বুলেট গন্তব্যে পৌঁছুল না, কিন্তু গার্ড ভয়ে শুয়ে পড়ল। এক মুহূর্ত চুপ করে পড়ে থাকল সে। সুযোগটা নিল উর্বশী, লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে একের পর এক গুলি করে ম্যাগাজিন খালি করল। দু'জনের দূরত্ব এখনও অন্তত পঞ্চাশ ফুট। কোনও ফায়ারিং রেঞ্জে উর্বশী এই দূরত্বে বারোটার মধ্যে এগারোটা গুলি বুল্‌স্ আই-এ লাগাবে, কিন্তু এই অন্ধকার অপরিচিত জাহাজে একটা গুলি লাগলে সেটাই অনেক বেশি। একটা বুলেট গার্ডের ডান কাঁধে গর্ত তৈরি করেছে। আরেকটু হলে হাতটা সঙ্গে নিয়ে যেত বুলেট। ভারী দেহ নিয়ে টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল লোকটা, কাঁধের সঙ্গে ঝুলে আছে অকেজো হাত। তার ইউনিফর্ম রক্তে মাখামাখি, বৈদ্যুতিক আলোয় মনে হলো রক্ত যেন কোনও ধরনের তেল। অস্ত্রটা হারিয়ে ফেলেছে সে, কিন্তু হারতে রাজি নয়, উর্বশীর দিকে তেড়ে এল।

এখন আর রিলোডের সময় নেই উর্বশীর। উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুত পায়ে ছুটল ও, লোকটার মুখোমুখি হবে। মাঝামাঝি জায়গায় মুখোমুখি হলো দু'জন। লোকটার গতি কাজে লাগিয়ে হিপ-থ্রো করতে চাইল উর্বশী। কিন্তু আহত গার্ড পাত্তা দিল না, বামহাতে ওর গলা আঁকড়ে ধরল। আছাড় খেয়ে নরম মেঝেতে পড়ল দু'জন। পড়বার সময় লোকটার এক হাঁটু উর্বশীর বুকের উপরে পড়েছে। ফুসফুসে চাপ খেয়ে দম আটকে গেল ওর। কিন্তু দ্রুত উঠতে হবে! দাঁড়াতে হবে!

দুই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রায় একইসঙ্গে উঠে দাঁড়াল। গার্ড গুরুতর আহত, কিন্তু না দমে কোমরের খাপে থাবা দিল, টেনে বের করল ছোরা। একটু আগে আহত কাঁধ টিপে ধরেছিল, এখন আঙুল থেকে রক্ত টপটপ করে ঝরল। উরুর পাশে ধরেছে ছোরা, ওটা উপরে না তুলেই শত্রুর পেটে গেঁথে দিতে চাইল। সহজেই পিছাতে পারল উর্বশী, পিস্তলটা রিলোড করতে চাইছে। কিন্তু একটু সময় দরকার ওর।

গার্ড জানে, পিস্তলধারিণী সুযোগ পেলে সে শেষ। মরিয়া হয়ে ক্ষ্যাপার মত এগিয়ে এসে ছোরা চালাল সে। আবারও পিছিয়ে গেল উর্বশী, বুঝে গেছে, আক্রমণ না করে বাঁচবার পথ নেই ওরও। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল উর্বশী, এক

পা এগিয়ে পুরো শক্তিতে সাইড কিক করল গার্ডের ডানপায়ের হাঁটুতে। ছড়-ছড়াৎ করে একটা বিশ্রী আওয়াজ শুনল ও—লোকটার কার্টিলেজ ছিঁড়ে গেছে। চিত হয়ে পড়ল গার্ড। উর্বশী না এগিয়ে পিস্তলে নতুন ম্যাগাজিন ভরল, হাতের ঝটকায় স্লাইড টেনে নিল—চেম্বারে পৌঁছে গেল বুলেট। রাশান চুপচাপ পড়ে আছে, ডান কাঁধের নীচে ছোটখাটো একটা লাল পুকুর।

সাবধানে আরেক পা এগোল উর্বশী।

রাশান গার্ড ফিসফিস করে বলল, 'নেইয়েত, স্পেসিভো!'

এগোল না উর্বশী। লোকটার বামহাত দেহের তলায় আটকা পড়েছে। তবে এখনও সে বিপদ ঘটাতে পারে। পিস্তলের বাঁটে মুঠো শক্ত করল উর্বশী। লোকটাকে এখনই মেরে ফেলা উচিত। কিন্তু একে জীবিতাবস্থায় মার্ভেলে নিয়ে যেতে পারলে জরুরি সূত্র পাওয়া যাবে।

নির্দেশ দিল উর্বশী, 'ছোরাটা দেখি।'

চেহারা দেখে মনে হলো লোকটা ইংরেজি বোঝে। খুব সাবধানে বামহাত বের করে আনছে। ডান কাঁধ নড়ে ওঠায় ব্যথায় মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল তার। উর্বশী চার ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে, ভাবছে, ছোরাটা ছুঁড়ে দেবে নাকি! না মনে হয়, সেরকম তেড়িবেড়ি দেখলে এক গুলিতে মগজ ছিন্নভিন্ন করে দেবে ও। ছোরাটা বের করে আনল লোকটা, মনে হলো ওর পায়ের সামনে ফেলবে। কিন্তু বুঝে উঠবার আগেই দ্রুত ছোরা নামিয়ে আনল রাশান, তীক্ষ্ণধার ফলা প্লাস্টিকের ফেব্রিক চিরে দিল। টানটান ফেব্রিকে ছোট্ট একটা ফুটো হলো, পরমুহূর্তে মনে হলো প্রবল ভূমিকম্প শুরু হলো—কম্পনে মাটি যেমন ফেটে যায়, প্লাস্টিকের ফেব্রিকও তেমন ফাটল। চিড়চিড় আওয়াজে ছিঁড়ছে মেঝে! রাশান মুহূর্তে উধাও হলো! আশি ফুট নীচে তার জন্য অপেক্ষা করছে হোল্ডের ধাতব মেঝে!

উর্বশী নড়বার আগেই ফাটল বেড়ে গেল। ওর ওজনে ফেব্রিক ঝুলে গেল। পরমুহূর্তে ও দেখল, উপুড় হয়ে পড়ে আছে—দ্রুত পিছলে নেমে চলেছে ক্রমবর্দ্ধমান খোঁড়লের দিকে।

এগারো

দু'হাত দু'পাশে ছড়িয়ে দিল উর্বশী, কিন্তু ওর গ্লাভ্স কোনও কাজে লাগছে না, বরং পিছলে দিল! ফেব্রিকের ফাটল বাড়ছেই! গর্তের মধ্যে গিয়ে পড়ছে ও! গহ্বরের কিনারায় পৌঁছে গেল, দু'হাতে ছেঁড়া ফেব্রিক শক্ত করে ধরল। কিন্তু ওর দেহের পতনের গতি অনেক বেশি! এক সেকেণ্ড পর গর্তের মধ্যে চলে গেল ওর মাথা। তারপর দু'কাঁধ!

চেঁচানোর সুযোগ নেই! চেঁচিয়ে লাভ কী? সরসরিয়ে নেমে চলেছে ও! ভিতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার! আশি ফুট নীচে হোল্ডের মেঝে! গর্তে কোমরটা আটকাল! ফ্যাব্রিকের দুলুনিতে ভিতরে কাঁধ-মাথা দুলছে। দু'পা ছড়িয়ে পতন ঠেকাবার চেষ্টা

করল। কিন্তু না, নেমেই চলেছে, এবার সোজা নীচে গিয়ে পড়বে ও!

গর্তে ঢুকে গেল দু'উরু! এবার পতন! কিন্তু কে যেন খুব শক্ত করে ওর বাম গোড়ালি ধরেছে! তবুও পিছলে নামছে ও! পরমুহূর্তে টের পেল, কেউ ওকে প্রাণপণে টানছে উপর দিকে! প্লাস্টিকের কর্কশ ফেব্রিক শরীরে আঁচড় কাটছে! গাল কেটে গেল। তারপর ওকে খোঁড়ল থেকে বের করা হলো!

শরীর মুচড়ে চিত হলো উর্বশী, জোডিয়াকের পাইলটের ধবধবে দাঁতগুলো দেখতে পেল ও। স্বস্তির হাসি হাসছে লোকটা!

'ভগবান!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল উর্বশী, 'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ! এক পলকের জন্যে মনে হলো...' চুপ হয়ে গেল ও।

মাথা দোলাল পাইলট। 'একটু হলেই পড়তেন।'

'দ্বিতীয় গার্ড?' জানতে চাইল উর্বশী।

'সরানো হয়েছে।'

'আচ্ছা,' দ্রুত হাতে কমব্যাট হার্নেস খুলছে উর্বশী, বলল, 'হাতে সময় পাব না আমরা, যে-কোনও সময় ওদের খোঁজ পড়বে।' বেল্ট থেকে সাসপেণ্ডার খুলল ও, ওগুলো দিয়ে আট ফুটি একটা বেল্ট বানানোর ফাঁকে বলল, 'দুই নম্বর টিম, আপনারা দ্বিতীয় লাশটা নিয়ে আসুন।'

জবাব এল, 'আসছি, ম্যাডাম।'

'আপনার হার্নেসটা দিন,' বলল উর্বশী। পাইলটের হার্নেস নিয়ে বেল্ট হিসেবে ব্যবহার করল ও, ওর দড়ির দৈর্ঘ্য বাড়ল। এক প্রান্তে একটা লুপ তৈরি করে কাঁধ গলিয়ে পরে নিল। চোখে নাইট ভিশন মনোকল্ পরল। পেরিস্কোপটার ফ্লাড-লাইটের দিকে তাকাল না আর।

দ্বিতীয় টিম চলে এসেছে, লাশটা নামিয়ে রাখল। দুটো ব্যাপার লক্ষ করল উর্বশী। এক—কেউ মৃত গার্ডের প্যান্টের চেইন আটকে দিয়েছে। দুই—গার্ডের ঘাড় মটকে ভাঙা হয়েছে। নির্দেশ দিল ও, 'আপনারা হার্নেস দিয়ে আমাকে ধরে রাখবেন।'

ক্রল করে ফাটলের পাশে চলে গেল ও। রাশান গার্ড সেলাইয়ের পাশে ছোরা বসিয়েছে। টানটান ফেব্রিকের চাপ ও-জায়গায় অনেক বেশি। ও ভেবেছিল ফেব্রিক পুড়িয়ে গর্ত তৈরি করবে, যেন অন্য গার্ডরা আন্দাজ করে দুই গার্ড জ্বলন্ত সিগারেট না নিভিয়ে চরম ভুল করেছে। কিন্তু এখন আর পোড়ানোর প্রয়োজন নেই। এই ফাটলই যথেষ্ট। গার্ডরা ধরে নেবে এরা হোল্ডের উপর দিয়ে শর্টকাট মারতে গিয়ে সেলাই ছিঁড়ে ফেলেছে। ফলে পতন!

গর্তের আরও কাছে সরে গেল উর্বশী, টের পেল ওর ওজনে ফেব্রিক ঝুলে পড়ছে। তবে সমস্যা নেই, টিমের সবাই ওর দিকে খেয়াল রাখবে; বিপদ হলে মুহূর্তে টেনে সরিয়ে নেবে। গর্তের দিকে একটু পিছলে নীচে নামল ও। সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীরা দু'হাত ধরে পতন ঠেকাল। শ্বাস ফেলে বলল উর্বশী, 'আমাকে ধরে রাখুন।'

ফাটলের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দিল ও, খুদে একটা টর্চ জ্বালল।

প্রথম কাজ পাবলোকে দেখা। লোকটা কেমন ভাবে পড়েছে তার উপরে

নির্ভর করে ওদের অপারেশনের সফলতা। গুলির ক্ষত পরে অনেক কিছু বলে দিতে পারে। নীচে তাকাল ও। স্বল্প আলোর অপটিক্স দুই ডিমেনশনাল হয়, ফলে ওর মাথা ঘুরে উঠল না। সরাসরি ওর নীচে একটা মাঝারি জাহাজ আছে, সুপারস্ট্রাকচার দ্য চুহার স্টার্নের দিকে তাক করা। পিছনের দিকে তাকাল ও, তারপুলিনে লেগে যাবে বলে জাহাজের চিমনি ও মাস্তুলগুলো কাটা হয়েছে। উপর থেকে ভেসেলের নাম, পরিচিতি বা বৈশিষ্ট্য দেখা গেল না। তবে এটা এখন পরিষ্কার যে, এই দল জলদস্যুতা ও জাহাজ অপহরণ—দুটো কাজের সঙ্গেই জড়িত। এরা কি মানুষও পাচার করে?

উর্বশী লো-লাইট গগল্‌স্‌-এর সুইচ টিপে ওটাকে ইনফ্রারেড করে নিল। মুহূর্তে চোখে সব কালো লাগল, তবে একটা কিছু জ্বলজ্বল করে উঠল। জাহাজের রেইলিঙে কী যেন জ্বলছে, জিনিসটা নেমে গেছে হোল্ডে। ওখানে জ্বলজ্বলে রঙের একটা ছোট্ট পুকুর। ইনফ্রারেড বদলে নিয়ে নাইট অপটিক্স চালু করল উর্বশী, টর্চ জ্বালল। আইআর-এর কারণে রক্তের দাগ ও দেহটা দেখা গেছে। পাবলো প্রথমে ফ্রেইটারের রেইলিঙে গিয়ে পড়েছে, তারপর নীচের ডেকে। মাংস ছেঁচে গেছে, মাথাটা থ্যাঁতলানো। লোকটা যেভাবে পড়েছে, মনে হয় না প্যাথোলজিস্ট ছাড়া আর কেউ বুঝবে, গুলি খেয়েছে।

ওকে টেনে তুলতে বলল উর্বশী। সরে এসে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'হোল্ডে একটা ট্যাঙ্কার। বড়জোর চারশো ফুটি। চিমনি-মাস্তুল কেটে ফেলেছে।'

মার্ভেলের অপারেশন্স সেন্টারে বসে জিজ্ঞেস করল সোহেল, 'উর্বশী, জাহাজের নামটা জানাতে পারবেন?'

'না। আমাদের এক্ষুণি সরে যেতে হবে। গার্ডদের ফিরে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে।'

'ঠিক আছে, চলে আসুন।'

কমাণ্ডোরা মৃত লোকটার লাশ গর্তের মধ্যে ফেলে দিল। মুহূর্তে ওটা হারিয়ে গেল।

উর্বশীর ইশারায় ফিরতি পথে ছুটল সবাই। এক মিনিট পেরনোর আগেই জোডিয়াক যেখানে আছে, সেখানে চলে এল ওরা। একে একে দড়ি বেয়ে নৌযানে নামল ওরা। পাইলট তৈরি হতেই শ্যুটার দড়ি খুলে দিল। ইনফ্লেটেবলটা ঝপাস্‌ করে সাগরে পড়ল, তার আগেই ওটার ইলেক্ট্রিক মোটর চালু হয়ে গেছে। কয়েক সেকেণ্ড টলমল করল জোডিয়াক, তারপর সামলে নিয়ে ড্রাই-ডকের গা ছেড়ে সরে গেল, ছুটল মার্ভেলের দিকে।

পনেরো মিনিট পর বিশ নট গতিতে মার্ভেলের কাছাকাছি পৌঁছে গেল ওরা। জাহাজের গ্যারাজে অপেক্ষা করছে নাবিকরা, তারা ক্লোস্‌ড্‌-সার্কিট টিভিতে জোডিয়াক আসতে দেখল। ইনফ্লেটেবল আরও কাছাকাছি চলে আসায় গ্যারাজের লাল বাতি জ্বেলে দেয়া হলো, খুলে গেল দরজা। তিরিশ সেকেণ্ড পর জোডিয়াক র‍্যাম্পে উঠে এল, ঝাঁকি খেয়ে থামল। পাইলট ইঞ্জিন বন্ধ করবার আগেই গ্যারাজের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

উপস্থিত হয়েছে সোহেল, উর্বশীর হাতে সেল-ফোন ধরিয়ে দিল।

কালো ক্যাপটা খুলে কানে ফোন লাগাল উর্বশী। 'দাশা স্পিকিং।'

'উর্বশী, আমি রানা। কী পেলে?'

'দ্য চুহার ভিতরে মাঝারি একটা ট্যাঙ্কার আছে, রানা। নামটা জানতে পারিনি।'

'ক্রুদের কী হয়েছে আন্দাজ করতে পারো?'

'না। হোল্ড পুরোপুরি অন্ধকার ছিল। মনে হয় তারা আগেই খুন হয়ে গেছে। অবশ্য দ্য চুহার দুই টাগ-বোটে থাকতে পারে।'

রানা এ-ব্যাপারে আর কিছু বলল না। এরা মানুষ বাঁচিয়ে রাখবে কেন? নরম স্বরে বলল ও, 'ভেরি গুড জব, উর্বশী। থ্যাঙ্কস্।'

'মিস্টার আহমেদের সঙ্গে কথা বলো,' সেল-ফোন সোহেলের হাতে ধরিয়ে দিল উর্বশী। ঠিক করেছে, কেবিনে ফিরে এখন লম্বা একটা শাওয়ার নেবে। রওনা হয়ে গেল।

'কী করবি ঠিক করেছিস?' জানতে চাইল সোহেল।

'অনিল তো বলেছে দ্য চুহা তাইওয়ানের দিকে চলেছে,' বলল রানা। 'তোরা আগেই ওখানে পৌঁছে যেতে পারবি। যদি দেখি সত্যিই তাইওয়ানের কোনও বন্দরে গেছে, আমিও চলে আসব।'

'মানে বলতে চাইছিস ওটা আসলে...' প্রসঙ্গ পাল্টাল সোহেল, 'আর যদি আগেই অন্য কোনও দিকে রওনা হয়?'

'ওটার সঙ্গে থাকবি।'

'গগল পাগল হয়ে যাবে রে,' আফসোস করল সোহেল। 'ওই ড্রাই-ডক ঘণ্টায় মাত্র তিন মাইল নড়ে! গগল নালিশ করছিল, ওটা সত্যিই হয়তো একদিন কোনও বন্দরে ভিড়বে, কিন্তু দেখা যাবে, ততদিনে আমরা সবাই বুড়ো হয়ে মরে গেছি!'

'ওকে বল্, আপাতত কিছু করার নেই,' বলল রানা।

'তোর মনে আছে নাকিমুচির শেষ জাহাজটা ট্যাঙ্কার ছিল?' জানতে চাইল সোহেল। 'ওটার নাম ছিল টা... কী যেন?'

যোগান দিল রানা, 'টায়ে-টায়ে।'

'হ্যাঁ। মনে হয় ওটা এখন দ্য চুহার পেটের ভেতরে। আমরা ইচ্ছে করলে জাপান নেভি বা কোস্ট গার্ডে খবর দিতে পারি।'

'পারি। কিন্তু...'

মুখের কথা কেড়ে নিল সোহেল, 'ড্রাই-ডকের দুই টাগ-বোটে গুরুত্বপূর্ণ কেউ থাকবে না। সেক্ষেত্রে জানা যাবে না মানুষগুলো কোথায় যায়।'

'তা-ই আসলে,' বলল রানা। 'জলদস্যু বল্, জাহাজ-ডাকাতই বল্, বা আদম-ব্যাপারি—এরা সবাই অতি চালাক। কেন? কী করে সম্ভব? সব একই সুতোয় গাঁথা মনে হচ্ছে না?'

যেন নিজেকেই বলল সোহেল, 'সব নিয়ন্ত্রণ করছে অতি বুদ্ধিমান কোনও ব্রেন? কবীর চৌধুরীর মত?'

'মনে হয়,' বলল রানা। 'কবীর চৌধুরী তো অনেকদিন হলো ডুব দিয়েছে।

শেষ শুনেছি আর্জেন্টিনায় ছিল। তবে এশিয়া জুড়ে যা ঘটছে সেটার মধ্যে কোনও বিজ্ঞানের গন্ধ নেই। আমার ধারণা দ্য চুহা তাইপের কাছাকাছি গিয়ে আরেক দিকে রওনা হবে।'

'নেতৃত্বে যে লোকটা আছে, সে অন্য কোথাও বসে আছে, নির্দেশ দিচ্ছে, কিন্তু আমরা তার কিছুই করতে পারছি না,' বলল সোহেল।

'আমরা এখন নাকিমুচির উপকার করতে পারি, টায়ে-টায়ে সহ দ্য চুহা ধরিয়ে দিতে পারি, কিন্তু ওতে শুধু কয়েকজন কর্মচারী ধরা পড়বে—আসল লোকটা থাকবে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।'

'একই কথা আমিও ভেবেছি,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল সোহেল। 'কিন্তু পরিস্থিতির কোনও ডেভেলপমেন্ট নেই! অস্থির লাগছে।'

'আমারও,' স্বীকার করল রানা।

দ্য চুহা যেখানে আছে, তার পাঁচশো মাইল উত্তরে রয়েছে আরেকটা ড্রাই-ডক—ওটার নাম দ্য চুহি। চুহা ও চুহি আসলে ভাই-বোন। ওই প্রকাণ্ড ড্রাই-ডকটা এখন শাখালিন দ্বীপপুঞ্জ ও জাপানের উত্তর শেষপ্রান্তে লা পেরোইস স্ট্রেইট-এ রয়েছে, এগিয়ে চলেছে রুক্ষ সি অভ ওখোটস্ক-এর দিকে। ওটাকে টানছে শক্তিশালী দুটো টাগ-বোট। ড্রাই-ডকটা প্রতি ঘণ্টায় ছয় মাইল এগোচ্ছে। উর্বশী চুহার ভিতরে যে জাহাজটাকে দেখেছে, তার চেয়ে অনেক বড় জাহাজ গিলেছে ওটা।

সি অভ ওখোটস্ক-এ ঢুকল দ্য চুহি। সাগর যেন ফুঁসছে। একটার পর একটা ঢেউ এল। টাগ-বোট ও ড্রাই-ডকের লম্বা টো-লাইনগুলো টানটান হলো, আবার ঢিল পড়ল—ডুবে গেল সাগরে। পরমুহূর্তে শেকলগুলো লোহার দণ্ডের মত শক্ত হয়ে উঠল, পানি ছিটকে দিল। টাগ-বোটগুলো ক্ষ্যাপা সাগরের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, ভারী ড্রাই-ডক নিয়ে উত্তরদিকে চলেছে। দ্য চুহি যেন সাগরকে পাত্তা দেবে না—প্রকাণ্ড ঢেউগুলো এসে ওটার বো-এ আছড়ে পড়ছে। ফেনাগুলো মেইন ডেকে পৌঁছে গিয়ে ঝরছে। ড্রাই-ডক বারবার দেহ তুলছে, যেন ঠিক করেছে, পাগলা সাগরকে তোয়াক্কা করবে না!

দ্য চুহার মত এটার হোল্ডও ঢাকা। তবে প্লাস্টিক শিট দিয়ে নয়, স্টিলের শিট দিয়ে। ওগুলো সব ঝালাই করা। হোল্ড প্রায় এয়ারটাইট, তবে স্টার্নের উপরে বসানো ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ভেন্টিলেটরগুলো কাজে ব্যস্ত। শক্তিশালী মেশিনগুলো প্রতি মিনিটে হাজার হাজার কিউবিক ফিট বাতাস হোল্ডে পাঠাচ্ছে। বদলে একই সমান বাতাস বের করে নিচ্ছে। নীচের ডেকে অসংখ্য কেমিকেল ফিল্টার কাজ করছে—ওগুলো দুর্গন্ধ কমিয়ে আনছে। এ এমন এক বদ গন্ধ, যা অন্য কিছুর সঙ্গে তুলনা করা যায় না! গত পৌনে দুশো বছরে খোলা সাগরে ওই পচা গন্ধ পাওয়া যায়নি!

অনিল যতক্ষণ না কোনও সূত্র পাচ্ছে, টোকিয়োতে আটকে গেছে রানা। তিনদিন হলো জিমনেশিয়াম আর ঘর করছে ও। এদিকে ফু-চুং বেইজিং হয়ে শাংহাই-এ

পৌঁছে গেছে। একবার ফোন করেছিল, তারপর উধাও। বিশাল চিন ভূখণ্ডে চাইনিজ মোবাইল-ফোনের কোম্পানিগুলো এখনও বড় শহর ও আশপাশের এলাকার বাইরে সার্ভিস পৌঁছুতে পারেনি। বহু দূরের গ্রামাঞ্চলে গেছে ফু-চুং, ওখানে সেল-ফোন সবার চোখে পড়বে, কাজেই ও জিনিস সঙ্গে রাখেনি ও। ওর সঙ্গে এখন আর যোগাযোগের কোনও ব্যবস্থা নেই।

সোফায় বসে একটার পর একটা সিগারেট পোড়াচ্ছে রানা, এমন সময় বুকের কাছে টিট-টিট করে উঠল সেল-ফোন। ওটা বের করে স্ক্রিন দেখল রানা—সোহেলের কল। রিসিভ করল ও, 'বল্।'

'আর কত বিশ্রাম নিবি তুই?' ধমকে উঠল সোহেল। 'এত আয়েস কীসের তোর, শুনি! খাচ্ছিস আর মোটা হচ্ছিস! ব্যাটা, মর্কট!'

ধক্ করে উঠল রানার হৃৎপিণ্ড। 'অনিল কিছু পেয়েছে?' কণ্ঠে চাপা স্বস্তি ঠেকাতে পারল না, বলল, 'শালা রে, তোর মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক।'

'আমি মরে লাশ হয়েছি, না মিথ্যুক রাজনীতিক হয়েছি যে ফুল-চন্দন পড়বে! বে-আদব! অনিলের সঙ্গে কথা বল্। লাইনে আমিও থাকছি।'

'কী রে?' বলল অনিল। 'তোর জন্যে সামান্য খবর আছে।'

'বলে ফ্যাল!'

'ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স, কোটি ডলারের ট্যাক্স হেভেন, ছায়ায় লুকানো কোম্পানি আর ডিরাইভেটিভের মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে অনেক কিছু শিখলাম,' বলল অনিল। 'প্রথম কথা হচ্ছে, দ্য চুহার মালিক খুঁজতে ডামি কোম্পানি খুঁজেছি আমি। তোর নিশ্চয়ই মনে আছে কয়েকটা কোম্পানির কথা বলেছি?'

'হ্যাঁ।'

'জানলাম, এই কোম্পানিগুলো ড্রাই-ডক কিনতে ফর্ম করা হয়েছে। এসব কোম্পানির আর কোনও অ্যাসেট নেই।'

'শুনেছি মাঝে মাঝে এরকম করা হয়,' বলল রানা। 'তা হলে কোনও ক্লেইম হলে দেখা যায়, ওই ড্রাই-ডক ছাড়া এসব কোম্পানির আর কোনও অ্যাসেট নেই।'

'এরা কখনও ইনশ্যুরেন্স ক্লেইম করতে পারবে না,' বলল অনিল। 'আইন তা-ই বলে। ...খেয়াল করলাম এসব কোম্পানি একই দেশে ফর্ম হয়নি। একটার হেড-কোয়ার্টার পাকিস্তানে, একটা তাইওয়ানে, আরেকটা দুবাই-এ। আমি সরাসরি এনপি অ্যাডভাইজার্স এলএলসি-তে যোগাযোগ করি। ওদের কোনও টেলিফোনও নেই! চিঠিপত্র পোস্ট-অফিসের বক্সে জমা পড়ে। পরে অন্য ঠিকানায় পাঠানো হয়।'

'ঠিকানাটা বের করা যায়?'

'না। পোস্ট-অফিসে ঢুকে ডাকাতি করলে আলাদা কথা।'

'দরকার হলে তা-ই করব আমরা,' বলল রানা। 'বলে যা।'

'এসব কোম্পানির করপোরেট স্ট্রাকচার দেখলাম। কপাল ভাল যে ওদের ডেটা-বেজে পাবলিক রেকর্ডগুলো পেয়েছি। খুঁজলাম কোম্পানির বোর্ডে একই নামের লোক আছে কি না। নেই। যেসব কোম্পানি দ্য চুহা নিয়ে কাজ করছে,

তাদের একটা ব্যাপার চোখে পড়ল। কাদা ঘাঁটতে শুরু করলাম। চল্লিশজন ডিরেক্টর পেলাম,' চুপ হয়ে গেল অনিল। দম নিয়ে বলল, 'মনে পড়ে গেল উর্বশী দ্য চুহায় উঠেছিল, ওখানে রাশান গার্ড ছিল। এবার খেয়াল করলাম, এসব ডিরেক্টররা সবাই রাশান। এখন আমাদের অপেক্ষার পালা। ইন্টারপোলে সার্চ করছি এখন। কয়েকটা নাম বেরিয়ে এসেছে। এরা রাশান মাফিয়ার মাঝারি নেতা।'

'ধরে নিলাম এরাই জাহাজ হাইজ্যাক করছে, কিন্তু আদম-ব্যাপারিরা অর্গানাইয্ড্,' বলল রানা। 'ওরা কী রাশান মাফিয়াকে নিজেদের এলাকায় ঢুকতে দেবে?'

'দেয়ার কথা না,' বলল সোহেল। 'কিন্তু মনে হচ্ছে এই দুই দল একইসঙ্গে মিলে কাজ করছে।'

'আদম-ব্যাপারিরা রাশানদের সঙ্গে কোনও চুক্তি করেছে, এমন কিছু আমাদের জানা নেই,' বলল অনিল। আগের প্রসঙ্গে ফিরল, 'ক্ষমতাশালী কেউ রাশান মাফিয়াকে কিছু টাকা ধরিয়ে দিয়ে নামগুলো ধার করেছে। ডামি কোম্পানির জন্যে ফর্ম করা হয়েছে ডামি ডিরেক্টর। কিন্তু দুটো ব্যাপার লক্ষ করবার মত—প্রথমত, এসব কোম্পানি দ্য চুহার অংশ কিনেছে। দ্বিতীয়ত, এদের ডকুমেন্ট পাকা করেছে জুরিখের এক উকিল। লোকটার নাম লিয়ার বেয়ারমান।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'তাকে কোথায় পাওয়া যাবে?'

'কয়েকমাস আগে ইউরোপে একটা বিশ্রী অর্থনৈতিক স্ক্যাণ্ডাল হয়,' বলল অনিল। 'নাৎসিদের চুরি করা সোনা মেরে দেয় কয়েকজন ব্যাঙ্কার। ...তোর মনে পড়ে?'

'আবছা ভাবে।'

'তখন জানা যায় সুইস ব্যাঙ্কগুলো সুইটযারল্যাণ্ডে নাৎসিদের সোনা লুকিয়ে রেখেছে। এই লিয়ার বেয়ারমান ওই মামলায় রাজ-সাক্ষী হয়। এ বিরাট একটা মানি লণ্ডারিং নেটওয়র্কের সঙ্গে জড়িত ছিল। ধরা পড়ে বুঝতে পারে তার আর মুক্তি নেই। বাধ্য হয়ে সুইস প্রসিকিউটারদের সঙ্গে চুক্তি করে, তথ্য ছাড়তে শুরু করে। কেলেঙ্কারির খবর বেরিয়ে আসায় বড় কয়েকটা ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট আড়ালে চলে যেতে বাধ্য হয়। কয়েকজন মিনিস্টার বাধ্য হয়ে রিযাইন দেয়। গত পরশু দিনের খবর বলছি তোকে—এখন বেরিয়ে আসছে, পিএলও সারা দুনিয়া থেকে যে টাকা পেয়েছে, তার বিরাট একটা অংশ আটকে ফেলেছে সুইস ব্যাঙ্কাররা। এখন জানা যাচ্ছে এরা ভেবেছে ইয়াসির আরাফাত নেই, কাজেই সব তাদের নিজেদের হয়ে গেছে। এদের ওপরে খেপে আছে পিএলও। বেয়ারমানকে পেলে হয়তো মেরে ফেলবে। এখন সাধারণ মানুষ অপেক্ষা করছে, কী হয় দেখবে।'

'এই উকিল এখন আছে কোথায়?' জানতে চাইল রানা।

'জুরিখের বাইরে, রেজেন্সডোর্ফ প্রিযন-এ, প্রটেক্টিভ কাস্টোডিতে,' বলল অনিল। 'পাঁচ মাসে কয়েকবার তাকে স্পেশাল প্রসিকিউটোরিয়াল কোর্টে আর্মার্ড ভ্যান করে নেয়া হয়েছে। সাধারণ কেউ আশপাশে যেতে পারবে না। লোকটাকে পরিয়ে রাখা হয় ফ্ল্যাক ভেস্ট আর হেলমেট, মুখে থাকে ভারী ব্যাণ্ডেজ। সুইস

প্রেস ধারণা করছে প্লাস্টিক সার্জারি করে লোকটার মুখ বদলে দেয়া হবে। বিচার শেষে নতুন পরিচয় নিয়ে বহুদূরে কোথাও চলে যাবে সে।'

'আর্মার্ড ভ্যান?' বিড়বিড় করে বলল রানা।

'সঙ্গে পুলিশের এসকর্টও আছে,' জানাল অনিল। 'আমরা যদি ধরে নিই ওই লোক আমাদের হাতের অনেক বাইরে, তা হলে মাত্র একটা পথই থাকে। আমরা মাফিয়ার নেতাদের পিছু নিতে পারি। কিন্তু তাতে কোনও কাজ হবে বলে মনে হয় না।'

'ক'টার পিছনে দৌড়াব আমরা?' বলল সোহেল।

'কোনও ভিজিটর বেয়ারমানের সঙ্গে দেখা করতে পারে?' জানতে চাইল রানা। জবাবটা অন্তরে পেয়ে গেল। বেয়ারমান এখন রাজ-সাক্ষী হওয়ায় ভাল অবস্থানে আছে, চমৎকার একটা চুক্তি পেয়েছে, এখন উল্টোপাল্টা বলে নিজের ক্ষতি করবে না। অন্য কোনও পথে লোকটাকে পেতে হবে।

'মাত্র একজন তার কাছে যেতে পারে,' বলল অনিল। 'তার স্ত্রী।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রানা, অদ্ভুত একটা চিন্তা খেলে গেছে ওর মনে। একটা পথ দেখতে পাচ্ছে ও। লিয়ার বেয়ারমানের মুখ খোলাবার একটা উপায় আছে। ব্যাপারটা অতিরিক্ত ঝুঁকিপূর্ণ। আইনের অনেক বাইরে চলে যেতে হবে। তবে তথ্য পাওয়া যাবে। নিজেকে প্রশ্ন করল ও, আমরা যদি পিএলও-র লোক হই? পিএলও তো খেপে আছে। ...অভিনয় খুব ভাল হতে হবে।

নীরবতা ভাঙল সোহেল, 'কী ভাবছিস?'

'আমাদের কাছে লিয়ার বেয়ারমানের বউয়ের ছবি আছে?' জানতে চাইল রানা।

'সুইটযারল্যাণ্ডের নিউজ পেপারের আর্কাইভ ঘাঁটলে পেয়ে যাব,' জানাল অনিল।

'তা হলে জোগাড় কর্ তোরা,' বলল রানা। পরমুহূর্তে বোমা ফাটাল, 'আমি তা হলে জুরিখে চললাম, চারপাশ না দেখে কিছু বলব না—মুখ খুললে তোরা আমাকে পাগল ভাববি। ...তোরা এখন কোথায়?'

'পুব চিন সাগরে, তাইওয়ানের দুশো মাইল উত্তরে,' জানাল সোহেল।

'আর, দ্য চুহা?'

'আমাদের বিশ মাইল সামনে,' বলল সোহেল। 'ওটার রেইডার ওই পর্যন্ত কাজ করে। বারো ঘণ্টা পর পর ইউএভি দিয়ে ওটাকে দেখছি আমরা। এখনও কোর্স পাল্টায়নি।'

'পরে তোদের সব খুলে বলব,' বলল রানা। 'ড্রাই-ডকের সঙ্গে লেগে থাক।' দু'বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফোন রেখে দিল ও। মনে মনে হিসাব কষল, দ্য চুহা প্রতিদিন বড়জোর একশো পঞ্চাশ মাইল যায়, আরও দেড় দিন পর তাইপে-তে পৌঁছুবে। কিন্তু ওর মন বলছে ওটা কোর্স পাল্টাবে, অন্য কোনও দিকে রওনা হবে। এমন কোথাও যাবে, যেখানে গোপনে জাহাজ সরানো যায়। ভিয়েতনাম? ফিলিপাইনস? নাকি ইন্দোনেশিয়া?

হাতে বেশি সময় নেই। মার্ভেল তাইওয়ান ছেড়ে দূরে চলে গেলে মুশকিল

হবে। ওটার কপ্টারের রেঞ্জ এত বেশি নয় যে যখন-তখন ব্যবহার করা যাবে। দূর সাগরে চলে গেলে প্রয়োজনীয় রসদ পাবে না ও। হাতে মাত্র দু'দিন আছে। এরইমধ্যে জুরিখ ঘুরে পরিস্থিতি দেখে ঠিক করতে হবে কারা সঙ্গে যাবে, কী সঙ্গে নেবে।

যে-পরিকল্পনা ও করেছে, তাতে দ্রুত কাজ সারতে হবে। ভুলেও কোনও ভুল করা চলবে না। ওরা কেউ ধরা পড়লে রেজেন্সডোর্ফ-এ পচে মরবে। দলবল নিয়ে ওখানে ঢুকতে চায় না ও। আজ পর্যন্ত কেউ রেজেন্সডোর্ফ প্রিযন ছেড়ে পালাতে পারেনি। কাজেই ওদের উদ্ধার করবে না কেউ।

রানা মনে মনে বলল, 'খুব সাবধান, রানা! খু-উ-ব সাবধান!'

বারো

টোকিয়ো থেকে বেইজিঙে ফিরে একবার অফিসে ঢুঁ দিয়েছে ফু-চুং, ওখানে শুনেছে ফুজিয়ান প্রভিন্সে রিজিয়োনাল ইলেকশন চলছে। জেনে নিয়েছে, শিচেন মফস্বলের শহর, বরং বলা উচিত বড় একটা গ্রাম—জনসংখ্যা নয় হাজার। চারপাশের আর সব গ্রামের মতই ওখানে নির্বাচন উপলক্ষে তাঁবু গেড়েছে সেনাবাহিনী। সৈন্যদের ট্যাগ-আইডেন্টিফিকেশন সঙ্গে নিয়েছে ও, পকেটে মোটা টাকা। স্নেকহেডের নেতা জানতে চাইলে বলবে, সেনাবাহিনী ছেড়ে পালিয়েছে।

এয়ার-চায়না ফ্লাইটে শাংহাই পৌঁচেছে। এরপর বাস টার্মিনালে গিয়ে ফুজিয়ান প্রভিন্সের বাস ধরেছে। বাইশ ঘণ্টার জার্নি। আটশো কিলোমিটার। মাঝখানে লিসুইয়ে এক ঘণ্টার বিশ্রাম। তারপর আবারও এগোনো। বাস শেষপর্যন্ত ওকে নামিয়ে দিয়েছে সানমিং-এ। এরপর আধঘণ্টা অপেক্ষা করে লোকাল বাস ধরে শিচেনের পাঁচ মাইল দূরে নেমেছে। সাড়ে চার মাইল হেঁটেছে। মিলিটারির প্রশ্নের ভয়ে এখন একটা সেতুর নীচে ইরিগেশনের গভীর নালার পাশে শুয়ে অপেক্ষা করছে। আর্মি সরে গেলে বেরোবে এখান থেকে। ওর তিন-ফুট দূর দিয়ে কুলকুল করে বয়ে চলেছে শীতল স্রোত। আশপাশে কেউ নেই। বামে বহুদূরে ধানের খেত দিগন্তে গিয়ে মিশেছে। ডানপাশে ঝোপঝাড়-জঙ্গল। মাঝখান দিয়ে ইঁটের রাস্তা চলে গেছে শিচেন-এ।

আগেই শিচেনে ঢুকতে পারত ও, কিন্তু ভেবে দেখেছে, যাওয়া উচিত হবে না। এসব খুদে মফস্বল শহরে সবাই সবাইকে চেনে। সন্দেহের দৃষ্টিতে ওকে দেখা হবে। সেনাবাহিনী যে-কোনও সময় চ্যালেঞ্জ করতে পারে। সে-রকম কিছু হলে নানান প্রশ্ন উঠবে। সেক্ষেত্রে বেইজিঙের অফিসে যোগাযোগ করতে হবে। সেনাবাহিনী ছেড়ে দেবে ঠিকই, কিন্তু জানাজানি ঠেকানো যাবে না।

সাত ঘণ্টা আগে লুকিয়েছে ফু-চুং। ঠিক করেছে রাত নামলে শহরে ঢুকবে। হুড়োহুড়িতে ভাল কোনও প্ল্যান তৈরি করতে পারেনি ও। ঠিক করেছে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেবে, পরিস্থিতি অনুযায়ী এগোবে।

এসবই ভাবছিল ফু-চুং, কিন্তু হঠাৎ গলার আওয়াজে সচেতন হয়ে উঠল। কাঠের ব্রিজে উঠছে কেউ। রাস্তার সুরকি ঢাল বেয়ে নালায় পড়ল।

'আরেকটু দূরেই,' পুরুষ কণ্ঠ আহ্লাদ করল, 'শহরে আসার সময় জায়গাটা দেখেছি। খুব সুন্দর জায়গা।'

'না, আমি বাড়ি ফিরব,' বলল নারী কণ্ঠ। কমবয়সী কোনও মেয়ে। কিশোরী, বা তরুণী। মনে হয় ভয় পেয়েছে।

পুরুষ কণ্ঠ বলল, 'তোমার কোনও ভয় নেই।' সুরে স্থানীয় টান নেই। শাংহাই বা আশপাশের বাসিন্দা। মেয়েটা মফস্বলের।

'না। প্লিইজ। আমার বাবা-মা চিন্তা করবে। আমার কাজ আছে।'

লোকটা ভদ্রতার মুখোশ খুলে ফেলল, 'এসো, আসতে বলেছি আমি!' কড়া স্বর। কামনা? রাগ? কণ্ঠে কর্কশ সুর।

ফু-চুঙের মাথার উপর দিয়ে চলেছে তারা। সেতুর কাঠ মচমচ করল, ধুলো নীচে পড়ছে। দু'জনের পদক্ষেপ বদলে গেল। মনোদৃষ্টিতে তাদের দেখতে পেল ফু-চুং। মেয়েটা দাঁড়িয়ে পড়তে চাইছে। কিন্তু লোকটা তাকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে চলেছে।

নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল ফু-চুং, নালা পার হয়ে সেতুর ও-প্রান্তে চলে গেল। উপরে লোকটা সঙ্গিনীকে ধরে নিয়ে চলেছে, হাঁপাচ্ছে। চাপা স্বরে বলল, 'খুব মজা পাবে! কোনও ভয় নাই!'

'ছাড়েন, ছেড়ে দিন আমাকে!' এক কথাই বারবার বলে চলেছে মেয়েটা। ভয়ে কাঁপছে গলা।

ডানপাশে ঝোপঝাড় আর জঙ্গল। মেয়েটাকে ওখানে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করা হবে। সেতু পেরিয়ে গেল দু'জন। রাস্তা জঙ্গল পেরিয়ে শিচেনের দিকে বাঁক নিয়েছে। কেউ ওদিক থেকে এলে ভাল হতো। ফু-চুং জানে, সেতুর নীচে থাকাই ওর জন্য ভাল, কিন্তু একটা মেয়েকে ধর্ষণ করা হবে, আর চুপচাপ বসে থাকবে ও? ধস্তাধস্তির মাত্রা বেড়ে গেছে। যেতে চাইছে না মেয়েটা।

ঢাল বেয়ে উঠে এল ফু-চুং, সাবধানে চারপাশ দেখল।

লোকটা সোলজার। কাঁধে একে-ফোরটিসেভেন ঝুলছে। ওর ইউনিফর্ম মেয়েটির পোশাকের চেয়ে ঢের দামি ও পরিষ্কার। সঙ্গিনীকে দু'হাতে তুলে ঝোপের দিকে এগিয়ে চলেছে সে। তরুণীর দু'পা মাটি ছুঁই-ছুঁই করছে। মুক্তি পাবার জন্য পা ছুঁড়ছে, শরীর মোচড়াচ্ছে। লোকটা কাছের গাছগুলোর দিকে চলেছে।

পাহাড়ি এলাকা, সূর্য এইরমধ্যে ঢলে গেছে, গাঢ় কালো ছায়া নামছে। মেয়েটার পরনে সাধারণ স্কার্ট, সাদা ব্লাউজ। শীর্ণ কাঁধে পড়ে আছে চওড়া বেণী দুটো।

চুপচাপ অপেক্ষা করল ফু-চুং। লোকটা শিকার ধরে নিয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়ল। ওই জঙ্গলের ওপাশে আছে শিচেন। রাস্তার দিকে আরেকবার তাকাল ফু-চুং। কেউ আসছে না। দ্রুত পায়ে জঙ্গলে ঢুকল ও, কান পাতল। ওই লোক আরও গভীরে ঢুকছে। মেয়েটা চেঁচিয়ে সাহায্য চাইল, তারপর আবছা গোঙানির

আওয়াজ ভেসে এল। লোকটা নিশ্চয়ই এক হাতে ওর মুখ চেপে ধরেছে।

নিঃশব্দে এগোল ফু-চুং। একটা বিরাট পাইন গাছের তলায় চোখ পড়ল—সাদা কাপড়টা পাতার কার্পেটে পড়ে আছে। মেয়েটার ব্লাউজ। পায়ে পায়ে মোটা পাইনের পিছনে চলে এল ফু-চুং, আড়াল থেকে তাকাল।

তরুণীকে মাটিতে ফেলে জাপ্টে ধরেছে লোকটা। পাশেই পড়ে আছে রাইফেলটা। নিজের বুক দিয়ে মেয়েটাকে ঢেকে ফেলেছে সে। ঝটকা-ঝটকি করছে তরুণী, চিৎকার করতে চাইছে। কিন্তু লোকটা বাম হাতে তার মুখ চেপে ধরেছে, ডান হাতে স্কার্ট খুলছে। এবার পিশাচটা বুঝে গেল, এভাবে হবে না—মুখ ছেড়ে দিল সে, চিৎকারের সুযোগ পেল না তরুণী, চোয়ালে প্রচণ্ড ঘুসি খেয়ে মুহূর্তে জ্ঞান হারাল।

লোকটা নয় ফুট দূরে, ব্যস্ত হয়ে স্কার্ট খুলছে। তাকে না টপকালে রাইফেল পাওয়া যাবে না। শামুকের গতিতে পাইনের কাণ্ডের আড়াল ছাড়ল ফু-চুং। মানুষের চোখ সরাসরি সামনে যতটা দেখে, তার চেয়ে অনেক ভাল দেখে চোখের কোণ দিয়ে। ফু-চুং তিন কদম ফেলতেই ওর উপস্থিতি টের পেয়ে গেল লোকটা। দেরি না করে ধেয়ে গেল ফু-চুং। লোকটা রাইফেল তুলতে হুমড়ি দিল। বামহাতে বাঁটের গ্রিপ ধরে ফেলল সে, অভ্যস্ত ডান হাতে খুঁজল সেফটি ক্যাচ। টার্গেটের দিকে রাইফেল ঘোরাল সে। মনে মনে হায়-হায় করে উঠল ফু-চুং, লোকটা হয়তো গুলি মিস করবে, কিন্তু আওয়াজ শহরে পৌঁছে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসবে সেনাবাহিনীর সদস্যরা। ব্যাপারটা লোকটা নিজেও জানে, তাই ওকে সাইটে পাওয়ার আগেই ট্রিগার টিপছে।

তীরের মত ঝাঁপ দিল ফু-চুং। ডানহাত বাড়িয়ে দিল ব্যারেল ধরতে, ওর বাম হাতের কারাতে চপ ছুটল লোকটার উইণ্ড-পাইপের দিকে। কিন্তু দেরি করে ফেলেছে ও, লোকটা ট্রিগার টিপে দিল! কিন্তু গুলি বেরুলো না!

তরুণীর বুকের উপর থেকে লোকটাকে তুলে নিয়ে ছিটকে পড়ল ফু-চুং। প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে শত্রুসহ দু'বার গড়াল লোকটা। পিছনে মেয়েটা জ্ঞান ফিরে পেয়েছে, চিৎকার করে উঠল। ওদিকে মনোযোগ ফেরাল না ফু-চুং। লোকটা ওর বুকের উপরে পড়ে আছে। নড়ে উঠবার আগেই বাম হাতে চুল চেপে ধরে উঁচু করল ফু-চুং, পরপর দু'বার অ্যাডাম্‌স্ অ্যাপ্‌ল্-এ ডানহাতি চপ মারল। হাতে পুরো জোর পায়নি ও, তবে দু'বার আঘাত যথেষ্ট হলো। লোকটার উইণ্ড-পাইপ ভেঙে গেছে। কয়েক মুহূর্ত হাঁসফাঁস করল লোকটা, তারপর মারা গেল।

লাশ গা থেকে নামিয়ে দিল ফু-চুং, উঠে দাঁড়াল। মেয়েটা কাত হয়ে পড়ে আছে, গোঙাচ্ছে। তরুণীকে তুলে বসাল ফু-চুং, ব্লাউজটা নিয়ে এসে ওর গা ঢেকে দিল। তরুণীর চোয়ালের হাড় খুলে যায়নি, তবে কয়েকদিন গালে কালসিটে দাগ থাকবে। ব্যথায়-ভয়ে কাঁপছে। মুঠো পাকানো হাত দুটো খুলে দিল ফু-চুং। তরুণীর ডান তর্জনী অস্বাভাবিক বেঁকে গেছে। এবার ফু-চুং বুঝল কেন রাইফেলের গুলি বের হয়নি। মেয়েটা ধর্ষণকারীকে প্রাণপণে ঠেকিয়েছে, পরে জ্ঞান ফিরে পেয়ে ট্রিগারের পিছনে আঙুল ভরে দিয়েছে। ও ফু-চুংকে বাঁচিয়েছে, নিজেকে ধর্ষণের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। ফু-চুং যখন রাইফেল কেড়ে নেয়, তখন

ওর আঙুল ভেঙে গেছে।

'অনেক সাহস তোমার,' নরম স্বরে বলল ফু-চুং।

গোঙানির ফাঁকে জিজ্ঞেস করল তরুণী, 'কে আপনি?'

'এমন কেউ নই, যে বলব,' বলল ফু-চুং। 'ধরে নাও আমাকে দেখোনি তুমি। মাঠে কাজ করতে গিয়ে পিছলে পড়ে গিয়েছিলে তুমি, তখন আঙুল ভেঙে গেছে। আমার কথা বুঝতে পারছ তো?' লাশটা দেখল তরুণী, তারপর ঘুরে তাকাল। যেন নীরবে প্রশ্ন করছে। 'লাশের ব্যবস্থা করব আমি,' বলল ফু-চুং। 'তোমার কোনও চিন্তা করতে হবে না। কেউ জানবে না কী হয়েছে। এবার তুমি বাসায় চলে যাও। আজকের এই ঘটনা মন থেকে মুছে ফেলো।'

সরে বসল তরুণী, কাপড় পরছে। দুটো বোতাম খসে পড়েছে, কিন্তু ব্লাউজ পরা যায়। উঠে দাঁড়াল, দু'চোখের কোণে অশ্রু টলটল করছে। বামদিকের জঙ্গলের দিকে এগোল।

'একটু দাঁড়াও,' বলল ফু-চুং। 'শিচেনে গাওলুং নামের একটা পরিবার আছে, তাদের কয়েকজন দেশ ছেড়ে স্নেকদের সঙ্গে চলে গেছে। তাদের চেনো তুমি?'

তরুণীর চোখে কী যেন—ভয়? দুঃসংবাদের আশঙ্কা? কেঁপে উঠল একবার। মনে হলো যে-কোনও মুহূর্তে দৌড়ে পালাবে। কিন্তু নড়ল না, বোধহয় ঠিক করেছে উদ্ধারকারীর প্রশ্নের জবাব দেবে। বলল, 'হ্যাঁ, ওরা শহরে থাকে। ওদের একটা পুরোনো সাইকেলের দোকান আছে। সবাই ওরা ভাল মানুষ। আপনি কী ওদের জন্যে কোনও খবর নিয়ে এসেছেন?'

মেয়েটার কথায় মনে হলো গাওলুংদের ভাল করেই চেনে। হতে পারে মৃত যুবকটি যে-মেয়ের কথা লিখেছে, এ-ই সেই তরুণী। 'হ্যাঁ, একটা খবর আছে,' বলল ফু-চুং। পরের কথাটা বলতে গিয়ে তিক্ত হয়ে গেল ওর মন। 'হ্যাঁ, জাপানে পৌঁছে গেছে ওরা। কাজ পেয়েছে। ...এবার তুমি যাও!'

শেষ খবরটা শুনে, যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেয়ে গেছে সে, দ্রুত পায়ে জঙ্গলে হারিয়ে গেল তরুণী। দাঁতে দাঁত চাপল ফু-চুং—ওই ধর্ষণকারীর চেয়ে খারাপ কাজ করেছে ও। মেয়েটাকে এমন এক আশা দিয়েছে, যে-আশা কখনও পূরণ হবে না।

রাইফেলের স্লিং খুলে নিল ফু-চুং, সৈনিকের বেল্টও। চারপাশটা ঘুরেফিরে দেখে নিয়ে ফিরে এল। এবার লাশটা তুলে একজোড়া ওক গাছের তলায় নিয়ে রাখল। পনেরো মিনিট পরিশ্রম করে লাশটা গাছের উপরে তুলে বেঁধে ফেলল। আর্মি লোকটাকে খুঁজবে, সার্চ-পার্টি ধরে নেবে পালিয়েছে। লাশ পেতে কয়েকদিন লাগবে। মৃতদেহের গন্ধ সবাইকে ডেকে আনবে।

একটা ডাল ভেঙে নিয়ে পায়ের চিহ্ন মুছে ফেলল ফু-চুং, ফিরে এল সেই সেতুর নীচে। মেয়েটা এতক্ষণে বাসায় চলে গেছে। মা ওকে নিয়ে গেছে ডাক্তারের কাছে। ওর আর বিপদ হবে না। কিন্তু ফু-চুঙের বিপদ মাত্র শুরু হলো।

নিজেদের লোক না পাওয়া পর্যন্ত এখান থেকে সরবে না মিলিটারি। কালকের রোল কল-এ ধরা পড়বে, তাদের একজন লোক কম। সার্চ-পার্টি খুঁজতে বেরবে। মৃত লোকের বন্ধুরা তাকে বাঁচাতে চাইবে। সবাই ধরে নেবে, সে কোনও চাষীর

সুন্দরী মেয়েকে নিয়ে পালিয়েছে।

আর্মি পুরো শহর খুঁজবে। তারপর আশপাশের খামারে। সার্চ-পার্টি ধীরে ধীরে বৃত্ত বড় করবে। ফু-চুং আগামীকাল শহরে থাকলে আটকা পড়বে। তার মানে, ভোরের আগে স্নেকহেডের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। সিয়েন লাউকে জানাতে হবে, ও আর্মি ছেড়ে পালিয়েছে, এবার দেশ ছেড়ে চলে যেতে চায়। কানাঘুষা শুনে ওই লোক নিশ্চিত হবে সত্যিই পালিয়েছে ও।

তারপর কী ঘটবে?

তেরো

ভ্লাদিমিয়ার সরোকিন মনে মনে স্বস্তি বোধ করছে। একের পর এক ক্লান্তিকর ফ্লাইট শেষ হয়ে আসছে। আর মাত্র একটা ফ্লাইট, তারপর পৌঁছে যাবে রিজিয়োনাল ক্যাপিটাল পেদ্রোপাভ্লোভস্ক-কামচাটস্কিয়িতে। এলিযোভো এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করতে হবে না, ওখান থেকে চলে যাবে সে কামচাটকা পেনিনসুলায়, সাগরের তীরে। রাশার শেষ পুব প্রান্ত ওটা। তার কাজ ওখানেই।

আজ থেকে পঁচিশ লক্ষ বছর আগে কামচাটকা সাগর ছেড়ে উঠে আসে। কয়েক হাজার বছরের মধ্যেই সাগর পর্বতগুলোকে ধুয়ে নামিয়ে দেয়, কিন্তু পরে অসংখ্য আগ্নেয়গিরি এই এলাকা নিজেদের মত করে সাজিয়ে নিয়েছে। দেড়শো আগ্নেয়গিরির মধ্যে উনত্রিশটা এখনও জীবন্ত। যেমন কারিম্স্কি আগ্নেয়গিরি, উনিশশো ছিয়ানব্বুইর পর আবারও খেপে উঠেছে ওটা। মানুষজন অবশ্য আগেই সরে গেছে। এই আগ্নেয়গিরি এখন আকাশে ছাই ছুঁড়ছে। সেই সঙ্গে ইদানীং জুটেছে নাম-না-জানা আরেকটা।

প্রায় আড়াই দশক আগে ভ্লাদিমিয়ার সরোকিন একটা সরকারি সার্ভে টিমের সঙ্গে এখানে খনিজ সম্পদের সম্ভাবনা জরিপ করতে আসে। সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতারা ধারণা করেছিল এই বিশাল এলাকায় প্রচুর খনি পাওয়া যেতে পারে। সে-সময় প্রেসিডেন্ট রিগান আমেরিকার সামরিক শক্তির অকল্পনীয় বৃদ্ধি করে পশ্চিমা দেশগুলোর বাহবা কুড়াচ্ছে। সোভিয়েতরাও বাধ্য হয়ে নিজেদের মিলিটারি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল-কমপ্লেক্সের জন্য খনিজ সম্পদ খুঁজতে শুরু করে পূর্ণোদ্যমে। তারা জানত, বুলেট বা বোমা দিয়ে লড়াই হবে না, টক্কর দিতে হবে হাজারো ফ্যাক্টোরি গড়ে। ঠাণ্ডা লড়াই জিততে হলে সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্য অতি জরুরি হয়ে ওঠে নিজের জমি থেকে সম্পদ উত্তোলন। সে-সময় খনিজ সম্পদ খোঁজার পিছনে যে-পরিমাণ উদ্যোগ নেয়া হয়, সেটা পরে আর হয়নি। পাওয়া যায় কয়লা, লোহা, ইউরেনিয়াম ও অন্যান্য খনিজ পদার্থ।

ভ্লাদিমিয়ার সরোকিন ছিল তখন ব্যুরো অভ ন্যাচারাল রিসোর্সেস-এর ফিল্ড রিসার্চার। সেন্ট্রাল কমিটি ব্যুরোকে সোভিয়েত সীমান্তের সমস্ত খনিজ সম্পদ খুঁজে বের করবার নির্দেশ দেয়। উনিশশো ছিয়াশিতে কামচাটকা পেনিনসুলায় আসে

সরোকিন। সঙ্গে ছিল আরও দু'জন। এই তিনজনের নেতৃত্বে ছিলেন মস্কো ইউনিভার্সিটির জিয়োলজির অ্যাকাদেমিক প্রফেসর আইয়ো আকানভ।

চারজনের এই দল চার মাস ধরে রেড আর্মির হেলিকপ্টার ও অল-টেরেইন ভেহিকেলে চড়ে চারপাশ ঘুরে দেখে। অ্যাকটিভ জিয়োলজির কারণে ধরে নেয়া হয় কামচাটকায় হীরার খনি পাওয়া যাবে। কিন্তু পরে দেখা গেল মস্কোর বিশ্বাস ঠিক নয়। অবশ্য হীরার বদলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অন্য এক সম্পদ পাওয়া গেছে।

সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ছে সরোকিনের। সে-সময়ে রিফের কাছে ক্যাম্প করেছিল ওরা। চারজন মিলে সারাদিন স্যাম্পল জোগাড় করত, আর রাতে বসে কল্পনা করত কী পেতে পারে। সে-সময় মনে হতো যা কিছু পাওয়া যাবে, সব তো আসলে ওদেরই। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। সম্পদের বদলে তারা পাবে খানিকটা প্রশংসা, সেই সঙ্গে পিঠ চাপড়ে আশ্বাস দেয়া হবে, ভবিষ্যতে তারা আগের চেয়ে বড় অ্যাপার্টমেন্ট পাবে।

সরোকিনের মনে পড়ে না কে প্রথমে কথাটা বলেছিল, হয়তো সে নিজেই, কিন্তু এখন আর মনে নেই। সবাই মিলে খুব হেসেছিল। পরে সবাই বারবার আলাপ করেছে, কল্পনা করেছে। সে-রাতে বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল কামচাটকায়। সবাই মিলে একটা ভোদকা শেষ করেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নে আর যা-ই দিক বা না দিক, সে-যুগের কমিউনিস্ট নেতারা সবাইকে প্রচুর পরিমাণে ভোদকা যোগান দিতে ভুল করত না।

একজন পষ্ট জিজ্ঞেস করেছিল—আমরা যা পাব, তা-ই সবাইকে বলব? ওরা চারজন সত্যিকার ঘটনা জানত। ওরা বুঝতে পারে, একবার রিপোর্ট করলে আর ফিরতে পারবে না কখনও। অনেক আলাপ করেছে ওরা। একজন বলেছিল, আরেকটা কাজ করা যায়, ওরা মস্কোতে ফিরে যেতে পারে, অপেক্ষা করতে পারে। পরে এখানে এসে রিফে কাজ করতে পারবে। সবাই বড়লোক হয়ে যাবে।

ইলাইয়ুশিন জেট-লাইনার থেমে গেছে, দরজা খুলে দেয়া হলো। সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে অ্যাকাদেমিক আকানভের চেহারাটা মনে পড়ায় হাসল সরোকিন। লোকটা ওদের দু'ঘণ্টা স্বপ্নে ঘুরবার সুযোগ দেয়, তারপর বাস্তবে নামিয়ে আনে। লোকটা একবারও বলেনি ওদের অন্যায় হবে। লোভ তারও হয়েছিল। স্বাভাবিক। চালাক মানুষ ছিল, ভাল করেই জানত ওরা স্বপ্নে ভাসছে। দু'এক কথায় বলে ওরা কেন আর কামচাটকায় ফিরতে পারবে না। খুলে বলেছিল কেন ওরা খনিতে কাজ করতে পারবে না। জানিয়েছিল, ওরা যে সামান্য 'ওর' পাবে, তাতে জীবন চলবে না। বিশ্বের মার্কেট কী ভাবে চলে সেটা খুলে বলেছিল। লোকটা ওদের স্বপ্নের গোড়ায় কুঠার মারে। ধাক্কা খেয়ে সবার ভোদকার নেশা কেটে যায়।

সরোকিনের মনে পড়ছে, লোকটার কথা শেষ হতে না হতেই আবার বৃষ্টি নেমেছিল। আকানভ ওদের গ্যাসের লণ্ঠন নিভিয়ে দিয়েছিল। তখন ওরা কিছুক্ষণ চুপচাপ বৃষ্টির আওয়াজ শুনেছে। বৃষ্টির ফোঁটা টিপটিপ করে ক্যানভাসের তাঁবুতে পড়ছিল। তারপর যার-যার স্লিপিং ব্যাগে ঢুকে পড়ে। সবাই বোধহয় কথাগুলো নিয়ে ভাবছিল, তারপর একসময় ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু সে নিজে ঘুমাতে পারল না, চুপচাপ পড়ে থাকল। সবার শ্বাস-প্রশ্বাস শুনছিল সে। গভীর ঘুমে ডুবে গিয়েছিল

সবাই। এরপর অন্তত তিনঘণ্টা পেরিয়ে যায়। সে-সময় সে ভেবেছে, ওরা ভাল করেই জানে ফিরে আসা সম্ভব নয়। তবে আরেকটা ব্যাপার ভাবেনি কেউ। পরিস্থিতি পাল্টায়।

ওরা সবাই ভবিষ্যৎ নিয়ে ভেবেছে। অন্তত সরোকিন বুঝেছে, সে এক দশকে ফিরতে পারবে না। কমিউনিস্ট সরকারের পতন হবে, তারপর গণতন্ত্র আসবে, তখন বদলে যাবে বহুকিছু। বেশিরভাগ মানুষ ভাবতে পারেনি কমিউনিস্ট শাসন এভাবে ব্যর্থ হবে। কিন্তু সে জানত, এটা হবেই। জনগণের মনে আর উৎসাহ ছিল না, সমস্ত কর্মকাণ্ড স্তব্ধ হয়ে পড়ছিল। নেতারা ধরে নিয়েছিল, তারা যেহেতু নিজেরা কাজ করে না, মানুষ কাজ করবে না। সরোকিন অনুভব করত, নীরব এক অভ্যুত্থান চলছে, সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজের ওজনেই মুখ থুবড়ে পড়বে। অপেক্ষা করলে ও যা চায়, সেটাই পাবে। ধাঁধার টুকরোগুলো একের পর এক মিলে যাবে—তার নিজের কিছু করতে হবে না। তবে একটু সময় দিতে হবে।

তার সঙ্গীরা আরেকটা ব্যাপার মোটেই খেয়াল করেনি। ওর মত করে ভাবেনি তারা। সে ঠিক করেছিল, যে-সম্পদ পাবে, সব নিজের জন্য রাখবে, বাকিদের কিছুই দেবে না।

সে জানত, তারা পঁয়ত্রিশ দিন আগে রিফে এসেছে। আরও চারদিন পর হেলিকপ্টার আসবে। তার অনেক আগেই কাজে নামতে হবে। হাতে যথেষ্ট সময় আছে। ওদের বলা হয়েছিল ষাট বর্গ কিলোমিটার খুঁজে দেখতে হবে। নির্দিষ্ট দিনে হেলিকপ্টার পেদ্রোপাভ্লোভস্ক-কামচাটস্কিয়ি ছেড়ে আসবে, গ্রিডের নির্দিষ্ট অংশে তাদের খুঁজবে। ফ্লেয়ার ছুঁড়তে হবে তখন। উজ্জ্বল আলো দেখে তাদের তুলে নেবে কপ্টার।

পরে হেলিকপ্টার নিয়ে চিন্তা করলেও চলবে, জানত সে। প্রথম কাজ দলটাকে খনির কাছ থেকে সরিয়ে দেয়া। কিন্তু আকানভ এখন আর এই জায়গা ছেড়ে সরবে না। প্রশংসা ছাড়বার পাত্র নয় সে। চিন্তায় পড়ে গেল সরোকিন। এদিকে হাতে কোনও অস্ত্র নেই! দ্রুত কোনও ব্যবস্থা নিতে হবে, নইলে সব শেষ হয়ে যাবে!

আরও দেড় ঘণ্টা পড়ে থাকল সরোকিন। পরিকল্পনা শেষে দুঃখবোধ বা পাপবোধ এল না তার। সময় দিল সে দলের সবাইকে। গাঢ় ঘুমে তলিয়ে রইল তারা। রাত চারটের দিকে উঠে পড়ল সে, পেন-লাইট জ্বেলে তাদের মেডিকেল কেস খুলল। ভিতরে ছিল ব্যাণ্ডেজ, অ্যান্টিসেপটিক, অ্যান্টিবায়োটিক্স ও তিনটে সিরিঞ্জে মরফিন।

কালো মাছিগুলো জেদ করে ফিরে আসে বলে এখন আর চাপড় মারে না কেউ, বিরক্ত হলেও হুলের জ্বলুনি সহ্য করে। এতদিনে সবার মুখ-হাত-গোড়ালিতে অসংখ্য হুলের দাগ হয়ে গেছে। লাল ফুটকির শেষ নেই।

সরোকিন মরফিনের একটা সিরিঞ্জ তুলে নিল, তরলটা ফেলে দিয়ে প্লাঞ্জার টেনে নিখাদ বাতাস ভরল সিলিণ্ডারে। সার্ভে দলে সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল মীর, এই ইউক্রেনিয়ান একসময় কিয়েভের সেরা কুস্তিগীর ছিল—সরোকিন ঠিক করল একে আগে সরাতে হবে। সূক্ষ্ম সুঁই বসিয়ে দিল সে মীরের গলায়, ক্যারোটিড

আর্টারিতে। লোকটার আর্টারিতে সামান্য পাল্‌স্‌ টের পেল সে। ধীরে প্লাঞ্জার দাবিয়ে দিল, কুস্তিগীরের রক্তস্রোতে মিশে গেল বাতাসের বুদ্বুদ। কালো মাছির কামড়ে অভ্যস্ত লোকটা, টেরও পেল না কিছু। এরপর কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করল সরোকিন। এরইমধ্যে বুদ্বুদগুলো চলে গেছে লোকটার মগজে। নীরবে স্ট্রোক করল লোকটা, কোমায় চলে গেল। আরও দু'বার বুদ্বুদ নিয়ে খেলল সরোকিন। শুধু শেষদিকে সমস্যা করল বুড়ো প্রফেসর আইয়ো আকানভ। লোকটা নিডলের খোঁচা খেয়ে চোখ মেলল। সরোকিন বাধ্য হয়ে তার মুখ চেপে ধরল, বুকের উপরে চেপে বসে এক হাতে বাতাস ইনজেক্ট করল লোকটার আর্টারিতে। আকানভ আধ মিনিট উঠে বসতে চাইল, তারপর মারা গেল।

সরোকিন গ্যাস লণ্ঠনের আলোয় পরবর্তী কাজ ঠিক করে নিল। উপকূলের পাঁচ কিলোমিটার উত্তরে আছে একটা খাড়া পাহাড়ি ঢাল। ওখানে সাবধান না হলে যে-কেউ পা পিছলাবে, পুরো এক কিলোমিটার নীচে গিয়ে পড়বে। এই তিনজন যদি ওখান থেকে নীচে গিয়ে পড়ে? দেহ এত ক্ষত-বিক্ষত হবে যে চেনা জানে না। পাষাণহৃদয় ডাক্তারও ভয় পাবে দেখলে। এদের অটপসি হবে? মনে হয় না।

প্রথম রাতে দলের সবার নোটবুক আর ফিল্ড জার্নাল পড়ল সরোকিন। খনি বিষয়ে যা কিছু লেখা ছিল, ছিঁড়ে ফেলল। এদিকের এলাকা সম্পর্কে সব জার্নাল গায়েব করে দিল। খাড়া পাহাড়ি ঢালের এ-পাশ নিয়ে যা কিছু লেখা হয়েছিল, উধাও হয়ে গেল। কারও কৌতূহল উদ্রেক করবার মত কিছু থাকল না। নিজের জার্নালের বক্তব্য বদলে দিল সে। লিখল, তারা এসব এলাকা আগেই ঘুরে দেখেছে। আর কোনও দল আবার এদিকে ফিরে আসবে, সে সুযোগ থাকল না।

ভোরে একে একে লাশ ভরা স্লিপিং ব্যাগ সরাল সরোকিন। ইউক্রেনিয়ান মীর ছিল সবচেয়ে ভারী, তার জন্য একটা স্ট্রেচার তৈরি করল সে। নিজের জন্য একটা ব্যাকপ্যাক বানাল, ওটার সঙ্গে আটকে নিল স্লিপিং ব্যাগগুলো। এরপর টানতে শুরু করল। বারবার ক্লান্তিতে সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে পড়ল সে। শেষ লাশটা পরদিন ঢালে নিয়ে যেতে পারল। সে-রাতে আর ক্যাম্পে ফিরল না, লাশের সঙ্গে রাত কাটাল।

তৃতীয় দিন ফিরে এসে ক্যাম্প গোটাল, সমস্ত মালপত্র ঢালের উপরে নিয়ে গেল। লাশগুলোর সঙ্গে বেঁধে দিল সমস্ত প্যাক। এ-দিন সব কাজ শেষ করা গেল না। ঠিক করল পরদিন লাশগুলো ঢাল থেকে নীচে ফেলবে। ভাবতে ভাল লাগে না, মানুষগুলো হাজারো পাথরে ঠোক্কর খেয়ে বহু নীচে গিয়ে পড়বে, কিন্তু কিছু করবার নেই। লোকগুলো ঠিকমত গিয়ে নীচে পড়ল, সেটা নিশ্চিত হতে হবে। হেলিকপ্টার ডেকে আনবার ফ্লেয়ার শুধু প্রফেসার আকানভের কাছে ছিল। লোকটা আগামীকাল বিকেলে ওগুলো জ্বালত।

পরদিন ভোরে ভাল নাস্তা করল সরোকিন—পাঁউরুটি, ক্যান ভরা মাংস, কমলা-লেবু সঙ্গে কফি। খাওয়া শেষে প্রথমে মীরকে ঢালে গড়িয়ে দিল সে। বিনকিউলারে দেখল দেহটা গড়িয়ে নামছে, তারপর গতি বাড়ল, ছিটকে নীচের

দিকে রওনা হলো। মনে হলো লাফিয়ে লাফিয়ে নীচের দিকে ছুটছে লোকটা। একের পর এক আঘাতে রক্তাক্ত দেহটা ফাটা টমেটোর মত হয়ে গেল। হাড়গুলো অনেক আগেই ভেঙে টুকরো হয়ে গেছে। সরোকিন ভাবল, সম্ভবত বাকি দু'জনের অবস্থা আরও করুণ দেখাবে।

এক ঘণ্টা পর পাহাড়ি ঢালে সাবধানে নামতে শুরু করল সরোকিন। পাথরের খোঁচায় তার দু'হাতে ক্ষত তৈরি হলো। নীচে নেমে পাহাড়ে চলবার সমস্ত গিয়ার খুলে ফেলল, খাবার ছড়িয়ে দিল চারপাশে। কয়েকটা ক্যান খুলে খাবার ফেলে দিল। এর ফলে মনে হবে সে চারদিন ধরে এই পাহাড়ের পায়ের কাছে পড়ে আছে।

বিকেল চারটের দিকে আসবে হেলিকপ্টার। তিনটের দিকে অবশিষ্ট মরফিন দুটো বামহাতে ইনজেক্ট করল সে, অপেক্ষা করল ওগুলোর কাজ শুরু হতে। কিছুক্ষণ পর বুঝতে পারল, তার মাথা হালকা হয়ে উঠছে। এবার বড় করে একবার দম নিল সে, ঠিক করে রেখেছে, আর সবার জীবন যাবে, আর তার কিছুই হবে না, সেটা ভাল দেখাবে না—কাজেই ব্যবস্থা নিল।

ডান হাতে বড়সড় একটা পাথর তুলে নিল সে, বামহাত রাখল একটা বিরাট ব্যাসল্টের উপরে, আর দ্বিতীয়বার চিন্তা না করে নামিয়ে আনল বামহাতের উপরে। রেডিয়াস-উলনা, দু'হাড় মট্ করে ভাঙল। ব্যথায় চিৎকার করে উঠল সরোকিন। অ্যাড্রেনালিন আর মরফিনের জোরে আরেকটা ছোট পাথর তুলে নিল সে, মাথায় আঘাত করল। প্রথম আঘাতে চামড়া ফেটে গেল। মুখে গ্যাঁজলা উঠল তার, ব্যথায় বারবার চাইল: 'মরফিন ব্যথা কমিয়ে দিক! দূর করে দিক!' কিন্তু ব্যথা কমল না।

মনে হলো অনেক পরে বহুদূরে হেলিকপ্টারের আওয়াজ শুনল। কয়েকবার চেষ্টা করে শেষপর্যন্ত ফ্লেয়ার ছুঁড়তে পারল। ধোঁয়ার পিছনে ছুটল সাদা ফসফোরাস। পাইলট বোধহয় সঙ্গে সঙ্গে দেখল। লোকটা দেরি না করে চলে এল। সরোকিনের এরপর আর কিছু জানা নেই। তার ঘুম ভাঙল হাসপাতালে, পেদ্রোপাভ্লোভস্ক-এ।

খুব সাধারণ ভাবে তদন্ত হলো। কপ্টারের ক্রুরা যে বর্ণনা দিয়েছিল, সেটাই আরেকবার বলল সরোকিন। জানাল কীভাবে তারা নীচে গিয়ে পড়েছে। তদন্তকারী অফিসার বলল, সরোকিনের কপাল ভাল যে অল্পের উপর দিয়ে বেঁচে গেছে সে। মাথায় আঘাত পেয়েছে, হাতের হাড় ভেঙেছে, অনেক জায়গায় চামড়া ছড়েছে—কিন্তু এর চেয়ে অনেক খারাপ কিছু হতে পারত।

লোকটা তার নোটবুক বন্ধ করে দেয়ার পর সরোকিন শুধু বলেছিল, 'সত্যি, আমার কপাল ভাল যে এখনও বেঁচে আছি!'

টারমাক ছেড়ে এয়ারপোর্ট টার্মিনালে ঢুকল সরোকিন, কয়েকবার বাম বাহু ডলল। গত কয়েক বছর ধরে বৃষ্টি-ভেজা দিনে হাড়ের ব্যথাটা হয়, মনে পড়ে কী করেছে সে।

ইমিগ্রেশন এজেন্ট সরোকিনকে লম্বা লাইনের শেষে দেখতে পেয়েছে, হাতের

ইশারায় ডাকল। স্থানীয়দের কয়েকজন গজর-গজর করল, কিন্তু মুখে প্রতিবাদ করল না।

'আবার এসেছেন, মিস্টার সরোকিন?' হাসি হাসি মুখে জানতে চাইল গার্ড, পাসপোর্ট নিল। ওটার পাতার ফাঁকে একটা বিশ ডলারের নোট উঁকি দিল। ওটা চট্ করে চলে গেল গার্ডের প্যান্টের পকেটে।

'আপনাদের আগ্নেয়গিরি থামলে তবে না শান্তিতে মস্কোয় বসে আমার অফিসের কাজ সারতে পারব,' মৃদু বিরক্তি ফুটল সরোকিনের কণ্ঠে।

'এসব আসলে ভূতের কাজ,' গোপন কথা বলছে, এমন ভাবে বলল গার্ড। 'স্থানীয়রা বলে তাদের বাবা-দাদার আত্মা রাতে তিমি মাছ ধরতে যায়, আর ভোরে আগ্নেয়গিরিতে ফিরে বড় চুল্লিতে মাংস রাঁধে।'

'হাড় পেলে তখন ভূতের দোষ দেব,' বলল সরোকিন। 'আপাতত ধরে নিলাম এখানে টেকটোনিক অ্যাক্টিভিটি সমস্যা করছে।'

সেই ঘটনার পর সুস্থ হয়ে মস্কোতে ফিরে যায় সে, গোপন তথ্য নিজের কাছেই আটকে রাখে। নীরবে ব্যুরো অভ ন্যাচারাল রিসোর্সেস-এ কাজ করতে থাকে। সোভিয়েত ইউনিয়ন টুকরো হয়ে যাওয়া পর্যন্ত ওখানে চাকরি করে। রাশার অস্থির দিনগুলোয় বিদেশিদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে সে। এক পাকিস্তানী তাকে পরিচয় করিয়ে দেয় মুদাস্‌সর আলী খানের সঙ্গে। লোকটাকে একটুও পছন্দ না হলেও ভবিষ্যতের কথা ভেবে ঘনিষ্ঠতা গড়ে নেয় সে। জানত, এসব লোক পরে তার কাজে আসবে।

এক সিমপোজিয়ামে এক সুইস মেটালার্জিস্টের সঙ্গে পরিচয় হয় তার। ওই লোকই তাকে পরিচয় করিয়ে দেয় সুইস ব্যাঙ্কার ফ্রেডারিখ বাউয়ারের সঙ্গে। দেখেই চিনেছে দুজন দুজনকে রুথলেস অপরচুনিস্ট হিসাবে। বাউয়ারের সঙ্গে একটা চুক্তিতে আসতে বেশি সময় লাগেনি তার ও মুদাস্‌সর খানের।

টাকা ঢালে ব্যাঙ্কার, কয়েকটা ছায়া-কোম্পানি গঠন করে, দুটো রাশান ড্রাই-ডক কিনে নেয়। এরপর মুদাস্‌সর খানের উপর বর্তায় মানুষ সংগ্রহের কাজ। এদিকে সরোকিন চলে যায় কামচাটকায়। সে গত এক বছরে বহুবার কামচাটকায় এসেছে। এখানে এলে সরোকিন সব সময় নিজেকে ভলকানোলজিস্ট হিসেবে পরিচয় দেয়। সাধারণ মানুষ জানে ওই লোক কামচাটকায় যত রকমের অগ্ন্যুৎপাত হয়, সেগুলো পরীক্ষা করে। মাসে অন্তত একবার এখানে আসে। তার জন্য আভাচা হোটেলে একটা রিজার্ভেশন থাকে। এর বেশি কিছু জানবার দরকার কী?

সরোকিন ব্যাগ যোগাড় করে সোজা স্কাই অ্যাডভেঞ্চারার্স কোম্পানির কাউন্টারে চলে এল। বেশ কিছুদিন হলো পেনিনসুলার রুক্ষ পর্বত-চূড়ায় স্কিইং চালু হয়েছে। তিনটে কোম্পানি স্কিয়ারদের হেলিকপ্টারে তুলে পাহাড়ে নিয়ে যায়। স্কাই অ্যাডভেঞ্চারার্স কোম্পানি স্কি ট্রিপের ব্যবস্থা করে। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় এই কোম্পানি বে-আইনি কিছু করে না, কিন্তু আসলে ওটা ডামি কোম্পানি। ফ্রেডারিখ বাউয়ার ওটা ফর্ম করেছে সরোকিনের জন্য। যেন যখন তখন

হেলিকপ্টার পেতে পারে। সবসময় এলিযোভো এয়ারপোর্টে তার জন্য একটা প্রাইভেট হেলিকপ্টার থাকলে মানুষের চোখ পড়বে, তা-ই এই ব্যবস্থা।

কাউন্টারের পিছনে বসে জাপানি ফ্যাশন ম্যাগাজিন পড়ছিল মেয়েটা, সরোকিনকে আসতে দেখে পত্রিকা রেখে কপট হাসি উপহার দিল। এই মেয়েকে আগে এখানে দেখেনি সরোকিন।

'স্কাই অ্যাডভেঞ্চারার্স-এ আপনাকে স্বাগতম,' বলল মেয়েটা।

'আমার নাম ভ্লাদিমিয়ার সরোকিন,' প্রায় ধমকে উঠল সে। 'ইউরি কোথায়?'

মেয়েটা বিস্মিত হলো, তারপর ওর চোখে চাকরি হারাবার ভয় প্রকাশ পেল। অফিসের আরেকদিকে পর্দা টাঙানো আছে, দ্রুত পায়ে ওপাশে চলে গেল সে। পনেরো সেকেণ্ড পর পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এল সরোকিনের পাইলট, ইউরি স্ত্রামভ। লোকটা জলপাই রঙের ফ্লাইট সুট পরে আছে। 'মিস্টার সরোকিন, ভাল আছেন?' ভদ্রতা দেখাল সে। 'ভেবেছিলাম হোটেলে উঠবেন। সকালে রওনা হবেন।'

'হ্যালো ইউরি,' বলল সরোকিন। অন্য কেউ শুনে ফেলতে পারে, কাজেই বলল, 'না, এখন ওখানে যাব না। অগ্ন্যুৎপাতটা রাত নামার আগেই দেখতে চাই।'

'তা হলে ফ্লাইট প্ল্যান জমা দেব?'

'দাও।'

চল্লিশ মিনিট পর মোচড়ানো একটা উপত্যকা ধরে ছুটে চলল কপ্টার। রুক্ষ পাহাড়গুলো কখনও কখনও আট হাজার ফুট উপরে উঠেছে। স্কাই অ্যাডভেঞ্চারার্সের এমআই-এইট কপ্টার দ্রুত ছুটছে। দূরে দেখা যায় কিছু চূড়া, ওগুলো পনেরো হাজার ফুটের বেশি। উত্তরে রয়েছে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, ওটা গরম ছাই ছুঁড়ছে আকাশে। কয়লার গুঁড়ো মেশা বাতাসে পোড়া পোড়া গন্ধ। কপ্টারের বয়স মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর, কাজেই ওটার আওয়াজে কথা বলা যায় না। আরও দু'ঘণ্টা এই আওয়াজ সহ্য করতে হবে।

বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকল সরোকিন, মন থেকে সমস্ত চিন্তা দূর করে দিল।

অনেক পরে কাঁধে টোকা পড়ায় ঘুরে তাকাল সে। পাইলট সামনের দিকে কী যেন দেখাচ্ছে। সরোকিন দেখল ওরা গন্তব্যের কাছে চলে এসেছে।

এত উপর থেকে দূরে তাকালে মনে হয় চারপাশের প্রকৃতি অনাদিকাল থেকে এমনি পবিত্র। গালফ অভ শেলেকভ-এর কালো জলরাশিতে মিশে আছে হলদেটে দাগ। উপকূলে বেশ কিছু কন্টেইনমেন্ট বুম ছড়িয়ে আছে। কাজ এখনও বুম পর্যন্ত যায়নি। দূর থেকে দেখতে ভাল লাগছে, কিন্তু বাস্তবে লোহার খুঁটি দিয়ে একরের পর একর জমি তারপুলিনে ঢেকে দেয়া হয়েছে। তারপুলিনের উপরে বরফের ছবি আঁকা হয়েছে, কখনও ছাইয়ের ছবি। কয়েকটা জাহাজ সৈকতে আটকা পড়েছে। ওগুলোর উপর দিয়ে গেছে ক্ল্যামোফ্লেজ নেট। নেটের উপরে বালি, মাটি, পাথর ফেলা হয়েছে, ওগুলো দিয়ে জাহাজের আকৃতি লুকানো হয়েছে।

এই এলাকার একশো মাইলের মধ্যে মানুষের উপস্থিতি বোঝা যেত না, যদি

না জাহাজগুলোর চিমনি ধোঁয়া ছাড়ত। কর্মীদের জন্য গরম খাবার ও তাপ না দিলে চলবে না।

সাগরের দিকে তাকাল সরোকিন। একটা ট্রলার তীরের দিকে ফিরে আসছে। প্রচুর মাছ ধরেছে, ওগুলোর ওজনে ডুবুডুবু। সর্বক্ষণ দুটো ট্রলার ডাঙায় তোলা জাহাজে ফিউল, মিষ্টি পানি ও খাবার যোগান দিচ্ছে। এই বসতি দুনিয়াকে কলা দেখিয়ে মাসের পর মাস টিকে থাকতে পারবে। সরোকিনের গর্বের কারণ রয়েছে। অর্ধেক জীবন ব্যয় করেছে সে পরিকল্পনার খুঁটিনাটি সব ঠিক করতে, তারপর গড়ে তুলেছে এই বসতি!

তার কারণে হাজার মানুষ পেট ভরে খেতে পাচ্ছে আজ।

তিক্ত হাসল সরোকিন, সব সামলেছে সে। কিন্তু একটা ব্যাপার এখনও মন থেকে মানতে পারেনি। বড় দ্রুত কাজ করতে হচ্ছে। ক্রমেই বাড়তি মানুষ পাওয়া কঠিন হয়ে উঠছে।

ইউরি স্ক্রামভ সাইট ম্যানেজারের কাছে রেডিয়ো করেছে, লোকটা হেলি-প্যাডে হাজির হয়েছে। কপ্টার নীচে নামতেই এগিয়ে এল সে। দরজা খুলে নেমে পড়ল সরোকিন, কেঁপে উঠল হাড় কাঁপানো শীতল হাওয়ায়। তারা আছে আর্কটিকের মাত্র চারশো মাইল দক্ষিণে। মে মাস চলছে, কিন্তু শীত যেন জমিয়ে দেবে।

'এলেন তা হলে, সরোকিন,' বলল গিলবার্ট ওয়ালজ্যাক। 'আসুন।' সঙ্গী জিপের সামনের সিটে উঠতেই গিয়ার দিল সে, খুশি মনে বলল, 'আমাদের কাজ ঘুরে দেখবেন?' দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী খনি ইঞ্জিনিয়ার সে, লম্বা-চওড়া লোক, প্রচুর মদ গিলতে পারে।

সরোকিন মাত্র একবার এই প্রোজেক্ট ঘুরে দেখেছে, তখনই মনে মনে ঠিক করেছে, আর কখনও প্রোজেক্ট দেখতে যাবে না। মাথা নাড়ল সরোকিন, 'ভাল ভাবে কাজ চলছে জানি, বরং আপনার অফিসে চলুন। আমার ব্যাগে একটা স্কচ উইস্কি আছে।' ওয়ালজ্যাকের ভাল-মন্দ যা-ই হোক, তার কিছু যায়-আসে না। কিন্তু এখন লোকটাকে খুশি না করে উপায় নেই। প্রতি বছর ওয়ালজ্যাক বেতন হিসাবে পাঁচ মিলিয়ন ডলার পাচ্ছে, এই বেতনের হাজারগুণ কাজ আদায় করে নিতে হবে ওর কাছ থেকে মাথায় হাত বুলিয়ে।

ছয়টা জাহাজ সৈকতে বাঁধা আছে, ওগুলো সব পুরনো ক্রুজ লাইনার। মুদাস্‌সর আলী খান এক বছর আগে জাহাজগুলো যোগাড় করে দিয়েছে। ওগুলোর বয়স হয়েছে, কিন্তু জিনিসগুলো সরোকিনের প্রয়োজন পূরণ করতে যথেষ্ট। গিলবার্ট ওয়ালজ্যাক তিনশো ফুটি একটা ক্রুজ শিপের অ্যাম্বাসেডার সুইটে আস্তানা গেড়েছে। এটাই তার অফিস।

একসময় সুইটের সোনালী-নীল ডেকোরেশন ছিল দেখবার মত, কিন্তু এখন কার্পেটও নানান জায়গায় ছিঁড়ে গেছে। এখানে-ওখানে পড়ে আছে সিগারেটের বাট। আসবাবপত্রের ছাল চামড়া উঠে গেছে, বাতির ফিক্সচার ছিঁড়ে নামানো হয়েছে। সরোকিন টয়লেটে গিয়ে টের পেল নাকে প্রস্রাবের বিশ্রী দুর্গন্ধ আসছে। পারদ খসে যাওয়া আয়নাটা নষ্ট হয়ে গেছে, নিজের অবয়ব দেখে বিরক্ত হলো

সে, কাজ সেরে প্যান্টের চেইন টেনে টয়লেট ছেড়ে বেরিয়ে এল।

সুইটের লিভিং রুমের একটা সোফায় বসেছে ওয়ালজ্যাক। তার মুখোমুখি বসল সরোকিন। সাইট ম্যানেজার দুটো টাম্বলারে স্কচ ঢালল, একটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'ড্রাই-ডকে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে।'

'কোন্‌টায়?' স্কচ নিল সরোকিন।

'দ্য চুহায়। আপনার দুই কমাণ্ডো নিয়ম না মেনে টার্পের উপর দিয়ে হোল্ড পার হতে চেয়েছে। লোক দুটো টার্প ছিঁড়ে নীচে পড়ে মারা গেছে।'

হালকা চুমুক দিল সরোকিন, 'এমন তো নয় যে কেউ ধাক্কা মেরেছে?'

'না। এরা হারিয়ে যাওয়ায় আর সবাই খুঁজতে বের হয়। লাশ পাওয়ার পর হোল্ড আর জাহাজ খুঁজেছে তারা। ড্রাই-ডকে কেউ ওঠেনি। কারও সঙ্গে মারামারির চিহ্ন ছিল না। ধারেকাছে বলতে একটা ইরানিয়ান ফ্রেইটার ছিল। ওটার মোল্লারা জানে না আমরা কী করি, কাজেই ধরে নেয়া যায়, ওরা আমাদের উপরে হামলা করেনি।'

বিড়বিড় করে কপালের দোষ দিল সরোকিন। সে ড্রাই-ডকের জন্য স্পাত্‌স্‌ন্যাজের প্রাক্তন যোদ্ধাদের নিয়েছে। তাদের ট্রেইনিং অনুযায়ী তারা প্যাট্রলের সময় অন্যদিকে যায় না। কিন্তু এখন বোঝা যাচ্ছে, এই দু'জন ভুল করেছিল। সবাইকে বলা হয়েছে, একবার কোনও জাহাজ দখল করলে যেন সতর্ক থাকে। কিন্তু বাস্তব কথা হচ্ছে, খোলা সাগরে এরা খামোকা সতর্ক থাকবে কেন! লোক দু'জন প্যাট্রলের পথ বদলে হোল্ডের উপরে যায়, ফেব্রিক ছিঁড়ে নীচে পড়ে। এর ফলে অন্যরা সাবধান হবে।

কোনও সন্দেহ নেই যে, ব্যাপারটা দুঃখজনক দুর্ঘটনা। এদের ব্যাপারে সমস্ত চিন্তা মন থেকে দূর্ করে দিল সরোকিন। জিজ্ঞেস করল, 'এদিকে সব খবর ভাল?'

দক্ষিণ আফ্রিকানের দাঁতগুলো খয়ে যাওয়া, হলদেটে, বিশ্রী। মনে হলো দাঁত খিঁচাল। 'দারুণ চলছে সব। আপনি যে রিফ পেয়েছেন, তার তুলনা হয় না। আগে কখনও এরকম খনি দেখিনি। রিফে খনিজের শেষ নেই। হাসতে হাসতে বারো পার্সেন্ট পাই। আর এখন পর্যন্ত শুধু পাহাড়ি ঢালে কাজ চলছে। আমরা আসল খনি এখনও ধরিইনি!'

'কবে প্রথম চালান পাঠাতে পারবেন?'

'যা ভেবেছি, তার আগে। দ্য চুহিতে যে জিনিস আছে, সেজন্য তিনগুণ লোক দিয়েছি। ওটার ফিরতে দশ দিন লাগবে, তারপর মাল সহ দক্ষিণে রওনা করিয়ে দেব।'

'ঠিক আছে। দু'দিন আগে বাউয়ারের সঙ্গে কথা হয়েছে। প্রসেসিং সেন্টার তৈরি হয়ে গেছে। আগামী সপ্তাহে ব্যাঙ্কগুলোর ডাইস আর স্ট্যাম্প চলে আসবে।'

'তারপর? ব্যাঙ্কগুলো ওগুলো নিয়ে নেবে?'

'যত দ্রুত সম্ভব দিতে হবে।'

ওয়ালজ্যাক নতুন করে স্কচ ঢালল, গ্লাস তুলে দিল সরোকিনের হাতে। টোস্ট করে বলল, 'বাউয়ারের অসীম লোভ আর নির্বোধ গরিবগুলোর বোকামির

প্রতি। ভালই বুদ্ধি বের করেছেন সরোকিন, রাজা হয়ে যাবেন আপনি অল্পদিনেই।'

মৃদু হেসে চুমুক দিল সরোকিন স্কচে।

চোদ্দ

রাত প্রায় বারোটা বাজে। সাইকেলের দোকানের উপরের তলায় থাকে গেনজি গাওলুংরা। তাদের বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এল লিউ ফু-চুং। ওর কথা শুনে মুষড়ে পড়েছে দম্পতি। ওরা একবার ছেলে হারিয়েছে, চলে গেছে সে স্নেক-হেডের সঙ্গে, এবার শুনতে হলো, সাগর সারাজীবনের জন্য তাকে নিয়ে গেছে। ফু-চুং নিজেকে চিন মিলিটারিচালিত শিপিঙের খালাসি হিসেবে পরিচয় দিয়েছে। বলেছে, শাংহাই ফেরবার পথে তারা একটা কন্টেইনার পেয়েছে। ক্যাপ্টেনের নির্দেশে ওটা তুলে আনে ওরা। সবাই ভেবেছিল কেউ দামি কিছু হারিয়েছে। ফু-চুং লাশের ব্যাপারে আর বিস্তারিত কিছু বলেনি, শুধু বলেছে, ওরা ডায়েরি পড়ে প্রতিজ্ঞা করে ছেলেটার পরিবারকে খবর পৌঁছে দেবে।

গেনজিকে দেড় ঘণ্টা পটানোর পর জানা গেছে স্নেক-হেড কোথায় থাকে। এই সিয়েন লাউয়ের অফিস কাছেই। কেন ফু-চুং লোকটা সম্পর্কে জানতে চাইছে, সেটা জিজ্ঞেস করেনি গেনজি। সন্তান হারিয়ে আর কোনও কিছুতেই আগ্রহ নেই মানুষটার। হু-হু করছে তার মন হুতাশে। স্বাভাবিক।

হাঁটছে ফু-চুং। শহরে বৈদ্যুতিক আলো এসেছে, তবে সবাই এখনও নিতে পারেনি। সন্ধ্যায় বেশিরভাগ বাড়িতে মোমের বাতি জ্বলতে দেখেছে ও। এখন সব অন্ধকার। বিকেলে শহরের স্কয়্যারে বিশ চাকাওয়ালা মিলিটারি ট্রাক এসেছিল। আরও সৈন্য এসেছে। সেনাবাহিনী স্কয়্যারে ক্যাম্প করেছে।

হাঁটবার গতি বাড়াল ফু-চুং। রাস্তা একদম ফাঁকা। কোনও মানুষ নেই। শহরে মিলিটারি এলে যা হয়। সবাই যার-যার বাসায় বসে আছে। ফু-চুং জানে, একটা বার-এ যেতে হবে। ওটা ওয়্যারহাউজ ডিস্ট্রিক্টে। ওখানে আছে সিয়েন লাউ, একটা বার চালায় সে। এই লোকই আনজি গাওলুং ও তার ভাইদের মৃত্যুর মুখে পাঠিয়েছে।

মিন নদী থেকে এদিকে একটা খাল এসেছে, ওটার পাশ দিয়ে গেছে রাস্তা। লং মার্চ স্ট্রিট। দু'পাশে অ্যাসফল্টের বাড়ি ও ওয়্যারহাউজ। এখানে ওখানে বাতি দেখা গেল। নোনা ধরা বাড়ি-ঘর আর করোগেটেড আয়রনের ওয়্যারহাউজগুলো পুরোনো আমলের গন্ধ ছাড়ছে। ওগুলো যেন পাশের বাড়ির গায়ে পড়বে। মাঝে মাঝে ফাঁকা জমি, ঝোপঝাড় জন্মেছে। মাটি কালো, তাতে মিশে আছে গ্রিজ।

ডানপাশে একটার পর একটা তিনতলা অ্যাপার্টমেন্ট ভবন। নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে ফু-চুং। ভবনগুলোর মাঝখানে সরু গলি আছে, ওখানে আবর্জনার স্তূপ পড়ে আছে। বর্জ্যের ভিতরে দৌড়াদৌড়ি করে খাবার খুঁজছে ইঁদুর-বিড়াল। একটা

শিশু পাশের একটা অ্যাপার্টমেন্টে কেঁদে উঠল। বাতি জ্বালল মা।

রাস্তার শেষমাথার একটা দোকান এখনও খোলা, ভিতরে আলো জ্বলছে। গানের শব্দ শুনতে পেল ফু-চুং। আন্দাজ করল, ওটাই বার। হাঁটার গতি কমাল ও, আনজির কথা মনে পড়ল। স্নেকহেড তাকে নিয়ে গিয়ে আর কারও হাতে তুলে দিয়েছে। পরের ঘটনা জানা নেই। শেষপর্যন্ত ছেলেটা লাশ হয়ে মার্ভেলের ডেকে পড়ে ছিল। আনজির অনুসরণ করবে ও, নিজেও লাশ হয়ে যেতে পারে। একবার নিজেকে সিয়েন লাউয়ের হাতে তুলে দিলে আর কিছু করবার থাকবে না। অন্ধের মত এগিয়ে যেতে হবে। কোথায়, কে জানে!

পপ মিউজিক ভেসে আসছে। কয়েকবার বড় করে শ্বাস নিল ও। ফাঁদে পা ফেলতে মন সায় দেয় না, কিন্তু আর কোনও পথও নেই। সিয়েন লাউকে ধরতে পারে ওরা, কিন্তু অপরাধী-চক্রের নেতারা শিকলের উপরের লিঙ্কটাকে সরিয়ে নিলেই আর কাউকে পাওয়া যাবে না। আগেও এমনই ঘটেছে। আসলে এদের সঙ্গে যেতে হবে, জানতে হবে কী ভাবে এদের ঠেকানো যায়।

শেষ কয়েক পা দ্রুত এগোল ফু-চুং। কোনও বাউন্সার নেই, দরজা ঠেলে বারে ঢুকল ও। বার কাউন্টারের পিছনে আছে দুটো স্পিকার, ওগুলো অতিরিক্ত জোরে বাজছে। ঘরের ভিতরে সিগারেটের ধোঁয়া এত ঘন যে মনে হলো টিয়ার গ্যাসের মধ্যে পড়েছে। ধোঁয়ায় দু'চোখ জ্বলে উঠল ওর। বিয়ার পড়ে মেঝে পিছলা হয়ে আছে। কাঠের প্ল্যাঙ্কিঙ এখানে-ওখানে পচে গেছে। বেশিরভাগ কাস্টোমার তরুণ, আমেরিকান তরুণদের অনুকরণে কালো লেদারের জ্যাকেট পরেছে। তরুণীদের পরনে মিনি-স্কার্ট ও পেট-খোলা টপ্‌স্। দ্রুত ছন্দের গান চলছে, কিন্তু ফু-চুঙের মনে হলো, এখানে অন্য কিছু ঘটছে। নোঙরা কিছু।

পিছনে বার কাউন্টার, ওটার সামনে টুলে বসে আছে কয়েকজন। ফু-চুং চট্ করে বুঝে নিল আসল সমস্যা কোথায়। ওখানে তিনজনের পরনে ইউনিফর্ম। আর সবাই সতর্ক হয়ে উঠেছে। সিয়েন লাউ এখানে থাকলেও অন্যদের মতই নিশ্চুপ। ভুলেও মাতাল সৈন্যদের ঘাঁটাবে না সে। কাজেই ধরে নেয়া যায় তরুণরা মুখ সামলে রাখবে। সৈন্যরা পেট ভরে বিয়ার গিলে চলে গেলে পরিবেশ স্বাভাবিক হবে।

ফু-চুঙের দিকে দ্বিতীয়বার দেখল না কেউ। কাউন্টারের এক কোনায় গিয়ে টুলে বসল ও, একটা বিয়ার চাইল। আর কোনও দিকে দেখছে না এমন একটা ভঙ্গি নিল, কোমরের পেট-মোটা থলি খুলল, বের করল টাকার মোটা বাণ্ডিল। নিশ্চিত হলো, বার-টেণ্ডার ওগুলো দেখেছে। লোকটা বিয়ার দিয়ে গেল। দ্রুত চিন্তা করছে ফু-চুং, বিয়ারে এক চুমুক দিয়ে অর্ধেক নামিয়ে দিল, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, কী করবে।

সৈন্যরা চলে গেলে ভাল হতো। কিছুক্ষণ পর নিশ্চয়ই রাতের মত বার বন্ধ হয়ে যাবে। কাল সকালে মৃত সৈন্যের খোঁজ পড়বে, আর্মি গ্রাম তন্নতন্ন করে খুঁজবে—সিয়েন লাউ তখন আড়ালে চলে যাবে, লাশটা না পাওয়া পর্যন্ত স্মাগলিং রিং বন্ধ রাখবে। আর্মি দু'চারজন খারাপ লোককে ধরবে, পিটাবে, কিন্তু কিছুই জানতে পারবে না। লাউ চুপচাপ অপেক্ষা করবে, লাশ পাওয়ার পর আর্মি

একসময় বাধ্য হয়ে চলে যাবে। তখন সে নতুন করে নিজের আদম-পাচার শুরু করবে। ফু-চুং জানে, ও আজ রাতে পাচার হয়ে গেলে ভাল হয়। যত দ্রুত সম্ভব জানতে হবে স্নেক-হেড ও জলদস্যুদের মধ্যে কী সম্পর্ক। আড় চোখে তিন সৈন্যকে দেখল ফু-চুং। এবার এদের এখান থেকে সরিয়ে দিতে হবে। বার-টেণ্ডারের তিক্ত চেহারা বলছে, কিছুক্ষণ পর সবাইকে চলে যেতে বলবে সে।

সৈন্যের একজন প্রচুর বিয়ার টানছে। লোকটা কর্পোরাল। সঙ্গের দু'জন বয়সে কম, পদেও। কর্পোরাল আকাশ-কুসুম গল্প শুনিয়ে তাদের মুগ্ধ করছে, সেইসঙ্গে একের পর এক বিয়ার শেষ করছে। দুই জোয়ান হাঁ করে শুনছে। চেহারা বলে দেয় এরা কয়েকদিন আগেও খামারে কাজ করত। যা-ই শুনছে, বিশ্বাস করছে, ভাবছে দুনিয়ায় কী না কী যে ঘটছে, আর তারা লাঙ্গল নিয়ে পড়ে ছিল! কর্পোরালের কথাবার্তায় মনে হয় সে শহরের মানুষ। ফু-চুং ভাবল, ও যে শহুরে সৈন্যকে খুন করে এসেছে, এই লোক হয়তো তারই বন্ধু! গল্প বানাতে ওস্তাদ এ, বলে চলেছে কী ভাবে শত শত মেয়েকে পাগল করেছে। কত লোক তার কাছে হেরে গেল, তার কোনও হিসাব নেই। কমবয়সী সঙ্গীদের মাথা নষ্ট করছে লোকটা। দুই তরুণ এসব শুনে ভবিষ্যতে কী করে বসবে, কে জানে! লোকটা আরেকটা কাহিনি শুরু করেছে, মাথা কাত করে কাছের মেয়েটাকে দেখাল সে, চাপড় দিল ওর উরুতে, চাতুর্যের হাসি নিয়ে বলতে শুরু করল, 'কিছু কিছু মেয়ে আবার আমাকে দেখেই...'

স্থানীয় তরুণরা কিছু করে কি না দেখতে অপেক্ষা করল ফু-চুং। কালো জিন্স ও মোটর সাইকেলের জ্যাকেট পরা এক লোক ঘরের অন্ধকার প্রান্তে তাকাল, দ্রুত চোখের ইশারা করল। সৈন্যরা দেখেনি, কিন্তু ফু-চুং দেখেছে। ওদিকের প্রায় অন্ধকার টেবিলে বসে আছে তিনজন লোক। তাদের সঙ্গে বসেছে দুটো মেয়ে, দেখলে মনে হয় যমজ। তাদের দু'পাশের লোক দুটো বডি-গার্ড। সম্ভবত তৃতীয় লোকটা এ শহরের স্নেকহেড, সিয়েন লাউ। কালো টি-শার্টের উপরে কালো স্যুট পরেছে সে, চোখে কালো সানগ্লাস। সিয়েন লাউ আস্তে করে মাথা নাড়ল। আর্মির সঙ্গে গোলমালে যেতে চায় না সে।

ফু-চুঙের দৃষ্টি লক্ষ করেছে স্নেকহেড। নিজের মনের ইচ্ছা লুকিয়ে রাখল না ফু-চুং। উঠে দাঁড়াল, বিয়ার শেষ করে বোতলের গলাটা ধরল। সিয়েন লাউ রে-ব্যান সানগ্লাস নাকের ডগায় নামিয়ে দিয়ে ওকে দেখছে। চেহারায় কোনও অনুভূতি নেই। তার দুই সঙ্গী কিছুই টের পায়নি।

কর্পোরালের পিছনে চলে গেল ফু-চুং, লোকটার মাংসল কাঁধে টোকা দিল। লম্বা-চওড়া লোকটা পাত্তা দিল না, ঘাড় ফেরাল না। তার সঙ্গের এক জোয়ান ফু-চুংকে সতর্ক চোখে দেখল। ইতিমধ্যে ঘরের সবাই টের পেয়ে গেছে কিছু ঘটছে। ফিসফিস করে কথা বলছে তারা, তারপর চুপ হয়ে গেল। স্টেরিয়োতে এখনও গান বাজছে। ফু-চুং দ্বিতীয়বারের মত কর্পোরালের কাঁধে টোকা দিল। আগের চেয়ে জোরে।

বারের স্টুলে চরকির মত ঘুরল কর্পোরাল, ঝট করে উঠে দাঁড়াল। ফু-চুং যা ভেবেছে, তার চেয়ে অনেক স্বাভাবিক আছে লোকটা। টলছে না। শুয়োরের মত

কুতকুতে দু'চোখ সরু করল সে, সামনে দাঁড়ানো কাঁধ-সমান লোকটাকে দেখল। মনে হলো চিন্তায় পড়ে গেছে সে। ভাবছে, এই খাটো শালার-পো শালা তার সঙ্গে লাগতে এল কী করে! বুঝে উঠতে পারল না, ব্যাটা কোন্ সাহসে এল!

ভদ্রতার সঙ্গে বলল ফু-চুং, 'আমার মনে হয় তোমার ওই ভদ্রমহিলার কাছে মাফ চাওয়া উচিত। তারপর তোমরা এখান থেকে চলে গেলে সবাই খুশি হবে।'

কর্পোরালের কণ্ঠ গমগম করে উঠল, হাসছে। 'তোমার তা-ই মনে হয়?' আরেকবার হেসে নিল সে। 'তুমি নিজে বরং চলে যাও।' ভারী একটা হাত রাখল সে ফু-চুঙের বুকে, তারপর গায়ের জোরে ধাক্কা মারল।

তৈরি ছিল ফু-চুং, চট করে পিছলে সরে গেল ও। কর্পোরাল শত্রুকে ঠেলতে গিয়ে নিজেই এক পা এগিয়েছে। ফু-চুং যা ভেবেছে, কর্পোরালের দুই সঙ্গী স্টুলে বসে থাকল। ওরা আশা করছে ওদের ওস্তাদ দারুণ একটা পিট্টি দেবে এই লোকটাকে। কর্পোরাল বিদ্যুৎ-গতিতে শত্রুর মাথা লক্ষ্য করে ঘুসি ছুঁড়ল। ঝুঁকে পড়ে ঘুসি এড়িয়ে গেল ফু-চুং। সঙ্গে সঙ্গে এল বামহাতি জ্যাব। এবার আর সরতে পারল না ও, ঘুসি এসে পড়ল পাঁজরের উপরে। তীব্র ব্যথার ফাঁকে ভাবল ফু-চুং, হয় লোকটা মোটেই মাতাল নয়, নইলে বার-এ মারামারিতে রীতিমত অভ্যস্ত।

কর্পোরাল নিজের বিয়ারের বোতল তুলে নিল, ওটার তলার অংশ কাউন্টারে আছড়ে ভাঙল। তার হাতে রয়ে গেল অর্ধেকের বেশি। তলার অংশ ছুরির মত তীক্ষ্ণধার। দেরি না করে শত্রুর মাথা লক্ষ্য করে চালাল সে। ফু-চুং নিজের বোতলটা ভাঙতে পারত, কিন্তু কর্পোরালকে মেরে ফেললে ওর চলবে না। এদের তিনজনকে বার থেকে বের করে দিতে হবে, কিন্তু পুলিশ আসবে না, এমন কিছু করতে হবে!

কর্পোরাল দাঁত খিঁচিয়ে হিসহিস করে বলল, 'আমার মনে হয় একটু রক্ত হারানো উচিত তোমার!' শত্রুর গলায় বোতল বসাতে চাইল সে। কাঁচ আরেকটু হলে ফু-চুঙের কার্টিলেজ-আর্টারি ছিঁড়ে দিত, কিন্তু লাফিয়ে পিছিয়ে গেল ও। ভাঙা বোতল ওর মুখের সামনে দিয়ে চলে গেল। কর্পোরালের পাঁজরে বোতলে গুঁতো বসাল ও। পেটের পেশিতে আঘাত পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল লোকটা, পিছিয়ে গেল।

তার সঙ্গের দুই জোয়ান উঠে দাঁড়িয়েছে।

ওদের দিকে কড়া চোখে চাইল ফু-চুং, চাপা স্বরে বলল, 'এর মধ্যে নাক গলিয়ো না।' কর্পোরালের দিকে দেখল, পরমুহূর্তে মার্শাল আর্টের স্ট্যান্স-এ দাঁড়াল, মনে হলো আসলে ওর শরীর পানি দিয়ে তৈরি। বোতলটা আস্তে করে ছেড়ে দিল ও।

শত্রুর অনুকরণে কুঁজো হয়ে দাঁড়াল কর্পোরাল, মুখের সামনে দু'হাত দ্রুত দোলাল, চোখ রাখল ফু-চুঙের দিকে।

মস্ত ভুল করল সে।

ফু-চুঙের ঊর্ধ্বাঙ্গ নড়ল না, কিন্তু পরপর তিনবার লাথি ছুঁড়ল ও—পাঁজরে, হাঁটুতে ও পেটে। পেটে খুব ভাল ভাবে লাগল না, তবে লোকটার সাবধান হওয়া উচিত ছিল।

কর্পোরালকে সোজা হতে দিল না ফু-চুং, মুহূর্তে তার গায়ের কাছে চলে গেল। মনে হলো ওর দু'হাত দ্রুত কী যেন করল। লোকটা একের পর এক ঘুসি খেল—গলায়, পাঁজরে, সোলার প্লেক্সেস-এ, মাথায়, আবার পাঁজরে, নাকে। দ্রুত পিছিয়ে গেল ফু-চুং। মাত্র পাঁচ সেকেণ্ড নিয়েছে ও। লোকটার মুখ এখন রক্তাক্ত একটা পিণ্ড।

তার সঙ্গের এক জোয়ান হাত মুঠো করে ফেলল, ভাবছে কর্পোরালের সাহায্যে এগোবে কি না। সুযোগটা দিল না ফু-চুং, তার গলায় হাত রেখে বাধা দিল। চাপা স্বরে বলল, 'ওর জন্যে বিপদে পোড়ো না। ওটা কোনও মানুষ না।' ফু-চুঙের শ্বাস একেবারে স্বাভাবিক, আস্তে করে ধাক্কা দিয়ে ছেলেটাকে স্টুলে বসিয়ে দিল।

কর্পোরাল এখনও দাঁড়িয়ে আছে, টলছে সামনে-পিছনে। চোখে তীব্র ঘৃণা। সাধারণত এমন ঘটলে সৈন্যরা পরে আবার দলবল নিয়ে আসে। সুযোগটা দিল না ফু-চুং, লোকটার মাথার পাশে পরপর দুটো রাউণ্ড-হাউজ কিক মারল। কর্পোরাল প্রথম কিকে উবু হয়ে গেল, চোখ উল্টে গেল তার। দ্বিতীয় কিকে ধড়াস্ করে পড়ল সে। মেঝে থরথর করে কাঁপল। জ্ঞান হারিয়েছে লোকটা। আগামী কয়েক ঘণ্টা ঘুমাবে। অন্তত চব্বিশ ঘণ্টা চুপচাপ পড়ে থাকবে, কথা বলতে পারবে না। পরে প্রতিশোধের কথা ভাববে।

দুই জোয়ানের দিকে তাকাল ফু-চুং। 'ভাগ্য তোমাদের নিজেদের হাতে, ওর বদলে ভাল কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব করা উচিত তোমাদের। ওর মুখে বড়বড় কথা শুনতে পাবে, কিন্তু তোমরা বিপদে পড়লে ও কোনও সাহায্যে আসবে না। কথাটা বুঝতে পেরেছ?' নীরবে মাথা দোলাল এক জোয়ান। 'ওকে ক্যাম্পে নিয়ে যাও। সার্জেন্টকে বোলো ও সিঁড়ি থেকে নীচে পড়েছে। এরপর আর কখনও এখানে এসো না।'

মারপিট করা হবে না বুঝে স্বস্তির শ্বাস ফেলল দু'জন। অজ্ঞান কর্পোরালকে তুলে নিল ওরা, ওজনটা নিয়ে ধীর পায়ে বার ছেড়ে চলে গেল দ্বিতীয়বার না তাকিয়ে। দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ফু-চুং, হাতের ইশারায় বার-টেণ্ডারের কাছে আরেকটা বিয়ার চাইল। এবার মনে হলো কোনও বাঁধ ভেঙে গেছে, সবাই একইসঙ্গে কথা বলতে শুরু করল।

ফু-চুং এক চুমুক বিয়ার শেষ করতে না করতে সিয়েন লাউয়ের এক বডি-গার্ড চলে এল। লোকটা ভদ্রতার সঙ্গে বলল, 'মিস্টার লাউ তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান।'

নীরবে বডি-গার্ডকে দেখল ফু-চুং, আরেক চুমুক বিয়ার খেয়ে উঠে দাঁড়াল। ও ভাল করেই জানে, একবার মাঠে খেলতে নামলে আর পেছানোর পথ থাকে না। ওর জীবন নিয়ে খেলবে ওই স্নেকহেড। ওকে হয়তো তুলে দেবে পরের লিঙ্কের কাছে। সেরকম হলে ওকে কি সমুদ্রগামী কোনও ট্রলারে ওঠানো হবে? কণ্টেইনারে আটকা পড়বে ও? তার অনেক আগেই তো লোকটা ওকে মেরে ফেলতে পারে। এসব চিন্তা করে লাভ কী? বডি-গার্ডের পিছু নিল ও, অন্ধকার টেবিলের দিকে হাঁটছে।

যমজ তরুণীদের কী যেন বলল সিয়েন লাউ। মেয়েদুটো টেবিল ছাড়ল। পাশ কাটানোর সময় তাদের একজন ফু-চুঙের উরুতে নিতম্ব ঘসে গেল। পাত্তা দিল না ফু-চুং, সিয়েন লাউয়ের উল্টোদিকের একটা চেয়ার টেনে বসল। সানগ্লাস খুলল লাউ। লোকটার বয়স তিরিশের বেশি নয়, আন্দাজ করল ফু-চুং। কিন্তু পঙ্কিলতা তার চেহারায় ছাপ ফেলেছে। দেখলেই মন বলে, এ অন্ধকারময় দুনিয়ার লোক।

'নিশ্চয়ই এত কীর্তির পিছনে কোনও কারণ আছে তোমার?' বলল লাউ।

'ওরা বারে থাকলে আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারতাম না।'

'মানে?'

জবাব দিল না ফু-চুং, গলায় ঝোলানো ডগ-ট্যাগটা খুলে নিল, দাগে ভরা টেবিলের উপরে রাখল।

লাউ ওটা তুলে নিল না, পার্টির দিকে তাকিয়ে হিসাব কষল। 'ইলেকশনের জন্যে আর্মির যারা এসেছে, তাদের সঙ্গে এখানে এসেছ তুমি?'

'না। আমার স্টেশন ছিল ফউজোউয়ে।'

'কিন্তু এখানে চলে এলে কেন?'

'কিছুদিন আগে আমার এক বন্ধুর কাযিনকে সাহায্য করেছ তুমি।'

'আমি বহু মানুষের উপকার করেছি। ...তো ওই লোকের কী উপকার করেছি?'

'তুমি ওকে সোনার পাহাড়ে পাঠিয়ে দিয়েছ,' বলল ফু-চুং। সাধারণ চাইনিজরা আমেরিকাকে সোনার পাহাড় বলে। কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকল ফু-চুং, তারপর বলল, 'আমিও যেতে চাই।'

'সম্ভব না।'

'কেন?'

উদাস হয়ে গেল সিয়েন লাউ। 'উপকারের বদলে টাকা নিই আমি।'

এ-কথায় থলি থেকে এক তোড়া নোট বের করে আনল ফু-চুং। 'আমি জানি কীভাবে কাজটা করা হয়। আমার এখনই অনেক টাকা দিতে হবে। আর বাকি টাকা আমেরিকায় পৌঁছে। আমার কোনও আত্মীয়-স্বজনকে চেনো না তুমি, কাজেই ওদের ধরতে পারবে না।' কয়েকটা উয়ান-এর নোট সরাল ফু-চুং, এবার দেখা গেল ইউএস ডলারের নোট। 'এখনই পাঁচ হাজার দেব। চায়না ছাড়ার সময় আরও দু'হাজার। এরপর আমার কথা একেবারে ভুলে যেতে হবে।'

নাক কুঁচকাল সিয়েন লাউ, চোখ সরু হয়ে গেল। 'আর আমি যদি এখন তোমার টাকা নিয়ে পরে স্বীকার না করি যে তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে?'

দু'পায়ে টেবিলটা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি ঘোরাল ফু-চুং, এক বডি-গার্ডের বুকে জোরে ঠেকাল। ফুসফুসে ব্যথা পেয়ে শ্বাস ছাড়ল লোকটা। এক লাফে উঠে দাঁড়াল ফু-চুং, টেবিলের উপরে কনুই দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করল—সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের কাঠ দু'টুকরো হয়ে গেল, খসে পড়ল ওগুলো। তার আগেই টেবিলের একটা পায়া চলে এল ওর হাতে। ওটা দ্বিতীয় বডি-গার্ডের কণ্ঠে ঠেকাল, লোকটা পিস্তল বের করবার সাহস পেল না।

সিয়েন লাউ চেয়ারে বসে আছে, নিজ চোখেও বিশ্বাস করতে পারছে না তার

সেরা দু'জন লোককে এভাবে শায়েস্তা করা যায়।

'আমি তোমাদের তিনজনকে মেরে ফেলতে পারতাম,' স্পিকারের আওয়াজের উপর দিয়ে বলল ফু-চুং। কথাটা সবাই শুনল। এবার বলল, 'আমি একটা ভাল প্রস্তাব দিয়েছি। তুমি রাজি না হলে বলে দাও, আমি চলে যাব।'

'আমার কেন যেন মনে হচ্ছে তুমি সোনার পাহাড়ে ভাল করবে,' বলল লাউ। এবার শয়তানির হাসি হাসতে শুরু করল সে।

টেবিলের পায়া ফেলে দিল ফু-চুং, আগের চেয়ারে বসে পড়ল। বডি-গার্ড আলতো হাতে গলা ঘসল, প্রতিপক্ষের দিকে তাকাল না আর।

'এখান থেকে কোথায় যেতে হবে?' জানতে চাইল ফু-চুং।

'তোমার সঙ্গে যাবার মত আরও দু'জন আছে এখন,' বলল লাউ। ঘড়ি দেখল সে। 'ঠিক করেছিলাম আগামীকাল রাতে ওদের রওনা করিয়ে দেব, কিন্তু ওই কর্পোরাল এদিকটা গরম করে তুলবে। আমার একটা ট্রাক আছে, এক ঘণ্টা পর রাস্তার ওদিকের প্রথম বাঁকে অপেক্ষা কোরো। আগামীকাল আমার কন্ট্যাক্টের সঙ্গে ফউজোউয়ে দেখা হবে তোমার। ওরাই তোমাকে বুঝে নেবে। দরকারী কাগজ তৈরি করবে।' থেমে গেল সিয়েন লাউ। তার চোখের দৃষ্টি কড়া হয়ে উঠল। 'একটা পরামর্শ মনে রেখো, ভুলেও ওদের সঙ্গে লাগতে যেয়ো না। আজ রাতে খেলা দেখিয়েছ তুমি, কিন্তু বাড়াবাড়ি করতে গেলে মারা পড়বে।'

ঘাড় কাত করল ফু-চুং, মেনে নিয়েছে উপদেশটা।

***

WWW.DOWNLOADPDFBOOK.C

স্বর্ণ-বিপর্যয়-২

প্রথম প্রকাশ: ২০১০

এক

জাম্বো-জেট জুরিখ এয়ারপোর্টের টারমাকে চাকা নামাল, ছুটল রানওয়ে ধরে। গতি কমে এল দ্রুতই, থেমে দাঁড়াল, তারপর ঘুরে চলে এল টার্মিনালের সামনে। জুরিখে আসবার পথে মাসুদ রানা পরিকল্পনার খসড়া নিয়ে অনেক ভেবেছে। আলাদা একটা দায়িত্ব চেপে গেছে ঘাড়ে, তবে সেজন্য ওর প্ল্যানে তেমন কোনও পরিবর্তনের প্রয়োজন পড়বে না। এখন ও জানে, কীভাবে এগোবে। স্বাভাবিক মানুষ বলবে লোকটা পাগল হয়ে গেছে। কিন্তু এসব কাজে কিছুটা পাগলামির এলিমেন্ট তো থাকেই।

টোকিয়ো ছেড়ে জুরিখে আসবার দীর্ঘ পথে পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত ছিল রানা। সোহেলের সঙ্গে আগেই যোগাযোগ হয়েছে। কারা জুরিখে ওর সঙ্গে কাজ করবে, মার্ভেল থেকে কী কী ইকুইপমেন্ট নেওয়া হবে, ঠিক করেছে ওরা। এখন তাইপের দিকে ছুটে চলেছে মার্ভেল। রানার দলের সবাই আপাতত ভারতীয় হয়ে যাবে, তাদের পাসপোর্ট তৈরি হয়ে গেছে। ওরা জুরিখে আসবার জন্য তাইপে এয়ারপোর্ট ব্যবহার করবে। এদিকে দ্য চুহা প্রতি ঘণ্টায় চার নট গতিতে এগিয়ে চলেছে, কাজেই আশা করা যায় মার্ভেল ফিরে গিয়ে ওটাকে সাগরেই পাবে।

কিছুক্ষণ আগে ওর পাশের সিট থেকে মাঝবয়েসি এক লোক উঠে গেছে, সম্ভবত টয়লেটে। সেই খালি সিটে এসে বসল সুন্দরী এক তরুণী। হালকা সেন্টের সুবাস পেয়ে অবাক হয়ে ঘাড় ফিরিয়ে রানা দেখল ওর দিকে চেয়ে মুচকি হাসছে মেয়েটি। চট্ করে চোখ ফিরিয়ে নিল রানা। মতলবটা কী?

'টোকিয়োতে আপনার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম আমি, মাসুদ ভাই,' নিচু স্বরে আরবিতে বলল মেয়েটি। যেন আপন মনে কথা বলছে। 'আমার নাম মুশতারি।'

আবার একবার চট্ করে মেয়েটিকে দেখে নিল রানা। না, চেনে না ওকে।

'আমাকে চেহারা দেখে চিনতে পারবেন না, মাসুদ ভাই। আমি আপনাকে দেখেছি লেবাননে, আমাদের ক্যাম্পে। আবদুল্লাহ আল্ করিম আমার চাচা। উনি পাঠিয়েছেন আমাকে।'

আবদুল্লাহ আল্ করিম বর্তমানে পিএলও-র সেকেণ্ড ইন কমাণ্ড। তৃতীয়বার তাকিয়ে চেহারার মিল পেল রানা। অবশ্য তা-তে কিছুই প্রমাণ হয় না, মেয়েটির বক্তব্য শুনলে জানা যাবে ওর উদ্দেশ্য। রানার সঙ্গে দেখা করতে এ মেয়ের টোকিয়োতে যাওয়ার মানে ওর গতিবিধি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল এরা। কীভাবে সেটা সম্ভব হলো জানা দরকার। চুপচাপ বসে রইল ও।

'আপনার সাহায্য দরকার পিএলও-র।'

'কী রকম?'

'ব্যাপারটা...' আরও নিচু হলো মেয়েটির কণ্ঠ, রানার কানের পাশে চলে এসেছে ওর ঠোঁট, 'রেজেন্সডোর্ফ প্রিযন ও এক উকিল সংক্রান্ত।'

ভিতর ভিতর চমকে গেল রানা। ও যে টোকিওতে ছিল, কী করতে কোথায় যাচ্ছে... সবই দেখা যাচ্ছে জানে এরা! এতসব খবর লিক-আউট হলো কীভাবে?

চুপচাপ পাথর হয়ে বসে থাকল রানা।

'আপনার বস্ যোগাযোগ করেছিলেন আমার চাচার সঙ্গে।' কথা বলতে বলতে রানার চোখের সামনে একটুকরো কাগজ ধরল মেয়েটি। মুহূর্তে দূর হয়ে গেল রানার সব দুশ্চিন্তা।

মেয়েটি আরবি হরফে লিখে এনেছে বিসিআই-চিফ মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানের একটা বাংলা সাঙ্কেতিক মেসেজ। এর অর্থ সম্ভব হলে সাহায্য কোরো।

তা হলে এই ব্যাপার! উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই, সোহেল রিপোর্ট করেছে হেড অফিসে, জানিয়েছে রানা এখন কোথায় আছে, কী করতে যাচ্ছে। তিনি জানিয়েছেন এদের।

'ঘটনাটা কী?' এতক্ষণে নিচু কণ্ঠে প্রশ্ন করল ও।

সব খুলে বলল মুশতারি। ভুরু কুঁচকে ভাবল রানা কিছুক্ষণ, তারপর বলে দিল কী করতে হবে ওদের। ধন্যবাদ জানিয়ে উঠে গেল মেয়েটি, আবার নিজের জায়গায় ফিরে এল মাঝবয়েসি ভদ্রলোক—যেন কিছুই জানেন না।

ইন্টারন্যাশনাল কাস্টম্স্-এর কারণে বেশ কিছু ইকুইপমেন্ট আনা যাবে না। তাতে সমস্যা নেই। অনেককিছুই রানা এজেন্সির জুরিখ অফিস থেকে পাবে। ওদের লাগবে কয়েকটা পিস্তল আর কিছু কেমিকেল। বিস্ফোরক ওরা নিজেরাই তৈরি করে নেবে। আর যা কিছু লাগবে, সেসব ভাড়ায় পাওয়া যায়।

রানার দলের সবাই জুরিখে পৌঁছুবে চব্বিশ ঘণ্টা পর। এখন প্রথম কাজ, রেজেন্সডোর্ফ প্রিযন থেকে ডাউন-টাউনের কোর্ট হাউজের পুরো পথ ভাল মত রেকি করা। পরে একটা সেফ হাউজ ভাড়া করবে ও।

বিশ মিনিট পর কাস্টম্স্ পেরিয়ে টার্মিনাল ছেড়ে বেরিয়ে এল রানা, ভাড়া করা মার্সিডিজ এমএল-৫০০ স্পোর্টস্ ইউটিলিটি ভেহিকেল নিয়ে রওনা হয়ে গেল। গাড়িটার অফ-রোড সুবিধেটা লাগবে বলে মনে করে না রানা, কিন্তু বড়লোকদের এই শহরে গাড়িটা বেমানান লাগছে না। জিপিএস ম্যাপিং সিস্টেমটা কাজে লাগতে পারে। বসন্তের সুন্দর এক উজ্জ্বল সকাল। নীল আকাশে মেঘের চিহ্নমাত্র নেই। এয়ারপোর্ট ছেড়ে বেরিয়ে এল রানা, দু'পাশের জানালা খুলে দিল, বাটন টিপে সান-রুফ উধাও করল।

জুরিখ শহরের চেহারা অনেক বদলে গেছে। আধুনিক স্থাপত্য মিশেছে পুরোনো ঐতিহ্যের সঙ্গে। প্রাচীন শিল্পরীতি ও অতি আধুনিকতা, পাশাপাশি দেখতে খারাপ লাগে না। শহর এড়িয়ে রিং রোডে চলে এল রানা, একটা এক্সিট পার হয়ে রওনা হয়ে গেল রেজেন্সডোর্ফ প্রিযনের উদ্দেশে। ওদের জন্য একটা ভাল জায়গা লাগবে, নইলে মোক্ষম সময়ে কাজে নামা যাবে না।

রেজেন্সডোর্ফের মোড়ে পৌঁছে ফিরতি পথ ধরল রানা, জেলখানার গার্ডদের

গাড়িটা দেখতে দেবে না। সম্ভবত এই পথে আরও কয়েকবার আসতে হবে। দলের সবার জন্য কোর্ট হাউজ ও রেসেন্সডোর্ফের রাস্তায় ভাল একটা জায়গা খুঁজতে হবে। শহরে ফিরে কোর্ট হাউজের পাশে চলে এল রানা। এই কোর্টে লিয়ার বেয়ারমান রাজ-সাক্ষী হিসেবে সাক্ষ্য দেয়। মামলাটি তুমুল আলোড়ন তুলেছে। সবাই অপেক্ষা করছে, দেখবে কী ঘটে।

কোর্ট হাউজের সামনের রাস্তায় প্রচুর গাড়ি। ট্রাফিক পুলিশরা ব্যস্ত। কোর্টের বেশ খানিকটা আগে বামপাশে একটা বহুতলা বাড়ি উঠছে, ওখানে গাড়ি আর মানুষের ভিড় বেশি। ব্যস্ত ট্রাকগুলো সিমেন্ট-বালি-বিম ইত্যাদি নিয়ে সাইটে আসছে, বদলে নিয়ে চলেছে নানান রকম জঞ্জাল। ইন্টারসেকশানে জ্যাম লেগেই আছে। নতুন বিল্ডিং এখনও শুধু স্টিলের কঙ্কাল, তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে কংক্রিটের স্ল্যাব। ওগুলো দিয়ে মেঝে তৈরি হবে। স্ল্যাবগুলো সাজিয়ে সাত তলা উঁচু বিশাল একটা বাক্স বানানো হয়েছে। প্রয়োজন মত ওখান থেকে নেওয়া হবে। কনস্ট্রাকশান সাইটে মাথা তুলে আছে একটা টাওয়ার ক্রেন। ওটার হরাইযন্টাল বুম প্লাইউড ও চেইন-লিঙ্কের দেয়ালের যে-কোনও দিকে যায়। বুমটা যেন হাত বাড়িয়ে আছে।

লাল বাতি জ্বলে ওঠায় গাড়ি থামাল রানা। ক্রেনের বুম অসংখ্য আই-বিম তুলে নিল। রানার পিছনের গাড়ির চালক চমকে গেছে, আলতো করে হর্ন বাজিয়ে থেমে গেল। বাতি বদলে গেছে আবার, লোকটা হাতের ইশারায় দুঃখিত জানিয়ে চলে গেল।

রেজেন্সডোর্ফ প্রিযন ও কোর্ট হাউজের মধ্যে ছয়বার এল গেল রানা, ছ'বারই বিভিন্ন রাস্তা ব্যবহার করল। ও নিজে সিকিউরিটি দলের লিডার হলে একেক দিন একেক রাস্তায় লিয়ার বেয়ারমানকে নিয়ে আসত। কোনও দলের জন্য আর্মার্ড ক্যারাভানে হামলা করা খুব কঠিন হবে। তবে একটা ব্যাপার খেয়াল করেনি পুলিশ—প্রতিবার একই গন্তব্যে এসে পৌঁছুবে তারা। আর্মার্ড ভ্যান কোর্টের যত কাছে আসবে, ততই নিশ্চিন্তে হামলা করা যাবে।

কোর্ট হাউজ পার হয়ে দু'ব্লক এগিয়ে গাড়ি রাখল রানা, পরবর্তী দু'ঘণ্টা পায়ে হেঁটে চারপাশটা ঘুরে দেখল। একবার থেমে স্টারবাক থেকে কালো কফি নিয়ে গলা ভিজাল। খেয়াল করল, কোর্ট ও কনস্ট্রাকশান সাইটের সামনের রাস্তায় প্রচুর মানুষের আনাগোনা, তবে কনস্ট্রাকশান সাইটের পিছনের রাস্তা প্রায় খালি। মনে মনে বলল ও, *আমরা যদি কাজটা এখানে করি, তা হলে দু'দিন কাউকে রাখতে হবে। আগে জানতে হবে এখানে কী পরিমাণ যানবাহন চলে।* জায়গাটা খারাপ লাগছে না ওর। চাহিদার সব মিলবে না, তবে চলে। ওর মূল পরিকল্পনায় সামান্য পরিবর্তন আনতে হবে, এই আরকী।

দুপুরের পর একটা চার তলা অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের উপর তলা ভাড়া করল রানা। জায়গাটা কোর্টের ছ'ব্লক দূরে। লিযিং এজেন্টকে জানাল, ওরা কয়েকজন আমেরিকান উকিল। ওরা জুরিখে দু'মাস থাকবে, একটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির পক্ষে আইনী লড়াই করবে। অ্যাপার্টমেন্টটা খারাপ লাগেনি রানার। তিনটে বেডরুম, তিনটে টয়লেট, কিচেন। সঙ্গে একটা মাঝারি অফিস রুম।

আসবাবপত্রগুলো পুরোনো। তাতে অসুবিধে নেই। বাড়ির ভাল কিছু দিক আছে, দরকার পড়লে ছাদে উঠতে পারবে ওরা, একটা ফায়ার এস্কেপ নেমেছে পিছনের গলিতে। লিযিং এজেন্ট বাঘা লোক, রানার কাছে তিন মাসের অ্যাডভান্স চাইল।

রানার কাজ আট দিনে শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু আপত্তি করল না ও, রাজি হয়ে গেল। পৌনে তিনমাস ওটা হবে বিসিআই-এর সেফ হাউস। দু'জন ওখানে থাকবে, প্রয়োজন পড়লে জানাবে ওরা আমেরিকান উকিল। বিসিআই-এর এক্সপার্টরা ওদের জন্য সরকারী কাগজ তৈরি করে দেবে।

রানা জানে, অপরাধী বেশিরভাগ সময় প্রতিবেশীর কাছে নিজেকে ভাল লোক দেখাতে চায়। যে-ব্যাঙ্কে ডাকাতি করবে, সেটার অতি কাছাকাছি থাকে, তারপর অপরাধ শেষে দ্রুত এলাকা ছেড়ে চলে যায়। পুলিশ জানে, বেশিরভাগ ক্রিমিনাল এমনই করে। সেজন্যই পুলিশ আগে খুঁজে বের করে কে কে ওই এলাকা ছেড়ে চলে গেছে। এর ফলে নিরেট সূত্র পাওয়া যায়। বিসিআই-এর কয়েকজন এজেন্ট রানার ভাড়া করা বাড়িতে উঠবে, নির্দিষ্ট সময় শেষে অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে চলে যাবে।

রানা অ্যাপার্টমেন্ট বুঝে নিয়ে এজেন্টকে নগদ টাকা দিয়ে বিদায় করল। ফোন করল রানা এজেন্সির শাখা চিফকে, জানিয়ে দিল একটা ওয়ালথার, তিনটে গ্লক, তিনটে এমপি-ফাইভ পিস্তল ও কিছু কেমিকেল লাগবে। ঠিক হলো, আগামীকাল আগ্নেয়াস্ত্র ও কেমিকেলগুলো পৌঁছে যাবে। রানার আর কোনও কাজ থাকল না। কাছের একটা রেস্টুরেন্টে গিয়ে খেয়ে নিল। তারপর আবার বসল ওর পরিকল্পনা নিয়ে, নানা ভাবে খুঁত বের করবার চেষ্টা করল। ওর চিন্তা অনুযায়ী কাজ হবে, নাকি যারা ওর উপরে নির্ভর করবে, তারা ডুববে! কী ঘটতে চলেছে? গুন গুন করে গাইল হিন্দি গানের সুর : কোঈ না জানে কিয়া হোগা কাল, ক্যায়সে হোঙ্গে আনেওয়ালে প্যল...

পরদিন সবার শেষে এলো ডাক্তার ফারা রাইনার। রানা ওকে সেফ হাউজে না রেখে জুরিখের বিখ্যাত ব্যাঙ্কিং ডিস্ট্রিক্টের ব্যাহনহোফস্ট্রাসের একটা হোটেলে উঠতে বলেছে। এই অপারেশনে ফারার বদলে উর্বশীকে কাজে লাগাতে পারলে ভাল হতো, কিন্তু যে উচ্চতা রানার দরকার, সেটা উর্বশীর নেই। প্রস্তাব দিতেই রাজি হয়ে গেছে ফারা। তবে রানা আগেই বলে রেখেছে, অতি প্রয়োজন না পড়লে ফারাকে কাজে লাগানো হবে না।

আতাসি ফারাকে সঙ্গে নিয়ে সেফ হাউজে এসেছে। অচেনা এই নারীকে দেখে একমুহূর্ত বোকা হয়ে গিয়েছিল রানা। কপাল ঢেকে আছে তার বিরাট সানগ্লাসে। চুলগুলো সব ধূসর। যেন কোনও ঝোপ। ফারার দুর্দান্ত ফিগার আর নেই, বদলে মোটা মেরে গেছে। পরনে প্রিযন মেট্রনের কোঁচকানো পোশাক। মুখে-কপালে অসংখ্য বলি রেখা। নাকের দু'পাশের হাসি-রেখা দেখলে মনে হয় ওগুলো গভীর নালা।

কে বলবে ফারা সুন্দরী, ও এখন সত্যিই জটিল উকিলের কুটিল স্ত্রী ফ্রাউ বেয়ারমান হয়ে গেছে।

'সর্বনাশ,' ফারাকে দেখে মৃদু হেসে ফেলল রানা। 'তুমি সত্যিই ফারা তো?'

'পছন্দ হয় না আমাকে?' ভ্রূ কুঁচকে রানাকে দেখল ফারা। গাল বাড়িয়ে দিল। 'মোফিজ বিল্লাহ্ জাদু দেখাতে পারে। এসো বাপ্, আমার গালে একটা চুমু দাও।'

ফারার চারপাশে এক পাক ঘুরল রানা, সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখল। 'পরে আবার এরকম মেকআপ নিতে পারবে তো?'

'বিল্লাহ শিখিয়েছে,' বলল ফারা। 'কাপড় আমি নিজেই পরে নিতে পারতাম, কিন্তু আসল জিনিস মুখের যত্ন—বিল্লাহ আমাকে পাঁচ ঘণ্টার কোর্স করিয়েছে। চেহারা কী করে বদলে দিতে হয়... বিশ্বাস করা যায় না। আমি এখন আগলি পার্লার খুলতে পারব। কাপড়-চোপড় যে পরিমাণ দিয়েছে, তাতে ছ'মাস চলবে।'

'এখন কস্টিউম নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না,' বলল রানা। 'আমরা কাজে নামলে অভিনয়ের সুযোগ পাবে। তার আগে চাই না লোকজন দেখুক শহরে বেয়ারমানের স্ত্রীর ক্লোন আছে।'

'বেশ।'

লিভিংরুমে চলে এল দলের বাকি দু'জন। ফারাকে দেখে হেসে ফেলল ওরা। রানা সহ ওরা পাঁচজন এসেছে জুরিখে। ছোট্ট একটা দল, কিন্তু সব ঠিকমত চললে কাজ উদ্ধার করা যাবে। ফারার প্রথম দায়িত্ব শেষ হলে অন্যরা আরেকটা কাজে নামবে। তখন ফারা দলের ব্যাকআপ হিসেবে থাকবে।

'আমি কাজ চলার মত একটা জায়গা বাছাই করেছি,' বলল রানা। 'দু'দিন ওখানে চোখ রাখতে হবে। একটা কথা এখানে বলে রাখি, কারও যদি মনে হয় ওই জায়গায় ঝুঁকি অনেক বেশি, সঙ্গে সঙ্গে জানাবে তোমরা। পরে আমরা একসঙ্গে গিয়ে জায়গাটা ঘুরে দেখব। আজই বিস্ফোরক তৈরি করব। এরপর শুরু হবে আমাদের প্রথম কাজ। আমরা আসল ফ্রাউ বেয়ারমানকে তারই বাসায় কিডন্যাপ করব।'

'তার কোনও প্রহরী আছে?' জিজ্ঞেস করল আতাসি।

'এখনও জানি না। জানতে হবে। ওর উপর চোখ রাখলেই বোঝা যাবে।'

'আমরা নিজেদের কী পরিচয় দেব?' জিজ্ঞেস করল ফারা।

'রাশান। লিয়ার বেয়ারমান দ্য চুহা কিনতে একগাদা ডামি কোম্পানি করেছে, আমরা সেসব কোম্পানির কোনও একটার বোর্ড অভ ডিরেক্টর্স। আসলে রাশান মাফিয়ার লোক। আমাদের কাজ বেয়ারমানকে জেল থেকে উদ্ধার করা।'

'মাসুদ ভাই, লোকটা জেল ভেঙে পালাতে চাইবে?' জানতে চাইল বাংলাদেশ আর্মির এক কমাণ্ডো। 'সোহেল ভাই ব্রিফ করার সময় বলেছেন, এই বুড়ো-শেয়াল নাকি প্রসিকিউটারের সঙ্গে ভাল চুক্তি করেছে।'

'বেয়ারমানকে খেলিয়ে তুলতে হবে,' বলল রানা। 'লোকটা পিএলওর টাকা হাতিয়েছে। এখন জানবে পিএলওর আততায়ী তাকে খুঁজছে।'

'সত্যিই পিএলওর টাকা মেরেছে এ, বস?' জিজ্ঞেস করল আতাসি।

'মেরেছে। এরা ইয়াসির আরাফাতের বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার সরিয়ে ফেলেছে। এখন আমাদের কাজ এই বেয়ারমানকে বোঝানো, পিএলও তাকে

হাতে পেলে খুন করবে। তার বাঁচার একটাই পথ—ইচ্ছে করলে সে আমাদের সঙ্গে সরে পড়তে পারে। নইলে নিশ্চিত মৃত্যু।'

'ধরে নিই পেলাম তাকে,' বলল ফারা। 'তারপর কী করব?'

'আমরা ওকে মরণের ভয় দেখাব,' কড়া শোনাল রানার কণ্ঠ, 'এমন ব্যবস্থা নেয়া হবে যে প্যান্ট খারাপ করে ফেলবে। ...ফু-চুং এখন কোথায় আছে আমরা জানি না। মানুষ কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে জানতে গেছে ও। আর এই বেয়ারমান এসবের সঙ্গে আগাপাশতলা জড়িত। কাজেই তাকে খাতির করব না আমরা।'

'বস্, মিস্টার ফু-চুং গেছেন ফউজোউ-এ,' বলল আতাসি। 'আর কোনও খবর নেই। মার্ভেলের সবাই উদ্বিগ্ন।'

'এখানে কাজ শেষে মার্ভেলে ফিরব আমরা,' বলল রানা। 'আশা করি ও সাগরগামী কোনও ট্রলারে থাকবে। পাচার হয়ে যাওয়ার আগেই ওকে উদ্ধার করতে হবে। আমরা জানি লিয়ার বেয়ারমান দ্য চুহা আর জলদস্যুতার সঙ্গে জড়িত। ওর কাছ থেকে হয়তো বেরিয়ে আসতে পারে এত মানুষ কোথায় যায়।'

'লোকটা যদি মুখ না খোলে?' জিজ্ঞেস করল ফারা। 'এমন যদি হয় এই লোক শুধু ডামি কোম্পানি গড়েছে, কিন্তু আর কিছুই জানে না—তখন?'

এরকম সম্ভাবনা আছে, রানা জানে। মন মানতে চায় না, কিন্তু... উত্তর ওকে দিতেই হবে, কাজেই বলল, 'তা হলে ধরে নিতে হবে ফু-চুং মারা গেছে। যেখানে ছিলাম, সেখানেই আটকে গেছি। সেক্ষেত্রে আবার নতুন করে জলদস্যুদের পিছু নেব।'

সবাইকে নিয়ে অফিস-রুমে বসল রানা। পরবর্তী আধ ঘণ্টায় ওর খসড়া পরিকল্পনা খুলে বলল। তারপর প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আলাপ হলো ওদের, যার যা মতামত জানাল নির্ভয়ে। ওরা জানে কঠিন কাজ হাতে নিয়েছে, এতে প্রচুর ঝুঁকি রয়েছে, কাজেই পরিকল্পনায় গভীর মনোযোগ দিয়েছে সবাই, প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় বিচার করেছে নিরপেক্ষ ভাবে। মিশনে কিছু পরিবর্তন এল।

আড়াই ঘণ্টা পর সন্তুষ্ট হলো রানা।

ওরা এখন জানে, এর বেশি কিছু করতে পারবে না চাইলেও। এই পরিস্থিতিতে সেরা প্ল্যানটাই কাজে লাগাবে ওরা। রানা সবাইকে আগামী তিন দিনের কাজ ভাগ করে দিল।

একজন যাবে কোর্ট ও কনস্ট্রাকশান সাইটে, রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়ার বাড়া-কমা চার্ট করবে। অন্যরা দরকারি জিনিসপত্র যোগাড় করবে, ইকুইপমেন্টে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটাবে।

অতি জরুরি দশ চাকাওয়ালা একটা ট্রাক, ওটার সঙ্গে থাকবে ট্রেইলার—ওটা নিয়ে আসবে রানা। শহরের বাইরের একটা ওয়্যারহাউজ ভাড়া করবে ও।

এদিকে দ্বিতীয় কমাণ্ডো ও আতাসির কাজ বেয়ারমানের বাড়ির উপর নজর রাখা। ওই বাড়ির সিকিউরিটি কেমন জানতে হবে। এক বা একাধিক গার্ড থাকতে পারে। রানা পরে গিয়ে ও-বাড়ির উপর চোখ রাখবে। সুযোগ পেলেই ওরা মহিলাকে তুলে আনবে।

আজ মঙ্গলবার। সব ঠিক মত চললে আগামী সোমবার লিয়ার বেয়ারমান

আবারও কোর্টে দাঁড়াবে। সেইদিন আসল কাজে নামবে ওরা। তার মানে, বৃহস্পতিবার রাতে বেয়ারমানের স্ত্রীকে তুলে আনতে হবে। রেজেন্সডোর্ফ প্রিযনে শুক্রবার সকালে ভিজিটিং আওয়ার শুরু হয়। ফারা ওই মহিলার বদলে ওখানে যাবে। কথাটা ভেবে অস্বস্তি বোধ করছে রানা। বড় দ্রুত কাজ করতে হচ্ছে। লিয়ার বেয়ারমানকে এরপর আবার কবে কোর্টে তোলা হবে, সে-আশায় বসে থাকা যায় না। এদিকে ফু-চুঙের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। এখানে বসে আঙুল চুষলে চলবে না। জানতে হবে দ্য চুহা কোথায় যায়!

'কমিউনিকেশন চেক করো,' বলল রানা। ওর ভয়েস-অ্যাক্টিভেটেড থ্রোট মাইকে অদ্ভুত লাগল কথাগুলো।

লেফটেন্যান্ট আবু কাশেম ও আতাসির সিগনাল পেল ও।

'বস্, আপনার কাছ থেকে পাওয়া ট্রেনিং কাজে লাগুক,' বলল আতাসি। 'দোয়া করবেন।'

'সময় হয়ে গেছে, দু'মিনিট পর রওনা হবে তোমরা,' বলল রানা। পাশে ফারা। ওকে অন্তত ষোলো ঘণ্টা জেগে থাকতে হবে। আজ রাতে ওর জন্য ঘুম নেই।

রাতের আকাশে চাঁদ ঢাকা পড়েছে মেঘে। সামনেই তিনতলা বাড়িটা। সামনে ঘাস ছাওয়া লন। ঘাসের মাথায় বিন্দু বিন্দু শিশির জমেছে। একটু আগে এক প্রৌঢ় তাঁর কুকুর নিয়ে বেরিয়েছিলেন। তখন আধঘণ্টা মনে হয়েছে ডাশাণ্ডটার টয়লেট আটকে গেছে। তারপর ভদ্রলোক কুকুর নিয়ে নিজের বাড়িতে ঢুকে পড়েছেন। অনেকক্ষণ হলো এলাকা নীরব হয়ে গেছে। প্রতিবেশীদের কারও কোনও সাড়া নেই।

তিনদিন ফ্রাউ বেয়ারমানকে লক্ষ করে রানার ধারণা হয়েছে, মহিলা এই বাড়িতে একাই থাকেন। সকালে এক কাজের বুয়া আসে, বিকেলে চলে যায়। ওরা এখন জানে, এ-বাড়িতে একটা অ্যালার্ম সিস্টেম আছে। প্রতিটি দরজা-জানালা ওয়ায়ারড্। উঁকি দিয়ে দেখেছে রানা, সকালে কাজের বুয়া এসে অ্যালার্ম বন্ধ করে। ধারণা করেছে, মহিলার স্বামী গ্রেফতার হওয়ার পর বাড়িতে অ্যালার্ম বসানো হয়েছে। মাটিতে কোনও তার পাওয়া যায়নি, মোশন ডিটেক্টর বা আইআর ক্যামেরা নেই। কিন্তু ঝুঁকি নেওয়া যায় না, মহিলা ভয় পেয়ে অ্যালার্মের বাটন টিপে দিলে দোজখ হয়ে যাবে গোটা এলাকা। পুলিশের স্টেশন কাছেই। তারা আসতে বড়জোর সাত মিনিট লাগাবে।

ঘড়ি দেখল রানা। 'ঠিক আছে, আতাসি, যাও। কাশেম দরজা খুললে অ্যালার্ম ডিঅ্যাকটিভেট করতে ষাট সেকেণ্ড পাবে তুমি।' রানা জানে এর বেশি সময় দেয়া উচিত না।

ফ্রাউ-এর বয়স ষাটের বেশি, অর্থাৎ পুরোপুরি বুড়ি হয়নি, ঠিকই ইলেকট্রোনিক্স ব্যবহার করতে পারে। যে-লোক এ বাড়ির অ্যালার্ম ইন্সটল করেছে, সে নিশ্চয়ই বয়স্কা ক্লায়েন্টের জন্য এমন ব্যবস্থা রেখেছে, যাতে ভুলে অ্যালার্ম সিস্টেম চালু করলেও পরে থামাতে পারে। সাধারণত অন্তত এক মিনিটের সুযোগ

দেয়া হয়। এরপর পুলিশ-স্টেশনে অ্যালার্ম পৌঁছে যায়, দেরি না করে ফোর্স চলে আসে।

শীঘ্রি কাশেম ও কমিউনিকেশন্স স্পেশালিস্ট আতাসির কাজ শেষ হয়ে যাবে, ওরা ফিরে যাবে মার্সিডিজে। এরপর রানার কাজ শুরু। ও কেমিকেল মেখে ভূতের মত ফরসা হয়ে গেছে। এখন ও রাশান মাফিয়ার একজন। খবর পেয়ে মহিলার স্বামীকে উদ্ধার করতে এসেছে। বলবে, পিএলওর আততায়ীরা তার স্বামীকে খুন করতে আসছে। ও এসেছে বেয়ারমানকে সরিয়ে নিতে।

ওদের পরিকল্পনার শেষ পর্যায়ে প্রাণ খুলে হেসেছিল আতাসি। 'বস্, একেই বলে বহুকিছু করব, এমন ভাব দেখিয়ে, কিছুই না করা!'

কাঁটা ঝোপের বেড়া দিয়ে বাড়ির সীমানা তৈরি হয়েছে। কাশেম ও আতাসি সেদিক লক্ষ করে ছুটল। কালো পোশাক পরে আছে ওরা। আতাসির হাতে ছোট একটা ডাফল্ ব্যাগ, ওটার ভিতর ওর যন্ত্রপাতি। কাশেমের হাতে চিকন লকপিক, প্যান্টের পকেটে পাতলা বিলফোল্ড।

ওক কাঠের ভারী দরজার সামনে চলে গেল ওরা। পাশের দেয়ালে একটা সুন্দর ফিক্সচারে বাতি জ্বলছে, এ ছাড়া বাড়িতে আর কোনও আলো নেই। সব ঘুটঘুটে অন্ধকার। তিন ঘণ্টা আগে ফসেট বেয়ারমানের বেডরুমের আলো নিভে গেছে। তার মানে এখনও সে ঘুমের গভীর আরইএম-এ পৌঁছোয়নি, তবে এখন আর টয়লেট চাপবে না।

কাশেমের ডান পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল আতাসি। লকপিক নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেল কাশেম। এই দরজায় যে তালা আছে সেটার মত আরেকটা তালা কিনেছে সে শহরের আরেকপ্রান্ত থেকে। ওটার উপরে হাত মকশো করেছে। এখন তালার টেনশন পিক নিয়ে কাজ করছে, চেহারা দেখে মনে হচ্ছে সে কোনও দক্ষ সার্জন, রোগীর হৃৎপিণ্ডে অপারেশন করছে। তালার পিনগুলো নিয়ে ব্যস্ত। ওর হাতে ছোট একটা যন্ত্র। ডেড-বোল্ট খুলতে আট সেকেণ্ড লাগাল কাশেম, মেইন হ্যাণ্ডেল ঘোরাতে নিল পনেরো সেকেণ্ড।

শ্বাস ফেলে আতাসির দিকে তাকাল সে। ব্যাগ হাতড়ে একটা হেডব্যাণ্ড বের করল আতাসি। ওটার সঙ্গে ঝুলে আছে খুদে একটা বাল্ব্। ব্যাণ্ডটা কপালে পরে নিল, আস্তে করে মাথা দোলাল। কাশেম দরজাটা নিঃশব্দে খুলে দিল। ঘরে একটা মৃদু ইলেকট্রনিক আওয়াজ শুরু হলো। পাঁচ সেকেণ্ড পরপর বেশ কয়েকবার সুযোগ দেবে ওটা, তারপরও যদি অ্যালার্ম সিস্টেম বন্ধ না করা হয়—বেজে উঠবে কান ফাটিয়ে!

ঘরের মেঝে কাঠ দিয়ে তৈরি, চকচকে পলিশ করা। সামনে চওড়া সিঁড়ির ধাপ দামি ইরানি কার্পেট দিয়ে মোড়া। প্রথম তলায় ডানে-বামে আরও কয়েকটা ঘর আছে। এছাড়াও আছে বিরাট লিভিং ও ডাইনিং রুম—ওখানে অন্তত বিশজনকে বসতে দেয়া যায়। আতাসি তিন সেকেণ্ডে ওগুলো দেখে নিল। অ্যালার্ম প্যানেলটা দরজার ডানপাশে। ওখানে ছোট্ট একটা লাল বাতি বারবার জ্বলছে-নিভছে।

স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে প্যানেলের ঢাকনি খুলে ফেলল সে। ভিতরে অসংখ্য চিকন

তারের জট্। ওগুলোর দিকে মনোযোগ দিল না ও, জানে, ইতিমধ্যে অ্যালার্মের সার্কিট বন্ধ হয়ে গেছে। ওর এখন নিউম্যারিকাল কী-টা দরকার, নইলে সিস্টেম ডিঅ্যাকটিভেট করতে পারবে না। খেয়াল করল ছোট একটা মাদারবোর্ডের বুকে বসে আছে দুটো কম্পিউটার চিপ্স্। ও দুটো এক টানে ছিঁড়ে নিল আতাসি, ওগুলোর জায়গায় সরু একটা তার দিয়ে বাইপাস করল। বাতি বা টিনটিন শব্দ বন্ধ হলো না। ওদিকে সিঁড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে কাশেম, কান পাতল। ফ্রাউ ফসেটের ঘুম ভাঙেনি এখনও।

এ-ধরনের অ্যালার্ম সিস্টেম মালিককে তিনবার সঠিক কোড জানানোর সুযোগ দেয়, এরপরও যদি কোড জানাতে না পারে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে অ্যালার্ম বেজে ওঠে। প্যানেল থেকে লজিক সার্কিট সরিয়ে ফেলেছে আতাসি, সিকিউরিটি সিস্টেম এখন আর জানবে না অ্যালার্ম বন্ধ করতে কতবার চেষ্টা করা হয়েছে।

অ্যালার্মের টাচ-প্যাডে ফিঙ্গার-প্রিন্ট পাউডার ছড়াল আতাসি, ওগুলো আসলে সূক্ষ্মভাবে গুঁড়ো করা পেন্সিলের সীসা। তুলি বুলাতেই টাচ-প্যাডে চারটে আঙুলের ছাপ ফুটে উঠল। দেখে বিরাট একটা শ্বাস ছাড়ল আতাসি। ফিঙ্গার-প্রিন্টগুলো জাবড়ে আছে, কিন্তু সেটা মূল বিষয় নয়। চারটে আঙুলের খেলায় অ্যালার্ম রিসেট করা হতো, তার মানে মোটমাট ছত্রিশটা কম্বিনেশন পাওয়া গেল। কিন্তু ওই ছত্রিশটা কম্বিনেশন নিয়ে কাজ করবার সময় পাবে না ওরা। এমন যদি হতো ফসেট বেয়ারমান যে চারটে কী ব্যবহার করেছে, ওগুলো এক-দুই-তিন-চার, তা হলে ভাল হতো। বেশিরভাগ মানুষ ওই এক-দুই-তিন-চারকে দুনিয়ার সেরা অ্যালার্ম কোড মনে করে। বাড়ির মালিক থেকে শুরু করে চোর পর্যন্ত সবাই ওই কোড ব্যবহার করে। টাচ-প্যাডে ওই সিকিউয়েন্স অনুযায়ী আঙুল চালাল আতাসি। লাল বাতি এখনও টিপটিপ করছে। ইলেক্ট্রনিক্সের মৃদু আওয়াজ বলে দিল আরও পাঁচ সেকেণ্ড পেরিয়ে গেছে।

আতাসি সংখ্যাগুলো উল্টো ভাবে লিখল। না, অ্যালার্ম এখনও অ্যাক্টিভ। লাল বাতি জ্বলছে।

মাইক্রোফোনে ফিসফিস করল আতাসি, 'কয় সেকেণ্ড গেল, বস্?'

'তেইশ সেকেণ্ড,' বাড়ির বাইরে থেকে জানাল রানা।

এখন এক এক করে কম্বিনেশন নিয়ে কাজ করতে হবে। ব্যস্ত হয়ে পড়ল আতাসি—১২৪৩ এন্টার, ১৩২৪ এন্টার, ১৩৪২ এন্টার, ১৪২৩ এন্টার, ১৪৩২ এন্টার।

'কী করছ, আতাসি?' জানতে চাইল রানা।

'র‍্যাণ্ডম সংখ্যা নিয়ে কাজ করছি, বস্। আসল নাম্বার এখনও পাইনি।'

'তুমি আর দশ সেকেণ্ড পাবে।'

২১৩৪ এন্টার, ২১৪৩ এন্টার, ২৩১৪ এন্টার, ২৩৪১ এন্টার।

'আতাসি,' ফিসফিস করল কাশেম, 'তিন-এক-চার-দুই দিয়ে দেখো।'

'আতাসি, তোমার হাতে আর পাঁচ সেকেণ্ড আছে,' বলল রানা।

আবু কাশেম কেন ওই সংখ্যার কথা বলেছে জানতে চাইল না আতাসি, সংখ্যাগুলো টিপে এন্টার কী দাবাল।

ইলেক্ট্রনিক্সের মৃদু আওয়াজ আবারও হলো। লাল বাতির টিপটিপ আরও দ্রুত হলো।

'হচ্ছে না কেন!' আতাসি বিরক্ত হয়ে উঠল।

'উল্টোদিক থেকে লেখো,' বলল কাশেম। '৪২৩১ দিয়ে এন্টার দাও।'

'এক সেকেণ্ড। দাঁড়াও।' কাশেম যে সংখ্যাগুলো বলেছে, ওগুলো উল্টো সংখ্যা নয়, তবুও লিখল আতাসি, পাঞ্চ করল: ৪২৩১ এন্টার।

লাল বাতি থমকে গেল। অ্যালার্ম ডিসেবল হয়ে গেছে। চোখে প্রশ্ন নিয়ে কাশেমের দিকে তাকাল আতাসি।

মৃদু হেসে কাশেম বলল, 'তুমি সোহেল ভাইয়ের ব্রিফিঙে পুরোপুরি মন দাওনি। বেয়ারমানের বয়স্ক দুই ছেলেমেয়ে আছে। প্রথমটা জন্মেছে এপ্রিলের দুই তারিখে, দ্বিতীয়টা মার্চের এক তারিখে। তা হলে পেলে ফোর/টু, থ্রী/ওয়ান। এ তো সাধারণ ব্যাপার! এলিমেন্টারি, মাই ডিয়ার আতাসি, এলিমেন্টারি!'

আরও কয়েক মিনিট নিল আতাসি অ্যালার্ম প্যানেলের প্যানিক বাটনগুলো ডিসেবল করতে। ধারণা করল, ফসেট বেয়ারমানের বিছানায় যে কন্ট্রোলটা আছে, সেটা ঠিক এই কন্ট্রোলের মত।

ফারাকে সঙ্গে নিয়ে ফয়ে-তে পৌঁছে মাইক্রোফোনে বলল রানা, 'এবার তোমরা যাও। বিশ মিনিটে যদি বের না হই, ধরে নিয়ো আমরা ভাল আছি। সেফ হাউসে চলে যেয়ো। ফারা কালকে মিসেস বেয়ারমানের গাড়ি নিয়ে রেজেন্সডোর্ফ প্রিযনে যাবে। ওখান থেকে ফিরে এসে রোববার পর্যন্ত মহিলাকে আটকে রাখবে। গাড়িটা এখানেই থাকুক, আমি ওটা নিয়ে শহরে ফিরব।'

আতাসি ও আবু কাশেম বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেল, স্পোর্টস্ ইউটিলিটি ভেহিকেল-এ গিয়ে বসল। বাইরে বেরিয়ে এল রানাও, সেল-ফোন দিয়ে বেয়ারমান রেসিডেন্স-এ ফোন করল। বাড়ির ভিতরে টেলিফোনটা বেজে উঠল, স্পষ্ট আওয়াজ পাওয়া গেল। তৃতীয়বারের মত রিং করবার পর ঘুম-ভাঙা কর্কশ কণ্ঠ শোনা গেল, 'অ্যালো?'

রাশান টানে ইংরেজি বলল রানা, 'ফ্রাউ বেয়ারমান, আমার নাম মিখাইল এস্তোকোভ। আমি আপনার স্বামীর বন্ধু। খুব জরুরি কথা আছে, আজ রাতে আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চাই।'

'ওয়াস? নেইন।' এবার মহিলা আপত্তির সুরে বলল, 'এত রাতে কথা বলতে পারব না। মেইন গট, এখন রাত দুটো বাজে!'

'আমি যে-কথা বলতে চাই সেটা একটু শুনুন,' গম্ভীর স্বরে বলল রানা। 'আপনার স্বামী এখন বিরাট বিপদের মধ্যে আছেন।' একটু সময় দিল রানা। মহিলা জানে তার স্বামীর বন্ধু-বান্ধব আইনের এদিকের লোক নয়। এতক্ষণে নিশ্চয়ই মাথা খেলাতে শুরু করেছে মহিলা। 'আমি এখন আপনাদের বাড়ির সামনে। আপনি দয়া করে নীচে আসুন। আমি আপনার অ্যালার্ম সিস্টেম বন্ধ করে দিয়েছি। যদি আপনার ক্ষতি করতে চাইতাম, তা হলে অনেক আগেই করতে পারতাম।'

'কে আপনি?' মহিলার স্বরে ভয় মিশে আছে।

'আমি এমন এক লোক যে আপনাদের সাহায্য করতে চায়। আমি যে সংগঠনে কাজ করি, সেখানে কাজ করেন আপনার স্বামীও। আমরা ওঁকে বিশ্বাস করি। এখন আমরা জানি, তাঁর ওপর ভয়ঙ্কর হামলা হবে। কয়েকজন আততায়ী তাঁকে সোমবার সকালে খুন করবে।'

'খুন?'

'হ্যাঁ, ফ্রাউ বেয়ারমান। ওরা পিএলওর সদস্য।'

'আপনার নাম কী যেন বললেন?'

'মিখাইল এস্তোকোভ। আপনাদের জন্য আমাকে পিতার্সবার্গ থেকে পাঠানো হয়েছে।'

মহিলা ভাল করেই জানে তার স্বামী রাশান মাফিয়ার সঙ্গে জড়িত। কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকল সে, তারপর দেখা করতে রাজি হয়ে গেল। স্বস্তির শ্বাস ফেলল রানা। ইচ্ছে করলেই মহিলাকে বেঁধে-ছেঁদে তারই বিছানায় ফেলে রাখতে পারত, সকালে ফারাকে দিয়ে মেইডকে বিদায় করানো যেত। এতেও নিজের প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করতে পারত ও। কিন্তু মহিলা নিজে তার স্বামীর কীর্তির জন্য শাস্তি পাবে কেন? কাজেই ঠিক করেছে, মহিলাকে যথাসম্ভব কম কষ্ট দেবে।

সিঁড়ির উপরের ল্যাণ্ডিঙে একটা বাতি জ্বলে উঠল। স্যাণ্ডেলের শব্দ শুনতে পেল রানা। বাঁক ঘুরে ল্যাণ্ডিঙে নামল মহিলা। বলতে নেই, মহিলাকে দেখে বিকট এক ডাইনীর মত লাগল রানার। চুলগুলো জট্ পাকিয়ে গেছে। লালচে মুখটা ফুলে আছে, চোখে জড়িয়ে আছে ঘুম। পরনে ভারী রোব।

রানা নিজে কালো জিন্স পরেছে, সঙ্গে কালো শার্ট। ওটার উপরে চাপিয়েছে কালো লেদার জ্যাকেট। আজকাল রাশান মাফিয়োসোরা এই ফ্যাশন নিয়ে নিজেদের ব্যক্তিত্বপূর্ণ মনে করে। মাথার চুলের বারোটা বাজিয়েছে ও, ওগুলো এখন রেড ওয়াইনের মত লালচে। মুখ ভরা পাঁচ দিনের খোঁচা-খোঁচা দাড়িতে ওকে ডাকাতের মত লাগছে।

মহিলা নেমে আসায় রানা বলল, 'আপনাকে বিরক্ত করতে হলো বলে খারাপ লাগছে, ফ্রাউ বেয়ারমান।' মহিলা হাত বাড়িয়ে দিল না, কাজেই হ্যাণ্ডশেক করল না ও। 'কিন্তু আর কোনও পথ ছিল না। আমরা আপনার স্বামীকে রেজেন্সডোর্ফ থেকে বের করব। কিন্তু কাজটা করতে হলে আপনার সাহায্য লাগবে। আপনি একমাত্র মানুষ যাঁকে রেজেন্সডোর্ফে ঢুকতে দেয়া হয়। এদিকে যা ঘটছে, সেটা আপনার স্বামীর জানা দরকার।'

'আপনি বলছিলেন কারা যেন আমার লিয়ারকে খুন করতে চায়,' একটা চেয়ারে বসে পড়ল মহিলা। ইতিমধ্যে দু'চোখে পানি জমে গেছে।

'ওরা তা-ই চায়। আপনি বোধহয় জানেন না, কিন্তু পিএলওর সদস্যরা মনে করে আপনার স্বামী তাদের কোটি কোটি ডলার সরিয়েছেন। বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার।'

'কিন্তু... ও তো বলেছিল প্যালেস্টাইনের জন্য যা করেছে সব আইন মেনে করেছে।'

মহিলার সামনে চলে গিয়ে একটু ঝুঁকল রানা, তার একটা হাত নিজের হাতে

নিল। মহিলার আঙুলগুলো থরথর করে কাঁপছে। 'বেয়ারমান হয়তো ঠিকই বলেছেন, কিন্তু এসব গুজব খুব দ্রুত ছড়ায়। এদেরকে কে বোঝাবে আসল ঘটনা কী। এরা সোমবার সকালে বেয়ারমানকে খুন করবে। তার আগেই কিছু করতে হবে আমাদের।'

'আমি জানি না...' থেমে গেল ফসেট বেয়ারমান, তারপর ফুঁপিয়ে উঠে বলল; 'আমি জানি না কী করব। আপনারা পুলিশকে জানাবেন না?'

'আপনার স্বামী রাজসাক্ষী হওয়ায় অনেক লোকের ক্যারিয়ার শেষ হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে বড় ব্যবসায়ী তো আছেই, সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারাও আছে। তারা পিএলওর চেয়েও অনেক শক্তিশালী। ওরা সবাই চায় আপনার স্বামী যেন আর কখনও মুখ খুলতে না পারেন।'

রানা বুঝতে পারছে, মহিলাকে যথেষ্ট ভয় দেখানো হয়েছে। ফ্রাউ বেয়ারমান মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। মাত্র একবছর আগে তিনি ছিলেন সফল এক উকিলের সুখী স্ত্রী, আর সব সুইস হাউস-ফ্রাউদের মত আনন্দের মাঝে কাটিয়েছেন। কিন্তু এখন একদল রিপোর্টার তাঁকে ধাওয়া করে, ওই লোকগুলো প্রতিদিন তাঁর স্বামীর কুকীর্তি নিয়ে লেখে। কাজেই এবার মহিলার কাছে মূল কথা পাড়া যায়।

'আমি আসলে যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে, আপনার স্বামীর উপরে কোনও হামলা হলে পুলিশ সেটা ঠেকাবে না।'

'কিন্তু সেটা তো নিয়ম না!' রাগে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মহিলা। 'আমরা ট্যাক্স দিই।'

ফসেট বেয়ারমান নিজেদের দিকটা ঠিকই দেখতে পাচ্ছে। আরও গম্ভীর হয়ে গেল রানা। 'আসলে ফ্রাউ, আপনার স্বামী ভিমরুলের চাকে খোঁচা মেরে বসেছেন। আমার কাজ তাঁকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া।'

মহিলা রোবের পকেটে হাত ভরে টিশ্যু বের করল, ওটা দিয়ে চোখ মুছল। কাঁধ টানটান করে বসতে চাইল, নিচু স্বরে বলল, 'আমি জানি না কী করা উচিত। রেজেন্সডোর্ফে গিয়ে লিয়ারকে কী জানাব? আপনার প্ল্যান কী?'

'আপনার কিছু করতে হবে না, ফ্রাউ বেয়ারমান,' ঘাড় ফিরিয়ে ডাইনিং রুমের দিকে তাকাল রানা, 'ওয়ে, তামারা?'

সিঁড়ির উপরের আলোয় ফারা রাইনারকে দেখা গেল, এইমাত্র ডাইনিং রুম ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে সে। ফ্রাউ বেয়ারমান যমজ বোন দেখে হাঁ হয়ে গেল, ডানহাতের কড়াগুলো দিয়ে মুখ চেপে ধরল। রানার কয়েক সেকেণ্ড মনে হলো, মহিলা জ্ঞান হারাবে। কিন্তু সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল সে, চলে গেল ফারার সামনে, অবাক হয়ে দেখল নকলকে।

'ও আমার সঙ্গে এসেছে, ওর নাম তামারা জুকোভস্কি,' নরম স্বরে বলল রানা। 'কালকে ও আপনার বদলে রেজেন্সডোর্ফে যাবে। মনে কিছু করবেন না, তবে ও ওখানে আপনার বদলে গেলে আমাদের প্ল্যান আপনার স্বামীকে ভাল ভাবে বুঝিয়ে বলতে পারবে। হাতে যদি সময় থাকত, তা হলে আপনি নিজেই ওখানে গিয়ে সব বলতে পারতেন, কিন্তু...' মিলিয়ে গেল রানার কণ্ঠ। মহিলাকে

সুযোগ করে দিল ও, যেন নিজেই গুরুতর অবস্থা বুঝে নিতে পারে। এবার বলল, 'উনি জেলে যাওয়ার পর কখনও কিছু দিয়েছেন ওঁকে আপনি? গার্ডরা কিছু দিতে দেয়?'

ফারার দিকে তাকিয়ে আছে মহিলা এখনও, রানার দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করতে হলো।

'না, তা দেয় না,' বলল মহিলা। 'তবে বেশ কয়েকবার ছোট চিঠি পাচার করেছি। গার্ডরা কখনও আমাকে সার্চ করেনি।'

'তা হলে তো ভাল। আপনার স্বামীকে চিঠি লিখবেন। কী লিখতে হবে আমি বলে দেব। লিখবেন, আমরা আপনার কোনও ক্ষতি করিনি, সে যেন তামারার কথা মন দিয়ে শোনে। আমার জন্য আপনার চিঠিটা পাওয়া অতি জরুরি। লিখতে পারবেন না?'

'জা। হ্যাঁ, তা পারব।' মনে হলো মহিলার বাস্তব বুদ্ধি ফিরে এসেছে, বুঝতে পেরেছে সত্যি মিখাইল ও তামারা তাকে সাহায্য করছে। 'তারপর আপনারা কী করবেন?'

'আপনি বোধহয় জানতে চাইছেন আমরা বেয়ারমানকে মুক্ত করলে তখন কী হবে। পরে কী হবে জানি না। আমাকে বলা হয়েছে আপনার স্বামীকে একটা সেফ হাউজে পৌঁছে দিতে হবে। তারপর...' যুদ্ধে নেমে পড়া সৈন্যের মত কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'এর পরে কী হবে সেটা ঠিক করবেন আপনার স্বামী আর আমার বস্। এটুকু জানি, আপনাকে সরিয়ে নেয়া হবে। আপনাদের দক্ষিণ ফ্রান্সের কোস্তা দেল সোল-এ পৌঁছে দেয়া হবে, ওখানে অবসর জীবন কাটাবেন।'

ফসেট বেয়ারমান ম্লান হাসল। সে বুঝে গেছে, বাকি জীবন আর নিশ্চিন্তে থাকা হবে না।

পরদিন সকাল ন'টায় রেজেন্সডোর্ফ প্রিযনের উদ্দেশে রওনা হলো ফারা। অধীর অপেক্ষায় থাকল রানা। ও জানে, ঝুঁকি রয়ে গেল, ফসেট বেয়ারমান যে-কোনও সময় মত পাল্টে পুলিশে ফোন করতে পারে। ভোরে আজ মেইডকে বিদায় করেছে সে। এখন ডাইনিং রুমে রানার সামনে বসে আছে। ওদের সামনে কোল্ড কফি।

রাশান গ্যাংস্টারের অভিনয় চালিয়ে যাচ্ছে রানা। কথাবার্তা খুব একটা হচ্ছে না, সেজন্য খুশি। উকিলকে কিডন্যাপ করতে আর মাত্র তিনদিন বাকি। অনুভব করছে, একটা একটা করে ঘণ্টা শেষ হচ্ছে, আর আসল সময় এগিয়ে আসছে। এখনও ট্রাকের উপর কারিগরি ফলানো শেষ হয়নি আতাসিদের। রবিবারের মধ্যে কনস্ট্রাকশান সাইটের কাজগুলো শেষ করতে হবে। কপাল ভাল, যে-কোম্পানি ওই বাড়ি তৈরি করছে, রাতের জন্য পাহারাদার রাখেনি তারা।

ওর দলের সবাই দ্রুত কাজ সারছে। আজ রাতে অন্তত দশ টন সিমেন্ট জায়গামত রাখা হবে।

সকাল এগারোটায় পঞ্চমবারের মত ঘড়ি দেখল রানা। ইতিমধ্যে একবার সেল-ফোনে আতাসির সঙ্গে কথা বলেছে। আতাসি-কাশেম-জলিল ওয়্যারহাউজের

নিত্য নতুন ইবুকের জন্য

সবসময় ভিজিট করুন

www.DOWNLOADPDFBOOK.com

STOP

বিনা অনুমতিতে

সরাসরি ডাউনলোড লিঙ্ক

শেয়ার না করার অনুরোধ রইল

কাজ নিয়ে ব্যস্ত। এখন ট্রাকে পঞ্চাশ পাউণ্ডের সিমেন্টের বস্তা তুলছে।

কোথায় যেন একটা অটোম্যাটিক গ্যারাজের দরজা খুলে গেল। চেয়ার ছেড়ে সদর দরজার কাছে চলে গেল রানা। ঠিকই ধারণা করেছে, এইমাত্র বেয়ারমানের ৭৪০-বিএমডাব্লিউটা ফিরেছে। কলিং-বেল বাজাল না কেউ। দশ সেকেণ্ড পর দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল ফারা।

'কী অবস্থা?' নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল রানা।

'সহজ কাজ,' অনাবিল হাসল ফারা। 'লোকটা পাক্কা দুই মিনিট পর বুঝতে পারে আমি নকল। গার্ডরা দ্বিতীয়বার দেখেনি।'

'গুড। সে তৈরি থাকবে?'

'পারলে এখনই চলে আসতে চায়। পিএলওর আততায়ীরা তাকে খুন করতে চায় বলতেই সব কথায় রাজি হয়ে গেল।'

'আমরা কী ভাবে কী করব শুনিয়েছ?'

'হ্যাঁ। সোমবার ভোরে রেজেন্সডোর্ফের ডিআইজির সঙ্গে কথা বলবে, জানাবে তক্ষুনি তার অ্যাটর্নির সঙ্গে কথা বলতে চায়। তাকে বলেছি, লেবাররা ওই সাইটে নটার সময় কাজ শুরু করে। আর্মার্ড কনভয় তার অনেক আগেই আসতে হবে।'

'কোনও তথ্য ছেড়েছ?'

'দ্য চুহার ব্যাপারে? না। কোনও চাপ দিইনি আমি। তবে যখন শুনেছে রাশানরা আমাকে পাঠিয়েছে, তখন জিজ্ঞেস করেছে আমি ভ্লাদিমিয়ার সরোকিনের কাজ করি কি না। কোনও কথা বলিনি, শুধু মাথা দুলিয়েছি। মনে হয়েছে বেয়ারমান স্বস্তি পেয়েছে। সরোকিন সম্ভবত তার আসল কন্ট্যাক্ট।'

'ভ্লাদিমিয়ার সরোকিন,' বিড়বিড় করে বলল রানা। না, নামটা পরিচিত নয়। 'চিনলাম না ঐ কে। অনিল নামটা কম্পিউটারে সার্চ করলে কিছু বেরিয়ে আসতে পারে।' ফারার কটা চোখে তাকাল ও। ফারা কন্ট্যাক্ট লেন্স খুলছে। এক চোখ বেগুনী হয়ে যাওয়ায় রানা বলল, 'মহিলাকে পাহারা দিতে পারবে তো?'

'জিনিসপত্র সঙ্গে এনেছি, কাজেই কোনও সমস্যা নেই।' কাঁধে ঝোলানো ব্যাগে আলতো চাপড় দিল ফারা। ওটার ভিতরে একটা সিরিঞ্জ আছে। ফ্রাউ বেয়ারমান রবিবার রাতে শুয়ে পড়বার পর তাকে ইঞ্জেকশন দেবে ও। মহিলা চব্বিশ ঘণ্টা ঘুমিয়ে উঠবে। তার অনেক আগেই রানা নিজের দলবল নিয়ে দ্য মার্ভেল অভ গ্রিসের উদ্দেশে রওনা হয়ে যাবে।

দুই

ডক্টর ফারা যতই ধমক দিক, সিগারেট ছাড়তে আপত্তি আছে সোহেলের। কয়েকদিন আগে জেদী মেয়েটা জোর করে ওর কোলেস্টেরল পরীক্ষা করেছে। সবই ঠিক আছে। কিন্তু ওই যে সিগারেট খায়, সেটাই নাকি ওকে শেষ করবে। ও মারাই যাচ্ছিল, মেয়েটা ওকে সুস্থ করতে অনেক খেটেছে, এককথায় স্বীকার

করবে সোহেল, তা-ই বলে...

রানা বলেছে, 'মেয়েটা বোধহয় তোকে ভালবাসে।'

দুঃখ করে বলেছে সোহেল, 'আমার তা মনে হয় না, ও যদি ভালই বাসবে, তা হলে আমাকে না খাইয়ে মেরে ফেলবে কেন? বুড়োর হাত থেকে বাঁচিয়ে এনে তুই এ কোন্ বুড়ির হাতে ফেলে দিলি!'

ওই ফারা রাইনার জাহাজে উঠবার পর থেকে ওর উপর শ্যেন দৃষ্টি রেখেছে। মেয়েটার ধারণা, ওর উচিত না খেয়ে থেকে ওজন কমানো। স্বাভাবিক ওজনের চেয়ে এক কেজি বাড়তি হওয়া এতই বড় দোষ? ওর প্রিয় খাবারগুলো গায়েব হয়ে গেছে মেন্যু ছেড়ে।

আর এখন? ওকে ঠেকায় কে? এইমাত্র খাওয়া শেষ করেছে সোহেল, ভালবেসেই তো মস্ত এক টুকরো চকলেট কেক নিল। ওটা শেষ করে ন্যাপকিন সরিয়ে রাখল। স্টুয়ার্ড ছাড়া মেস-হল-এ কেউ নেই। বিরাট ঢেকুরটা ঠেকাল ও। এবার একটা সিগারেট ধরানো যায়। ডেকে অবশ্য যাওয়া যাবে না। গত দেড় ঘণ্টা ধরে জোর বাতাস ছেড়েছে।

সাদা জ্যাকেট পরা স্টুয়ার্ড বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, 'সার, আপনার খাওয়া শেষ?'

'আপাতত,' চেয়ার ছেড়ে দরজার দিকে রওনা হয়ে গেল সোহেল। 'বাবুর্চিকে বোলো আমার কেবিনে পুডিং পাঠিয়ে দিতে হবে।'

কেবিনে ফিরে আয়েশ করে আর্ম-চেয়ারে বসল ও, একটা সিগারেট ধরাল। দু'টান দিতেই ইন্টারকম বেজে উঠল। সিগারেট ছাইদানীতে রেখে ইন্টারকমের রিসিভার তুলল ও।

'বিরক্ত করতে হলো,' বলল উর্বশী। ও আছে অপারেশন্স সেন্টারে।

পেট ভরে খেতে পেয়ে খুশি মনে বলল সোহেল, 'কোনও সমস্যা নেই, বলে ফেলুন।'

'আপনি জানতে চেয়েছেন মিস্টার ফু-চুঙের কোনও খবর আছে কি না। আমরা এখন ধারণা করছি তিনি ফউজোউ ছেড়ে শাংহাইয়ে ফিরেছেন।'

তথ্যটা চুপচাপ হজম করল সোহেল। 'স্নেকহেড ওকে ওখানে নিয়ে যেতে পারে। ওটা তো দুনিয়ার ব্যস্ততম বন্দর। ফউজোউ বন্দরের বদলে ওখান থেকে লোক তোলা সোজা হবে। ওরা একদল লোককে বেআইনী ভাবে ফ্রেইটারে তুলে দিতে পারবে।'

'মিস্টার চ্যাটার্জি একই কথা বলেছেন। আমিও একমত। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা কী রানাকে ফোন দেব?'

'না, সেটা উচিত হবে না। আরও দুশ্চিন্তা করবে। আমরা আর কোনও তথ্য পেলে তখন জানাব। ...আমাদের খুনি বন্ধুরা এখন কোন্ পজিশনে আছে?'

'গতি বাড়িয়েছে। এখন ছয় নট-এ চলেছে। আমরা পাঁচ ঘণ্টা পর হো-চি-মিন সিটি থেকে একশো মাইল পুবে থাকব।'

ঠোঁটে সিগারেট তুলল সোহেল, টান দিল না। 'ভিয়েতনামের হো-চি-মিন সিটি? দ্য চুহা কোর্স বদলেছে?'

'না। আগের মতই একশো পঁচাশি। ভাব দেখে মনে হচ্ছে ওটা সিঙ্গাপুরে যাবে। কিন্তু আমার ধারণা, আদতে ওখানে যাবে না। ওটা দুনিয়ার অন্যতম দুর্নীতি-মুক্ত বন্দর। আমার ধারণা দ্য চুহা শীঘ্রি দক্ষিণে রওনা হবে, যাবে ফিলিপাইন্‌স্ বা ইন্দোনেশিয়ায়।'

'হতে পারে,' বলল সোহেল। ইন্দোনেশিয়ায় হাজার খানেক দ্বীপ আছে। ইন্দোনেশিয়ান কোস্ট-গার্ড অনেকটা অসহায়। জলদস্যুরা সহজেই তাদের ফাঁকি দিতে পারবে, নীরব কোনও উপকূলে চোরাই জাহাজ খালাস করা খুব কঠিন হবে না। সোহেলও আন্দাজ করছে, জলদস্যুরা ফিলিপাইন্‌স্ বা ইন্দোনেশিয়ায় যাবে। ওরা কোথায় চলেছে বোঝা যাবে শীঘ্রিই।

'ঠিক আছে, উর্বশী, দ্য চুহা বাঁক নিলে জানাবেন। আর এর মধ্যে ফু-চুং বা রানা যোগাযোগ করলে আলাপ করা যাবে।'

'আই-আই, মিস্টার আহমেদ,' ইন্টারকম রেখে দিল উর্বশী।

ছাইদানীতে পোড়া সিগারেট ফেলে আরেকটা সিগারেট ধরাল সোহেল। ভাবল, জলদস্যুরা শান্ত সাগরে যে-কোনও জায়গায় জাহাজ সরিয়ে ফেলতে পারত—তা করেনি কেন? জাহাজের নতুন একটা নাম দিয়ে সামান্য বৈশিষ্ট্য বদলে নিতে হতো। চোরাই জাহাজ খোলা সাগরে কে চিনবে। এসব জাহাজ দক্ষিণ আমেরিকার সাগরে নামালে ধরবে কে? অথচ জাহাজটা ড্রাই-ডকে নিয়ে বুকে আগলে রাখছে। কেন? দ্য চুহার পিছু নিলে জলদস্যুদের আস্তানায় পৌঁছে যাবে ওরা?

এদিকে রানা কী জানতে পারবে কে জানে! আর ফু-চুং—ও কী মানুষ-পাচার সম্পর্কে কিছু জানতে পারল?

লিউ ফু-চুং জানে না এ-মুহূর্তে ওর কথাই ভাবছে সোহেল, আশা করছে, যে-লোক নিরীহ বোকা মানুষগুলোকে সরিয়ে নিয়ে চলেছে, ফু-চুং তাকে ধরতে পারবে।

দুর্ধর্ষ চিনা স্পাইটি এখন অতীত স্মৃতির মাঝে ডুব দিয়েছে। আর্মিতে কমাণ্ডো ট্রেইনিঙের সময় ইন্সট্রাক্টর ওকে একটা কোড মনে রাখতে দিয়েছিল, বলেছিল ট্রেইণ্ড কমাণ্ডোরা ধরে ফেললে ওর মগজ থেকে কোড বের করতে চাইবে। একদিন ধরা পড়ে গেল ও। তারপর পুরো একমাস ওকে টর্চার করা হলো। নিয়মিত কয়েকবার পেটানো হতো, রোদের মধ্যে লোহার বাক্সে আটকে রাখা হতো। দিনে একবার অতি সামান্য খাবার দিত। ট্রেইণ্ড কমাণ্ডোরা ক্যাডেটদের নানা ভাবে ভেঙে ফেলতে চাইত। শেষদিকে ওকে পরপর ছয়দিন ঘুমাতে দেয়া হয়নি। ফু-চুং তখন দুনিয়ার সমস্ত গালি শুনেছে। শেষে ওকে ন্যাংটা করে লাল পিঁপড়ের ঢিবিতে বেঁধে রাখা হলো। রাতে ওকে কারাগারে নিয়ে জোর করে দুই পাইন্ট কড়া মদ গিলিয়ে দিল। এরপর জ্ঞান হারায় ও। পরেও কিছুতেই কোড বলেনি ও। এক সময় ট্রেইণ্ড কমাণ্ডোদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

ওটা ছিল ট্রেইনিং।

কিন্তু এখন কোনও ট্রেইনিং হচ্ছে না। এটা বাস্তব জীবন। ট্রাকের পিছনের

ট্রেইলারে অবৈধ দেশত্যাগীরা গাদা মেরে দাঁড়িয়ে আছে। ট্রাক ক্রমাগত ঝাঁকি খেয়ে, এপাশ-ওপাশ দুলে এগিয়ে চলেছে। যারা পিছনের দরজার কাছে দাঁড়িয়েছে, তারা প্রায় চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে গেছে।

স্নেকহেডদের হাতে আটকে থেকে ফু-চুঙের এখন মনে হচ্ছে, কমাণ্ডো ট্রেইনিঙের সময় যে-ট্রেইণ্ড কমাণ্ডোরা অত্যাচার করত, এদের তুলনায় তারা একেবারে শিশু। ওগুলো ছিল আনন্দের দিন। তখন মনে একটা শান্তি ছিল, শেষ পর্যন্ত বাঁচবে। কিন্তু এখন কী ঘটবে কেউ জানে না।

ট্রাকের পিছনের বাক্সে একশো মানুষ ঠেসে ভরা হয়েছে। পুরো দু'দিন ওদের কোনও খাবার দেয়া হয়নি, সামান্য পানিও না। সবাই এখনও দাঁড়িয়ে আছে তার কারণ, পড়ে যাওয়ার জায়গা নেই! বাক্সের ভিতরে ঘাম, প্রশ্রাব ও পায়খানার দুর্গন্ধে শ্বাস আটকে আসছে। ফু-চুঙের মুখের ভিতরে চড়া পড়েছে, দম নেওয়ার সময় ফুসফুস ছিঁড়ে যেতে চাইছে।

সিয়েন লাউ ওকে ফউজোউয়ে পৌঁছে দেওয়ার পর থেকে এ-ই চলছে। লাউ ওদের তুলে দিয়েছে পরের লিঙ্কে। এরা ট্রায়াড, মাফিয়ার মতই, তবে চৈনিক ভার্শান। এরা ওর ছবি তুলে সরকারী ডকুমেন্ট তৈরি করেছে। ওকে আরও ষাটজন উদ্বাস্তুর সঙ্গে একটা সিমেন্ট ফ্যাক্টোরিতে নিয়ে গেছে, আণ্ডার-গ্রাউণ্ডে একটা কুঠুরিতে আটকে রেখেছে। ওখানে কোনও বাথরুম ছিল না। ওরা দু'দিন ওখানে বন্দি ছিল। প্রতি রাতে গার্ডরা এসে মেয়েদের নিয়ে গেছে। কয়েক ঘণ্টা পর তাদের ফিরিয়ে দিয়েছে, সবাই রক্তাক্ত—লজ্জায়, ব্যথায় মৃতপ্রায়।

তৃতীয় দিন সকালে একটা দল এল। লোকগুলো দক্ষিণ এশীয়। এরা বিদেশি টানে স্নেকহেডদের সঙ্গে কথা বলেছে। ফু-চুং আন্দাজ করতে পারেনি লোকগুলো কোন দেশি। মনে হয়েছে উপ-মহাদেশীয়। খেয়াল করেছে, এরা আসায় পরিস্থিতি বদলে গেছে। শুনেছে, ওদের সাধারণ পথে চিন থেকে সরানো হবে না। লোকগুলোকে জলদস্যু বলেই মনে হয়েছে ফু-চুঙের।

কুঠুরি থেকে একেক দলে দশজন করে বের করা হয়েছে। তাদের সামনে হাঁটানো হয়েছে। এরা সবাইকে উলঙ্গ করে দেখেছে। ভাব দেখে মনে হয়েছে, মুরগি কিনছে। ফু-চুঙের মন বলেছে, ওদেরকে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করা হচ্ছে। লোকগুলো ওর দাঁত পরীক্ষা করেছে, গোপন অঙ্গ দেখে বুঝতে চেয়েছে ওর কোনও ছোঁয়াচে রোগ আছে কি না। শরীরের শক্তির প্রমাণ দিতে হয়েছে ওদের। একটা বাঁশের দু'পাশে ঝোলানো ওজনদার কাঠের টুকরো ছিল, ওগুলো তুলেছে ওরা।

ওই লোকগুলো হাতের ইশারায় ফু-চুং ও আরও চারজনকে সরে দাঁড়াতে বলেছে। এই দলে ওরাই মোটামুটি শক্তিশালী। ওদের দলের অন্য ছ'জনকে কারাগারে ফেরত পাঠিয়েছে।

ষাটজনের মধ্যে দশজনকে বেছে ট্রাকে তোলা হয়েছে। গার্ডরা মোটা লাঠি দিয়ে ফু-চুংদের ঠেলে ট্রাকের ভিতরে ঢুকিয়েছে। এরা আগেই অনেক লোক তুলেছে। ভিতরে ঢুকে মনে হয়েছে, বড় করে শ্বাস ফেলা যাবে না।

ট্রাকের পিছনের দরজাটা বন্ধ করে দেওয়ার আগে একটা মোটা হোস পাইপ

তাক করা হয়েছে। ওটা ছিল সবাইকে পানি খাওয়ানোর উদ্যোগ! তাড়াতাড়ি করে পানি পেতে গিয়ে কয়েকজন আহত হয়েছে। ফু-চুং তখন এক মুখ পানি পেয়েছে, ট্রাকের ট্রেইলারের দেয়ালে পানি লেগেছে, সেগুলো সাবধানে চেটেছে। এরপর দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। ওরা সবাই অন্ধকারে বন্দি হয়েছে।

কিছুক্ষণ পর ট্রাক রওনা হয়েছে। কেউ কোনও কথা বলেনি। তখন ফু-চুং অনুভব করেছে, থমথমে নীরবতাও কষ্ট দিতে জানে। কেউ কাঁদেনি, অভিযোগ করেনি, কেউ মুক্তি চায়নি। ও জানে, এদের স্বপ্ন দেখানো হয়েছে, ভবিষ্যতে তারা চমৎকার জীবন পাবে—কিন্তু বোকা মানুষগুলো বাস্তবে কী পাবে? মৃত্যু? শিরি-ফোরের কন্টেইনারে যারা ছিল, তাদের মত মরতে হবে?

ওর মনে হয়েছে, ট্রাক কয়েক দিন ধরে এগিয়ে চলেছে। তবে, সময়টা বিশ ঘণ্টার বেশি হবে না। স্নেকহেডরা হাই-ওয়ে দিয়ে এগোয়নি, গেছে সেকেণ্ডারি রোড ধরে, নইলে এত কষ্ট হতো না। চাপাচাপি করে দাঁড়িয়ে অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ট্রেইলারের ভিতরে বমির টকটক গন্ধ প্রস্রাবের গন্ধকে ছাপিয়ে উঠেছে।

কিছুক্ষণ আগে মসৃণ পথে পড়েছে ওরা। তারপর হঠাৎ ট্রাক থেমে গেছে।

কেউ এসে দরজা খুলে দেয়নি। ফু-চুঙের মনে হয়েছে দূরে কোনও বিমান গর্জন করছে। জেট ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনেছে ও। আওয়াজটা অবশ্য বজ্রের শব্দও হতে পারে। ওরা সবাই বাধ্য হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ কোনও কথা বলছে না। শুধু দাঁড়িয়ে থাকা।

অন্তত একঘণ্টা পেরিয়ে গেল, তারপর কে যেন দরজার কাছে এল, তালা খুলে দিল। ট্রাকের দুই পাল্লা মেলে দেয়া হলো। ট্রেইলারের ভিতরে ওদের পুরো একদিন আটকে রাখা হয়েছে। সবার চোখে তীব্র সাদা আলো এসে পড়ল। কয়েক সেকেণ্ড কিছুই দেখতে পেল না ফু-চুং। চোখে পানি চলে এল, তবে শ্বাস নিয়ে মনে হলো, বেঁচে থাকা কী আনন্দের!

চারপাশ দেখল ও। ওরা আছে প্রকাণ্ড একটা আধুনিক ওয়্যারহাউজের ভিতরে। ভেবেছিল পুরোনো কোনও ডকে এসে থেমেছে, স্নেকহেডরা ওদের ট্রলারে তুলে দেবে। খেয়াল করলে বুঝতে পারত, ও যে ওয়্যারহাউজে আছে সেখানে কোনও কলাম-বিম নেই। ধাতব বিল্ডিংটা ধনুকের মত বেঁকে অনেক উপরে উঠেছে।

সবাইকে ট্রাক থেকে নামতে বলা হলো। অনেকে এত দুর্বল যে নীচে নেমে কংক্রিটে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। রাইফেলের খোঁচায় এদের সরানো হলো। মানুষগুলো ছেঁচড়ে সরে গেল। তাদের জায়গায় নামল আরও আরও লোক। কপালকে ধন্যবাদ দিল ফু-চুং, ও এখনও দাঁড়াতে পারছে। সরে গেল ও, ট্রাকের একটু দূরে গিয়ে বসে পড়ল।

ওয়্যারহাউজের ভিতরে ছয়জন গার্ড। পরনে পাঞ্জাবি, কোর্তা। পায়ে কম দামি স্যাণ্ডেল। হাতে একে-ফোরটিসেভেন। চেহারাগুলো খেয়াল করল ফু-চুং, পরে এদের দেখলে চিনতে পারবে।

মাথা ঘোরা কমে আসতে একটা ব্যাপার লক্ষ করল ও—এখানে সাগরের ঘ্রাণ নেই, তার বদলে আছে পরিচিত একটা কেমিকেলের গন্ধ। গার্ডদের

মনোযোগ আকর্ষণ না করে ট্রাকের ওপাশে চলে গেল ও। দূরে ছাদ-ছোঁয়া দরজাটা দেখতে পেল। চমকে গেল আরেকটা জিনিস দেখে—ভাবেওনি এ-জিনিস এখানে থাকবে। একটা কমার্শিয়াল এয়ার-লাইনার। ওটার পিছনের লেজে চারটে ইঞ্জিন বলে দিল, ওটা একটা পুরনো রাশান ইলিয়ুশিন II-62.

ওই কার্গো প্লেনে তুলে চিন থেকে ওদেরকে সরিয়ে নেওয়া হবে? কোথায়? কর্তৃপক্ষকে কলা দেখিয়ে দেশত্যাগীদের নিয়ে এত সহজে সরে পড়বে?

জেট-লাইনারের দরজা খুলে গেল, গার্ডরা এক লাইনে সবাইকে দাঁড় করিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। হ্যাঙারের দরজা এখনও আটকে রাখা হয়েছে। পালাবার পথ নেই। প্লেনে গুনে গুনে লোক তোলা হচ্ছে।

ফু-চুং সবার পিছনে হাঁটছে।

ট্রাকটা একপাশে দাঁড়িয়ে আছে, ইঞ্জিন বন্ধ। চাবিটা ইগনিশানে আছে? সবাই ইলিয়ুশিনে উঠছে। ট্রাকটা মাত্র দশ গজ দূরে। এই দূরত্ব ও কয়েক সেকেণ্ডে পেরতে পারবে। ট্রাকের কেবিনে উঠবে, ইঞ্জিন চালু করে হ্যাঙার ভেঙে বেরিয়ে যাবে। একবার এয়ারপোর্ট টার্মিনালে ঢুকলেই প্লেন আটকে দেবে ও। ওই গার্ড, পাইলট, স্নেকহেডরা—সবাই মুখ খুলতে বাধ্য হবে। এদের উপরের লোকগুলো টের পাওয়ার আগেই একের পর এক লিঙ্ক ধরবে ও। মারাত্মক কোনও ভুল না হলে শেষপর্যন্ত এদের নেতাও ধরা পড়বে।

ফু-চুং সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, প্লেনে না উঠে ঝুঁকি নেবে ও। এক পা এগোল, মনে মনে মানসিক প্রস্তুতি নিল—এবার দৌড়ে গিয়ে ট্রাকে... কিন্তু ড্রাইভার লোকটা এখনও ওটার ক্যাবে! একটু দমে গেল ফু-চুং। তাকে কাবু করতে গিয়ে খানিকটা সময় বেরিয়ে যাবে। কিন্তু একজন গার্ড ওকে থেমে দাঁড়াতে দেখে ধমকে উঠল, 'এগো, ব্যাটা!'

নিঃশব্দে দীর্ঘশ্বাস ফেলল ফু-চুং, শরীর শিথিল করে দিল। ট্রাকের ক্যাবের দিকে আরেকবার তাকাল, কিন্তু ওর সামনের লোকটা প্লেনে উঠে পড়েছে। এবার ওর পালা। আবারও ধমক দিল গার্ড, রাইফেল হাতে চোখ গরম করে তাকাল।

লোকটা অন্তত দশ ফুট দূরে। ফু-চুং বাধ্য হয়ে কয়েক ধাপ টপকে প্লেনে উঠল, সামনের দিকের একটা সিটে গিয়ে বসল। কেউ কোনও কথা বলছে না। হয়তো যে-যার মত করে ভাবছে বিদেশে গিয়ে তার জীবন কেমন কাটবে।

গার্ডরা বাইরে দাঁড়িয়ে। প্লেনের দরজা বন্ধ করে দিল। পনেরো মিনিট পর ইলিয়ুশিন টো করে হ্যাঙার থেকে বাইরে আনা হলো।

অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেল, তারপর হঠাৎ ইঞ্জিনগুলো চালু হলো। বিমান ট্যাক্সিং করছে। ফু-চুং জানে, ওরা ফউজোউ ছেড়ে এসেছে অনেক আগে। কাছাকাছি বড় শহর, শাংহাই। দূরত্ব মিলে যায়। সম্ভবত এটা শাংহাই এয়ারপোর্টের কাছেই, ছোট কোনও এয়ারপোর্ট। টার্মিনাল বিল্ডিংটা বড় নয়।

পাঁচ মিনিট পর প্লেন আকাশে উড়াল দিল। ফু-চুং ঠিকই ভেবেছে। শাংহাই আড়াআড়ি ভাবে পিছিয়ে গেল। ইলিয়ুশিন উত্তর দিকে চলল।

পাশে বসে থাকা তরুণ ফিসফিস করে বলল, 'ভাই, আপনার কী মনে হয়, আমাদের প্লেন কতক্ষণ পর আমেরিকায় পৌঁছবে?'

ছেলেটাকে দেখে মনে হয়, এ কোনও খামার-বাড়িতে কাজ করত। বেচারা জানেও না কীসের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। এখনও ভাবছে ইউনাইটেড স্টেট্স্-এ চলেছে। ওর কাছে ওটা সোনার দেশ। ওখানে পরিশ্রম করলে সবই সম্ভব। ফু-চুং জানে না এই প্লেন ওদের কোথায় নিয়ে চলেছে, তবে এটা নিশ্চিত যে ওরা আমেরিকায় যাবে না। ইলিয়ুশিনের এত রেঞ্জ নেই যে ওখানে যায়। চোখ বন্ধ করে শ্বাস ফেলল ফু-চুং, নরম স্বরে বলল, 'প্লেনটা পৌঁছে গেলেই বুঝতে পারবে কোথায় পৌঁছুতে কতক্ষণ লাগল।'

উইকেণ্ডের দু'দিনে রানা ওর দল নিয়ে বার বার রিহার্সেল দিয়ে প্রস্তুত হলো। আগামীকাল লিয়ার বেয়ারমানকে কিডন্যাপ করা হবে। ওরা কনস্ট্রাকশান সাইটে প্রতি রাতে ক্লান্তিহীন শ্রম দিয়েছে, সিমেন্টের ব্যাগ টেনেছে। সবাই মিলে শুক্রবার রাত থেকে শনিবারের বিকেল পর্যন্ত বিশ টন সিমেন্ট সরিয়েছে। ওরা জানে উইকেণ্ডে কেউ আসবে না। ফোরম্যান আসেওনি। সাইটে পোর্টল্যাণ্ড সিমেন্টের অভাব নেই। রবিবার রাতে ওয়ায়ারিং শেষে বিস্ফোরক বসাল ওরা। মাঝরাতে কাজ শেষ হয়ে গেল। আতাসি আর আবু কাশেম রানার ভাড়া করা গাড়িটা নিয়ে ওয়্যারহাউজে ফিরে গেল। জায়গাটা প্রায় নির্জন, জুরিখ থেকে বিশ মাইল উত্তরে।

রানা ও জলিল খান সাইটে রয়ে গেল, ট্রেইলারটা শেষবারের মত পরীক্ষা করে দেখবে। অন্ধকার রাত। রাস্তায় কোনও পথচারী নেই যে ওদের দেখে অবাক হবে। মডিফায়েড ট্রেইলারে ঢুকে দরজা বন্ধ করল রানা, এক কোনায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। ততক্ষণে ক্লান্তিতে ঘুম চলে এসেছে ওর। এবার দেখা যাবে কেমন ঝাঁকি লাগে। ছিটকে পড়বে কি না কে জানে! বিরাট ম্যান ডিজেল ইঞ্জিনের গর্জন শুনতে পেল ও। জলিল ট্রাক নিয়ে রওনা হলো। রানার হাতে একটা ফ্ল্যাশ-লাইট, কিন্তু এই ধাতব কন্টেইনার এমনই বদ্ধ যে, শ্বাস আটকে আসতে চাইছে। ছাদের সঙ্গে মোটর ও পুলিগুলো পরীক্ষা করে দেখল রানা। ওগুলো খুব সহজ ভাবে বসানো হয়েছে, জলিল ইচ্ছা করলেই ক্যাব থেকে অপারেট করতে পারবে।

পোর্টেবল রেডিয়ো চালু করল রানা, কোনও স্টেশন ধরতে পারল না। কোনও ফ্রিকোয়েন্সি নেই। এবার সেল-ফোন দেখল, কোনও সিগনাল নেই। 'আমি ফোন করতে পারব না,' ভাবল রানা। 'কেউ আমাকে পাবে না। গুড!'

ট্রেইলারের ভিতরে ব্যাফল ও জ্যামার্স বসিয়েছে ওরা। বাইরে থেকে ইলেক্ট্রনিক সিগনাল পাওয়া যাবে না। আতাসি ও কাশেম ওয়্যারহাউজে বসে ইকুইপমেন্টগুলো পরীক্ষা করেছে, কিন্তু রানা নিশ্চিত হতে চাইছে যে, ওদের তৈরি সিস্টেমটা শহরে চলবে। বড় শহরে সেল-ফোনের কোম্পানি সিগনালের ক্ষমতা বাড়িয়ে রাখে। কিন্তু এই কন্টেইনারে কোনও সিগনাল ঢুকলে চলবে না।

প্রতি পাঁচ মিনিট পর সেল-ফোন চালু করল রানা, আধঘণ্টা পর নিশ্চিত হলো, ওর ফোন কোনও কাজে আসছে না।

জলিল বিশ মাইলের রাস্তা ষোলো মিনিটে পার হলো। আতাসি ওয়্যারহাউজের দরজা খুলে দেয়ায় দশ চাকাওয়ালা ট্রাক ভিতরে ঢুকল। কাশেম ট্রেইলারের দরজা খুলে দিল।

রানা নেমে আসায় আতাসি জিজ্ঞেস করল, 'কী বুঝলেন, বস্?'

'ভেতরে কোনও সাড়া নেই,' বলল রানা। ও এখন জানে, ওর ফোন কাছের সেল টাওয়ার পর্যন্ত পৌঁছোয়নি। 'এবার আমরা তৈরি। সবাই ঘুমিয়ে পড়তে পারো। লিয়ার বেয়ারমানের ভ্যান সোয়া আটটায় আসবে। আমরা ওখানে সাড়ে সাতটায় হাজির থাকব। ...ফারা ফিরে গেছে?'

জলিল মাথা দোলাল। 'আপনি যখন ট্রেইলারে ছিলেন তখন ফোন করেছেন। বেয়ারমানের স্ত্রী ঘুমিয়ে পড়েছে। ফারা হোটেলে চলে গেছেন। সাতটায় জেলখানার সামনে থাকবেন। আর্মার্ড ভ্যান রওনা হলে ফোন দেবেন। কোর্ট পর্যন্ত ভ্যানের পিছন পিছন আসবেন।'

'ঠিক আছে। ওই কথাই হয়েছে আমাদের। জলিল, তুমি কনস্ট্রাকশান সাইটের পিছনে অপেক্ষা করছ। ...আতাসি, কাশেম, তোমরা তোমাদের গাড়ি কোথায় অ্যাক্সিডেন্ট করবে মনে রেখো।'

'মনে থাকবে, মাসুদ ভাই,' বলল কাশেম।

'আমরা তিনবার ট্রাই করে দেখেছি, কেব্‌লগুলো ঠিকই আছে, বস,' বলল আতাসি। 'আশা করি সমস্যা হবে না।'

'এখানে এসে এখন পর্যন্ত একটা মাত্র বেআইনী কাজ করেছি আমরা,' বলল রানা। 'এক উকিলের স্ত্রীর অভিনয় করা হয়েছে। সেটা খুব বড় দোষ নয়। কিন্তু কাল সকালে আমরা যা করব সেটা মস্ত বড় অপরাধ। আমরা সুইস পেনাল কোডের সব কটা আইন ভাঙব। মনে রেখো, কোনও ভুল হলে উদ্ধার করার কেউ থাকবে না। অন্তত বিশ বছর রেজেন্সডোর্ফে পচতে হবে।'

কেউ কোনও প্রশ্ন করল না। কোনও কথা বলল না। ওরা বুঝে-শুনেই ঝুঁকি নেবে।

পরদিন ভোর এল ধূসর মেঘ নিয়ে। বেশ শীত পড়েছে। ওরা শহরে ঢুকে যার যার পজিশনে চলে গেল। একটু পর হালকা বৃষ্টি শুরু হলো। রাস্তায় খুব কম মানুষ বেরিয়েছে। বেশিরভাগ ট্রেঞ্চকোট পরেছে, দু'একজনের হাতে ছাতা। আবহাওয়া ভাল না হওয়ায় রানাদের জন্য সেটা আরও সুবিধা হয়েছে। আজ সকালে যানজট কম থাকবে।

কনস্ট্রাকশান সাইটে ঢুকে পড়তে কোনও সমস্যা হলো না রানার। আজকে তৃতীয় বারের মত ওখানে ঢুকেছে ও। ক্রেনের বিরাট ইঞ্জিনের ইগনিশনের তার ছিঁড়ে রেখেছে, ওগুলো একসঙ্গে মুড়িয়ে দিল। মই বেয়ে উঁচু টাওয়ারে উঠবার সময় বৃষ্টিতে ভিজে গেল, তবে কপাল ভাল যে ক্রেনের ক্যাবে হিটার আছে। ইঞ্জিন চালু করল। এখন অপেক্ষার পালা। থারমোস ভরা কফিতে চুমুক দিয়ে নীচের দিকে তাকাল। গলা থেকে ঝুলছে ইনফ্রারেড গগ্‌ল্‌স্।

ফারা আরেকবার ফোন করল, জানিয়ে দিল লিয়ার বেয়ারমানের আর্মার্ড ভ্যান রওনা হয়েছে—ওটা কোর্টে পৌঁছুতে দশ মিনিট লাগবে।

অনেক উপর থেকে রাস্তা দেখতে পাচ্ছে রানা। অনেক দূরে দেখা যায়। আর্মার্ড ভ্যানের এগিয়ে আসা অন্তত পাঁচ ব্লক দূর থেকে দেখা যাবে।

জলিল ওর ট্রাক সাইটের পিছনে রেখেছে। জায়গাটা কাদা ভরা। ট্রাকের

ইঞ্জিন চলছে, মাথা উঁচু করা সাইলেন্সার পাইপ হালকা ধোঁয়া ছুঁড়ছে। আতাসি ও কাশেম অ্যাক্সিডেন্ট করবার জন্য অপেক্ষা করছে। ভ্যানটা সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড, আতাসি ওটা লুসার্নের একটা মুভিং কোম্পানির কাছ থেকে কিনেছে। মাঝারি ভ্যান, কোর্টের পঞ্চাশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছে। আতাসি বা কাশেমকে দেখতে পেল না রানা, তবে জানে, ওরা ইনফ্রারেড গগ্‌ল্‌স্ পরে আছে, মুখে গ্যাসের মুখোশ।

সাইটের চারপাশটা আরেকবার দেখল রানা। বাড়ি বানানোর মেটারিয়াল এদিক-ওদিক ছড়িয়ে আছে। চারটে ট্র্যাশ কন্টেইনার দেখা গেল, ওগুলো একেকটা মাঝারি ট্রাকের সমান। এক্সকেভেটার আর বুলডোজারগুলো থম মেরে পড়ে আছে। কনস্ট্রাকশান ট্রেইলারের কাছে কেউ নেই। ওখানে লোক আসতে দেরি আছে। গত সপ্তাহে রানার দলের সবাই এখানে চোখ রেখেছে। মজুররা আসবে পৌনে ন'টার দিকে। তার অনেক আগেই কিডন্যাপ হয়ে যাবে বেয়ারমান—যদি কপাল ভাল থাকে।

বৃষ্টির গতি বেড়েছে, সেইসঙ্গে বাড়ছে হাওয়া। আকাশ আরও কালচে হয়ে গেছে। সাততলা বিল্ডিঙের কঙ্কালটা অন্ধকারে থমথম করছে। রানা নীচে তাকাল। এত উপর থেকে বোমার তারগুলো দেখা যাবে না, কিন্তু ঠিক সময়েই ঘটবে বিস্ফোরণ।

ফোন বেজে উঠতেই রিসিভ করল রানা।

'রানা, আমি,' বলল ফারা। 'বেয়ারমানের ভ্যান হঠাৎ থেমে গেছে। সামনের গাড়ি থেকে নেমেছে এক পুলিশ, ভ্যানের ড্রাইভারকে কী যেন বলছে। দাঁড়াও। মনে হয় ঠিকই আছে। লোকটা নিজের গাড়িতে গিয়ে উঠেছে। ঠিক আছে, আবার রওনা হয়েছে। এক মিনিটের মধ্যে ওদের দেখতে পাবে।'

অনেক দূরে পুলিশের গাড়ি দেখল রানা। ওটার পিছু নিয়ে আসছে একটা আর্মার্ড ভ্যান। তারপর দ্বিতীয় ক্রুজার। আর্মার্ড ভ্যান বা ক্রুজারগুলোর মাথায় আলো নেই। সাইরেনের আওয়াজ পাওয়া গেল না। ওগুলো চারপাশের গাড়িগুলোর সঙ্গে মিশে আসছে।

ফোনের এনক্রিপ্টেড ওয়াকি-টকিতে বলল রানা, 'সময় হলো, তৈরি হও তোমরা।' ওটা রেখে ক্রেনের জয়স্টিক কন্ট্রোলে হাত রাখল। আগে কখনও টাওয়ার ক্রেন ব্যবহার করেনি ও, এ-জিনিসের উচ্চতার জন্য সাবধান থাকতে হবে। কিন্তু চালাতে পারবে। সাগরে ডেরিক ও ক্রেন আগে বহুবার ব্যবহার করেছে ও। পারা উচিত। আগেই একশো ফুট লম্বা হরাইযণ্টাল বুমটা রাস্তার উপরে নিয়ে এসেছে। ওটা থেকে ঝুলন্ত ট্রলি ও কেব্‌ল্ এখন রয়েছে ঠিক রাস্তার উপরে। পঞ্চাশ ফুট উপরে স্টিলের বিরাট হুকটা তৈরি।

'আমরা ওদের রিয়ারভিউ মিররে দেখতে পাচ্ছি,' আতাসি অ্যাক্সিডেন্ট করবার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিচ্ছে। ক্রুজার ওকে পাশ কাটাক, এগিয়ে গিয়ে ওটার পিছনে গুঁতো দেবে ও।

'সবাই গগলস পরে নাও,' নির্দেশ দিল রানা। বৃষ্টির কারণে খুঁটিনাটি সব দেখা যাচ্ছে না। ক্রেনের হুকের উপরে একটা ইনফ্রারেড লণ্ঠন রেখেছে ওরা, সেটা দেখা যাবে। গগলস না থাকলে বোঝা যেত না ওটা ওখানে আছে, তবে

আইআর ল্যাম্প ভাল ভাবেই জ্বলছে। গগলস পরে মনে হলো ওটা একটা জ্বলন্ত ফ্লেয়ার।

বামে দূরে আচমকা একটা নড়াচড়া দেখতে পেল রানা। ফেরারিটা বাঁক ঘুরে বেরিয়ে এসেছে। অন্তত আশি মাইল গতি তুলে ছুটছে। চালক পাগলের মত টু-ওয়ে রাস্তার উল্টো লেন ধরে আসছে। ইঞ্জিনের আওয়াজ দু'ধারের বাড়িতে ধাক্কা খেল। রানা একশো ফুট উপরে কন্ট্রোল ক্যাবে, তবুও কর্কশ গর্জন কানে এল। হিসব কষল রানা, ওই গাড়ি একটু পরেই পুলিশের ক্রুজার পিছনে ফেলবে। তার মানে আসল সময় ওটা আতাসির সামনে চলে আসবে। আতাসি যদি এখন এগিয়ে যায়, তা হলে ভয়ঙ্কর অ্যাক্সিডেন্ট হবে। ফেরারির চালক মরবে, আহত হবে আতাসি ও কাশেম। বেয়ারমানের ভ্যান যেখানে আছে, তাতে ওটাকে ঠেকানো যাবে না, পুলিশের কনভয় নিশ্চিন্তে অ্যাম্বুশ পেরিয়ে যাবে।

'বস? কী করব?' আতাসির কণ্ঠে তাড়া।

'আমি দেখছি,' শান্ত স্বরে বলল রানা। ক্রেনটা অনেক হিসাব কষে তৈরি রেখেছে ও, কিন্তু এখন নড়াতে হবে। জয়স্টিক নিয়ে দ্রুত কাজে নেমে পড়ল রানা, লম্বা বুমের বাহু সরিয়ে নিল। বুড়ো আঙুলে টগলের সেফটি কভার সরিয়ে দিল। বুম এগিয়ে যাচ্ছে, তারপর ঠিক যেখানে ওটাকে দরকার, সেখানে নিয়ে গেল রানা, সুইচ টিপে দিল। বিরাট হুক আকাশ থেকে খসে পড়ল। ওটার ওজন তিন হাজার পাউণ্ড।

ফেরারির চালক প্রথমে বুঝতে পারেনি ওজনটা নেমে আসছে। সরে যেতে মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পেল সে। গাড়ির বিশ ফুট দূরে স্টিলের হুকটা এসে নামল, রাস্তার গভীরে গেঁথে গেল। দু'ফুট চওড়া একটা গহ্বর তৈরি হলো। ড্রাইভার টের পেল বিরাট ওই হুক তার এফ-ফোরটির নাকের কাছে। ব্রেকের উপরে দাঁড়িয়ে পড়ল সে, বনবন করে হুইল ঘোরাল। গাড়িটা পুলিশের সামনের ক্রুজারে ধাক্কা মারল। রানা দ্রুত আরেকটা সুইচ টিপল, হুক রাস্তা থেকে তুলে নিল। ওটা থেকে ধুলো খসে পড়ল। হুকের গুঁতোয় মিলিয়ন ডলারের গাড়ির উইণ্ডশিল্ড চুরমার হয়ে গেল, ছাদের বড় একটা অংশ ছিঁড়ে পড়ল—মনে হলো সার্ডিনের ক্যান কাটা হয়েছে। ফেরারির পিছনের এক চাকা হুকের তৈরি গর্তে গিয়ে পড়ল। কাত হয়ে গেল গাড়িটা, আরেকবার পুলিশের ক্রুজারে ধাক্কা খেয়ে কিছুদূর গিয়ে থামল।

আতাসি বোধহয় দৃশ্যটা দেখেছে, কাজ থেকে মন সরায়নি ও। সামনের ক্রুজার ওর ভ্যান পার হলো। এগোল আতাসি, গতি বাড়িয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় চলে এল, ক্রুজারের পাশে ধাক্কা দিল। জোর গুঁতো গাড়িটাকে আধপাক ঘুরিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে সরু রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল।

বেয়ারমান যে আর্মার্ড ভ্যানে আছে, সেটা জোরে ব্রেক কষল। আরেকটু হলে সামনের ক্রুজারে ধাক্কা মারত। কনভয়ের ঠিক পিছনে আছে ফারা, নিজের গাড়ি আড়াআড়ি ভাবে পিছনে রাখল—আর্মার্ড ভ্যান আর উল্টোদিকে রওনা হবে না।

এবার ওয়্যারহাউজে বানানো বিস্ফোরকগুলো ফাটাবে রানা।

বাড়িটা অসম্পূর্ণ, ওখানে চার্জগুলো খুব সাবধানে বসিয়েছে ওরা, যেন মানুষের আত্মা কেঁপে যায়। একের পর এক বিস্ফোরণ ঘটবে। সব ক'টা ফ্লোরে

সিমেন্টের ব্যাগ রাখা হয়েছে, নীচতলা থেকে শুরু করে সাততলা পর্যন্ত ছড়িয়ে যাবে বিস্ফোরণ।

প্রচণ্ড আওয়াজ হলো। সিমেন্টের ব্যাগগুলো উড়ে গেল। ঘন ধূসর পাউডার ছিটকে উঠল। দূর থেকে দেখলে মনে হবে টুইন টাওয়ারের মত কিছু ঘটছে। একের পর এক কানফাটা আওয়াজ হলো। সিমেন্ট ভরা ব্যাগগুলো মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে উড়ে গেল। সিমেন্টের গুঁড়ো ছিটকে গেল দিগ্বিদিকে। চারপাশের দুশো ফুট এলাকা কালো হয়ে গেল। দু'ব্লক জুড়ে অন্ধকার নামল। যে-কেউ হাড়ে-হাড়ে টের পাবে কালো পর্দা কাকে বলে। হাওয়ার গতি আর বাড়েনি, বাতাস এরকম থাকলে সিমেন্টের ঘন কুয়াশা কাটতে কমপক্ষে দশ মিনিট লাগবে। আশপাশে যারা এখন আছে, কনস্ট্রাকশান সাইট বা রাস্তা দেখতে পাবে না।

একদল হতভম্ব পথচারী তারস্বরে চিৎকার করছে। সেদিকে খেয়াল না দিয়ে ভ্যান ছেড়ে নেমে পড়ল আতাসি, হাতে এক জোড়া কেব্‌ল্। ওপাশে নেমে পড়েছে কাশেমও, তার হাতেও একই জিনিস। দু'জন দু'দিকে ছুটল। ওদের মুখে গ্যাসের মাস্ক। ওগুলো সিমেন্টের বেশিরভাগ গুঁড়ো ঠেকাল। শ্বাসের সঙ্গে কিছু গুঁড়ো ঢুকল, জিভে বিশ্রী স্বাদ পেল ওরা। আইআর মাস্ক-এর কারণে ইনফ্রারেড লণ্ঠনসহ হুকটা নেমে আসতে দেখল। চারপাশে কী হচ্ছে, দেখা গেল না। হুক নেমে এলে কেব্‌ল্ পরাবে ওরা।

আর্মার্ড ভ্যানের ড্রাইভার নিশ্চয়ই ট্রেইণ্ড, অ্যাক্সিডেন্টের জায়গাটা দেখেই ধরে নিয়েছে, কোনও গোলমাল আছে। লোকটা সামনের গাড়িকে গুঁতো মেরে বেরিয়ে যাবে ভেবেছিল, কিন্তু বিস্ফোরণ বাগড়া দিয়েছে। ভয়ঙ্কর আওয়াজে স্তম্ভিত হয়ে গেছে সবাই, আন্দাজ করছে পাশের ওই নির্মাণরত বাড়ি ধসে পড়ছে।

আতাসি ঝুঁকে আর্মার্ড ভ্যানের সামনের অ্যাক্সেল দেখল, দ্রুত দুই কেবল ঘুরিয়ে নিয়ে দুটো লূপ করল। সরে গিয়ে লাফ দিয়ে উঠে পড়ল একটা গাড়ির বনেটে, সেখান থেকে আর্মার্ড ভ্যানের ছাদে—হাতে কেবল-এর দু'প্রান্ত। মুখ তুলে দেখল আঁধার আকাশে খুদে একটা নক্ষত্র। নামছে আইআর ল্যাম্প। ওটার নীচে বিরাট হুক।

এদিকে কাশেম আর্মার্ড ভ্যানের পিছনের অ্যাক্সেল-এ কেব্‌ল্ পেঁচিয়ে নিয়েছে, কয়েক লাফে আতাসির কাছে চলে এল সে, কেব্‌ল্ বাড়িয়ে দিল। ওগুলো নিল আতাসি। কাশেমের কাজ শেষ, মুখোশ খুলে ফেলল সে। পথচারীরা হতচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কাশেম মুহূর্তে তাদের মধ্যে হারিয়ে গেল। দু'পাশের ফুটপাথে মানুষের ভিড় থেমে গেছে। সবাই ধুলো-সিমেন্টে মাখামাখি, কনস্ট্রাকশান সাইট দেখছে।

টাওয়ারে নিজের সিটে বসে আছে রানা, অনেক নীচে আইআর-এর জ্বলজ্বলে আলো দেখতে পেল। ওখানে আছে আর্মার্ড ভ্যান। ওটার ছাদে আছে কেবলগুলো। আর্মার্ড ভ্যানের ড্রাইভার গাড়ি নড়িয়েছে। ছাদে আতাসি দৃঢ় ভাবে দু'পা রেখেছে।

গ্যাসের মুখোশের কারণে আতাসির কণ্ঠ চাপা শোনাল, 'ঠিক আছে, বস্। আপনি ঠিক আমার ওপরে আছেন। হুক আরও দশ ফুট নীচে নামান।'

'আরও দশ ফুট নামছে,' আরও কেব্‌ল্‌ ছাড়ল রানা। দুটো ইনফ্রারেড বাতি একসঙ্গে মিশে গেল। বাতাসে সিমেন্টের গুঁড়ো ভাসছে, আইআর ল্যাম্প না থাকলে ভ্যান খুঁজে পাওয়া যেত না।

'এখানে রাখুন,' বলল আতাসি। হুকের আই হোল-এ একে একে চারটে কেবল ঢোকাল ও, স্ন্যাপ হুক আটকে দিল। 'ঠিক আছে, বস্‌। আপনাকে দিয়ে দিলাম। পাঁচটা সেকেণ্ড দিন, সরে যাই।'

লাফ দিয়ে ভ্যানের ছাদ থেকে নামল আতাসি, ফুটপাথে উঠে ভিড়ে হারিয়ে যাবে—কিন্তু কনভয়ের প্রথম ক্রুজার ছেড়ে নেমে এসেছে এক লোক। সে ধুলো-মাখা এক পুলিশ। দু'জনের মধ্যে পাঁচ ফুট দূরত্ব। আতাসির মনে হলো লোকটা কয়েক যুগ ধরে ওকে দেখছে। তার চেহারায় বিস্ময় ফুটে উঠল, বুঝতে পেরেছে ওটা আতাসির হাতে গ্যাস মাস্ক। আতাসি ফু-চুঙের মত মার্শাল আর্টে অত দক্ষ নয়—বাধ্য হয়ে দ্রুত এক পা এগোল ও, পুলিশের পেটে প্রচণ্ড একটা লাথি বসিয়ে দিল।

দেরি করল না, ঘুরেই দিল দৌড়। দু'গজ যেতে না যেতেই আরেক পুলিশ দেখল ওকে। কনভয়ের পিছনের ক্রুজারের প্যাসেঞ্জার-সিট ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। লোকটা আকস্মিক অ্যাক্সিডেন্ট আর বিস্ফোরণে থতমত খেয়ে গেছে। তবে এর একহাতে ফ্ল্যাশ-লাইট। ডানহাতে বড় একটা পিস্তল্‌। আতাসিকে পাগলের মত দৌড়াতে দেখেছে সে। ভাবছে, ব্যাটা ধুলোর মধ্যে ওরকম ছুটছে কোথায়! তারপর আতাসির আরব চেহারা দেখে আন্দাজ করে ফেলল, এ নিশ্চয়ই সন্ত্রাসী! জানালা দিয়ে পিস্তল বাড়িয়ে দিল সে, কিন্তু সন্ত্রাসী যে অ্যাঙ্গেলে ছুটছে তাতে তাকে গুলি করা যায় না। আতাসি দড়াম করে ক্রুজারের প্যাসেঞ্জার দরজায় আছড়ে পড়ল। দরজাটা বন্ধ হলো না, তবে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের গোড়ালিটা ভেঙে গেল। লোকটা বিকট এক চিৎকার ছাড়ল, কিন্তু পিস্তল ছাড়ল না। সিগ সাওয়ারটা এখনও শক্ত করে ধরে রেখেছে। আতাসি বাম কনুই দিয়ে তার মুখে গুঁতো মারল। পরপর তিনবার। এতে মুঠো-ভরা পিস্তল আলগা হলো। ওটা কেড়ে নিল আতাসি, নিয়েই ঝেড়ে দৌড় দিল। ততক্ষণে পুলিশ ব্যথায় জ্ঞান হারিয়েছে, ধুপ করে রাস্তায় পড়ল।

এদিকে রানা জয়স্টিক নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, হুক উপরে তুলছে। দু' সেকেণ্ড থামল ও, কেবলের টেনশন দেখে আন্দাজ করে নিল সাত টনি আর্মার্ড ভ্যান কীভাবে নাড়ানো উচিত। গাড়িটা রাস্তা থেকে তিরিশ ফুট উপরে তুলে ফেলল ও। জয়স্টিক নেড়ে ক্রেনটা ঘড়ির উল্টো দিকে ঘোরাল। ঘন ধুলোর মধ্যে বড়সড় একটা আইআর ফ্লেয়ার দেখতে পেল। ক্রেন ঘোরানোর গতি কমাল ও, ভারী আর্মার্ড ভ্যান সাইটের পিছনে চলে এসেছে। নীচে জলিল ওর দশ চাকাওয়ালা ট্রাক নিয়ে অপেক্ষা করছে।

কয়েকদিন ব্যস্ত ছিল আতাসি-কাশেম-জলিল। ওরা ওয়্যারহাউজে কাটিং টর্চ দিয়ে ট্রেইলারের ছাদ লম্বালম্বি ভাবে কেটেছে। টুকরোগুলো জোড়া দিয়েছে লম্বা হিঞ্জ দিয়ে। ট্রেইলারের ছাদ এখন সম্পূর্ণ খোলা যায়। বাক্সের দু'কোণ জুড়ে জ্বলছে আইআর ল্যাম্প। রানা যেখানে বসে আছে সেখানে সিমেন্টের গুঁড়ো নেই,

অনেক নীচে ট্রাকের ক্যাব দেখতে পেল। ওখানে ধুলোর মত সিমেন্ট উড়ছে। আরেকটু পিছনে তাকাল রানা, গগল্‌স্‌ পরে থাকায় লম্বাটে আলো দেখতে পেল। আস্তে আস্তে ভ্যান নামাল ও।

জলিল ট্রাকের ক্যাবের ছাদে দাঁড়িয়ে আছে। আর্মার্ড ভ্যান ট্রাকের পিঠে নেমে গেল। গাড়ির চাকাগুলো ওজন নিতেই জলিল চলে গেল ওটার ছাদে, হুক খুলে দিল। ছাদ থেকে নেমে ক্যাবে উঠে ফোনে জানিয়ে দিল, 'মাল পেয়ে গেছি। মাসুদ ভাই, চোখে অনেক ধুলো দিয়েছেন, আমি চললাম।' দু'সেকেণ্ড পর ফার্স্ট গিয়ার দিল সে, রিমোট কণ্ট্রোল তুলে নির্দিষ্ট বাটন টিপল—ছাদের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

ভ্যানের গার্ডরা এখন একাকী হয়ে গেছে। কিডন্যাপ্‌ড্‌ হওয়ার সময়ে কাউকে ফোন দিলেও, ধুলোর কারণে কিছুই দেখতে পায়নি, জানাতে পারেনি কিছুই। স্থানীয় পুলিশ প্রথমে ভাববে এখানে সন্ত্রাসীদের হামলা হয়েছে। অন্তত দু'ঘণ্টা পর বুঝতে পারবে কী ঘটেছে।

ঘড়ি দেখল রানা, কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে সরু মই বেয়ে নামতে শুরু করল। বিস্ফোরণের পর আর্মার্ড ভ্যান সরিয়ে নেওয়া পর্যন্ত একমিনিট সাতচল্লিশ সেকেণ্ড পার হয়েছে। ওর হাতে আরও তিরিশ সেকেণ্ড ছিল। সেরাদের সঙ্গে কাজ করেছে ও। মই থেকে নেমে অন্ধের মত গেটের দিকে এগোল ও। ধূলি-ঝড় এখনও চলছে। চোখে সিমেন্টের গুঁড়ো ঢুকছে, শ্বাস আটকে আসছে। পাঁচ মিনিট লাগল গেট খুঁজে বের করতে। চেইন-লিঙ্ক ফেন্স টপকাল ও, বাইরের ফুটপাথে নামল।

রাস্তা থমথম করছে, যেন কারফিউ চলছে। অন্যদিকে সরে গেছে পথচারীরা। চালকরা তাদের গাড়ি ফেলে সরে পড়েছে। মনে হচ্ছে রাস্তায় আগ্নেয়গিরির ছাই জমেছে। সিমেন্টের ধূসর ধুলো গাড়ি-ঘোড়া ঢেকে দিয়েছে। ধূলি-ঝড়ের মধ্যে রানা হাতের স্পর্শে গাড়িগুলো ধরে দিক ঠিক করে নিল। দু'ব্লক পেরিয়ে যাওয়ার পর একটু ভালভাবে দেখতে পেল, হাঁটবার গতি বাড়াতে পারল। দেখল, পুলিশের গাড়ি আসছে। গাড়িগুলো অন্ধকারে উজ্জ্বল আলো ফেলল। দ্রুত কোর্ট হাউজের দিকে চলে গেল।

এক ইংরেজ একটা ক্যাফের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, রানাকে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে, সার?' তার পরনে পরিষ্কার কোট। রানার একটু হিংসেই হলো।

'মনে হয় ওদিকে কনস্ট্রাকশানের সময় দুর্ঘটনা হয়েছে,' কাশির ফাঁকে বলল রানা।

'ডিয়ার গড। মারা গেছে কেউ?'

একবার পিছনে তাকাল রানা, ধুলো থিতিয়ে আসছে। হাঁটতে শুরু করবার আগে বলল, 'কপাল ভাল যে মরেনি কেউ।'

লিয়ার বেয়ারমান জানে রাশানরা তাকে উদ্ধার করবে, কাজেই অপেক্ষা করছিল সে। তারপর ব্রেকের আওয়াজ শুনল, ধাতব সংঘর্ষের আওয়াজ পেল। কোনও

অ্যাক্সিডেন্ট করা হয়েছে। তার সঙ্গে গাড়ির ভিতরে যে গার্ড আছে, সে হতভম্ব হয়ে গেছে। তারপর হঠাৎ আর্মার্ড ভ্যান থেমে গেল। দুই সেকেণ্ড পর কোর্ট হাউজের কাছে একটা বাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটল। বেয়ারমান ভেবেছিল ওটা সত্যিই ধসে পড়ছে। তখন ভয় পেয়েছে সে।

গার্ড বা সে ছোট্ট জানালা দিয়ে কিছুই দেখতে পায়নি। কী ঘটছে বুঝবার উপায় ছিল না, তারপর গাড়িটা হঠাৎ দুলতে শুরু করল। মনে হলো গাড়ি আকাশে উঠছে। মাথা ঘুরে উঠল। আস্তে আস্তে গাড়ি অন্যদিকে গেল, মনে হলো বাঁক নিল। তারপর দুলুনি থেমে গেল, একটু ঝাঁকি খেল। তখন মাথার উপরে যন্ত্রপাতির তীক্ষ্ণ আওয়াজ পেয়েছে।

কয়েক সেকেণ্ড পর মনে হয়েছে গাড়িটা আবারও গতি পেয়েছে। তখন বেয়ারমানের মনে হয়েছে, ভ্যান আবার রাস্তায় নেমেছে। জানালা দিয়ে দেখেছে তারা, অন্ধকার ছাড়া আর কিছু দেখা যায়নি। সব ঘুটঘুটে অন্ধকার। গার্ড ফোনে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেয়েছে, কিন্তু কোনও সিগনাল পায়নি। ভ্যানের ক্যাবে আরও দু'জন আছে, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেয়েছে। দু'হাতে ক্যাবের পুরু পিঠে ধাক্কা দিয়েছে। সাড়া পাওয়া যায়নি।

পঁয়ত্রিশ মিনিট এগিয়েছে তারা। বেয়ারমান আন্দাজ করেছে, যে জিনিস ওদের নিয়ে যাচ্ছে, সেটা শহর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। তারপর গতি আরও বাড়ল। নিশ্চয়ই কোনও হাইওয়ে ধরে এগিয়েছে। কিছুক্ষণ পর গতি আবার কমল, বারবার বাঁক নিল। এরপর গাড়ি হঠাৎ থেমে গেল। বেয়ারমানের মনে হলো, রাশানরা গন্তব্যে পৌঁছে গেছে। তবে জানবার পথ নেই যে মিখাইল এস্কোকোভ ও তামারা জুকোভস্কি তাদের কোথায় নিয়ে এসেছে।

গার্ড ও সে চুপচাপ বসে আছে, আশা করছে কিছু ঘটবে। মিনিটগুলো ধীরে ধীরে পার হচ্ছে।

আর্মার্ড ভ্যানের ভিতরে আছে বলে বেয়ারমান জানে না, মাসুদ রানা নামের এক লোক তাকে উদ্ধার করবে। দলের সবাই এখন তার জন্য অপেক্ষা করছে। রানা আরও বিশ মিনিট পর ওর মার্সেডিজ ফারার ফোক্সওয়াগেনের পিছনে রাখল। আতাসি ও কাশেম ওয়্যারহাউজের চওড়া দরজা বন্ধ করে দিল। স্কাইলাইট দিয়ে ধূসর আলো আসছে, সে-আলোয় অন্ধকার কাটেনি। বাতিগুলো ছাদ থেকে ঝুলে আছে, জ্বেলে দিল আতাসি। প্রকাণ্ড ওয়্যারহাউজের ভিতরের থমথমে পরিবেশ।

গাড়ি থেকে নেমে এল রানা, ফারা ওকে একটা ভেজা রুমাল দিল। মুখ মুছে নিল রানা, মৃদু হেসে বলল, 'এখন পর্যন্ত কোনও ঝামেলা হয়নি। আমরা আমাদের কাজ করতে পেরেছি। তোমরা এখানে আসার পথে চোখ রেখেছ? গুড। এবার টিনের বাক্সটা খুলতে হবে।' জলিলের দিকে তাকাল রানা। 'বলতে পারো ভ্যান কোন্ দিকে মুখ দিয়ে আছে? নামানোর সময় বুঝতে পারিনি।'

'ভ্যানের নাক ট্রেইলারের দরজা তাক করে আছে, মাসুদ ভাই।'

রানা ছাড়া দলের আর সবাই কালো স্কি মাস্ক পরে নিল। চোখ আর ঠোঁট ছাড়া সব ঢাকা পড়ল। সবাই গ্লক ও হেকলার-অ্যাণ্ড কচ নিয়ে তৈরি হলো। রানা

দু'হাত আর মুখে পেইন্ট করল। কয়েক সেকেণ্ড পর শ্বেতাঙ্গ হয়ে গেল। এখন আবারও রাশান হয়ে গেছে ও। একটা হেকলার-অ্যাণ্ড-কচ এমপি-ফাইভ মেশিন গান ওয়ার্ক-বেঞ্চে পড়ে আছে, ওটা তুলে নিল রানা, স্ট্র্যাপটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিল। বামহাতে দুটো গ্রেনেড তুলে নিল। ওগুলো ডামি প্র্যাকটিস গ্রেনেড, তবে দেখলে আসল জিনিস মনে হয়। ওরা বলবে না ওগুলো নকল, কাজেই ভ্যানের গার্ডরা স্বাভাবিক ভাবেই ভয় পাবে।

সবাই অস্ত্র হাতে ট্রেইলারের দরজার কাছে দাঁড়াল। রানা দরজার ছিটকিনি খুলল, দলের সবাইকে পাঁচ সেকেণ্ড দিল, তারপর এক ঝাঁকিতে দরজা খুলে দিল। প্রায় একইসময় ট্রেইলারে উঠল ওরা, ভ্যানের লম্বা নাকে উঠে পড়ল—সবাই বিকট চিৎকার করছে। কোন্ ভাষা নিজেরাও জানে না। ড্রাইভার ও গার্ডের কাছে শটগান আছে, কোমরে সার্ভিস পিস্তল। কিন্তু তারা আছে বুলেট-প্রুফ কাঁচের ওপাশে। দু'দল কয়েক সেকেণ্ড পরস্পরকে দেখল—কেউ গুলি করতে পারবে না। ড্রাইভার যে-কোনও সময় ইঞ্জিন চালু করবে, ট্রেইলার ছেড়ে নেমে পড়বে। তার আগেই রানার ভয়ঙ্কর হাসি দেখতে পেল সে। লোকটার হাতের গ্রেনেড দেখে দমে গেল ড্রাইভার।

এক হাতে দলের সবাইকে দেখাল রানা, গ্রেনেডের পিন খুলে ফেলল, ভ্যানের দরজার পাশে চলে গেল। গার্ড ও ড্রাইভার বুঝে গেল, তেড়িবেড়ি করলে মরতে হবে।

গার্ড রাগী চোখে রানাকে দেখছে, তবে বুঝতে পারছে, তার আসলে আর কিছু করবার নেই। লোকটা বাধ্য হয়ে অস্ত্রগুলো ড্যাশবোর্ডের উপরে রেখে দিল। হাতের ইশারা করল রানা। লোক দু'জন বাধ্য হয়ে দরজার হ্যাণ্ডেলের দিকে হাত বাড়াল। দরজা আন-লক হতেই কাশেম প্লাস্টিক-টাই হ্যাণ্ডকাফ বের করল, তাদের হাত আটকে দিল। রুমাল দিয়ে চোখ বেঁধে, মুখে কাপড় গুঁজে দেয়া হলো। ড্রাইভারের চকচকে বেল্টে ঝুলছে চাবির রিং, ওটা এক টানে কেড়ে নিল আতাসি, রানার হাতে দিল।

ভ্যানের ছাদে উঠল রানা, হামাগুড়ি দিয়ে পিছনে চলে গেল, নামল ট্রেইলারের মেঝেতে। তালায় পাঁচ বার চাবি ঢুকাতে হলো, তারপর আসল চাবিটা লাগাতে পারল। তালা খুলবার আগে মাথার ইশারা করল ও, কাশেম চলে এল, নীচে নেমে পিস্তল নিয়ে তৈরি থাকল।

রাশান টানে ইংরেজি বলল রানা, 'হের বেয়ারমানের সঙ্গে ভিতরে যিনি আছেন, মন দিয়ে শুনুন। আপনার দুই সঙ্গী এখন আমাদের হাতে বন্দি। তারা আপনার কোনও সাহায্যে আসবে না। তাদের কোনও ক্ষতি করা হয়নি। আপনারও ক্ষতি করা হবে না। আমি এখন দরজা সামান্য ফাঁক করব, আপনি আপনার অস্ত্র বাইরে ফেলে দেবেন। আমার কথা মত না চললে টিয়ার গ্যাস ব্যবহার করব। আমার কথা বুঝতে পেরেছেন?'

'শুনেছি,' জবাব দিল গার্ড।

'হের বেয়ারমান, গার্ডের কাছে কয়টা অস্ত্র আছে?'

'একটাই,' জানাল উকিল। 'পিস্তল।'

'বেশ। গার্ড পিস্তলটা হোলস্টার থেকে বের করেছে?'

'হ্যাঁ।'

'বুদ্ধিমান লোক,' বলল রানা। 'হের বেয়ারমান, অস্ত্রটা তার হাত থেকে নিয়ে নিন, দরজার কাছে চলে আসুন। আমি দরজা সামান্য খুলব। পিস্তলটা এপাশে ফেলে দেবেন।'

ভারী দরজাটা সামান্য ফাঁক করল রানা। কালো একটা রিভলভার রিয়ার বাম্পারে ঠন-ঠনাৎ করে পড়ল, সেখান থেকে মেঝেতে। আতাসি ও ফারা পিছনে চলে এসেছে, হাতে পিস্তল। হাতের ইশারায় দরজা দেখাল রানা, তারপর পুরোপুরি খুলে দিল। ভীত গার্ড একপাশের বেঞ্চে বসে আছে। পরিস্থিতি বুঝেছে সে, দু'হাত রেখেছে মাথার উপরে। আতাসি তাকে হ্যাণ্ডকাফ পরিয়ে দিল, চোখ বেঁধে ফেলে মুখে রুমাল গুঁজে দিল। ফারা মোটা উকিলকে নেমে আসতে সাহায্য করল। দলের আর সবাই চলে এসেছে। তারা ড্রাইভার ও গার্ডকে ভ্যানের ভিতরে ঢোকাল। বাইরে থেকে দরজাটা তালা মেরে দিল রানা।

লিয়ার বেয়ারমান পাঁচজন কমাণ্ডো দেখল। তাদের একজন ধুলো ভরা পোশাক পরে আছে। অন্যদের পরনে কালো ইউনিফর্ম। একজনের কোমরের বাঁক দেখে মনে হলো, সে নারী। বেয়ারমান আন্দাজ করে নিল, এই মেয়ে সেই তামারা জুকোভস্কি। জিজ্ঞেস করল সে, 'আপনাদের মধ্যে মিখাইল আছেন?'

'ডা,' কমাণ্ডোদের একজন বলল। তার পরনের পোশাক ধূসর ধুলোয় ভরা। মাস্কটা খুলে ফেলল সে, মুখে লেগে আছে ধুলোবালি। লালচে চুল ও দাড়ি বলে দিল সে-ই মিখাইল। 'মিস্টার সরোকিন আপনাকে ওঁর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন,' বলল রানা। ওই নামটা পেয়েছে ও উকিলের কাছ থেকেই। 'উনি এখানে এসে আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারেননি বলে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। শীঘ্রি তাঁর সঙ্গে দেখা হবে আপনার। ওয়্যারহাউজের পেছনে অফিস আছে, তামারা আপনাকে ওখানে নিয়ে যাবে। কিছুক্ষণ পর আমরা এখান থেকে চলে যাব।'

ফারা ওর মাস্ক খুলল, এবার বেয়ারমান দেখল সুন্দরী মেয়েটা আসলে তামারা জুকোভস্কি। এখন আর সে মেকআপ দিয়ে নেই।

'অনেক ধন্যবাদ,' বেয়ারমান ফারার ডানহাত নিয়ে ঝাঁকিয়ে দিল। 'আমার স্ত্রী? ও কোথায়?'

'আমাদের আরেকটা দল তাকে এখানে নিয়ে আসবে,' বলল তামারা।

'অনেক, অনেক ধন্যবাদ,' আবারও বলল উকিল। 'আমাকে বাঁচানোর জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।'

কাশেম ট্রেইলারের দরজায় স্টেপ ল্যাডার রাখল। মোটা উকিল এবার সাবধানে নামতে পারবে।

'আপনার কোনও ক্ষতি হয়নি তো?' জানতে চাইল তামারা। উকিল নামবার পর ট্রেইলার থেকে নামল সে।

'না। ভাল আছি। একটু ভয় পেয়েছি শুধু। আপনি শুক্রবার সকালে আসবার আগে জানতাম না প্যালেস্টাইনিরা আমাকে মেরে ফেলতে চায়। আমার প্রাণ

বাঁচানোর জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ।'

মিষ্টি হাসল ফারা। 'আপনি বরং মিস্টার সরোকিনকে ধন্যবাদ দিন। আমরা শুধু চাকর, ওঁর নির্দেশ মত চলি।'

'জানি উনি ক্ষমতাশালী মানুষ, কিন্তু ভাবতেও পারিনি উনি এরকম কিছু ব্যবস্থা করতে পারবেন।'

'এসে গেছি আমরা,' বলল ফারা।

অফিসটা সুন্দর করে সাজানো নেই। তিনটে ডেস্ক ও কয়েকটা ফাইলিং কেবিনেট। এক কোনায় ফ্রস্টেড গ্লাসের জানালা, সেটার পাশে একটা পুরোনো কাউচ। মেঝেতে ছড়ানো ভুস্কা-ভুস্কা লিনোলিয়াম। ঘরে সিগারেটের ধোঁয়ার বাসি গন্ধ। একধারে একটা বড় জানালা আছে, সেটা দিয়ে ওয়্যারহাউজ দেখা যায়, তবে এখন পর্দাগুলো টেনে রাখা হয়েছে। বেয়ারমান ধুপ করে কাউচে বসল। তামারা কেবিনেটের উপর থেকে পানির বোতল নামাল, বোতলটা এগিয়ে দিল।

দু'মিনিট পর মিখাইল এস্তোকোভ অফিসে ঢুকল, এখন তার হাতে মেশিন পিস্তলটা নেই। ওয়্যারহাউজে রেখে এসেছে। তবে কোমরে একটা হোলস্টার আছে।

'এবার কী করবেন, হের এস্তোকোভ?' জানতে চাইল বেয়ারমান।

'আমার আরও লোক আসবে, সেজন্য অপেক্ষা করছি, তারপর আমরা সরে যাব। আমার যে-লোক ট্রাক চালিয়েছে, সে বলছে আরেক দল নাকি আমাদের পিছু নিয়েছে। আমাদের তাড়াতাড়ি সরে যেতে হবে। বুঝতে পারছি না ফিলিস্তিনিরা আমাদের পিছু নিয়েছে কি না।'

'অনেকদিন হলো পিএলও মিডল ইস্ট-এর বাইরে কিছু করেনি,' বলল বেয়ারমান। 'এখন মনে হচ্ছে ওরা মরিয়া হয়ে উঠেছে।'

'ইয়াসির আরাফাত মারা যাওয়ার পর অনেক টাকা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না,' বলল রানা। 'ওরা খেপবেই তো।'

বেয়ারমান জবাবে কী যেন বলবে ঠিক করেছে, কিন্তু হঠাৎ চমকে গেল সবাই। ওয়্যারহাউজের বাইরে জোর সংঘর্ষের আওয়াজ হয়েছে। কয়েক সেকেণ্ড, তারপর সাইলেন্সড আগ্নেয়াস্ত্রের গোলাগুলি শুরু হলো। মিখাইলের এক লোক আচমকা বিকট চিৎকার ছাড়ল। প্রায় নিঃশব্দে গোলগুলি চলছে। মানুষটা নীরব হয়ে গেল।

মারা গেছে?

মিখাইল এক টানে পিস্তলটা বের করে নিল, এক হাতে স্লাইড টানল। 'এখানে থেকো,' তামারাকে বলল। দ্রুত পায়ে চলে গেল সে দরজার কাছে, ঝুঁকে দরজার একপাশে সরল। বাইরে গোলাগুলির চলছে। পিস্তল বাগিয়ে দরজা পার হলো মিখাইল, সাবধানে কয়েক পা এগোল, এদিক-ওদিক দেখল। পরমুহূর্তে কয়েকবার গুলি করল। বিকট আওয়াজ হলো। ছায়ার মধ্যে কে যেন ট্রাকের আড়ালে সরে গেল। ঘাড় ফিরিয়ে তামারাকে কী যেন বলতে গেল সে, কিন্তু ঠিক তখন গুলিবর্ষণ হলো তার উপরে। হাঁটু থেকে শুরু করে বুক পর্যন্ত ঝাঁঝরা হয়ে

গেল তার। আট-দশটা গুলি লেগেছে বুকে। ধাক্কা খেয়ে ছিটকে অফিসে এসে পড়ল সে। ডেস্কের পাশে ধাক্কা খেল, তারপর চিৎ হয়ে মেঝেতে পড়ল। ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে বুক, শার্ট রক্তে ভেসে যাচ্ছে!

প্লেট গ্লাসের জানালা নিঃশব্দে চুরমার হয়ে গেল। বুলেটগুলো ঘরের চারপাশে লাগল। গুলি ধাতব আসবাবপত্রে স্ফুলিঙ্গ তুলছে। সস্তা প্যানেলগুলো ঝাঁঝরা হয়ে গেল। বেয়ারমানের উপরে বিড়ালির মত ঝাঁপিয়ে পড়ল তামারা, তাকে ঢেকে ফেলল, একইসঙ্গে হোলস্টার থেকে টেনে বের করল পিস্তল। জানালায় এসে দাঁড়িয়েছে কে যেন, তামারা ছিটকে সরে গেল। লোকটা মুখে পেঁচিয়ে রেখেছে চেক-চেক কেফিয়া। ফিলিস্তিনিরা ওটা খুব পছন্দ করে। তামারাকে দেখেছে সে, তাড়াতাড়ি রাইফেল কাঁধে তুলে ফেলল। তামারাই আগে গুলি করল। লিয়ার বেয়ারমানের মনে হলো, প্যালেস্টাইনির মুখটা তরমুজের মত ফেটে গেল। গলগল করে রক্ত বেরল। মগজ বিস্ফোরিত হয়েছে, বেয়ারমানের পাশের দেয়ালে এসে লাগল। লাল-হলদে রঙে ভরে গেল জায়গাটা। ওই লোকের জায়গায় দাঁড়িয়েছে আরেক আততায়ী, অ্যাসল্ট রাইফেল তুলে ব্রাশ ফায়ার করল সে। তামারার বাম হাতের অনেকখানি মাংস উধাও হলো, তারপরই পেটে পরপর কয়েকটা গুলি খেল বেচারি। নোংরা মেঝেতে পড়ল তামারা, গোঙালো কয়েক সেকেণ্ড, তারপর একটা ঝাঁকি খেয়ে স্থির হয়ে গেল। পড়ে থাকল নিজের রক্তের মধ্যে।

এত ভয়ঙ্কর ভাবে আক্রমণ করা হয়েছে যে বেয়ারমান বুঝে উঠবার আগেই রাশানরা শেষ হয়ে গেল। সে-বেচারা নড়তে পারেনি, এখন আস্তে আস্তে হুঁশ ফিরছে। ছোট্ট অফিসে রক্তের আঁশটে গন্ধ, গান-পাউডারের পোড়া ধোঁয়া। যে-লোক একটু আগে মিখাইলকে খুন করেছে, সে ঘরে এসে ঢুকেছে। লোকটা তামারার শিথিল দেহের পাশে দাঁড়াল, এক পায়ে দেহটা চিত করল, ক্ষতগুলো দেখল। গমগমে কণ্ঠে আরবীতে বলল, 'ভাল শ্যুটিং, আক্কাস।' জানালায় দাঁড়ানো লোকটাকে প্রশংসা করছে এ!

তার স্যাঙাৎ হাসল।

প্যালেস্টাইনি নেতা মুখ থেকে কেফিয়া সরাল, বেয়ারমানের দিকে তাকাল। তার নাক বাজপাখির মত খাড়া, চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, তাতে পরিষ্কার ঘৃণা। কড়া স্বরে বলল, 'আমি জানি তুমি আরবী জানো। চেয়ারম্যান আরাফাতের হয়ে কাজ করেছ তুমি। উনি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র গড়তে যে-টাকা সরিয়ে রেখেছিলেন, সেগুলো মেরে দিয়েছ তোমরা বেমালুম। বিশেষ করে তুমি।'

'আ... আ... আমি...'

ওয়্যারহাউজ ঘুরে এসে আক্কাস জানাল, 'ওরা সবাই মারা গেছে, রফি। এ বাড়িতে কিছুক্ষণ থাকা যায়।'

'আক্কাস, তোমাদের বলেছিলাম না ওরা ঠিকই এই শুয়োরের বাচ্চাকে বের করে আনবে,' টিটকারির দৃষ্টিতে বেয়ারমানকে দেখল রফি। চোখে তীব্র ঘৃণা। বেয়ারমান টের পেল, ঝরঝরিয়ে পেচ্ছাব হয়ে যাচ্ছে তার। 'বলেছিলাম না অপেক্ষা করলে ঠিকই এটাকে পাব।'

রফি একটানে কোমরের খাপ থেকে একটা সুইচ-ব্লেড বের করল। ফ্লুওরেসেন্ট বাতি পড়ল ওটার উপর, অস্ত্রটা ঝিকঝিক করছে। 'হ্যাঁ, বেয়ারমান, এবার এসো আমরা টাকা নিয়ে গল্প করি।'

তিন

লিয়ার বেয়ারমান কখনও ভাবেনি কারও টাকা মেরে দেয়া খারাপ কাজ। সবসময় মক্কেলের কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছে সে। তারা ছিল সাধারণ কিছু পাসওয়ার্ড, কোড। তারা থাকত ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টের লেজারে বা আইনী চুক্তির মধ্যে। সেগুলো ছিল কিছু অর্থহীন সই, এর বেশি কিছু নয়। সবসময় নিজেকে নিরাপদ ভেবেছে সে, নিজের ডেস্কে বসে আইনী কাগজের দুর্গের আড়ালে থেকেছে। কিন্তু এখন এই অফিসের দেয়ালে লেগে আছে মৃত মানুষের রক্ত, মগজ! ওই যে চোখের সামনে পড়ে আছে তামারা জুকোভস্কির লাশ। মিখাইলের বুকের মধ্যে যে-গর্তগুলো তৈরি হয়েছে, সেদিকে তাকাবার সাহস নেই তার। এখন সে জানে, সে একটা কাপুরুষ।

কোনও প্রশ্ন করবার আগেই ওয়্যারহাউজ থেকে ডাক এল, অফিস ছেড়ে চলে গেল রফি। আক্কাস দরজা পাহারায় থাকল। লোকটার চোখগুলো জ্বলন্ত কয়লার মত জ্বলছে! বেয়ারমান জানালা দিয়ে ওয়্যারহাউজ দেখতে পেল। এক প্যালেস্টাইনি ট্রেইলারের পিছনে একটা র‍্যাম্প লাগিয়েছে। ওরা আর্মার্ড ভ্যান নামিয়ে আনছে। বেয়ারমানের কাঁদতে ইচ্ছে হলো। চারপাশে এত রক্ত! মিখাইল লোকটা নিশ্চয়ই কিডন্যাপিঙের সময় কাউকে খুন করেনি? কিন্তু পিএলওর এই নেতা হাসতে হাসতে মানুষ খুন করে। এরা কী তাকে মেরে ফেলবে? তীব্র আতঙ্কে বেয়ারমান কাঁপতে শুরু করল, যেন জোর বাতাসে কাঁপছে বাঁশপাতা।

আক্কাস নামের লোকটা কড়া চোখে বেয়ারমানের দিকে তাকিয়ে আছে। দলের নেতা তাকে ডাক দিল। আক্কাস আরেকবার বেয়ারমানকে দেখে নিয়ে ওয়্যারহাউজে গিয়ে ঢুকল।

একটা করে মিনিট পার হচ্ছে, আর আতঙ্ক বাড়ছে বেয়ারমানের। কল্পনায় দেখতে পাচ্ছে কী হতে পারে। নিশ্চয়ই মারাত্মক অত্যাচার করা হবে তার উপর। হঠাৎ একটা আওয়াজ শুনতে পেল সে। প্রথমে বুঝতে পারল না ওটা কীসের আওয়াজ, তারপর মনে হলো কেউ নাম ধরে ডাকছে। শব্দটা যেন অনেক দূর হতে আসছে। বিকৃত শব্দ। কারও গলা থেকে বাতাসের শোঁ-শোঁ আওয়াজ হচ্ছে? দরজার দিকে তাকাল বেয়ারমান। ওখানে তো কেউ নেই! ঘরের চারপাশ দেখল সে। তামারা পড়ে আছে। ওর পোশাকে একগাদা রক্ত লেপ্টে আছে।

'বেয়ারমান।'

কথাটা আবারও শুনতে পেল উকিল। ঘুরে না তাকালে মিখাইলের ঠোঁটে দৃষ্টি পড়ত না তার। বিশ্বাস করতে পারল না সে, রাশান এখনও বেঁচে আছে! লোকটা

বিবর্ণ হয়ে গেছে, বুকের ক্ষত থেকে এখনও কালচে রক্ত বেরুচ্ছে। বেয়ারমানের বুকে আশা জন্মাল। লোকটা যদি তাকে নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে...

মিখাইল বিড়বিড় করে বলল, 'ওদের সঙ্গে আলাপ চালিয়ে যান।' ব্যথায় চোখের পাপড়ি কাঁপছে তার।

তাড়াতাড়ি করে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল বেয়ারমান, 'কী বলব?' আক্কাস বা রফি যে-কোনও সময় চলে আসবে!

'যা খুশি বলুন, যা জানতে চায় জানান। কথা বলতে থাকুন... এরা কেউ বাঁচবে না।' মিখাইলের কণ্ঠ এত অস্পষ্ট হয়ে গেছে যে কান পাততে হলো।

মাথা কাত করে শুনতে চাইছে বেয়ারমান, কাতর স্বরে বলল, 'আমি ভালমত শুনতে পাইনি। কেন বাঁচবে না!'

'আমার দলের আরও লোক আসবে...' মিলিয়ে গেল মিখাইলের স্বর। কয়েকবার চোখের পাতা কাঁপল, তারপর জ্ঞান হারাল সে। চোখ উল্টে গেছে। চিন্তা করা যায় না মানুষটা অতগুলো গুলির ক্ষত নিয়ে বেঁচে আছে কী করে। অবিশ্বাস্য!

বেয়ারমানের মনে পড়ল, এই হামলার আগে মিখাইল বলেছিল ওর দলের অন্যদের জন্য অপেক্ষা করছে। তাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই অস্ত্র থাকবে! কথাটা ভাবতেই বেয়ারমান বুক ভরা সাহস পেল। ওরা তাকে উদ্ধার করবে। ওরা এসে গেলে মরতে হবে না!

ওয়্যারহাউজের ভিতরে একটা গাড়ি স্টার্ট হলো, একযস্ট থেকে জোর আওয়াজ বেরল। আর্মার্ড ভ্যান ধীরে ধীরে ট্রেইলার ছেড়ে বেরিয়ে এল। মুখোশ পরা এক প্যালেস্টাইনি হাতের ইশারায় ওটাকে নামতে বলছে। একমিনিট পরে রফি এসে অফিসে ঢুকল। লোকটার চেহারায় মিশে আছে তীব্র ঘৃণা-রাগ আর ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতা। একটা ডেস্কের ওপাশ থেকে চেয়ার টেনে নিল সে, বেয়ারমানের সামনে এসে বসল। 'হ্যাঁ, এইবার বল্, শুয়োর, আমাদের টাকা কোথায় সরিয়েছিস।' লোকটার ইংরেজিতে কিছু একটা আছে, সেটার কারণে তাকে আরও ভয়ঙ্কর মনে হয়।

'যা জানতে চান, সব বলব,' আরবীতে বলল বেয়ারমান, 'কিছুই লুকাবো...'

গায়ের জোরে বেয়ারমানের গালে চড় কষাল রফি। পাঁচ আঙুলের দাগ বসে গেল। 'তোর আরবী বলতে হবে না, খবরদার! ওটা আমাদের পবিত্র ভাষা... ইংরেজিতে বল্, হারামির বাচ্চা। ...বেয়ারমান? ওটা তো সুইস-ইহুদি নাম মনে হচ্ছে!'

'আমি ক্যাথোলিক।'

আরেক গালে বাম হাতের চড় কষাল রফি। রাগে কাঁপছে সে। 'আমি যা জিজ্ঞেস করব, শুধু তারই উত্তর দিবি, বাড়তি একটা কথাও শুনতে চাই না!'

বেয়ারমান একবার মিখাইল এস্তোকোভের অসাড় দেহটা দেখল। লোকটার দলের সবাই চলে আসছে না কেন!

'আমরা জানি আমাদের অনেক টাকা খেয়ে ফেলেছিস ফালতু কোম্পানি বানিয়ে,' শুরু করল রফি। 'এনপি অ্যাডভাইজার্স, ফাইন্যানশিয়াল অ্যাসে, কমেট

ট্রেডিং—এসব নাম ব্যবহার করে বিরাট জাহাজ কিনেছিস তোরা। ওটার নাম দ্য চুহা। ওটা এখন আছে পুব চিন সাগরে। ...বল্, কে বা কারা এই কোম্পানি চালায়। আমরা জানতে চাই কারা ওই জাহাজের মুনাফা খায়। আমাদের দেশের মানুষ না খেয়ে মরছে আর তোরা আমাদের টাকাগুলো সব গিলে নিয়ে চদর-বদর করছিস!'

দেড় মিনিট পার হয়ে গেল, বেয়ারমান হাঁ করে আছে, বুঝতে পারছে না কী বলা উচিত। এই ফিলিস্তিনি মস্ত ভুল জানে! ওই জাহাজগুলো কিনতে গিয়ে পিএলওর কোনও টাকা ব্যবহার করা হয়নি। পিএলওর টাকা সে অন্যখানে রেখেছে। ওগুলো গেছে সুইটযারল্যাণ্ডের সেরা ব্যাঙ্কারের কাছে। ওগুলো সে ফ্রেডারিখ বাউয়ারের সঙ্গে শেয়ার করেছে। ...আর ওই দ্য চুহা? ভ্লাদিমিয়ার সরোকিন ও মুদাস্‌সর আলী খান ওটা নিয়ন্ত্রণ করে। সম্ভবত বাউয়ারও আছে ওদের সঙ্গে। বেয়ারমান ভাবছে, পিএলও যা খুশি ভাবুক, তার কী? ওরা ওই জাহাজগুলো নিয়ে ভাবছে, ভাবুক না! মিখাইলের লোকজন যে-কোনও সময় এসে পড়বে, এই শয়তানের বাচ্চাদের খুন করবে।

'মিথ্যে বলব না,' ডাহা মিথ্যে বলতে গিয়ে গলা খুসখুস করছে বেয়ারমানের, বারকয়েক কেশে গলা পরিষ্কার করল সে। 'আসলে ওরকম দুটো ফ্লোটিং ডক আছে। একটার নাম দ্য চুহা, আরেকটার নাম দ্য চুহি।'

'এই দুই জাহাজ দিয়ে কীসের ব্যবসা হয়? নিয়ন্ত্রণে কে আছে?' একটু ঝুঁকে গেল রফি।

'এক রাশান আর এক পাকিস্তানি। আমি জানি না কীসের ব্যবসা করে ভ্লাদিমিয়ার সরোকিন আর মুদাস্‌সর আলী খান।'

চড়াৎ করে চড় পড়ল আরেকটা। অসহ্য ব্যথায় কেঁদে ফেলল বেয়ারমান। 'সত্যি ব-ব্বলছি! আ...'

'আর কে?' হুঙ্কার ছাড়ল রফি, 'মিথ্যা বললে খুন হয়ে যাবি, হারামখোর! বল্ আর কারা আছে! আমরা ভ্লাদিমিয়ার সরোকিন সম্পর্কে জানি। এবার বল্, কোথায় পাওয়া যাবে তাকে।'

'আ... আমি জানি না,' গুঙিয়ে উঠল বেয়ারমান, জল গড়াচ্ছে দুই গাল বেয়ে। 'বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়ায় সে। তার কোনও বাড়ি আছে বলে শুনিনি। সেইন্ট পিটার্সবার্গে একটা পোস্ট বক্স রেখেছে সে, ওটার মাধ্যমে যোগাযোগ করা যায়।'

উকিলের গালে আরেক চড় বসাল রফি। 'লেখ্, নম্বরটা লিখে দে এই কাগজে!' কাঁপা হাতে লিখল সে নম্বরটা টেবিলে রাখা প্যাডে। 'এবার শোনা যাক, আর কে কে আছে তোদের সঙ্গে। তুই, সরোকিন, মুদাস্‌সর... আর কে?'

'আমি নেই!' রফিকে আবার নড়ে উঠতে দেখে চেঁচিয়ে উঠল, 'সত্যি বলছি, ঈশ্বরের শপথ করে বলছি! বাওয়ার থাকতে পারে।' মাথা নিচু করে অন্য দিকে তাকাল বেয়ারমান।

'বাওয়ার থাকতে পারে...'

'কে এই বাওয়ার?'

'ফ্রেডারিখ বাওয়ার। ব্যাঙ্কার। সুইস ব্যাঙ্কের...'

'আর সরোকিন? সে কী করে?'

'আমি জা...' মারের ভয়ে আঁৎকে উঠে তাড়াতাড়ি বলল, 'জীবনে মাত্র একবার তার সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার। সত্যি! দু'বছর আগে।'

'ওর ব্যাপারে পরে আলাপ হবে। আগে পাকিস্তানি লোকটার কথা বল্। কে সে?'

'মুদাস্‌সর আলী খান। পাকিস্তানি। পাঞ্জাবি। এখন ইন্দোনেশিয়ায় থাকে। বিরাট বড়লোক। তার সম্পত্তির মধ্যে প্রচুর জায়গা-জমি, বিরাট জঙ্গল, শিপিং ইয়ার্ড, হোটেল, রিয়াল এস্টেট—তার সবচেয়ে বড় ব্যবসা সুমাত্রার পশ্চিম তীরে। খান ব্রেকার্স ইয়ার্ড। যতটুকু জানি, ওই জাহাজ দুটো এই লোকই নিয়ন্ত্রণ করে।'

'এর সঙ্গে আগে কখনও দেখা হয়েছে তোর? কী ধরনের লোক সে?'

'গত বছর তাকে একটা ভিডিও কনফারেন্সে দেখেছি। আর সব পাঞ্জাবির মত, লম্বা-চড়া মানুষ। বুক ভরা দাড়ি।'

'ঠিক আছে, এবার বল্, আমাদের টাকাগুলো কোথায়। একটা মিছেকথা বলবি তো লাশ ফেলে দেব!'

'আম... আম...'

'কোথায়?' আবার চড় মারার ভঙ্গিতে হাত তুলল রফি।

চমকে উঠে মাথাটা পিছিয়ে নিল উকিল। 'বাওয়ারের কাছে। ওর ব্যাঙ্কের সেফটি ভল্টে রেখেছি।'

'লেখ্,' প্যাডের দিকে ইঙ্গিত করল রফি। 'অ্যাকাউন্ট নাম্বার, কোড... সব। টাকাগুলো তোলা না গেলে তোর মুক্তি নেই।'

এতক্ষণে ক্ষীণ আশা জাগল বেয়ারমানের মনে, টাকাগুলো পেয়ে গেলে এরা হয়তো ওকে খুন না-ও করতে পারে। ঠিক নম্বরগুলোই লিখল সে। মনে আশা, এখুনি হয়তো মিখাইলের লোকজন এসে এদের খুন করে ওকে উদ্ধার করবে। নম্বর-টম্বর কোনও কাজে আসবে না এই বদমাশটার। লেখা শেষ হতেই ফড়াৎ করে ওপরের চারটে পাতা ছিঁড়ে নিল রফি। কিছু বলতে যাচ্ছিল, মাথায় লাল ফুটকির কেফিয়ে জড়ানো একজন আরবকে ছুটে আসতে দেখে ভুরু কুঁচকে চাইল তার দিকে।

দৌড়ে এসে অফিসে ঢুকল আক্কাস, হড়বড় করে বলল, 'রফি! পুলিশ গাজি আবদেলকে গ্রেফতার করেছে! আবদেল জানে আমরা এখন কোথায় আছি। রফি...' থেমে গেল সে, সর্দারের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

বিরাট শরীরটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল রফি, ওরফে আতাসি। ওর ভাব-ভঙ্গি দেখে কাউচের ভিতরে গেঁথে গেল বেয়ারমান। ভয় পাচ্ছে লোকটা এবার তাকে খুনই করবে। কাঁপা স্বরে বলল, 'আমাকে মেরো না। প্লিজ!'

'চোপ!' ধমক দিল আতাসি। হাত বাড়িয়ে দিল সে, সঙ্গে সঙ্গে আক্কাস হার্ড প্লাস্টিকের এয়ার প্রোটেক্টর ও রুমাল এগিয়ে দিল।

বেয়ারমান ভয়ে চাপা স্বরে বলল, 'কী... কী করবেন আপনারা?' তার দু'চোখ বিস্ফারিত। টপটপ করে কয়েক ফোঁটা পানি গাল বেয়ে মেঝেতে পড়ল। সে বুঝে

গেছে, এবার তাকে মেরে ফেলা হচ্ছে।

'অ্যাইও! চোপ!' ধমক দিল আতাসি।

বেয়ারমানের দু'হাত পিছ-মোড়া করে বেঁধে ফেলা হলো, কানে ভরে দেয়া হলো এয়ার প্রোটেক্টর। চোখ বাঁধা হলো। বেয়ারমান থরথর করে কাঁপতে লাগল। চোখে কিছুই দেখছে না সে, কানেও কিছু শোনা যায় না। মুখের মধ্যে রুমাল গুঁজে দেয়ায় চেঁচাতেও পারবে না। কে যেন তাকে ঘাড় ধরে টেনে ওঠাল। ধাক্কা দিয়ে অফিস থেকে বের করা হলো। কোথায় যে নিয়ে চলেছে, ঈশ্বর জানেন! কয়েক পা এগোনোর পর একটা গাড়ির সাইলেন্সারের গন্ধ পেল সে। পোড়া মোবিলের গন্ধ। তাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে একটা গাড়িতে তোলা হলো। ধুপ করে বসে পড়ে নিতম্বে ব্যথা পেল সে। আশপাশে আরও কেউ আছে। বোধহয় সেই তিন গার্ড। প্লাস্টিকের টাই দিয়ে তার দু'গোড়ালি আটকে দেয়া হলো। টেপ দিয়ে দু'কব্জি ও হাত পেঁচানো হলো গায়ের সঙ্গে। মামির মত আটকা পড়ল সে। আঙুল নাড়ানোর উপায় নেই, কাজেই আর টেপ খোলা যাবে না।

রফি যার কাছ থেকে এসব শিখেছে, তার লোকজন সহজ কাজে ভুল করে না।

বেয়ারমান আন্দাজ করতে পারছে, তিন গার্ড এখন তার পাশে পড়ে আছে।

দড়াম করে আর্মার্ড ভ্যানের দরজা বন্ধ করা হলো। বেয়ারমান শুনতে পেল না রফি কার সঙ্গে কথা বলছে। যদি জানত মিখাইল সুস্থ হয়ে উঠেছে, খুবই অবাক হতো। মিখাইলের লোকজন ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, তারা ওয়্যারহাউজের যেসব জায়গায় গেছে, সেসব জায়গায় ব্লিচ ছিটাচ্ছে, পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলছে। আঙুলের ছাপ বা ডিএনএ-র ট্রেস থাকলে চলবে না। ওয়্যারহাউজ পুড়িয়ে না দিলে ওগুলো থাকতে পারে। রানার মার্সিডিজ গাড়ি ভাল ভাবে ধোয়া হলো, কোথাও সিমেন্টের কণা থাকল না।

বেয়ারমান পড়ে আছে। জানে না, কিছুক্ষণ পর সত্যিকারের ফিলিস্তিনিরা আসবে! ওরা সত্যিই পিএলওর সদস্য! মাসুদ রানা নামের এক বদ-লোকের খবর পেয়ে আসবে ওরা, টাকা তো উদ্ধার করবেই, নানান কৌশলে তার পেট থেকে আরও অনেক কথা বের করবে; তারপর গভীর রাতে আর্মার্ড ভ্যান নিয়ে সামনের রাস্তায় রেখে সরে পড়বে। পুলিশের হাতে আবারও ধরা পড়বে সে! তাদেরকেও বলতে হবে অনেক কথা।

অফিসে ঢুকে সবাইকে দেখল রানা। আতাসি এইমাত্র কেফিয়ে খুলেছে। ওটা চওড়া কাঁধে জড়িয়ে নিল। ফারা কিছুক্ষণ আগে জলিলের হাতে মারা পড়েছিল, এখন দিব্যি হাসছে।

'চমৎকার অভিনয়,' প্রশংসা করে বলল রানা। 'ভাল করেছ তোমরা।'

'বস্, আপনি যেমন শিখিয়েছেন,' হাসছে আতাসি। 'এমন দুষ্টবুদ্ধি আমার মাথায় আসত না।'

'মাসুদ ভাই যেভাবে মারা গেল,' হেসে ফেলল জলিল ওরফে আক্কাস। 'জানালা থেকে দেখে মনে হলো বড় করুণ মৃত্যু!'

ফারা মাথা নাড়ল। 'তবে ও মরেনি। ওকে ফিসফিস করে বেয়ারমানকে কী যেন বলতে শুনেছি। তবে ভুল হতে পারে, আমি তো তার অনেক আগেই মরে গেছি! তারপর দেখলাম আতাসি উকিলের গালে কষে কয়েকটা চড় দিয়েছেন। আমার ধারণা তার গালের ব্যথা কয়েকদিন থাকবে।'

কাশেম মৃদু মৃদু হাসছে, 'আমি অনেক আগের মরা। সেই যে ফারা আমাকে খুন করলেন, তারপর আর সুযোগ পেলাম না।' শরীর থেকে নানান ডিভাইস খুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে। হলিউডি এক্সপার্টরা ওগুলো স্কুইব বলে। সিনেমা তৈরির সময় এগুলো সুপার এফেক্ট আনবার জন্য ব্যবহার করা হয়। মোফিজ বিল্লাহ জিনিসগুলো মার্ভেলে বসে তৈরি করেছে। রানাকে মনে মনে স্বীকার করতে হলো, ছোকরা ভাল জিনিসই বানিয়েছে।

বিশেষ এক ভেস্ট পরেছে ওরা, ওটা শার্টের তলায় পরতে হয়। ভেস্টে আছে অসংখ্য অতি খুদে বিস্ফোরক, সঙ্গে থাকে কয়েক আউন্স নকল রক্ত। কাশেমকে দেয়া হয়েছিল আরও সফিসটিকেটেড স্কুইব। তার কেফিয়ের ভিতরে ছিল ওটা, কিছুক্ষণ আগে মনে হয়েছে ফারার গুলিতে তার খুলির অর্ধেক উড়ে গেছে। অফিসের দেয়ালে ও ফার্নিচারে ছিল বারুদের খুদে সব চার্জ। ওগুলো ঠিক সময় ফাটিয়ে দেয়ায় মনে হয়েছে বুলেট আঘাত করছে। যেসব অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে, তাতে বুলেট ছিল ব্ল্যাঙ্ক।

পুলিশ যখন বেয়ারমান ও গার্ডদের খুঁজে পাবে তখন অদ্ভুত কাহিনি শুনবে। গার্ডরা বলবে একদল রাশান বেয়ারমানকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। যোগ করবে বেয়ারমান, এই ঘটনার পর আরেক দল এসে রাশানদের খুন করে। তারা ফিলিস্তিনি। পিএলও। তারা দু'দফা জেরা করেছে তাকে। তারপর রাস্তায় ফেলে রেখে গেছে।

পুলিশ চিন্তায় পড়ে যাবে, রাশানদের লাশ কোথায়! ওই ওয়্যারহাউজ কোথায়, যেখানে এতকিছু ঘটল! এই ফিলিস্তিনিরা কোত্থেকে এল? অনেক প্রশ্ন উঠবে, কিন্তু উত্তর পাবে না কেউ।

সন্দেহ নেই, সুইস কর্তৃপক্ষ খেপে উঠবে, সীমান্তে কড়াকড়ি করবে, কিন্তু যখন কাউকে ধরতে পারবে না, তখন এই ভেবে সন্তুষ্ট থাকবে, তাদের রাজসাক্ষী তো ফিরে পাওয়া গেছে!

কর্তৃপক্ষের জিজ্ঞাসাবাদে বেয়ারমান আরও যা বলবে সেটা ঠেকাতে পারবে না রানা। লোকটা ভ্লাদিমিয়ার সরোকিন ও মুদাসসর আলী খানের ব্যাপারে কিছু বললে সুইস কর্তৃপক্ষ তদন্ত করতে পারে। তবে আশা করা যায়, বেয়ারমান সরোকিন ও পিএলওর ভয়ে চুপ থাকবে।

ওয়্যারহাউজে একটা মাত্র বাথরুম। সবার আগে সেখানে গেল ফারা, মুখ-হাতে লেগে থাকা নকল রক্ত ধুয়ে ফেলল। স্কুইবের জন্য মনে হয়েছিল হাতের এক অংশ উড়ে গেছে, কিন্তু এখন হাত ধোয়ার পর লালচে একটা দাগ থাকল। হাতে অবশ্য সামান্য ব্যথা আছে। পোশাক পাল্টে নিল ও।

ওর পরে সবাই একে একে বাথরুম ব্যবহার করল। পোশাক পাল্টে নিল। সবাই অফিসে জড় হওয়ার পর রানা বলল, 'ফারা, তুমি হোটেলে ফিরবে। প্লেনের

রিজার্ভেশন করেছ?'

'দুপুর দুটোয় ইস্তাম্বুলে পৌঁছব,' বলল ফারা। 'তুমি ওখানে পৌঁছলে একসঙ্গে রওনা হবো। বেয়ারমান যা বলেছে, তাতে মনে হয় তুমি ইন্দোনেশিয়ায় যাবে?'

'মনে হচ্ছে শিকলের পরের লিঙ্ক ওই মুদাস্‌সর আলী খান,' বলল রানা।

'আতাতুর্ক ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে পৌঁছে তোমার জন্য টিকেট নেব,' বলল ফারা। 'জাকার্তার রিজার্ভেশন করব। ...আরেকটা কথা, আমার মেকআপ-এর সবকিছু এখানে আছে, ওগুলো সরিয়ে ফেলতে হবে।'

'সব পুড়িয়ে ফেলা হবে,' বলল রানা। 'আমরা কিছুক্ষণ পর চলে যাচ্ছি। কয়েক ঘণ্টা পর ওয়্যারহাউজে আগুন লাগবে।'

বিদায় নিল ফারা, ওর ফোক্সওয়াগেনে গিয়ে উঠল। আতাসি ওয়্যারহাউজের দরজা খুলে দিল, ফারা চলে যাওয়ার পর আবারও দরজা বন্ধ করল।

জলিল আরেকবার গেল বাথরুমে, আঙুলের ছাপ ও ডিএনএ মুছবার জন্য ব্লিচ করল। আতাসি ও কাশেম ওয়্যারহাউজের বিভিন্ন জায়গায় আগুনে বোমা রাখল। মাসুদ ভাই বলেছেন ওয়্যারহাউজটা ট্রাক ও আতাসির ভ্যানসহ পুড়ে ছাই হবে।

সবাই ফিরে আসবার পর রানা বলল, 'আমরা আলাদা ভাবে নানা পথে যাচ্ছি, কাজেই বিপদ হওয়ার কথা নয়। আশা করি আগামীকাল তোমরা এই সময় মার্ভেলে পৌঁছে যাবে।'

'বস্, বোমার টাইমারে কত বসাব?' জানতে চাইল আতাসি।

'একটু অপেক্ষা করো,' বলল রানা, ফোন করল মার্ভেলে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রিসিভ করল উর্বশী, 'কেমন আছ তোমরা, রানা?'

সুইটযারল্যাণ্ড ও দক্ষিণ চিন সাগরের সময়ের পার্থক্য হিসাব করল রানা। 'শুভ বিকেল, উর্বশী। আমরা ভাল আছি। তুমি?'

'কী করে বেড়াচ্ছ?'

'কিছুই নয়, আমাদের কাজ শেষ। ...ভাল কথা, উর্বশী, অনিল কি জুরিখের সব খবর রাখছে?'

'হ্যাঁ। একটু ধরো, মিস্টার চ্যাটার্জিকে দিচ্ছি।'

দশ সেকেণ্ড পর ফোনে এল অনিল। 'রানা, সিএনএন আর স্কাই নিউজ দেখছি আমি। সুইস কর্তৃপক্ষ কিছুই বুঝতে পারছে না। প্রথমে ওরা ভেবেছে ওই বাড়ির স্ট্রাকচারাল ফল্ট আছে, পরে ভেবেছে ওদের নিজেদের নাইন/ইলেভেন ঘটছে। পুলিশের আলাপে কয়েকবার আর্মার্ড ভ্যানের কথা এসেছে। দু'জন বলেছে ওখানে যখন বিস্ফোরণ হয়, তখন এক অস্ত্রধারীকে দেখা গেছে।'

'ওরা সীমান্ত বন্ধ করে দিয়েছে, বা ফ্লাইট পিছিয়ে দিচ্ছে?'

'না। ওদের ধারণা এসব স্থানীয় ব্যাপার, দ্রুত সামলে নেবে।'

'তা হলে আপাতত আমরা নিরাপদ।'

'ওদের দুইয়ে দুইয়ে চার করতে দেরি হবে। হয়তো জানবেও না কী হয়েছিল।'

'তোরা সুমাত্রা থেকে কতটা দূরে?'

'আরও দু'দিন। কেন?'

'লিয়ার বেয়ারমান এক লোকের নাম দিয়েছে। মুদাস্‌সর আলী খান। সে দ্য চুহার মালিকদের একজন। এই লোকের একটা কোম্পানি আছে—খান ব্রেকার্স ইয়ার্ড। খুঁজে দেখ্ মুদাসসর আলী খান আর তার কোম্পানি সম্বন্ধে কী পাওয়া যায়। দ্য চুহার মত আরেকটা ফ্লোটিং ড্রাই-ডক আছে, ওটার নাম দ্য চুহি—ওটাও খানের।'

'পাওয়া যাবে। আর কিছু?'

'গগলকে বল্ ও যেন দ্য চুহাকে অনুসরণ করা বাদ দিয়ে বেস্ট প্র্যাকটিকাল স্পিডে খান ব্রেকার্স ইয়ার্ডের দিকে রওনা হয়ে যায়।' মার্ভেলের বেস্ট প্র্যাকটিকাল স্পিড ওটার টপ স্পিডের চেয়ে অনেক কম। দিনের আলোয় মার্ভেল টপ স্পিড তুললে আশপাশের জাহাজগুলো চমকে যাবে। রেইডার জ্যাম না করলে জাহাজের সবচেয়ে বড় অস্ত্র, সেই দ্রুতগতির রহস্য প্রকাশ পাবে।

'গগলকে জানিয়ে দিচ্ছি। ...কবে ফিরবি?'

'মনে হয় কালকে, রাখি তা হলে,' ফোন রেখে দিল রানা। আতাসি-কাশেম-জলিল ওর নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করছে। 'পুলিশ এখনও কিছু বুঝতে পারেনি। আমরা সবাই ছ'ঘণ্টার মধ্যে সুইটযারল্যাণ্ড ছেড়ে চলে যাচ্ছি। বেয়ারমানকে নিয়ে গাজি আবদেলের কাজ চার-পাঁচ ঘণ্টা পর শেষ হবে। রাত বারোটার পর রাস্তায় আর্মার্ড ভ্যান ফেলে যাবে। ঠিক আছে, আতাসি, তোমরা টাইমারগুলো রাত আড়াইটায় সেট করো।'

মার্সিডিজে উঠল রানা, ওর স্যাঙাতরা ওয়্যারহাউজের দরজা খুলে দিল। ও চলে যাওয়ায় যে-যার কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

রানা এখন লম্বা ড্রাইভে চলেছে। মিউনিখে যাবে, ওখান থেকে উঠবে প্লেনে।

চার

টেবিলের ওপাশে বসা লোকটার পরনে কম দামি পোশাক। তাকে দেখতে কেমন লাগছে তা নিয়ে কোনও দুশ্চিন্তা নেই তার। মাথায় সুতির গোল টুপি, অনেক পুরোনো। প্রচুর ঘামে লোকটা। টুপি-শার্টে ঘামের অসংখ্য তিলে, শার্টের দু'বগলে গোল হলদেটে দাগ। গোঁফ-দাড়ি খাবারের টুকরো ধরে রেখেছে। একে দেখেই রানার মনে হয়েছে, এ লোক মহা হারামজাদা।

অফিসে এমন একটা ভঙ্গি নেয়া হয়েছে যে, এটা কাজের জায়গা, আড্ডা মারবার জায়গা নয়। টেবিলে অসংখ্য কাগজ ছড়িয়ে আছে, ফাইল কেবিনেটগুলো উপচে পড়ছে। আসবাবপত্র সস্তা, আরাম করে বসবার জন্য নয়। কাজ শেষ হলেই বিদায় করবার উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা। দেয়ালে কয়েকটা পোস্টার ঝুলছে, ওগুলো সম্ভবত ইন্দোনেশিয়ান ট্যুরিস্ট বোর্ড থেকে পাওয়া। ডেস্কের একপাশে একটা কম্পিউটার, তবে ওটার যাওয়া উচিত প্রাচীন প্রকৌশল জাদুঘরে।

এক ইন্দোনেশিয়ান মহিলা রানাকে এখানে ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে। মহিলা বয়স্কা। কাঠির মত চিকন, দেখলে মনে হয় অতি ক্লান্ত। পরনে বসের মতই সস্তা পোশাক। রানার ধারণা হয়েছে, এদের স্মাগলিং সেটআপ-এ মহিলাকে গরীব দেখানো হয়েছে, তা নয়—আসলে বেতন এমনই কম দেয়া হয় যে, ভাল পোশাক পরা তো দূরের কথা, পেট ভরে খেতেই পায় না।

অনিল মুদাস্‌স্‌র্ আলী খান ও তার পরিবারের উপরে একটা ডোশিয়ে তৈরি করেছে। এখানে আসবার আগে ওটা পড়েছে রানা। এখন ও জানে, মুদাস্‌স্‌র্ আলী খানের সহায়-সম্পত্তি আধ বিলিয়ন ডলারের বেশি। পাঁচশো একর দেয়াল ঘেরা জমির উপর তার বাড়ি। লোকটার এগারো ছেলে-মেয়ে ও তাদের পরিবারের সবাই একইসঙ্গে প্রকাণ্ড ওই বাড়িতে থাকে। জামাইদের বিশ্বাস করে না সে, বেআইনী ব্যবসায় বসায় না। তার ছেলেরা সেসব দেখে। তার বড় ছেলে আজগার আলী খান তাদের খান ব্রেকার্স ইয়ার্ডের রিপ্রেজেন্টেটিভ।

এই আজগার আলী খান জাকার্তার ডাউন-টাউনের ঘুপচি একটা এলাকায় অফিস করে। এখান থেকে ডক বেশি দূরে নয়, তবে নতুন কেউ শহরে এলে জায়গাটা খুঁজে বের করতে হিমশিম খাবে। অফিসে বসে জাহাজের বাঁশি শুনছে রানা।

আজগার আলী খানের সঙ্গে দেখা করা কঠিন হয়নি। মিউনিখ থেকে জাকার্তায় আসবার পথে রানা মার্ভেলের ক্যাপ্টেন হিসেবে এ-অফিসে যোগাযোগ করেছে। বলেছে, ও জাহাজটা স্ক্র্যাপ হিসেবে বিক্রি করবে। জানতে চেয়েছে খান ব্রেকার্স ইয়ার্ড ওর জাহাজ কত টাকায় কিনবে।

রানা আজগারের মতই কম দামি পোশাক পরেছে। যে-দিন ও ফসেট বেয়ারমানকে ঘুম থেকে তুলল তার কয়েকদিন আগে থেকে দাড়ি রেখেছে, পরেও কাটেনি। মাথায় এখন উইগ, তার উপর চাপিয়েছে ইয়টসম্যান ক্যাপ। দেখলে মনে হয় কালো প্যান্টে কখনও ইস্ত্রি পড়েনি। পুরোনো একটা কালো ব্লেযার পরেছে ও, ওটা কোনওমতে বিরাট ভুঁড়ি ঢেকেছে। ব্লেযারের হাতায় দুটো বোতাম নেই। বিত্তশালী খানরা যদি নিজেদের মজুর শ্রেণীর মানুষ হিসেবে দেখায়, তা হলে রানা কী দোষ করেছে? ও এখন এমন এক দুর্ভাগা ক্যাপ্টেম, যার বেতন অতিরিক্ত কম। তাকে বাধ্য হয়ে চুরি করতে হয়।

আজগার আলী মার্ভেলের রিপোর্ট পড়ছে। অবশ্য মার্ভেলের নাম পাল্টে দেয়া হয়েছে, ওটা এখন পুরোনো একটা ফ্রেইটার, হাল-এ লেখা: দ্য ফরচুন। কাগজে লেখা আছে মার্ভেলের ডাইমেনশন, টনেজ, ইকুইপমেন্ট ইত্যাদি। কাগজের সঙ্গে এক ডজন ছবিও আছে। আজগার খানের চোখ শুয়োরের মত কুতকুতে, রানার মনে হলো লোকটা ডকুমেন্টগুলো চোখ দিয়ে গিলছে। অফিসের ভিতরে আওয়াজ বলতে পুরোনো একটা খটাংখট করা সিলিং ফ্যান আর জানালা দিয়ে আসা গাড়ি-ঘোড়ার শব্দ।

'এখানে একটা জিনিস দেখতে পেলাম না, ক্যাপ্টেন... হব্‌স্‌,' লোকটা তীক্ষ্ণ চোখে রানাকে দেখল। 'আপনি কিন্তু ওউনারশিপ ডকুমেন্টস দেখাননি। আমার মনে হচ্ছে আপনি এই জাহাজের মালিক নন, কাজেই আপনি চাইলেও স্ক্র্যাপ

বিক্রি করতে পারবেন না।'

রানার মুখ আরও গম্ভীর হয়ে গেল, খানের চোখে তাকাল। 'আপনি ওখানে আরেকটা জিনিস দেখেননি।' কয়েকটা কাগজ টেবিলের উপর দিয়ে বাড়িয়ে দিল ও।

কাগজগুলো নিল খান, পড়তে পড়তে মাঝামাঝি জায়গায় পৌঁছে একবার রানাকে দেখে নিয়ে আবারও কাগজে মন দিল। তার চোখে লালসা ফুটে উঠল।

'এখন আপনি দেখতে পাচ্ছেন,' বলল রানা। 'আমরা করাচি থেকে আট হাজার টন অ্যালুমিনিয়াম তুলেছি। ওগুলো এখন জাহাজের হোল্ডে। মিস্টার খান, এখন কেমন হয় আমরা ওগুলো নিয়ে ব্যবসা করলে? আপনি যদি ভুলে যান জাহাজের মালিক অন্য কেউ, তা হলে আমিও ভুলে যাব ইনগটগুলোর কথা। ওখানে দশ মিলিয়ন ডলার পড়ে আছে।'

কাগজগুলো ডেস্কে নামিয়ে রাখল আজগার, ওগুলোর উপরে দু'হাত রেখে রানাকে হিসাবী চোখে দেখল। 'ক্যাপ্টেন, একটু খুলে বলুন তো আপনি কেন খান ব্রেকার্সে এলেন?'

লোকটা জানতে চায় রানা কী করে জানল তাদের ব্রেকার্সে বেআইনী কাজ হয়। 'মিস্টার খান, কবিরা বলেছেন সাগর আসলে অনেক বিশাল। কথাটা ঠিক, কিন্তু ওঁরা একথা বলেননি দুনিয়াটা আসলে ছোট্ট একটা গ্রাম। কান খোলা রাখলে অনেক কথা শোনা যায়।'

'তো সেসব কথা কোথা থেকে শোনা গেল?'

ক্যাপ্টেন টম হবসের চেহারা দেখে মনে হলো এসব গোপন বিষয়ে আলাপ করতে চায় না। 'অনেকে অনেক কথা বলে। ঠিক মনে পড়ছে না কে আপনার ব্রেকার্স ইয়ার্ডের কথা বলেছিল, কিন্তু আমি নামটা মনে রেখেছি। আপনি তো জানেনই, কথা আগুনের চেয়ে দ্রুত ছড়ায়, বাতাসের আগে ছোটে—আর বেশি কথা কখনও কখনও মানুষের জীবন ধ্বংস করে।' ক্যাপ্টেন হব্‌স্ হিমশীতল চোখে আজগার খানকে দেখল, এখন তার চেহারা পাথরের মত হয়ে গেছে। ক্যাপ্টেন মুখে বলছে না কিছু, কিন্তু নীরবে যেন বলে দিল: যথেষ্ট প্রশ্ন করেছ, বাড়তি প্রশ্ন করলে এবার বিপদে পড়বে তুমি—এমন ব্যবস্থা করব, কর্তৃপক্ষ খান ব্রেকার্স ইয়ার্ডে তদন্ত করবে।

ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসল আজগার। 'শুনে খুব ভাল লাগল যে আমাদের ব্রেকার্সের এত প্রশংসা করা হয়েছে! ক্যাপ্টেন হব্‌স্, আমার মনে হয় আমরা ভাল কোনও চুক্তি করতে পারব। নিশ্চয়ই জানেন, স্টিলের স্ক্র্যাপের দাম বেড়েছে, এখন হাল্কের জন্য একশো দশ ডলার করে পাবেন।'

'আমার ধারণা প্রতি টনে আমি সাড়ে পাঁচশো ডলার পাব,' বলল রানা। যা বলছে তার চারগুণ পাবে ওই অ্যালুমিনিয়ামের ইনগটের জন্য, কিন্তু জিনিসগুলো নিজের না হওয়ায় ওর বুকে এখন আর অত সাহস নেই।

'না, এত টাকা আমি দিতে পারব না,' বলল আজগার। তার ভাব দেখে মনে হলো এইমাত্র তার বোনকে চরম অপমান করা হয়েছে। 'দুশো ডলার দিতে পারব, তাতেও কষ্ট হয়ে যাবে।'

'আপনি হাসতে হাসতে চারশো দিতে পারবেন, কিন্তু আমি তিনশোতে রাজি হবো।'

'ক্যাপ্টেন... ক্যাপ্টেন...' গুঙিয়ে উঠল খান, এবার রানার মনে হলো লোকটার মাকে চরম অপমান করা হয়েছে। 'তিনশো ডলার? ওই দামে আমার ব্রেক ইভেনই হয় না।'

'তার বেশি পাবেন। আপনি ভাল করেই জানেন হোল্ডে যা আছে সেটার দাম কত করে। ...ঠিক আছে, প্রতি টন আড়াইশো ডলার করে দেবেন, আর দু'দিন পর আপনার ইয়ার্ডে জাহাজ পৌঁছে যাবে।'

প্রস্তাবটা নিয়ে ভাবছে আজগার। রানা জানে, আগামী পরশু দ্য চুহা খান ব্রেকার্স ইয়ার্ডে পৌঁছুবে, সেসময় মার্ভেল নিয়ে হাজির হবে ও। খান কী ভাবছে জানতে পারলে ভাল হতো। সাবধানী লোক হলে জাহাজটা ড্রাই-ডক থেকে নামিয়ে ভেঙে ফেলবে, জলদস্যুতার প্রমাণ রাখবে না। এদিকে তাকে যে প্রস্তাব দেয়া হয়েছে, তাতে তার কয়েক মিলিয়ন ডলার লাভ থাকবে। লোকটা লোভকে গুরুত্ব দেবে, নাকি সতর্কতাকে?

সিদ্ধান্ত নিল আজগার খান। 'ইয়ার্ডে এখন জায়গা নেই। সাতদিন পরে জাহাজ আনুন। তখন জায়গা দিতে পারব।'

উঠে দাঁড়াল রানা। 'ঠিক আছে। আর জাহাজের মালিক যদি জাকার্তায় কোনও গুপ্তচর পাঠায়, তা হলে দুদিনের মধ্যে ইয়ার্ডে চলে আসব।'

আজগার খান কথাটা পুরোপুরি বুঝবার আগেই অফিস থেকে বেরিয়ে এল রানা, রিসেপশন পার হয়ে রাস্তায় নেমে পড়ল।

এয়ারপোর্টে পৌঁছে ক্যাপ্টেন আলম সিরাজের সঙ্গে দেখা করল রানা। পনেরো মিনিট পর ক্যাপ্টেনের হেলিকপ্টার সাগরের দিকে রওনা হয়ে গেল। মার্ভেল এখন শিপিং লেনের বাইরে রানার জন্য অপেক্ষা করছে। আলম সিরাজ গত দু'দিন ঘুমাননি, এক এক করে রানার কমাণ্ডো দল জাকার্তায় ফিরেছে, তাদের জাহাজে পৌঁছে দিয়েছেন। মার্ভেলের সবাই এখন জাহাজে, কিন্তু একজন এখনও নেই—লিউ ফু-চুঙের কোনও খবরই নেই।

জাহাজে ফিরে সোজা নিজের কেবিনে চলে এল রানা, দুর্গন্ধওয়ালা পোশাক ও ভুঁড়ি প্লাস্টিকের ব্যাগে পুরল, রেখে দিল ওয়াক-ইন ক্লজিটে। জিনিসটা পরে আবার লাগতে পারে।

দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে স্নান শেষে নিজেকে মানুষ বলে মনে হলো ওর। ট্রাউজার্স আর পোলো শার্ট পরল, চুল আঁচড়ে নিল। ভাবল, ওদের শিকার ধরবার সময় এসেছে। আজগার আলী খান চোরাই জাহাজ কিনতে রাজি হওয়ায় এখন লোকটাকে গ্রেফতার করানো যাবে। জুরিখ-কর্মকাণ্ডের সুফল পাওয়া যাচ্ছে এখন, ওরা এখন জানে জলদস্যুতা ও আদম-পাচার একইসঙ্গে চলছে। আজগার খান ও তার বাপ বেআইনী কাজে গলা পর্যন্ত ডুবে আছে। এবার এদের হাতের মুঠোয় পাওয়া গেছে। এখন বাকি রইল জাল গুটিয়ে তোলা। ওদের মাধ্যমে ভ্লাদিমিয়ার সরোকিনকে পাওয়া যাবে। হয়তো বেরিয়ে আসবে আরও বড় কুমির।

পায়ে নরম মোকাসিন পরে টেবিলের সামনে চলে এল রানা, ইন্টারকমে

স্টুয়ার্ডকে ওদের জন্য বোর্ডরুমে স্ন্যাক্স পাঠাতে বলল। কেবিন থেকে বেরিয়ে আসবার আগে দলের সিনিয়রদের জানিয়ে দিল, ওরা জরুরি মিটিঙে বসবে।

বোর্ডরুমটা জাহাজের সুপারস্ট্রাকচারের পিছনে, স্টার-বোর্ডে। ওখানে চল্লিশজন মিটিং করতে পারে, তবে টেবিলে বসবার ব্যবস্থা মাত্র বারোজনের। চওড়া পোর্টহোলগুলো খুলে দিলে প্রচুর আলো-হাওয়া আসে। সবার আগে ওখানে পৌঁছে গেল রানা, নিজের চেয়ারে বসে পড়ল। ওর পরপর হাজির হলো স্টুয়ার্ড, প্লেট ভরা গরম সামুসা ও কফি দিয়ে গেল।

আধ মিনিট পর বোর্ডরুমে ঢুকল সোহেল, উর্বশী ও ফারা, যার যার চেয়ারে বসল। সোহেল কাপে কফি ঢালল, একবার ফারাকে দেখে নিয়ে উদাস হয়ে সামুসা নিয়ে কামড় বসাল।

'এগুলো বিষ,' বলল ফারা। 'বিশেষ করে যার ওজন ঠিক নেই।'

সামুসা শেষ করে আরেকটা নিল না সোহেল, কফিতে চুমুক দিয়ে বদ-দোয়া দিল, 'আল্লা যেন তোকে উপযুক্ত শাস্তি দেয়!'

পঁচিশ সেকেণ্ড পর এল গগল, অনিল ও আতাসি, চেয়ারে বসে পড়ল।

'তা হলে মিটিং শুরু করা যাক,' বলল রানা। '...ফু-চুঙের কোনও খবর পাওয়া গেল?'

'না,' বলল আতাসি।

ফারার দিকে তাকাল রানা।

'তোমরা জাপানের উদ্দেশে রওয়ানা হবার আগেই মিস্টার ফু-চুঙের উরুতে সাবকিউটেনিয়াস ট্র্যান্সমিটার বসিয়েছি আমি, সেটা তুমি জানো,' বলল ফারা। 'ওটা কাজ করছিল তখন, পরেও কোনও সমস্যা করেনি। তোমাদের প্রত্যেকের ট্র্যান্সমিটার কাজ করছে।'

মার্ভেল ছেড়ে যাদের আর কোথাও যাবার প্রয়োজন হতে পারে, তাদের প্রত্যেকের চামড়ার নীচে স্পেশাল বার্স্ট্ লোকেটার বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরমুহূর্ত থেকে ওগুলো বিপ্ পাঠাতে শুরু করে। জিনিসটা ছোট্ট একটা স্ট্যাম্পের মত, দেহের নিজস্ব নার্ভাস সিস্টেম থেকে শক্তি সংগ্রহ করে। বারো ঘণ্টা পর পর একটা কমার্শিয়াল স্যাটালাইটকে তথ্য পাঠায়, জানিয়ে দেয় মানুষটা বেঁচে আছে কি না, এবং কোথায় আছে। ওই স্যাটালাইট মার্ভেলকে তথ্য পাঠায়। এই টেকনোলজি আবিষ্কার হওয়ায় আজকাল আর গুপ্তচররা গুবরে পোকা সঙ্গে রাখে না। কেউ ধরা পড়লেও তার সঙ্গে বাগ থাকে না। তবে নতুন টেকনোলজি, এখনও সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়।

'ফু-চুং বসের শেষ ট্র্যান্সমিশন থেকে জানা যায়, উনি শাংহাইয়ের কাছাকাছি ছিলেন,' বলল আতাসি। 'জায়গাটা নতুন এয়ারপোর্টের কাছে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'এমন হতে পারে ওকে প্লেনে তুলে পাচার করা হয়েছে।'

বুক পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল সোহেল, একটা সিগারেট নিল, কিন্তু ডক্টর ফারার কড়া দৃষ্টি দেখে ঠোঁটে ঝুলাল না। বলল, 'আমরা এ নিয়ে ভেবেছি। এখন পর্যন্ত যা জানা গেছে, তা থেকে মনে হয় না স্মাগলাররা ওকে

প্লেনে তুলেছে। আমরা স্মাগল্ড মানুষের কন্টেইনার পেয়েছি, ফু-চুং সে-পথে এগিয়েছে, স্মাগলারদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। আমার ধারণা ওকে সাগর পথেই নিয়েছে।'

'এমন যদি হয় সাগর পথে স্মাগলিং হচ্ছিল, তারপর জলদস্যুরা হামলা করেছে?' বলল অনিল। 'হতে পারে আদম-ব্যাপারীরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে আর জাহাজ করে লোক পাঠাবে না।'

'আমাদের জানা নেই জলদস্যুরা কত মানুষ এভাবে নিয়েছে,' বলল গগল। 'ট্রলারে যারা ছিল তারা হয়তো প্রথম ব্যাচ।'

'অথবা ওই ট্রলারে ওরাই ছিল শেষ ব্যাচ,' বলল অনিল। 'আদম-ব্যাপারীরা হয়তো ঠিক করেছে এখন থেকে প্লেনে মানুষ পাচার করবে।'

'এরা তো আগেও লোকজন সাগর পার করেছে, এখন যদি প্লেন কাজে লাগায়, তা হলে বুঝতে হবে এদের সংগঠন নতুন করে সাজিয়েছে,' বলল সোহেল।

এ কথার পর চুপ হয়ে গেল সবাই। বুঝতে পারছে বাস্তবে কী ঘটছে তা না জেনে কথা বলা উচিত নয়। ফু-চুঙের ট্র্যান্সমিটার থেকে বিপ পেলে জানা যাবে ও কোথায় আছে।

'আতাসি, তুমি চারপাশে যেসব স্যাটালাইট আছে, সেগুলোর দিকে নজর দাও,' বলল রানা। 'ওরা হয়তো ইলেকট্রনিক বিপ পাচ্ছে।'

'আমরা ওগুলো দেখেছি, বস,' নরম স্বরে বলল আতাসি। 'এখনও দেখছি। শাংহাইয়ের এক হাজার মাইলের মধ্যে যত স্যাটালাইট আছে, সেগুলো দেখছি আমরা। কিন্তু কোথাও কোনও বিপ পাইনি।'

'ফু-চুং এক হাজার মাইল সার্কেলে থাকলে তোমরা বিপ পেতে,' বলল রানা। 'আমার মনে হয় ও ওই সার্কেলে নেই। তুমি শাংহাই থেকে শুরু করে চারপাশের দু'হাজার মাইল খোঁজো। এরপরেও যদি খুঁজে না পাওয়া যায়, তা হলে সার্কেলের বিস্তৃতি আরও বাড়াবে। যে-করে হোক ফু-চুংকে খুঁজে বের করতে হবে।'

'ঠিক আছে, বস্, আমরা রেঞ্জ বাড়াব।'

'এখন থেকে খান ব্রেকার্স ইয়ার্ডে চোখ রাখতে হবে।' অনিলের দিকে তাকাল রানা। 'তুই দ্য চুহার সিস্টার শিপের ব্যাপারে কিছু পেলি?'

'আমরা জানি, দ্য চুহা আর দ্য চুহি রাশানদের তৈরি,' বলল অনিল। 'দুই ড্রাই-ডক একইসঙ্গে কেনা হয়েছে। কয়েকটা ডামি কোম্পানি ওগুলো কিনেছে। এসব কোম্পানি গড়েছে উকিল লিয়ার বেয়ারমান। দ্য চুহা স্যালভেজের কাজ করে, কিন্তু দ্য চুহিকে ও-কাজে নামানো হয়নি। আজ পর্যন্ত কেউ ওটা ভাড়াও নেয়নি। ওই ড্রাই-ডক লয়েড'স-এর লিস্টে আছে, কিন্তু বলা হয়েছে, ওটার মালিকরা এখনও জাহাজটা ভ্লাদিভোসটোক থেকে ডেলিভারি নেয়নি।'

প্রশ্ন করতে মুখ খুলেছিল রানা, কিন্তু অনিল উত্তর জানিয়ে দিল, 'চেক করা হয়েছে। ওই ড্রাই-ডক আঠারো মাস আগে সরিয়ে নেয়া হয়। ওটার টাগ দুটোর নাম কারও মনে নেই।'

ভ্রূ কুঁচকাল রানা। 'তা হলে কোনও সূত্র পাব না।'

অর্ধেক সামুসা প্লেটে নামিয়ে রাখল উর্বশী, বলল, 'দেড় বছর হলো খান অ্যাণ্ড কোম্পানি দ্য চুহিকে গোপন কাজে নামিয়েছে। ওরা হয়তো ওই ড্রাই-ডক দিয়ে জাহাজ ধরছে না, কিন্তু সাগরে আর সব স্মাগলিং করছে। ইচ্ছে করলেই ওরা চোরাই গাড়ি সরাতে পারবে। ওই ড্রাই-ডকে একশোর বেশি রাখা যাবে। স্মাগলাররা হাসতে হাসতে এক হাজার লোক এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সরিয়ে নিতে পারবে।'

একটু থমকে গেল সবাই। উর্বশী ঠিক কথাই বলেছে। ওই ড্রাই-ডক যদি মানুষ পাচারে লাগানো হয়, তা হলে ঠেকাচ্ছে কে?

'এরকম হতেই পারে,' বলল গগল। 'গড়বড় দেখলে সাগরে মানুষ ডুবিয়ে দিতেই অসুবিধে কী?'

'দ্য চুহিকে খুঁজে বের কর্, অনিল,' বলল রানা। 'আমাদের জানা দরকার ওটা কী কাজ করছে।'

'দেখছি কী করা যায়,' গম্ভীর স্বরে বলল অনিল।

'এই মিটিঙে আরেকটা কথা বলব আমি,' বলল রানা। 'তোরা জানিস আমি এখানে আসবার আগে জাকার্তায় অপেক্ষা করেছি। আমার কাজ ছিল ওখানে বসে মার্ভেলকে স্ক্র্যাপ হিসেবে বিক্রি করা। লিয়ার বেয়ারমান যা বলেছে, সেটাই ঠিক। গতকাল পর্যন্ত আমরা সন্দেহ করেছি, কিন্তু এখন ভাল করেই জানি, খান ব্রেকার্স ইয়ার্ডের মালিক-পক্ষ চরম দুর্নীতি-পরায়ণ। এরা নিয়মিত জলদস্যুতা করে। এমন হতে পারে, এরাই মানুষ-পাচার করছে।

'আজগার আলী খান চায় না আমরা এক সপ্তাহের মধ্যে তাদের ইয়ার্ডে হাজির হই। দ্য চুহার ভেতরের জাহাজটা এর আগেই সরিয়ে ফেলবে। তবে সে-সুযোগ পাবে না। আগামী পরশুদিন আমরা তার ইয়ার্ডে হাজির হবো। দ্য চুহা আসুক, আমি সে-রাতেই ব্রেকার্স ইয়ার্ডে হানা দেব।'

'কোনও পরিকল্পনা করেছ?' জানতে চাইল গগল।

'এখনও না।'

'ব্রেকার্স ইয়ার্ডে তোর একা যাওয়া ঠিক হবে না,' বলল সোহেল। 'আমিও যাব। বসে থেকে বিরক্ত হয়ে মরতে চাই না। তোর কোনও আপত্তি আছে?'

বহুদিন তুই অপারেশনে নেই, বলতে পারত রানা, কিন্তু বলল, 'যাস, আমরা দু'জন প্রথমে ওখানে ঢুকব।' ও জানে, সোহেল অফিস করে হাঁপিয়ে উঠেছে, ওকে এখন বাধা দিলে মনে ভয়ানক কষ্ট পাবে। অনিলের দিকে চাইল রানা, 'অনিল, তোর কাছে ইয়ার্ডের ছবি আছে?'

'আছে। তবে কমার্শিয়াল স্যাটালাইট থেকে পাওয়া। একবছর আগে তোলা। ওই ইয়ার্ড তখন তৈরি হচ্ছে।'

'আলম সিরাজকে বলব ইয়ার্ডের উপর দিয়ে দু'বার ঘুরে আসতে,' বলল সোহেল। 'উনি ভাল ছবি নিয়ে আসতে পারবেন।'

'ওই ইয়ার্ড রবিনসনের রেঞ্জের বাইরে,' বলল উর্বশী। 'মিস্টার সিরাজ জাকার্তা গেলে তাঁকে আরেকটা হেলিকপ্টার যোগাড় করে দিতে পারব। আমার এক বান্ধবীর স্বামী হেলিকপ্টার ভাড়া দেয়।'

'তা হলে খুব ভাল হয়,' বলল সোহেল।

'ক্যাপ্টেন ঘুরে আসুন, ছবিগুলো দেখলে বোঝা যাবে ইয়ার্ডে কোথায় কী আছে,' বলল রানা।

'সবাই ছবির কপি নেব, তারপর আলাপ করা যাবে,' বলল উর্বশী।

ওর দিকে তাকাল রানা। 'আমরা জানি না ইয়ার্ডে কতজন পাহারা দেয়, সঙ্গে কী ধরনের অস্ত্র রাখে—কাজেই তোমার দলের সবাইকে সম্পূর্ণ সশস্ত্র রাখবে। তোমাদের সঙ্গে যেন শোল্ডার-ফায়ার্ড মিসাইলও থাকে।'

'ঠিক আছে।'

'ফারা...'

'জানি,' রানা কথা শুরু করবার আগেই বলল ফারা, 'আমাদের ব্লাড সাপ্লাই যথেষ্ট রয়েছে। তারপরও যদি লাগে, ক্রুদের কাছে ভ্যাম্পায়ার হয়ে দেখা দেব।'

মৃদু হেসে ফেলল সবাই।

'তোমরা জেনেশুনে এই অপরেশানে নামছ, কাজেই আমার আর কিছু বলার নেই,' বলল রানা। 'সবাই মানসিক ভাবে তৈরি হয়ে নাও। ধরে নিতে পারো, আমরা খান ব্রেকার্স ইয়ার্ডে ঢুকলে লড়াই হবে। ...কারও কোনও প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞেস করতে পারো।'

অপেক্ষা করল রানা, কেউ কোনও প্রশ্ন তুলল না। এসবে ওরা অভ্যস্ত।

অনেকক্ষণ হলো রানা ক্যাপ্টেন টম হবসের ছদ্মবেশ পরে সৈকতের দিকে তাকিয়ে আছে, হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছে মার্ভেলের ব্রিজের রেইলিঙে। ওর দু'হাতে লেগে আছে নকল মরচে। সূর্যের বিরাট গোলকটা কমলা রঙা হয়ে নীচে নামছে। খান ইয়ার্ডের অনেক পিছনে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়, সূর্য তার ওপাশে নেমে যাচ্ছে। বাতাসে ভাসছে পোড়া বাঙ্কার ফিউল, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সলভেন্টস ও ঝলসে যাওয়া ধাতুর কটু গন্ধ। রানা সুমাত্রা আসবার সময় কুমারী বনাঞ্চল ও সাদা সৈকত দেখেছে, এখনও ওখানে মানুষের কলঙ্কিত হাত পৌঁছয়নি। কিন্তু ইয়ার্ডে এসে মনে হচ্ছে দ্রুত এই ক্যান্সার চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে। সৈকত ভরে আছে হাজারো জিনিসে। সাগরের দিকটা সাবান-গোলা বিশ্রী রং ধরেছে। উপসাগরের মুখে একটা বিরাট ওয়্যারহাউজ, ওটা বাদ দিলে তিন দিকের বিল্ডিংগুলো অতি পুরোনো লাগছে। ওগুলোর গায়ে লেপ্টে আছে কালো ধুলো। রানা আগে কখনও এত কাছ থেকে কোনও ব্রেকার্স ইয়ার্ড দেখেনি।

একের পর এক বিল্ডিং, ক্রেন, কনস্ট্রাকশান ইকুইপমেন্ট—এসবের যেন শেষ নেই। ওখানে সব মিলে বিরাট হুলুস্থুল চলছে। হাজারো লোক কাজ করছে ডেরিকগুলো সৈকত থেকে স্টিলের স্ল্যাব তুলছে, দূরে নিয়ে গিয়ে ঘেরা একটা জায়গায় নামিয়ে দিচ্ছে। ওখানে একদল শ্রমিক ইলেকট্রিক টর্চ ও হাতুড়ি নিয়ে কাজ করছে। সবাই মিলে ব্যস্ত হয়ে জাহাজের ধাতব টুকরো ভাঙছে। সিকি মাইল দূরে মার্ভেলকে রেখেছে রানা, ওখান থেকে সৈকতের দিকে তাকালে মনে হয় একদল কর্মঠ পিঁপড়ে বিরাট কোনও মরা গুবরে পোকা পেয়েছে, টানাটানি করে লাশ নিয়ে বাড়ি ফিরছে।

মার্ভেলের চারপাশে অন্তত পঞ্চাশটা জাহাজ ভাসছে। যেদিকে তাকানো যায়, একটার পর একটা জাহাজ। কন্টেইনার শিপ, অয়েলার, ফ্রেইটার—কী নেই! সব জং ধরা, পরিত্যক্ত হয়েছে। একে একে ভেঙে ফেলা হবে। স্ল্যাবগুলো যাবে স্টিলের প্ল্যান্টে।

ব্রিজে ঢুকে গগল বলল, 'ওগুলোর তুলনায় মার্ভেলকে ব্র্যাণ্ডনিউ লাগছে।' ওর সঙ্গে সোহেলও আছে। দু'জন রানার পাশে এসে দাঁড়াল।

চকচকে ওয়্যারহাউজের ভিতর থেকে ভয়ঙ্কর আওয়াজ বেরিয়ে কানে তালা লাগিয়ে দিল। কী যেন বলল রানা, কিন্তু ওর কণ্ঠ হারিয়ে গেল প্রচণ্ড আওয়াজে।

'কী বললে?' আওয়াজটা মিলিয়ে যাওয়ার পর জানতে চাইল গগল।

'জাহাজের করাত।'

'হ্যাঁ, ওয়্যারহাউজের ভেতরে ওই জিনিস আছে,' বলল গগল। 'পত্রিকায় পড়েছি চেইনের মত করাত তৈরি হয়েছে, খুব সহজেই জাহাজ কেটে ফেলে।'

চার্ট টেবিলের ওপাশের দেয়ালে ঝুলছে বিনকিউলার, ওটা নামিয়ে আড়াল নিল সোহেল, চোখে লাগাল। কয়েক মিনিট পর ওয়্যারহাউজের পিছন দিকের দরজা খুলে গেল, বেরিয়ে এল ছোট একটা লোকোমোটিভ। সঙ্গে নিয়ে এসেছে ইস্পাতের বিশ ফুটি একটা টুকরো। মনে হলো অংশটা তরমুজের মত করে কেটেছে। ওটা ছিল কোনও জাহাজের বো। রেল লাইনের শেষ মাথায় চলে গেল লোকোমোটিভ, থামল। একটা মোবাইল ক্রেন তরমুজের টুকরো তুলে নিল। মনে হলো, যে জাহাজটা কাটা হচ্ছে, সেটা কোনও ফ্রেইটার না, বাল্ক ক্যারিয়ার বা ট্যাঙ্কার।

ক্রেন ইস্পাতের অংশটা নিয়ে আরেক জায়গায় নামিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকরা কাজে নেমে পড়ল।

সোহেলের হাত থেকে বিনকিউলার নিল রানা, ওয়্যারহাউজটা দেখল। 'ওখানে রাতে ঢুকব।'

'তার আগেই দ্য চুহা চলে আসবে,' বলল সোহেল।

'সন্ধ্যার আগেই,' গম্ভীর হয়ে গেল রানা। 'আসুক, আমরা জানি ওটার ভিতরে জাহাজ থাকবে।'

'তোমার বন্ধুর জাহাজও হতে পারে,' বলল গগল।

'সোহেল আর আমি আগে যাব ওয়্যারহাউজে।'

'শুধু তোমরা দু'জন? উচিত হবে?'

গগলের হাতে বিনকিউলার ধরিয়ে দিল রানা। 'দেখো, ওয়্যারহাউজের মুখে তাকাও। ওখানে অনেকখানি বেড়ে আছে। ওসব জায়গায় পাইলিং করেছে। দু'পাশের দেয়াল সাগরের মেঝে পর্যন্ত নামার কথা না। নামলেও, ওটার গেট সাগরতল পর্যন্ত নামবে না। পুরো দরজা থাকলে ড্র্যাগ অনেক বেশি হতো, পাল্লা খোলা-আটকানো অসম্ভব হয়ে উঠত।'

ওয়্যারহাউজের গেট দেখল গগল। 'ওই দরজার তলা দিয়ে ঢুকবে?'

'হ্যাঁ। চারপাশ দেখে আসব। জানতে চাই জাহাজটা কাদের। ঘুরে আসতে এক ঘণ্টার বেশি লাগবে না। বেশিরভাগ সময় যাবে যাওয়া-আসাতেই।'

বিশাল ছাউনিটা দেখছে গগল, আবারও গেট দেখল, তারপর বলল, 'সঙ্গে ড্রেইগার রিব্রিদার নিয়ো।' তীক্ষ্ণ হুইসল শুনতে পেল ওরা। কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিল, আজকের মত শ্রমিকদের ছুটি, কাজ শেষ। আওয়াজটা মিলিয়ে যাওয়ার পর গগল বলল, 'রিব্রিদার থাকলে বদ্বুদ উঠবে না, চুপচাপ ঘুরে আসতে পারবে।'

রাত একটায় বোট গ্যারাজে চলে এল রানা ও সোহেল। পোশাক পাল্টে ওয়েট স্যুট পরে নিল ওরা। ওরা শীতের কারণে স্যুট পরেনি, খান ব্রেকার্স ইয়ার্ডের আশপাশের সাগর কবোষ্ণ—কালো রঙের মাইক্রোপ্রেনের কারণে অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা যাবে। পুরু সোলওয়ালা ডাইভ বুট পরেছে ওরা, ফিনজোড়াও লাগিয়ে নিল। ওদের পিঠে ড্রেইগার ইউনিট ঝুলিয়ে দিল ডাইভ টেকনিশিয়ান। ড্রেইগার ইউনিট ব্যবহার করলে সাগরের উপর বুদ্বুদ উঠে আসে না, একই বাতাস ফিল্টার করে কার্বন ডাই অক্সাইড সরিয়ে রিসাইকেল করা হয়।

ড্রেইগার ইউনিট ব্যবহার করলে তিরিশ ফুটের বেশি গভীরে যাওয়া উচিত নয়। রানা ও সোহেল অবশ্য ঠিক করেছে বেশি নীচে নামবে না। ওদের সঙ্গে আছে একটা করে ওয়াটার-প্রুফ পাউচ ও ফ্ল্যাশলাইট। সোহেল নিয়েছে সদ্য আবিষ্কৃত একটা ফেব্রিক ন্যাশনাল ফাইভ-সেভেনএন ডাবল অ্যাকশান অটোমেটিক। ওটার অ্যামো ফাইভ পয়েন্ট সেভেন এমএম। ক্লিপে রাখা যায় বিশটা বুলেট, চেম্বারে একটা। সূচালো-মাথার বুলেটগুলো বহু দূর পর্যন্ত সরল রেখায় ছুটতে পারে।

ডান উরুতে একটা করে খাপে পোরা ডাইভ-নাইফ বেঁধে নিয়েছে ওরা। রানা বাম কব্জিতে বেঁধেছে ডাইভ কম্পিউটার। ডান বাহুতে বাঁধা একটা পাউচে পিস্তল ও ফ্ল্যাশলাইটের সঙ্গে রয়েছে মিনি কম্পিউটার।

ডাইভ টেকনিশিয়ান ওদের যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করে দেখছে।

গ্যারাজে ঢুকল উর্বশী, দ্রুত পায়ে এসে ওদের কাছে দাঁড়াল। 'আমি ডক্টর ফারাকে পানির স্যাম্পল দিয়েছিলাম, ও অ্যানালাইয করেছে।' শ্রাগ করল। 'ও বলেছে উনিশশো ষাটে কুয়াহোগা নদীর পানি যেমন ছিল, সাগর এখানে তার চেয়েও বিষাক্ত। ভুলেও পানি গিলতে যেয়ো না, মারা পড়বে।'

'এর চেয়ে ভাল কোনও খবর নেই?' বলল রানা। গম্ভীর। হাতের ইশারায় টেকনিশিয়ানকে গ্যারাজের ব্যাটল ল্যাম্প নিভিয়ে দিতে বলল।

'গগল হেলম-এ আছেন,' বলল উর্বশী। 'মিস্টার চ্যাটার্জি উইপন্স স্টেশনে আছেন। তোমরা ওয়্যারহাউজের অর্ধেক পথে যেতে না যেতে তৈরি হয়ে যাব আমি আমার কমাণ্ডোদের নিয়ে। দরকার পড়লে আমরা জোডিয়াক নিয়ে তোমাদের সাহায্য করতে পারব। খবরগুলো ভাল বলে মনে হচ্ছে?'

'মন্দ নয়। দেখা যাক আমরা গোলমাল না করে ফিরতে পারি কি না।'

গ্যারাজের দরজা খুলে গেল। দু'বন্ধু র‍্যাম্প বেয়ে দরজার কাছে চলে গেল, ফিন পরে নিয়ে নিঃশব্দে সাগরে নেমে পড়ল। ডুবে যাওয়ায় একগাদা ওজন হালকা হয়ে গেল। ওরা ট্রেইণ্ড কমাণ্ডো, একটু আগেও ওদের মনে হাজারো চিন্তা ছিল, কিন্তু এখন সব দূর হয়ে গেছে। এমন কী ফু-চুঙের কথাও মনে নেই। ওরা

জানে, ওদের কাজ এখন গন্তব্যে পৌঁছুনো।

বয়্যান্সি অ্যাডজাস্ট করল ওরা, দশ ফুট গভীরে নেমে গেল। ডাইভ কম্পিউটারে ইনটিগ্রেটেড কমপাস দেখল রানা, হাতের ইশারা করল সোহেলকে, তারপর দু'হাত কোমরের পাশে রেখে রওনা হয়ে গেল। অনুসরণ করল সোহেল। ওরা কালি-গোলা পানির মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলল। নিয়মিত শ্বাস নিচ্ছে, যন্ত্রের মত পা চলছে। একমিনিট পর টের পেল মার্ভেল এখন আর বামপাশে নেই। ওরা বো পিছনে ফেলে এসেছে।

ড্রেইগারের মাউথপিস বড়সড়, তারপরেও মুখে বিশ্রী স্বাদ পেল। মনে হলো জিভে কোনও পুরনো সিকি আটকে গেছে। সাগর এখানে নোংরা। স্পর্শ করে টের পেল স্যুট তেলতেলে হয়ে গেছে। দু'জনের মনে একই চিন্তা এল, মুদাস্‌স্‌র আলী খান চারপাশের পরিবেশ নষ্ট করছে।

ধরা পড়বার ভয়ে ওরা টর্চ জ্বালছে না। ইন্দ্রিয় কাজে লাগিয়ে এগিয়ে চলেছে। বিশ মিনিট পেরিয়ে গেল, একটানা সাঁতার কাটছে। ভাটা চলছে। সাগর ওদের টেনে নিতে চাইছে। আরও কিছুক্ষণ পর হুশ্‌হুশ্‌ আওয়াজ শুনতে পেল। প্রকাণ্ড ওয়্যারহাউজের গেটের কাছে চলে এসেছে ওরা, ওটার তলা দিয়ে স্রোত ঢুকছে। ঢেউ ওদের একপাশে সরিয়ে নিতে চাইল। বাধ্য হয়ে একটু দিক বদলাল। হাত বাড়িয়ে রাখল। আধ মিনিট পর কর্কশ কংক্রিট পেল রানা। ও দাঁড়িয়ে যাওয়ায় থামল সোহেল, কংক্রিট স্পর্শ করে দেখল। যেসব কলাম বিশাল এই ওয়্যারহাউজ ধরে রেখেছে, সেগুলোর একটা। ঘুরল রানা, ছাউনির দিকে পিঠ দিয়ে থামল। সামনে পানি একদম কুচকুচে কালো। বেশ দূরে সৈকতে অনেক বাতি আছে। বিল্ডিঙের সাগরের দিকটা একদম অন্ধকার। কোথাও কোনও আলো নেই। সোহেলকে ইশারা করে ডাইভ লাইট জ্বালল রানা। লালচে মৃদু আলোয় নিজেদের গন্তব্য ঠিক করে নিল।

টর্চ নিভিয়ে দিল রানা, দু'জন আস্তে করে ভেসে উঠল। খানিকটা দূরে দরজাটা দেখতে পেল—ওটা উচ্চতায় ওয়্যারহাউজের সমান, সাগর সমতল থেকে আশি ফুট উঁচু। বিল্ডিং চওড়ায় প্রায় দুশো ফুট, ওই দরজাও প্রশস্তে প্রায় সমানই। সবচেয়ে বড় ক্রুজ শিপ, কন্টেইনার শিপ বা ট্যাঙ্কার ছাড়া আর সবই ওই ওয়্যারহাউজে ঢুকবে।

মাউথপিস খুলে বলল রানা, 'এবার ঢুকব, চল্‌।'

ডুব দিল ওরা, এগিয়ে ফটকের সঙ্গে মিশে গেল, তারপর আরও নামতে শুরু করল। মাত্র পাঁচ ফুট নামবার পর গেটের তলা পেয়ে গেল ওরা, এপাশে চলে এসে আস্তে করে ভেসে উঠল। ছাউনিটা বিশাল কোনও হ্যাঙারের মত। রেগুলেটর খুলে ফেলল দু'জন, ডাইভ মাস্ক তুলে দিল কপালের উপরে। দম নিয়ে নাক কুঁচকে ফেলল ওরা, হ্যাঙারের বদ্ধ বাতাসে পোড়া ধাতুর গন্ধ, শ্বাস নিতে কষ্ট হয়।

কয়েক সেকেণ্ড ওদের মনে হলো ওয়্যারহাউজ পুরোপুরি অন্ধকার, চাঁদহীন আকাশের মত, তারপর বুঝতে পারল ওরা আছে একটা ক্যাটওয়াকের নীচে। তলা থেকে বেরিয়ে সামনে এগিয়ে দেখল, ওয়্যারহাউজের ছাদে কয়েকটা বালব

জ্বলছে। ওগুলো এতই উঁচুতে যে জোর আলো আসছে না। চারপাশ ঘন ছায়ায় ডুবে আছে। স্বল্প আলোয় একটা জাহাজের আকৃতি দেখতে পেল। জাহাজের পাশে চলে গেল ওরা, আরও সামনে এগোল। সাগর-সৈকতের ওপাশে যে জাহাজগুলো ভাসছে, জং ওগুলোকে ভাল ভাবে ধরেছে, কিন্তু এটাকে নয়। হাল স্পর্শ করে দেখল, এই জাহাজটা পরিত্যক্ত হওয়ার মত নয়। পুরোনো তো নয়ই, বরং প্রায় নতুন একটা জাহাজ। সামান্য শেওলাও নেই। শরীরে চকচকে কালো রং। রংটা গাঢ় নীলও হতে পারে।

ওয়্যারহাউজের এপাশে একটা ধাতব সিঁড়ি উঠে গেছে অনেক উপরে। কিছুটা উঠলেই একটা ওয়াকওয়ে। ওটা প্রায় পুরো বিল্ডিং ঘিরে আছে। কয়েক ধাপে উঠে গেছে একেবারে ছাদের কাছে। গিয়ারগুলো খুলে ফেলল ওরা, ওগুলো পানির নীচে বেঁধে রাখল। পাউচ থেকে বের করে নিল সাইলেন্স্ড্ পিস্তল। সঙ্গে শোল্ডার-হোল্স্টার এনেছে ওরা, তবে ওখানে পিস্তল রাখল না। রানা চেক করে দেখল ওর মিনি কম্পিউটার, ওটা ঠিক মত কাজ করছে।

সিঁড়িতে পা রাখল রানা, পিস্তল হাতে উঠতে শুরু করে বলল, 'আমি আগে যাচ্ছি, কাভার দে।'

ওয়াকওয়েতে উঠে অপেক্ষা করল ও, সোহেল উঠে আসতেই এগোল। প্রতি পা মেপে ফেলছে ওরা, পায়ের পুরো ওজন ফেলবার আগে দেখে নিচ্ছে, যেন পড়ে না যায়। আপাতত জানবার পথ নেই মুদাস্সর আলী কোনও প্রহরী রেখেছে কি না। বদ্ধ ধাতব হ্যাঙার। পায়ের সামান্য আওয়াজ অনেক জোরে প্রতিধ্বনিত হবে। সাবধানে এগোচ্ছে ওরা।

কিছুটা দূরে একটা সরু পাত দেখতে পেল, চওড়ায় দু ফুটের বেশি হবে না। ওটা নেমে গেছে জাহাজের ডেকে। ওরা আছে এখন আবছায়ায়। দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, কান পাতল। প্রহরীদের কথাবার্তা, বা কাশির আওয়াজের জন্য অপেক্ষা করল। দু'মিনিট পেরিয়ে গেল, আছে শুধু হিসহিস একটা আওয়াজ। বারবার স্রোত আসছে, ফিরছে। বড় ঢেউ এলে আওয়াজ বাড়ছে, তারপর মিলিয়ে যাচ্ছে। কারও গলার আওয়াজ নেই।

পাত ধরে এগোল রানা, নেমে এল জাহাজের ডেকে, গিয়ে থামল ক্যাপস্টানের আড়ালে। চারপাশ কাভার করল ও। পঁচিশ সেকেণ্ড পর সোহেল ওর পাশে চলে এল। ডেকে দু'আঙুল ছোঁয়াল রানা, ঘষল। ধাতব ডেক, নতুন রং করা হয়েছে। খসখসে অনুভূতি নেই। জাহাজ পুরো না দেখেও বোঝা যায়, এটা একটা মাঝারি ট্যাঙ্কার। এগুলোকে বলা হয় প্রোডাক্ট ট্যাঙ্কার। এরা শুধু রিফাইণ্ড জিনিস বহন করে, ক্রুড অয়েল নয়। কেরোসিন বা গ্যাসোলিনের মত জিনিস পৌঁছে দেয়। করাতের হামলায় ট্যাঙ্কারের প্রথম ষাট ফুট গায়েব হয়ে গেছে। জাহাজটা লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করে বানানো হয়েছে, কিন্তু মুদাস্সর আলী খান এক বেলাতেই ওটার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে।

ওরা আছে অ্যাফটে। হাতের ইশারা করল রানা, কুঁজো হয়ে ছুটল সুপারস্ট্রাকচারের দিকে। সোহেলের চারপাশ দেখা হয়ে গেছে, বন্ধুকে কাভার দিল ও। যে-কোনও সময় বিপদ আসতে পারে, কাজেই সাবধান হয়ে আছে।

রানা সুপারস্ট্রাকচারে পৌঁছে যাওয়ার পর উল্টো কাভার দিল। সোহেল হালকা দৌড়ে ওর কাছাকাছি চলে গেল।

স্টার্নে বসে আছে চারতলা অ্যাকোমোডেশন ব্লক। শ্রমিকরা ওখানে কাজ শুরু করেছে—ওয়্যারহাউজে ঢোকানোর আগে লম্বা ফানেল, ব্রিজ ইত্যাদি করাত দিয়ে নামিয়ে দিয়েছে। এক পাশে একটা হ্যাচ, ওটার পাশে চলে গেল রানা। ভিতরে ঢুকল, টর্চ জ্বালল। ডেক লিনোলিয়াম, দু'পাশের দেয়াল দামি প্যানেল দেওয়া। দেয়ালে বামহাত রেখে সামনে এগোল রানা, পিছনে সোহেলের বুটের খসখস আওয়াজ পেল। জাহাজের নাম, রেজিস্ট্রেশন বা অন্যান্য তথ্য কোম্পানির প্লেকে নেই, বদলে পাওয়া গেল স্ক্রু-র চারটে গর্ত। জাহাজের নাম সরিয়ে ফেলেছে কেউ।

সামনেই সিঁড়ি, রানাকে কাভার দিল সোহেল। রানা বারো ফুট উপরে উঠবার পর অনুসরণ করল সোহেল। পাঁচ মিনিট পর ভাঙা ব্রিজে ঢুকল রানা, টর্চ নিভিয়ে দিল। এক মিনিট পর ঢুকল সোহেল। চারপাশ দেখে এসেছে, বাইরে কেউ নেই। ব্রিজে ইলেক্ট্রনিক্স-এর কোনও ম্লান আলো নেই, ওগুলো উপড়ে নেওয়া হয়েছে। রেডিয়ো, ওয়েদার কম্পিউটার, ন্যাভিগেশন এইড—সব উধাও হয়েছে। র‍্যাকগুলো পুরোপুরি খালি, কিছুই নেই। যে-ই হোক, কাজে কোনও খুঁত রাখেনি। ছেঁড়া তারও নেই। মনে হলো এখানে তাড়াহুড়ো করেনি কেউ।

চারপাশে জাহাজের নাম থাকবে, এমন কিছু নেই। সুপারস্ট্রাকচার খুঁজে দেখল ওরা। গ্যালিতে যা কিছু আছে, সব স্টেইনলেস স্টিল। রিফ্রিজারেটর থেকে শুরু করে হাঁড়ি-প্লেট-চামচ-চুলো সব ঘাঁটল ওরা—কোথাও জাহাজের নাম নেই। কোথাও মালিকের করপোরেট লোগো নেই। সাবধানে সরিয়ে ফেলা হয়েছে সব। প্রতিটা কেবিনে ঢুকল ওরা, কোনও আসবাবপত্র পেল না। তবে বোঝা গেল, ওখানে কয়েকদিন আগেও আসবাবপত্র ছিল। এক কেবিনে সিগারেটের গন্ধ পেল, আরেকটায় আফটার শেভের সুবাস।

মেইন ডেক পার হয়ে আরও নীচে নামল ওরা, চলে এল ইঞ্জিন রুমে।

এখানে বিরাট দুটো ডিজেল ইঞ্জিন অনেক জায়গা নিয়েছে, দেখতে একেকটা আস্ত পাবলিক বাস। ওগুলোর ডাক্ট-এ ঢুকেছে হাজারো তার। দু'জন ইঞ্জিন দুটো ঘুরে দেখল, কোনও আইডেন্টিফিকেশন ট্যাগ নেই। সিরিজ নাম্বার যেখানে ছিল সেখানে কেউ গ্রাইণ্ডিং হুইল চালিয়েছে, সব মিশিয়ে দিয়েছে। ওসব জায়গায় ধাতু রুপালী হয়ে চকচক করছে।

ওয়ালথার হোলস্টারে পুরল রানা, 'তুই গার্ডে থাক্, আমি দেখি কিছু পাওয়া যায় কি না।'

ইঞ্জিন রুমের দরজার আড়ালে থাকল সোহেল, হাতে পিস্তল।

ঘরটা বড়সড় গুহার মত, ছোট্ট টর্চ দিয়ে পুরোটা খুঁজে দেখা প্রায় অসম্ভব—রানা ঠিক করেছে ইঞ্জিন থেকে শুরু করবে। চারপাশ অন্ধকারে ডুবে আছে। বামপাশের ইঞ্জিনের সামনে দাঁড়াল ও, তারপর একটা ফ্রেশওয়াটার কণ্ডেনসারের নীচে ঢুকল। এক মিনিট পর হতাশ হলো। আগেই কেউ ম্যানুফ্যাকচারের সিল উঠিয়ে রেখেছে। প্রত্যেক কোণ খুঁজে দেখল ও, কোথাও

কোম্পানির নাম পাওয়া গেল না।

মুদাস্‌সর আলী খানের লোকজন জানে কী করতে হয়, কাজে ভুল রাখেনি তারা। স্টার-বোর্ড ইঞ্জিনের তলায় ঢুকল রানা, কালি মেখে ভূত হয়ে গেল। নীচে উপচে পড়েছে তেল। এক কোণে বেশি পড়েছে। জায়গাটা এমন কোণে যে ওখানে ঢোকা খুব কঠিন। রানার মন চাইল না ওই ঘুপচিতে ঢুকতে। তবে ওর যখন ওখানে যেতে মন চাইছে না, তা হলে খানের লোকও হয়তো যায়নি ওখানে।

হাঁচড়ে এগোল রানা, মাথার উপর থম মেরে বসে আছে ঠাণ্ডা ইঞ্জিন। মাউন্টগুলো বাধা দিচ্ছে। পিছলে আগে বাড়ল ও, বাম হাতে টর্চ রেখেছে, আলো ফেলল। ওর ডান মুঠো জোরে ঘসা লাগল একটা কণ্ডিউটে, সঙ্গে সঙ্গে তিনটে গাঁট রক্তাক্ত হয়ে গেল। এক সেকেণ্ড থেমে আবারও এগোল রানা, ঘুপচির মধ্যে গিয়ে থামল। জায়গাটা তেল-ধুলো ভরা। সামনে চওড়া মাউন্ট। দু'ফুট জায়গায় তেল-মবিল বেশি পড়েছে। ডান হাতে ওগুলো সরাল। কয়েক সেকেণ্ড পর হাতে ধাতব প্লেটের ঘসা লাগল। খানের লোক ভুলে এটা সরায়নি!

তিন মিনিট ধরে প্লেট পরিষ্কার করল রানা, সরিয়ে ফেলল সব গ্রিজ। টর্চ তাক করে দেখল ট্যাগে লেখা: মিটসুবিশি হেভি ইণ্ডাস্ট্রিজ। পনেরো ডিজিট আইডি নাম্বার জ্বলজ্বল করছে। সংখ্যাগুলো মুখস্থ করল রানা, পিছলে পিছিয়ে এল, দু'মিনিট কসরৎ করে ইঞ্জিনের তলা থেকে বেরিয়ে এল। বাঁ হাতে মিনি কম্পিউটার খুলে অন করল। আধ মিনিট পর নাম্বারটা ক্রস-রেফারেন্স করল।

নাকিমুচি প্রচুর তথ্য পাঠিয়েছে, জাপান সাগরে ওর যে ক'টা জাহাজ হারিয়েছে সেগুলোর ব্যাপারে সবই জানিয়েছে। ক্রুদের ডোশিয়ে আছে; ছবি আছে, রয়েছে জরুরি কম্পোনেন্টের সিরিয়াল নাম্বার। স্টাইলাস দিয়ে পনেরো ডিজিট লিখল রানা, ইঞ্জিনের জন্য আইকন দেখানো জায়গাটা বাছাই করল, সার্চ বাটন দাবাল। চার সেকেণ্ড পর জাহাজের নামটা দেখা গেল।

'নাকিমুচির জাহাজ,' বিড়বিড় করল রানা। 'একটা পাওয়া গেল।' হঠাৎ ঝটকা-ঝটকির আওয়াজ শুনতে পেল। ঠন-ঠনাৎ করে একটা পিস্তল মেঝেতে পড়ল। হোলস্টার ছেড়ে বেরিয়ে এল রানার ওয়ালথার।

'আপনি কে?' সোহেলের বিস্মিত কণ্ঠ শুনতে পেল।

'আর আপনি কে?' কড়া স্বরে বলল মেয়েটা। 'আপনি আমার পিঠে খোঁচা দিচ্ছেন! কব্জিতে ব্যথা দিয়েছেন!'

সোহেলের লাথি খেয়ে পিস্তলটা রানার দিকে এগিয়ে এল।

'কব্জি ভেঙে দিইনি সেটাই বেশি,' বলল সোহেল। 'রানা, এগিয়ে আয়। ওর পিস্তলটা তুলে নে।'

দশ সেকেণ্ড আগে কেউ দরজা পার হয়েছে, সরাসরি টর্চ মেরেছে রানার মুখে। সোহেল নিরাপদ। কোনও মেয়েকে বন্দি করেছে। কে সে? নিঃশব্দে দ্রুত পায়ে দরজার দিকে এগোল রানা, জানে বন্দিনীর পিস্তল কোথায় থেমেছে। পাঁচ সেকেণ্ড পর থামল, ওটা তুলে নিল। মেয়েটার মুখে টর্চ তাক করে চমকে গেল। একবার ওদিকের দরজা দেখল, তারপর টর্চ নিভিয়ে দিল।

'এহ্‌হে, ওরা আসছে!' বলল মেয়েটা, তার টর্চ এখনও জ্বলছে। রানার মুখে

আলো পড়ল।

ইঞ্জিন রুমে আরও দুটো দরজা আছে, ওগুলোর একটায় ম্লান বাতি। টর্চের আলো! ওই দলে কয়েকজন আছে। পায়ের আওয়াজ এগিয়ে আসছে।

তাদের একজন কর্কশ স্বরে বলল, 'আয়া। হামনে দেখা। চালিয়ে দেখাতে হ্যায়!'

পাঁচ

ঘড়িতে দেখেছে ফু-চুং, প্লেন ছয় ঘণ্টা পর ল্যাণ্ড করেছে। তারপর একটা শিপিং কণ্টেইনারে তুলেছে ওদের। স্টিলের বাক্সে আবারও বন্দি হয়েছে ওরা। বদ্ধ জায়গায় অপেক্ষা করেছে। একটা ট্রাক ওদের নিয়ে গেছে কোনও বন্দরে, জাহাজে তুলেছে কণ্টেইনার। ওরা দশ ঘণ্টার বেশি দাঁড়িয়ে আছে। জানে না কোথায় চলেছে। তবে আবহাওয়া এখন অনেক শীতল হয়ে গেছে। প্লেন ওদের ঘণ্টায় অন্তত পাঁচশো মাইল বেগে উড়িয়ে নিয়ে এসেছে। এই জায়গাটা বোধহয় উত্তর মোঙ্গলিয়া বা দক্ষিণ সাইবেরিয়া। সম্ভবত সীমান্ত এলাকা। এদিকে এমন কোনও বড় লেক নেই যেটা জাহাজ দিয়ে পার হতে হবে। ফু-চুং আন্দাজ করছে, ওরা আছে কামচাটকা পেনিনসুলা বা ওখোটস্ক সাগরে।

হঠাৎ কণ্টেইনারটা খুব জোরে নামানো হলো। ছিটকে পড়ল ওরা, কষ্টেসৃষ্টে আবারও উঠে দাঁড়াল। ফু-চুং কয়েক সেকেণ্ড পর টের পেল, কণ্টেইনারের দরজা খুলছে। দরজা খুলে গেল। এবার ও আস্ত নরক দেখতে পেল।

অন্ধকারে দূরে উঁচু পর্বত দেখা গেল। শৃঙ্গগুলো যেন কয়লার কালো সূক্ষ্ম কণা দিয়ে ঢাকা। সব ঝাপসা লাগল। দুর্বল লাগছে ওর, বারকয়েক চোখ পিটপিট করে আবারও পর্বতের দিকে তাকাল। ওদিকটা ভালভাবে দেখা যায় না। সৈকতের দিকে ফিরল। চারপাশে পড়ে আছে নুড়ি-পাথর। ওগুলো থেকে শুরু করে ক্রিকেট বল আকৃতির পাথরও আছে। একটার পর একটা ঢেউ সৈকতে ফিরে আসছে, ক্ষুদ্র পাথরগুলো নিয়ে টুশ-টাশ আওয়াজ তুলে খেলছে। সৈকতের ওপাশে শান্ত সাগর, যতদূরে দেখা যায় সব কালো। ঝড় আসবার আগে সাধারণত সাগর এরকম শান্ত থাকে।

সৈকতের পর উঠে গেছে টিলা, সেদিকে তাকাল ফু-চুং, মানুষের অমানবিক কষ্ট দেখে চমকে গেল, শিউরে উঠল। ওদিকে হাজারো মানুষ কাদার মধ্যে ব্যস্ত। কারও পরনে লুঙ্গি, কারও ধুতি, কারও সারং। অনেকের আবার কিছু আছে কি না বোঝা গেল না। নানান দেশের অসংখ্য মানুষ টিলার গায়ে পিলপিল করছে, বেশিরভাগই এশিয়ান। ওরা খাটতে খাটতে শেষ হয়ে যাওয়া মানুষ। প্রাণ আছে, কাজেই তাদের খাটতে হবে। টলতে টলতে কাজ করে চলেছে।

এদিকের ঢালে আছে খেতে না পাওয়া অন্তত দু'হাজার মানুষ। সশস্ত্র প্রহরীরা তাদের পাহারা দিচ্ছে।

একদল মানুষ একসারিতে টিলার উপরে উঠছে, হাতে এখন খালি বাকেট। আরেকদল মাথায় তুলে বাকেট নিয়ে নেমে আসছে, ভিতরের জিনিস পৌঁছে দেবে নীচে। টিলার চুড়ো থেকে দুশো ফুট নীচে কাজে ব্যস্ত একদল, তারা কোদাল দিয়ে কাদা তুলছে, বাকেট ভরছে। সবাই যেন যন্ত্র, একই কাজ বারবার করছে, একটানা। মাটি খুঁড়ে তুলছে, খালি বাকেট ভরে দিচ্ছে, আরেক দল ওগুলো মাথায় নিয়ে নেমে আসছে। টিলার আরও উপরে অন্য এক দল ওয়াটার ক্যানন নিয়ে ব্যস্ত। অনেক উপরের গ্লেশিয়ার থেকে নেমে আসছে পানি, একটা পুকুর কেটে ধরা হয়েছে ওই পানি, সেখান থেকে নেমে এসেছে অসংখ্য মোটা হোস পাইপ। মাধ্যাকর্ষণের কারণে দ্রুত নামছে পানি, ক্যাননের মুখ দিয়ে বিস্ফোরণের মত বেরুচ্ছে। এসব ক্যাননের চালকরা উপরের ঢালে পানি ছুঁড়ছে। পানির তীব্র স্রোত মাটি সরিয়ে নামিয়ে আনছে।

বাড়তি পানি টিলা বেয়ে নামছে, চারপাশের মাটি ভিজে উঠছে। ওখানে সাবধান না হলে পা পিছলে পড়তে হবে। কয়েক সেকেণ্ড বোকার মত চারপাশ দেখল ফু-চুং, বিশ্বাস করতে পারল না কী ঘটছে। তারপর হঠাৎ দেখতে পেল ঢাল বেয়ে নেমে আসছে তুমুল পানি ও কাদা! উপরের টিলায় যারা আগেই সাবধান হয়নি, তারা ওয়াটার ক্যাননের তীব্র স্রোতে ভেসে গেল—ডিগবাজি খেয়ে টিলা থেকে নীচে পড়তে লাগল। অনেকে দ্রুত লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল, অনেকে উঠল ধীরে ধীরে। শেষ পর্যন্ত শুধু একজন আর উঠল না। কাদার তলায় চাপা পড়েছে সে।

সেদিকে কেউ তাকাল না, সবাই অনেক আগেই এসব মেনে নিয়েছে।

শ্রমিকরা একরের পর একর জুড়ে কাজ করছে, মাথার উপরে ক্যামোফ্লেজ নেটিং। ওগুলো ধূসর, কালো, বাদামি—দেখতে ঠিক চারপাশের জমির মতই। আকাশ থেকে শ্রমিকদের দেখা যাবে না। স্রষ্টাই জানেন, এখানে কী ঘটছে গোপনে!

সৈকতের কাছে দাঁড়িয়ে আছে ফু-চুং, দলের সবার মত বোকা হয়ে কাণ্ড দেখছে। শ্রমিকদের চোখে তাড়া খাওয়া দৃষ্টি, বাকেট নিয়ে আসছে তারা, মেকানিকাল স্লুইস বক্সে কাদা ঢালছে। এসব যন্ত্রপাতি একশো বছর আগে আবিষ্কার হয়েছে, কিন্তু এখনও একই কাজে লাগে। লম্বা একটা যান্ত্রিক টেবিলে কাদা নামিয়ে দেয়া হচ্ছে, মৃদু মৃদু ঝাঁকি খেয়ে কাদা সামনে বাড়ছে। ট্রাওফের তলায় আছে ব্যাফল্‌স্, সেটা ভারী ধাতু আটকে রাখছে, ধুয়ে সরিয়ে দিচ্ছে কাদা। ওগুলো বাক্সের শেষ মাথায় পৌঁছে সোজা সাগরে গিয়ে পড়ছে। কাদা ওদিকের স্রোতে গিয়ে মিশছে, সাগর ওদিকটায় বাদামি হয়ে উঠেছে তার ফলে। ব্যাফল্‌স্ কাজ করছে, ধাতু জমিয়ে পরে তুলে নেবে। ওগুলো আরও ভালভাবে শোধন করা হবে।

একদল লোক যান্ত্রিক টেবিল থেকে শুরু করে সৈকতের কাছের এক বিল্ডিং পর্যন্ত দাঁড়িয়ে আছে, তারা হাত বদলে বাকেট পৌঁছে দিচ্ছে। সাগর ও সৈকতের শেষপ্রান্তে আছে একটা সমতল বার্জ, জিনিসটা সাধারণত সাগরে কাজে লাগানো হয়। ফু-চুং ধারণা করল, ওখানে আছে প্রসেসিং প্ল্যান্ট। ইচ্ছে করলে বার্জটা

সাইট থেকে সরিয়ে নেওয়া যায়। ওটার একপাশের দেয়ালে একটা মোটা চিমনি, ওখান থেকে সাদা ধোঁয়া উড়ছে। যে জিনিস শোধন করা হয়, সেটার জন্য তাপ লাগে।

প্রহরীরা চারপাশ থেকে সবাইকে ঘিরে রেখেছে। প্রহরীদের পরনে উলের পুরু প্যান্ট ও জ্যাকেট। পায়ে হাঁটু সমান বুট। কাদায় হাঁটবার জন্য মোটা রাবার দিয়ে তৈরি সোল। সবার হাতে গ্লাভ্, কাঁধে ঝুলছে একে-ফোরটিসেভেন। বামহাতে মুগুর বা খাটো চাবুক। টিলার উপরে প্রহরী কম, বেশিরভাগ দায়িত্ব পালন করছে মাইনিং প্রসেসিঙের আশপাশে। চারজন করে প্রহরী প্রতি বারোটা স্লুইস বক্সে চোখ রাখছে। বাকেটওয়ালা দশজন শ্রমিকের জন্য একজন করে প্রহরী। চাবুকগুলো কিলবিল করছে, মাঝে মাঝে শ্রমিকদের পিঠে পড়ছে। তাদের ফাঁকি দেওয়ার পথ নেই।

মাইন প্রসেসিং বিল্ডিং ঘিরে রেখেছে কাঁটাতার দিয়ে। ওটার কাছে থেমে আছে একটা ট্র্যাকওয়ালা বাহন, দেখে মনে হলো ওটা আর্কটিক স্নো ক্যাট। আরও ওপাশে আছে একটা ক্রুজ শিপ। একসময় ওটা সাগরগামী জাহাজ ছিল, কিন্তু এখন ডেবে গেছে সৈকতে।

শ্রমিকদের আটকে রাখা কাঁটাতারের এপাশের সৈকতে আছে আরও কিছু জাহাজ। ওগুলো ছোট ক্রুজ শিপ, এখন সৈকতে গেঁথে গেছে। দেখলে অবাক হতে হয় ওগুলো কী করে সাগর পেরিয়ে এসেছে! ওগুলোর চারপাশে প্রচুর পাথর দিয়ে দেয়াল তৈরি করা হয়েছে, মাঝখানে জাহাজ আটকা পড়েছে। ডেকের উপর ঝুলছে ক্যামোফ্লেজ নেটিং, চারপাশ থেকে জাহাজ ঢেকে রাখা হয়েছে।

ফু-চুং আন্দাজ করল, ওই জাহাজগুলো আসলে শ্রমিকদের বসতি। চিন্তা আসতেই নিজেকে শুধরে নিল—এখানে কোনও শ্রমিক নেই। এখানে যা ঘটছে তার সঙ্গে শ্রমের কোনও সম্পর্ক নেই। সবাই এখানে ক্রীতদাস, বিশ্রী এই পরিবেশে কাজ করে করে মারা পড়বে।

দুনিয়ায় খুব কম জিনিস আছে যার জন্য মানুষ এত লোভী হয়ে উঠতে পারে। ওর মন বলে দিল, এরা নিরীহ মানুষ মারছে সোনার খনি পেয়ে!

খনি থেকে সোনা তুলে মারকিউরি দিয়ে শোধন করা হচ্ছে! মারকিউরি দুনিয়ায় একমাত্র জিনিস, যেটা দিয়ে সোনা পুরোপুরি পরিষ্কার করা যায়। সোনার মাইক্রোপার্টিকল্স্ একত্র হলে তখন প্রচণ্ড তাপ দিয়ে মারকিউরি উড়িয়ে দেয়া হয়, থাকে শুধু থকথকে খাঁটি সোনা।

আধুনিক স্মেলটারগুলো মারকিউরি আটকে রাখে, ঘন করে আবারও ব্যবহার করে। এমন ব্যবস্থা রাখা হয় যেন ভয়ানক এই বিষাক্ত ধাতু শ্রমিকের ক্ষতি না করে। কিন্তু ওই টিলায় সবাই চরম ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে, বারবার রিফাইনারিতে গেছে, মারকিউরির বাষ্পে শ্বাস নিয়েছে। মারকিউরি দুনিয়ার অন্যতম কড়া বিষ।

এই প্রকাণ্ড যজ্ঞ মাত্র কয়েক সেকেণ্ড ভালভাবে দেখতে পেল ফু-চুং, তারপরই বিশ্রী গালি শুনল। ওদের দলের সবাইকে একটা লাইনে দাঁড় করানো হচ্ছে। এক গার্ড ওর ঘাড় ধরল, গলায় সরু একটা চেইন পরিয়ে দিল। ওটা থেকে ঝুলছে একটা ট্যাগ। ওকে একটা আইডেনটিফিকেশন নাম্বার দেয়া হয়েছে। আরেক গার্ড

নাম্বারগুলো খাতায় তুলে নিল। এবার ওদের দলের সবাইকে তাড়িয়ে নেয়া হলো সামনে, তোলা হলো একটা বিধ্বস্ত ক্রুজ লাইনারে। ওদের জন্য কেবিন দেয়া হয়েছে। ভিতরে শীতল পরিবেশ, কোনও চুলো নেই। মেঝেতে পড়ে আছে বাঙ্কের গদি, ওখানে ঘুমাতে হবে। কেবিনগুলো তৈরি করা হয়েছে দু'জন যাত্রীর জন্য, কিন্তু ওখানে থাকতে হবে দশজনকে। দুর্গন্ধের তীব্রতায় বোঝা গেল জাহাজের প্লামিং কাজ করে না। শীত ঠেকাবার কোনও উপায় নেই এখানে, শ্বাস ফেললেই চোখের সামনে কুয়াশা তৈরি হচ্ছে। প্রতি বাঙ্কে আছে একটা করে কাদা-ভরা ব্ল্যাঙ্কেট। কুয়াশার কারণে ম্যাট্রেসগুলো ভিজে আছে। ক্রীতদাসরা গা মুছে নেবে আশপাশে সেরকম কোনও জায়গা নেই। তারা কাজ শেষে জাহাজে ফিরে বিছানায় শুয়ে পড়ে, ভেজা-কাদামাখা শরীরে পড়ে থাকে। ইতিমধ্যে বিদেশে চাকরির নমুনা টের পেয়ে গেছে সবাই।

এক প্রহরী ফু-চুংকে ঠেলে বের করে আনল কেবিন থেকে, দলের সবার সঙ্গে চলল ও। দেখিয়ে দেয়া হলো কোথায় বসে খাবার খেতে হবে। একসময় জায়গাটা ছিল ক্রুজ শিপের মেইন ডাইনিং রুম। এখন আর আসবাবপত্র বা কোনও অর্নামেন্টেশন নেই। সবাইকে শীতল ধাতব মেঝেতে বসে খেতে হবে। ওদের একটা লাইনে দাঁড় করানো হলো, একটা করে নোংরা বাসন দেয়া হলো। ওগুলো পড়ে ছিল এক কোণে। এবার কাজে লাগবে। এক লোকের বামহাতে স্লিং দেখল ফু-চুং, সে-লোক ডানহাতে এক হাতা ভাত বেড়ে দিল। এর পাশে আছে আরেক পঙ্গু লোক, তার সামনে একটা বিরাট ড্রাম। লোকটা বড় এক চামচ ভরা লালচে-ধূসর আঠালো কী যেন বাসনে তুলে দিল।

পাঁচ মিনিট পর সরে এসে মেঝেতে বসল ফু-চুং। হালুয়ার মত জিনিসটা প্রায় ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, স্বাদ এতই খারাপ যে মনে হলো বমি হয়ে যাবে। বোধহয় কোনও মাছ। আঁশটে গন্ধ। রান্নার আগে ধোয়া হয়নি। সুপের মধ্যে মাছের কাঁটা। গলায় ঠেকল। বাসনে রাখল। ফু-চুং ভাল করেই জানে, খেতে যেমনই হোক, খেতে হবে, নইলে দ্রুত দুর্বল হয়ে পড়বে সে।

কিছুক্ষণ পর এক প্রহরী ধমক দিয়ে উঠল, 'শোন্, শালারা!'

তার পাশে আছে আরেকজন, সে বলল, 'তোরা নতুন এসেছিস বলে আগেই খেতে পেলি। এখন থেকে মনে রাখবি, তোদের কাজের শিফ্‌ট্ শেষ হলে তখন খেতে পাবি।'

লোকটা ম্যাণ্ডারিন ভাষায় কথা বলল, কিন্তু মনে হলো চিবিয়ে চিবিয়ে বলছে। দেখতে এরা উপমহাদেশীয়দের মত। ফু-চুং জানে না এরা কোন্ দেশি। পাকিস্তানি, ভারতীয়, বাংলাদেশি? শীঘ্রি জানা যাবে।

খাওয়া শেষে এ-দলের সবাইকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হলো। প্রথমবারের মত ফু-চুং টের পেল, সাগর থেকে উঠে আসছে কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস, হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে। হাওয়ায় ভাসছে ছাইয়ের সূক্ষ্ম কণা। ছাই সম্ভবত আগ্নেয়গিরি থেকে এসেছে। এখন ও নিশ্চিত, ওরা আছে কামচাটকা পেনিনসুলায়। প্রহরীদের নির্দেশ শোনা গেল। ওদের দলের সবাইকে একটা করে বাকেট ধরিয়ে দেয়া হলো, বলা হলো সোজা টিলায় গিয়ে উঠতে হবে। ফু-চুং জানে, আজ থেকে ওর কাজ শুরু।

পরবর্তী দেড় ঘণ্টায় সাত বার টিলায় উঠল ও। একটু বিশ্রাম নেয়ার পথ নেই। ষোলো বার নামবার সময় উরুতে চাপড় দিল ও। ওখানে চামড়ার নীচে আছে ফারার বসানো হোমিং ডিভাইস।

ও আছে মার্ভেল থেকে অনেক দূরে, তবুও মনে হলো কাছেই আছে। বড়জোর দু'দিন, তারপর রানা ওর কমাণ্ডো দল নিয়ে হাজির হবে, ওকে এই দোজখ থেকে উদ্ধার করবে। আর বড়জোর দুটো দিন!

রাতে জাহাজে ফিরে খাওয়া সেরে নিল, কেবিনের আর সব বন্দির সঙ্গে আলাপ হলো। জাহাজে ইলেকট্রিসিটি নেই, কাজেই অন্ধকারে শুয়ে আছে ওরা। সবার কাহিনি একটু এদিক-ওদিক, কিন্তু বাকি ঘটনা সব এক। এই মানুষগুলো আদম-ব্যাপারিদের কাছে গিয়েছিল, তারা ওদের কণ্টেইনারে তুলে দিয়েছে। স্নেকহেডের নেতা তাদের কাছ থেকে পুরো টাকা নিয়েছে, বলেছে তাদের জাপানে পৌঁছে দেবে। কিন্তু কণ্টেইনার খোলার পর তারা দেখল, এখানে এই নরকে হাজির হয়েছে।

'আপনি আছেন কতদিন ধরে?' জানতে চাইল ফু-চুং।

পাশের বাঙ্ক থেকে ক্লান্ত, হতাশ একটা কণ্ঠ বলল, 'সারাজীবন ধরে।'

'ঠাট্টা না, কতদিন?'

'পুরো চার মাস,' বলল লোকটা। বাঙ্কের ভেজা গদিতে একটু সরে বসল সে। 'তবে এই খনিতে কাজ হচ্ছে আরও অনেক আগে থেকে।'

'কেউ পালাতে চায়নি?'

'যাবে কোথায়?' জবাব দিল আরেকজন। 'সাঁতার কেটে তো সাগর পার হতে পারবে না। পানি এত ঠাণ্ডা! ট্রলারগুলো মাছ ধরে ফিরে আসে, কিন্তু সর্বক্ষণ ওখানে থাকে সশস্ত্র গার্ড। পাহাড় তো দেখেইছেন। গার্ডরা পাহারা দিচ্ছে। যদি গার্ডদের ফাঁকিও দিই, যাব কোথায়? এই ঠাণ্ডায় একদিনও তো টিকব না।'

'আমরা আসলে ক্রীতদাস, মরলে বেঁচে যাব,' বলল তৃতীয় এক লোক। 'যখন চিন ছাড়ব বলেছি, তখন থেকে ওরা আমাদের কিনে নিয়েছে। আমরা খাটতে খাটতে মারা পড়লে ওদের কী? আমরা জাপানের কোনও টেক্সটাইল মিল-এ থাকি, বা নিউ ইয়র্কের কোনও সোয়েট-শপে থাকি—আমরা সবসময় চাকর। ঈশ্বর আমাদের বানিয়েছে এমন করে। আমরা খেটে মরব, তারপর একদিন মারা যাব—সেদিন সত্যিই মুক্তি। আমি আছি এখানে দশ মাস ধরে। এই কেবিনে আগে যারা ছিল তারা এখন আর নেই, মারা গেছে। বন্ধু, আপনি যেই হোন, স্বপ্ন দেখতে পারেন, কল্পনা করতে পারেন পালাবেন—কিন্তু জানবেন, আপনার এখান থেকে মুক্তি নেই। একমাত্র মরলেই বাঁচবেন।'

ফু-চুং দ্বিধা করল, ও কি বলবে ওর কাজ এখানে কী? কেবিনের ভিতরে হাঁটছে দু'তিনজন, শরীরে কটা হাড় ছাড়া আর কিছু নেই। মনে হয় না খনির ম্যানেজার এদের কাউকে গুপ্তচর হিসেবে রেখেছে, কিন্তু কিছু বলা উচিত হবে না। এদের যা অবস্থা, এরা খানিকটা বাড়তি খাবার বা আরেকটা ব্ল্যাঙ্কেটের জন্য কী যে করবে বলা যায় না। বেচারাদের বাঁচবার আশা দিতে পারত ও, কিন্তু ওর ট্রেইনিং ওকে সাবধান করল—কিছু বলা উচিত হবে না। অতিরিক্ত ক্লান্তিতে ঘুম

আসছে ওর, শুয়ে পড়ল ভেজা বেডিঙে। প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছে, সারা শরীরে ব্যথা, ঘুমাতে চেষ্টা করল। ওর পাশের দু'জন একটু পর পর কাশছে। ওরা সারারাত কাশল। ওদের নিউমোনিয়া বা আরও খারাপ কিছু হয়েছে। বিশ্রী আবহাওয়ার সঙ্গে আছে বাজে খাবার, সামান্য শরীর খারাপ হলেই রোগ ধরে যাবে। এখানে ঠিক তা-ই ঘটছে।

তৃতীয় দিন ফু-চুং বুঝতে পারল আপাতত কেউ ওকে উদ্ধার করবে না। হাড়-ভাঙা পরিশ্রম, প্রচণ্ড শীত, কাজ শেষে ফিরে এসে ভেজা গদিতে পড়ে থাকা—আর কী করতে পারে ও! রানা যদি জানত ও এখানে আটকা পড়েছে, তা হলে নিশ্চয়ই কিছু করত। প্লেন ভাড়া করে চলে আসত, কোনও এয়ারপোর্ট থেকে হেলিকপ্টার নিয়ে আকাশে চক্কর দিত। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনও হেলিকপ্টার এই এলাকার উপর দিয়ে যায়নি।

ফু-চুং চুপচাপ সবার সঙ্গে কাজ করে চলেছে, ও যেন একটা পিঁপড়ে, শুধু সহজাত প্রবৃত্তির বশে অনুসরণ করছে সামনের জনকে। মন থেকে সব চিন্তা দূর করে দিয়েছে, টিলা থেকে বাকেট ভরা কাদা নামিয়ে আনছে, আবার বাকেট নিয়ে উঠছে উপরে। এখানে বাঙালি, চাইনিজ, ইণ্ডিয়ানে তফাৎ নেই কোনও।

এরইমধ্যে জুতো হারিয়েছে ও, গতকাল থেকে শুনছে জোরে শ্বাস টানলে ফুসফুসে কেমন বিশ্রী খড়খড় আওয়াজ হচ্ছে। এই দলের অন্যদের তুলনায় অবশ্য অনেক ভাল আছে ও। ওদের কেবিনের দু'জন ইতিমধ্যে মারা গেছে। একজন মারা গেছে কাদার অ্যাভালাঞ্চে। দ্বিতীয়জন বাংলাদেশি, তাকে পিটিয়েছিল এক গার্ড। বেচারার কান ফেটে গেল, চোখ-কান দিয়ে প্রচুর রক্ত গেল, সবার চোখের সামনে ধড়াস্ করে পড়ে মারা গেল।

পঞ্চম দিন সকালে ফু-চুং কোনও দোষ না করেও মার খেল। ওকে চাবুক দিয়ে পেটানো হলো। এ থেকে দুটো ব্যাপার বুঝে নিল ফু-চুং। এক, ওর উরুতে বসে থাকা বার্স্ট্ ট্র্যান্সমিটার কাজ করছে না। দ্বিতীয় কথা, কেউ এখান থেকে উদ্ধার করবে না, এখানেই ধুঁকে ধুঁকে মরতে হবে ওকে।

ঠিক করল, তার আগে কোনও গার্ডের রাইফেল কেড়ে নেবে, মরার আগে যে কটা গার্ড পাবে, সঙ্গে নেবে।

ষষ্ঠ ভোররাতে ওদের সবাইকে বাইরে নেয়া হলো। শীতে থরথর করে কাঁপল ওরা। সাগরে বিশাল একটা জাহাজ দেখতে পেল। ওটা উপসাগরে ঢুকল। ওদের তাড়িয়ে সৈকতে নামানো হলো। ফু-চুং জাহাজ দেখে বুঝতে পারল, ওটা কোনও ফ্লোটিং ড্রাই-ডক, তবে ওর ধারণা হলো ওটা দ্য চুহা। কিন্তু বাস্তবে ওটা সিস্টার শিপ, দ্য চুহি। এত দূর থেকেও প্রচণ্ড দুর্গন্ধ এল, কালো জাহাজটার ভিতরে কী আছে কে জানে! এক ঝাঁক সিগাল ওটার খোলা পোর্টহোলের বাইরে উড়ছে, নরমাংসের টুকরো তুলে নিয়ে দূরে চলে যাচ্ছে।

এক গার্ড পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ফু-চুঙের কিডনিতে ব্যাটনের খোঁচা দিয়ে গেল। তীব্র ব্যথা পেয়ে চমকে গেল ও। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল, ওই জাহাজ আসলে ক্রীতদাসদের বাহন। যত শ্রমিক মারা গেছে, বা অসুস্থ হয়ে অতি দুর্বল হয়ে পড়েছে, তাদের বদলে নতুন দাস আনা হয়েছে। ও জানে না এভাবে কত

মানুষ হারিয়ে গেছে, কতজন মরেছে, তবে আন্দাজ করতে পারে,. উৎসাহী দেশত্যাগীরা নতুন করে জীবন গড়তে আসে এখানে।

বদলে কী পায়?

মৃত্যু?

একই কেবিনের এক যুবক বলল, 'এভাবেই আমাকে লোভ দেখিয়ে এনেছে ওরা।' এর নাম হুয়েং, ফু-চুঙের সঙ্গে খাতির হয়ে গেছে তার। দু'জন পিচ্ছিল টিলা বেয়ে উঠছে এখন। হুয়েং বলেছে চার মাস হলো সে এখানে আছে। কাঠির মত চিকন এক যুবক, পাঁজরের সবকটা হাড় বেরিয়ে এসেছে খেতে না পেয়ে। বয়স মাত্র সাতাশ বছর, কিন্তু দেখলে মনে হয় ষাট। 'আমাদের একটা পুরানো জাহাজে তুলে দিয়েছিল, তারপর ওই জাহাজটা গিলে ফেলল আরও বড় একটা জাহাজ। ওই যে বিরাট জাহাজটা দেখতে পাচ্ছ, হয়তো ওটাই ওখানে ছিল। যতদিন বাঁচব মনে পড়বে ওখানে কেমন অবস্থায় ছিলাম। এখানে যে কাজ করি তার চেয়ে ঢের খারাপ কাজ করতে হয়েছে তখন।'

কাদা দিয়ে বাকেট ভরে নিল ওরা, ফিরতি পথ ধরল। অনেক নীচে স্লুইস বক্সগুলো, বাকেট ওখানে পৌঁছে দিতে হবে। নামবার সময় দেখল, ড্রাই-ডকের ভিতর থেকে একটা জং-ধরা জাহাজ বেরিয়ে আসছে। ওটার ডেকে ক্রীতদাসরা কাজে ব্যস্ত, ভারী কী যেন বস্তার মত পানিতে ফেলছে।

'লাশ,' বলল হুয়েং। 'আমাকে দিয়ে ওই কাজ করিয়েছে ওরা। জাহাজে করে আসবার সময় যত মানুষ মারা গেছে, তাদের লাশ ফেলে দিয়েছে।'

'সে-সময় কতজন মারা গেছে?'

'একশো, বা আরও বেশি। আমার নিজের দুই চাচাতো ভাইয়ের লাশ ফেলতে হয়েছে আমাকে। ওরা আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল।'

হাঁটবার গতি কমাল না হুয়েং, তবে ফু-চুং টের পেল মানুষটা স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে কেঁপে গেছে।

'ওই জাহাজটা কী সৈকতে ভিড়িয়ে দেবে?' বলল ও। 'ওখানে আরও শ্রমিক রাখবে?'

'প্রথমে ওরা জাহাজের চারপাশে পাথরের দেয়াল তৈরি করবে, তারপর জাল পাতবে। ওটা আর আকাশ থেকে দেখা যাবে না।'

'কিন্তু সাগর থেকে সবই দেখা যাবে।'

মাথা নাড়ল হুয়েং। 'সাগরের এই এলাকায় আছে শুধু দুটো ট্রলার, গত চার মাসে ওগুলো ছাড়া আর কোনও জাহাজ দেখতে পাইনি। আমরা বোধহয় সব জাহাজের পথ থেকে অনেক দূরে। কেউ এখানে আসে না।'

স্লুইস বক্সের কাছে চলে গেছে ওরা, কিন্তু পরমুহূর্তে ফু-চুঙের মনে হলো কেউ ওর পায়ের তলা থেকে কার্পেট সরিয়ে নিয়েছে। থতমত খেল ও, ধুপ্ করে পড়ে গেল। চোখ তুলে দেখল অন্তত একশো শ্রমিক পড়ে গেছে। হঠাৎ মাটি কেঁপে উঠল, থরথর করে কাঁপছে সব।

ঘটনা বুঝে ওঠার আগেই ভূমিকম্প থেমে গেল। কানে তালা লেগে গেল প্রচণ্ড গর্জনে। মনে হলো অনেক দূর থেকে বজ্রের আওয়াজ ভেসে এল।

উঠে দাঁড়াল ফু-চুং, কাদা-মাখা কাপড় ঝেড়ে পরিষ্কার করতে চাইল। দশ সেকেণ্ড পর দূরের পর্বতের দিকে তাকাল। ওদিকেই তাকিয়ে আছে আর সবাই। পর্বতের মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড চূড়া আকাশ ছুঁয়েছে, ওখান থেকে কালো ছাই ও বাষ্প ছিটকে উঠছে। চূড়ার মাথার উপরে নিকষ কালো মেঘ জমেছে, দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। শীঘ্রি সূর্য ঢেকে ফেলল। চূড়ায় বারবার যেন বজ্রপাত হলো! মনে হলো ওখানে সেইন্ট এলমোর আগুন জ্বলে উঠেছে, এদিক-ওদিক ছুটছে।

তারকাঁটা দিয়ে ঘেরা প্ল্যান্টের দরজা খুলে গেল, এক লোক ছিটকে বেরিয়ে এল, দৌড়ের উপরে গ্যাসের মুখোশ পরে নিল। এখানে আসবার পর ফু-চুং প্রথমবারের মত কোনও শ্বেতাঙ্গ দেখল।

'ও-ই গিলবার্ট ওয়ালজ্যাক,' বলল হুয়েং। ফু-চুং দেখল, একদল প্রহরী ওদের দিকে ছুটে আসছে। 'খনির ম্যানেজার।'

গিলবার্ট ওয়ালজ্যাক শক্তপোক্ত ধরনের লোক, কাঁধ দুটো অতিরিক্ত চওড়া, চেহারায় প্রচণ্ড পরিশ্রমের ছাপ, হাতের পাঞ্জা কোদালের মত বড়। ফু-চুং ও হুয়েঙের কাছাকাছি এসে থামল সে, নতুন জেগে ওঠা আগ্নেয়গিরি দেখে নিয়ে কোমরের খাপ থেকে স্যাটালাইট ফোন বের করে নিল, অ্যান্টেনা উঁচু করে নিশ্চিত হলো সিগনাল আছে, তারপর ডায়াল করল।

'মিস্টার সরোকিন, আমি গিলবার্ট,' ইংরেজিতে বলল সে। কণ্ঠে দক্ষিণ আফ্রিকার টান। কথা শুনছে সে, তারপর বলল, 'আপনি যে পেদ্রোপাভলোভস্ক থেকে কাঁপুনি টের পেয়েছেন, তাতে অবাক হচ্ছি না। আমরা সবাই ভয় পেয়েছি। কিন্তু তার চেয়েও খারাপ খবর আছে, সেইজন্যেই ফোন করেছি—আমাদের টিলার ওপাশে যে পাহাড়টা ছিল, সেটা এখন আগ্নেয়গিরি, জেগে উঠেছে।' ওদিকের কথা শুনল সে। 'হ্যাঁ, আমরা আগেও এ নিয়ে আলাপ করেছি। এখন চোখের সামনে বিরাট লালচে মেঘ দেখতে পাচ্ছি। ওগুলো ছাই আর বাষ্প দিয়ে তৈরি। হ্যাঁ, তা-ই। আগ্নেয়গিরি লাভা ছুঁড়লে আমরা শেষ।'

তার কথা শেষ হতে না হতে প্রকৃতি যেন জানিয়ে দিল যে-কোনও সময় লাভা উদ্গিরণ করবে। জমি মৃদু কাঁপতে লাগল। 'ভালভাবে টের পাচ্ছেন নিশ্চয়ই, মিস্টার সরোকিন?' টিটকারির সুরে বলল ওয়ালজ্যাক। 'আপনি যতই নিশ্চয়তা দিন, ওসব কথার কোনও দাম নেই। আমার পোঁদে আগুনের আঁচ লাগছে, আপনি তো বসে আছেন গিয়ে তিনশো মাইল দূরে হোটেলের কামরায়।'

কী যেন জবাব দিল সরোকিন। ওর কথা শুনবার ফাঁকে ঘুরে তাকাল ওয়ালজ্যাক। সঙ্গে সঙ্গে কাদার মধ্যে বাকেট চুবিয়ে দিল ফু-চুং, আশা করল লোকটা টের পায়নি সব কথা শুনছিল ও। 'হ্যাঁ, দ্য চুহি মাত্র ফিরেছে। ওরা এখন খানের জাহাজ থেকে শেষ চালানের মজুর নামাচ্ছে। ওদের কাজ শেষ হলে প্রথম চালান তুলে দেব। আপনার সঙ্গে তো কথা হয়েই আছে, এই সপ্তাহেই প্রথম চালান পাচ্ছেন।'

ভ্রূ কুঁচকে ফু-চুংকে দেখল সে। বাধ্য হয়ে হাঁটতে শুরু করল ও, তবে যতক্ষণ পারে শুনল। 'মারকিউরি স্মেলটারের কাজ আপাতত শেষ। আমাদের এখন উচিত প্রসেসিং প্ল্যান্ট সৈকত থেকে সরিয়ে দেয়া। আগ্নেয়গিরির অবস্থা

দেখি আগে, পরে দরকার পড়লে স্মেলটার জায়গায় ফিরিয়ে আনা যাবে। আপনার রাশান বন্ধুদের বলে দিন তারা যেন এখানে কোনও বিজ্ঞানী না পাঠায়। আগ্নেয়গিরি দেখার দরকার নেই। ওরা কিছু ঠেকাতে পারবে? বরং আপনি নিজে এসে অবস্থা দেখে যান। আমি এদিকে দেখছি, আমরা এখান থেকে কীভাবে সরে পড়তে পারি।' ম্যানেজারের কণ্ঠ চড়ে গেল, বোধহয় কথা শুনতে সমস্যা হচ্ছে। 'কী? হ্যাঁ? ওগুলো মরল কি না সেটা দেখতে যাবে কে! দ্য চুহি দিয়ে গার্ডদের সরিয়ে নেয়া যাবে। খান আরও জাহাজ দিতে পারবে। মরুক শালারা। প্রতিবছর এশিয়া থেকে দেড় লাখ বেরিয়ে আসছে। দরকার পড়লে আবারও লোক পাব। কাজ এক-দেড় মাস বন্ধ থাকবে, থাকল। আমাদের এখন যা রসদ আছে তা দিয়েই মিন্টার চলবে আরও... হ্যাঁ। ঠিক আছে, ঘণ্টা তিনেক পরে আপনার সঙ্গে সামনাসামনি কথা হবে।'

হুয়েং এগিয়ে গেছে, ধীরে ধীরে টিলার উপরে উঠছে। তাকে ধরে ফেলতে সময় লাগল না ফু-চুঙের। মাথার উপরের আকাশে আরও ঘন হচ্ছে মেঘ। ম্যানেজারের কথাগুলো শুনে ভাবনায় পড়ে গেছে ও। পিশাচটা নিজের লোকজন নিয়ে সরে পড়তে চায়, কিন্তু তা করবার আগে তাকে সরোকিন নামের এক লোকের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হচ্ছে। সে-লোক প্রভাবশালী কেউ, এমন একজন, যার দহরম-মহরম আছে রাশান সরকারের সঙ্গে। ইচ্ছে করলে সে ভলকানোলজিস্টের এখানে আসা ঠেকিয়ে দিতে পারবে। দক্ষিণ আফ্রিকান ম্যানেজার বলেছে এখনই সরে যাওয়ার সময়। ড্রাই-ডকের শক্তিশালী টাগ-বোট তাদের সরিয়ে নেবে। কথা থেকে এটুকু বোঝা গেছে, এরা ইতিমধ্যে প্রচুর সোনা সংগ্রহ করেছে। তাদের সবচেয়ে দামি জিনিস স্মেলটার প্ল্যান্ট, ওটা তারা সৈকত থেকে সরিয়ে নেবে। থাকবে শুধু ক্রীতদাসদের মরচে ধরা আস্তানাগুলো, ওসব জাহাজ বড়জোর লোহার দামে বিক্রি হতো। ওয়ালজ্যাক তো বলেছে ওদের মত মানুষের দাম নেই। প্রয়োজনে হাজারে হাজারে পাবে।

তিক্ত হয়ে গেল ফু-চুঙের মন। লোকটা ঠিকই বলেছে। এদের কাছে ওরা আসলেই মানুষ না। মানুষ আবারও পাবে এরা, ভাবছে কিছুদিন হয়তো কাজ বন্ধ রাখতে হবে—এর বেশি কিছু নয়।

আবারও ভূমিকম্প হলো। গলা শুকিয়ে গেল ফু-চুঙের। ওই আগ্নেয়গিরি সত্যিই লাভা উদ্গিরণ করতে পারে! যদি মাউন্ট সেইন্ট হেলেন্সের মত ভয়ঙ্কর উদ্গিরণ হয়? বিস্ফোরণ ঘটে? পালাবার পথ থাকবে না! কেউ বাঁচবে না! গত কয়েকদিন হলো কাজে মন দিয়েছে ও, জানে রানা ওকে খুঁজে বের করবে, কিন্তু তাতে অনেক সময় লাগবে। তবে তার আগে বেঁচে তো থাকতে হবে!

ওয়ালজ্যাক বা স্ট্যানিভের হাতে অনেক সময় আছে, কিন্তু ওর হাতে সময় কোথায়!

ছয়

'কপালের ওপরে ওটা কী উঠিয়েছ?' জানতে চাইল রানা। 'নাইট ভিশন?'

'হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন,' প্রায় নিঃশব্দে বলল মেয়েটা। 'আপনারা এ জিনিস সঙ্গে আনেননি?'

'আমাদের মনে হয়েছে দরকার হবে না,' তিক্ত সুরে বলল সোহেল। 'আলো নেভান, জুডি।'

টর্চ নিভিয়ে দিল জুডি স্টিভেনসন, ওটা কোমরে গুঁজল।

'পথ দেখাও,' জুডির কব্জি ধরল রানা, পিস্তলটা হাতে দিল। 'পরে লাগতে পারে। ধরো।'

ইঞ্জিন রুমে হাজারো পাইপ, জুডি টর্চ নিভিয়ে দেয়ায় যে-কোনও সময় হোঁচট খেয়ে পড়বে ওরা। মেয়েটা চোখে নাইট ভিশন আটকে নিল।

ওদিকের দরজায় শক্তিশালী টর্চের আলো। লোকগুলো এগিয়ে আসছে।

'সোহেল, আমরা এখান থেকে বেরিয়ে গেলে ওকে ডানপাশ থেকে কাভার দিবি,' বলল রানা। 'আমি ওর বাঁ পাশে থাকব।'

রানা ও সোহেলের মনে একই চিন্তা খেলছে। ওরা জাহাজে উঠেছে চল্লিশ মিনিটের বেশি, কেউ ওদের অনুসরণ করেনি। এর একটাই অর্থ, ওদের সঙ্গিনী কিছু একটা ভুল করে গার্ডদের সতর্ক করে তুলেছে। বুদ্ধিমানের কাজ হবে এখন আলাদা হয়ে যাওয়া। জাহাজের রেইলিং পর্যন্ত পৌঁছে গেলে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে। ডুব সাঁতার দিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু মেয়েটার কী হবে? ধরা পড়লে তো স্রেফ মরবে।

'জুডি, এগোও,' তাড়া দিল রানা।

ওরা একটা হ্যাচওয়ের কাছে চলে এসেছে, ঢুকে পড়ল পরবর্তী ঘরে। এটা স্টিয়ারিং গিয়ার রুম। ঘরটা পেরিয়ে এল ওরা, সামনে বাঁক নিয়েছে করিডোর। চলে এল এপাশে, হাঁটছে দ্রুত। পিছনে লোকগুলোর আওয়াজ নেই।

নিঃশব্দে বো-র দিকে চলেছে ওরা। রানা বলল, 'বলো তো তুমি কে? এমআই-সিক্স, নাকি রয়াল নেভি?'

একমুহূর্ত চিন্তা করে জবাব দিল জুডি, 'কোনওটাই না। আমি লণ্ডন লয়েড্স্-এর ফিল্ড ইনভেস্টিগেটর। ফ্রড ডিভিশনে আছি।'

জাপান সাগরের জাহাজ হারিয়েছে যারা, তাদের অনেকে লয়েডসের ক্লায়েন্ট, কাজেই ইন্স্যুরেন্স দাবি করছে—মিলছে ব্যাপারটা। লয়েড্স তদন্ত করতে পাঠিয়েছে জুডি স্টিভেনসনকে। মেয়েটা সে-জন্যই দুর্ভাগা অ্যাভালাঞ্চে ছিল। ওই জাহাজে বোধহয় ওর দলের আরও অনেকে ছিল, জলদস্যু ধরতে এসেছিল, জানতে চেয়েছিল কারা আছে জলদস্যুতার পিছনে। তবে বুঝতে পারেনি আধুনিক জলদস্যুরা অনেক বেশি সচেতন, অস্ত্রেশস্ত্রে অনেক শক্তিশালী। শেষে তাদের

মরতে হয়েছে, টিকে ছিল শুধু জুডি স্টিভেনসন।

'আর তোমরা?' জানতে চাইল জুডি। রানার দিকে চট্ করে তাকাল। 'রানা, তুমি বলেছ তুমি ভাঙা একটা ফ্রেইটারের ক্যাপ্টেন। কথাগুলো বিশ্বাস করিনি। তোমাদের অন্য কোনও পরিচয় আছে।'

রানা মুখ খুলবার আগে সোহেল বলল, 'এখন কথা বলার সময় আছে, সিস? দ্রুত পা চালান।'

মেয়েটার উপস্থিতি রানাকে বিরক্ত করে তুলেছে। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে: সামনে বিরাট বিপদ! রানা, এই ওয়্যারহাউস ছেড়ে পালাও! মার্ভেলের ডেকে উঠবার আগে থেমো না!

টর্চের ডায়াল ঘুরিয়ে নিল রানা, আলোটা হবে নেভা-নেভা মোমবাতির মত, তবে বহু দূরে যাবে—সামনে টর্চ তাক করল। জুডি চোখ থেকে নাইট ভিশন খুলে ফেলল, কাঁধের ব্যাগে ভরে রাখল। লম্বা এলো-চুল ক্যাপের ভিতরে গুঁজে নিল।

দু'বন্ধু ভাবছে মেয়েটা কী ধরনের ট্রেইনিং পেয়েছে, কে জানে! তবে ডুবে যাওয়া অ্যাভালাঞ্চে একা থেকেছে, বাঁচবার আশা ছাড়েনি—এ থেকে বোঝা যায়, হাল ছাড়বে না।

সোহেল ফেলে আসা করিডোর দেখল, হাতে উদ্যত ফেব্রিক ন্যাশনাল ফাইভ-সেভেনএন ডাবল অ্যাকশন অটোমেটিক।

সামনের করিডোরে টর্চের আলো ফেলল রানা। শেষমাথায় একটা মই, উঠে গেছে একটা ওভারহেড হ্যাচে।

একটু থমকে গিয়ে জিজ্ঞেস করল মেয়েটা, 'তোমরা নিশ্চয়ই জানো কী করা উচিত?'

'আমাদের প্ল্যানে তুমি ছিলে না,' বলল রানা। 'ভাবিনি তুমি পাকিস্তানি বন্ধুদের সঙ্গে আনবে। আপাতত গোলাগুলি এড়াতে চাই। ছাউনিতে ড্রেইগার রিব্রিদার রেখে এসেছি আমরা। তুমি ডাইভিং জানো?' দ্রুত মাথা দোলাল জুডি। 'তা হলে আমরা ড্রেইগার নিয়ে সাঁতার কেটে জাহাজে ফিরব।'

'এখনই না!' এক পা ঠুকল জুডি। 'এ জাহাজ কাদের জানার আগে যাব না!'

মেয়েটা চিবুক উঁচু করেছে, রানা এক সেকেণ্ড পর বুঝে গেল, এ কিছুতে যাবে না। 'এটা একটা জাপানি জাহাজ, নাম টায়ে-টায়ে,' বলল রানা। 'মালিককে চিনি। এ জাহাজ এখানে থাকার কথা নয়। জলদস্যুরা যখন অ্যাভালাঞ্চ ডুবিয়ে দিল, তার একটু আগে এটা দখল করেছিল। সে-সময় তুমি একটা ড্রাই-ডক দেখেছ। ওটার নাম দ্য চুহা। সেটা এই জাহাজ গিলে নেয়, পরে উগরে দেয়। আমরা জানতাম দ্য চুহা একটা জাহাজ নিয়ে আসছে।'

'কিন্তু কেন এই জাহাজ এখানে থাকার কথা না?'

শ্রাগ করল রানা। 'কারণ দ্য চুহার এখানে আসতে এখনও দু'দিন বাকি।'

জুডির চোখে দ্বিধা ফুটে উঠল। 'কথাটা বুঝতে পারলাম না।'

আরও বিরক্ত হয়ে উঠল রানা। দ্রুত এখান থেকে সরে যাওয়া উচিত, অথচ মেয়েটা একের পর এক প্রশ্ন তুলছে!

সোহেল বিড়বিড় করে কী যেন বলল। নিজের উপরে রেগে আছে ও, দোষ

দিচ্ছে নিজেকে—জলদস্যুরা ওদের ফাঁকি দিয়ে এখানে চলে এসেছে, অথচ ওরা জানেও না!

'আমরা একদিনের জন্য তাইওয়ানের তাইপেতে গিয়েছিলাম, তখন ওরা টায়ে-টায়ে সরিয়ে ফেলেছে,' বলল সোহেল। 'এদের একদল নাবিক এই জাহাজ চালিয়ে এখানে এনেছে। অথচ পরে আমরা ড্রাই-ডকের পিছু নিয়েছি আবারও।'

'এদিকে ওরা ছাউনিতে এনে জাহাজ কাটছে,' বলল রানা। 'রো-টা এরইমধ্যে কাটা হয়ে গেছে।' জুডির বাহু স্পর্শ করল ও। 'পরে খুলে বলব, এখন চলো। দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

হাতের ইশারা করল ও, একটু দ্বিধা করল সোহেল, তারপর পিস্তল হোলস্টারে ভরে মই বেয়ে উঠতে লাগল। হ্যাচের কাছে চলে গেল, হুইল ঘোরাল—ধাতব তীক্ষ্ণ আওয়াজ তুলে হ্যাচ খুলে গেল। সাবধানে হ্যাচ তুলল ও, পিস্তল হাতে বেরিয়ে এল। মই থেকে সরে এদিক-ওদিক দেখল। ঘরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। কোথাও কোনও আওয়াজ নেই।

ওর পরপর উঠল জুডি স্টিভেনসন। শেষে রানা।

'আমরা আছি মেইন ব্যালাস্ট কন্ট্রোল রুমে,' বলল রানা।

ক্রুরা পাম্প চালিয়ে এক ট্যাঙ্ক থেকে অন্য ট্যাঙ্কে ওজন সরিয়ে দিত, জাহাজের ভারসাম্য ঠিক রাখত। ও ভাবছে, ওরা যদি সাকশন ইনলেট খুঁজে পায়, হাল-এ একটা ব্রিচ পাবে—ওটার মাধ্যমে পানি ঢুকিয়ে জাহাজের ব্যালাস্ট বদলে দেয়া যাবে। কাজটা করতে হলে আগে সাকশান ইনলেট খুঁজতে হবে, খুলে দিতে হবে ইন্সপেকশন হ্যাচ। কিন্তু সাকশান ইনলেটে মোটা নেট না থাকলে? শেওলা বা বড় মাছ পাম্পে ঢুকতে পারবে। পাম্পের বারোটা বাজবে। এতে শুধু সময় নষ্ট হবে, কোনও কাজই হবে না।

মিনি কম্পিউটার অন অবস্থায় রেখেছে রানা, ডানহাতে তুলে নিল ওটা—টায়ে-টায়ের ব্লু-প্রিন্ট খুলল। খুদে স্ক্রিনে দেখা খুব কঠিন, দেড় মিনিট লাগল এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজে বের করতে।

'ঠিক আছে, সোহেল, জুডির ডানপাশ কাভার কর্,' বলল রানা। হাতের ইশারা করল, 'আমাদের পিছনে এসো, জুডি।'

এগোল না মেয়েটা। 'তোমরা ভদ্রতা করছ, নাকি দয়া?'

রানা কড়া কথা বলবার আগেই সোহেল বলল, 'ভদ্রতা বা দয়া নয়, মিলিটারি ট্রেইনিং পাওনি? রানা আর আমি কেভলার আর্মার পরেছি। ...তুমি?'

'না, পরিনি,' আড়ষ্ট স্বরে বলল জুডি, 'এগোও তোমরা।'

ব্যালাস্ট কন্ট্রোল রুমের বাইরের করিডোরে বেরিয়ে এল রানা ও সোহেল। জুডি আবারও গগলস পরেছে, কিন্তু কোনও আলো না থাকায় ওটা কোনও কাজে এল না। রানা একবার টর্চ জ্বেলে সামনে দেখল, তারপর নিভিয়ে দিল। ভাবছে, গার্ডরা এলে নিশ্চয়ই টর্চ জ্বালবে?

ঘরটা পেরিয়ে এল ওরা, সামনে পড়ল খাড়া মই। সোহেল অর্ধেক উঠে গেল, তারপর ফিসফিস করে বলল, 'রানা, ওপরে আলো।' সাত ফুট নেমে এল ও। 'তোর কম্পিউটারে অন্য কোনও পথ আছে কি না দেখ্।'

কম্পিউটার দেখবার সময় পেল না রানা, মইয়ের উপরের শেষপ্রান্ত পার হলো দু'জন রাইফেলধারী লোক, চলে গেল আরেক দিকে। তিন মিনিট পার হয়ে গেল, তারপর রানা ও সোহেলের পিছু নিয়ে উপরে উঠে এল জুডি। ততক্ষণে আলাপের শব্দ অনেক দূরে চলে গেছে। গলার আওয়াজ মিলিয়ে গেল।

ওরা আছে এখন মেইন ডেকের নীচে। একবার উপরে উঠলে রেইলিং পার করে নেমে পড়বে, রিব্রিদার নিয়ে পানিতে ডুব দেবে। মুদাস্‌স্‌র খানের লোকজন ওদের খুঁজে পাবে না।

হলওয়ের ওপাশে হঠাৎ অস্ত্রের যান্ত্রিক আওয়াজ পাওয়া গেল, এইমাত্র অস্ত্র কক্ করা হয়েছে। জুডির পাশে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে রানা, চট্ করে মেয়েটাকে ধরে বসিয়ে দিল ও। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ডেকের সব ক'টা বাতি জ্বলে উঠল। রানা-সোহেল প্রতিপক্ষকে চমকে দিতে চাইল, টার্গেট পাওয়ার আগেই দুটো করে গুলি করল। আশা করল, শত্রুরা দ্বিধায় পড়বে। লোকগুলোর অ্যাম্বুশ থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। একবার গুলি ছুঁড়ল জুডি। ওর পিস্তলটা নাইন এমএম, সাইলেন্সার সঙ্গে নেই—ওটার আওয়াজে মনে হলো বদ্ধ জায়গায় কামান গর্জে উঠল।

'মই বেয়ে নেমে যা, সোহেল,' চিৎকার করল রানা, পরমুহূর্তে বুঝতে পারল, তা সম্ভব নয়। মইয়ের নীচ থেকে পাল্টা গুলি করা হচ্ছে। কানের পাশ দিয়ে গুলি চলে যাচ্ছে। মাযলের আগুন ওদের মুখের কাছে চলে আসছে, যে-কোনও মুহূর্তে কানে ঢুকবে গুলি।

মইয়ের পাশে ঘুরে বসল সোহেল, ফোকরে হাত ভরে দিল, পিস্তল নীচে তাক করে চারবার গুলি করল। চিৎকার করে উঠল কেউ, ধুপ করে নীচে পড়ল। একটা অস্ত্র মেঝেতে খটাংখট করে পড়ল। ওই লোকের সঙ্গী আছে, পাল্টা ব্রাশ-ফায়ার করল সে।

সোহেলের পিস্তলের ব্যারেলে লাগল একটা, আরেকটা কনুইয়ের পিছনের চামড়ায়। প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়ে পিস্তল ছেড়ে দিল ও, অস্ত্রটা খসে পড়ল। হাতের ব্যথায় ওর মনে হলো পাগল হয়ে যাবে। বুলেট ওর কনুইয়ের চামড়া ছিঁড়ে নিয়েছে, আর কিছু না। গড়ান দিয়ে সরে গেল সোহেল, ক্রল করে প্যাসেজের একপাশে চলে এল।

কিন্তু অস্ত্র হারানো উচিত হয়নি। 'প্যাসেজের বাঁকের দিকে এগিয়ে যা, রানা,' বলল ও।

'মাঝখানে এগোও, জুডি,' দ্রুত বলল রানা।

তিনজন ক্রল শুরু করল, প্যাসেজ সামনে নব্বুই ডিগ্রি বাঁক নিয়েছে, চলে এল ওরা এপাশে। যারা অ্যাম্বুশ করেছে, তারা এখন সামনে-পিছনে। চিৎকার করে কী যেন বলল দু'জন।

'সালা, মার গ্যায়া! হুঁশিয়ার!'

'হাঁ-হাঁ! আগে বাড়ো!'

'সোহেল, সাবধান, পাশে থাক্,' ফিসফিস করে বলল রানা, ঘুরে বসে মিনি-কম্পিউটার বামহাতে নিল, আস্তে করে হলওয়ের মাঝখানে ছুঁড়ে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে একটা অটোমেটিক গর্জে উঠল। লোকটার মনে প্রাণের ভয় জন্মেছে। হল-এ

হাত বাড়িয়ে দিল রানা, পিস্তল মেঝের সামান্য উপরে রেখে পরপর তিনবার গুলি করল। ও সরে যেতে না যেতে জুডি একই কাজ করল, তবে রানার দেয়া সুযোগটা কাজে লাগাতে পারল। দুবার গুলি ছুঁড়ল। লোকটা ডেকে শুয়ে একে-ফোরটিসেভেন প্যাসেজের দিকে তাক করছিল, বুকে গুলি খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল। দ্বিতীয়জনকে দেখতে পেল রানা, লোকটা হলওয়ের আরও দূরে, রাইফেল তাক করছে। মাথা পিছিয়ে নিল ও। লোকটা ট্রিগার টিপল, হলওয়েতে গুলিবর্ষণ হলো। মুহূর্তে রাইফেলের ম্যাগাজিন শেষ হয়ে গেল।

জুডির হাত ধরল রানা, উঠে দাঁড়িয়ে টান দিল, ছুটল অ্যামুশ থেকে দূরে। পাশে ছুটছে সোহেল। এই মুহূর্তে ওদের লুকিয়ে থাকবার ইচ্ছে নেই। পিছনে লোকগুলো ওদের গুলি করবে। তার আগেই পালাতে হবে।

দৌড়ে প্যাসেজের কোনা আগে ঘুরল সোহেল। এক সেকেণ্ড পর চোখের কোণে নড়াচড়া দেখতে পেল। ওর মাথার উপরে নেমে এল রাইফেলের বাঁট। ধড়াস করে পড়ল ও। ওর বামে বেরিয়ে এল জুডি ও রানা। চোখের পলকে লোকটার নাকের ফুটোয় পিস্তলের ব্যারেল ঠেকাল রানা। গার্ড তখনও রাইফেল তুলে দ্বিতীয়বার তৈরি হয়নি, তার নাকের হাড় থ্যাচ করে বসে গেল, কার্টিলেজ মগজের ভিতরে ঢুকে গেল। কলাগাছের মত পড়ল সে। আরও সামনে আছে আরেকজন, এইমাত্র প্যাসেজে বেরিয়ে এসেছে, তাকে গুলি করল জুডি—ওর পিস্তলের নাইন এমএম বুলেট লোকটাকে মেঝে থেকে তুলে নিয়ে দূরে ছিটকে ফেলল, তার আগেই মারা গেছে।

এক হাতে সোহেলকে তুলল রানা, 'হাঁটতে পারবি?'

'পারতে হবে,' আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল সোহেল, ভালমত কথা বুঝতে পারছে না। 'এগো তোরা, আমি হাঁটতে পারব।' ওর কপাল কেটে গেছে, ভ্রূ বেয়ে নাকের পাশ দিয়ে রক্ত নামছে। ডান চোখের উপরে নেমে এসেছে ফাটা চামড়া। একটানে চামড়াটা ছিঁড়ে ফেলল ও। রক্ত আরেকবার দ্রুত নামল, তবে এখন চোখে দেখতে পাচ্ছে।

কাণ্ড দেখে আঁৎকে উঠল জুডি।

'আমি এক সুন্দরী ভাল প্লাস্টিক সার্জনকে চিনি, এগোও!' তাড়া দিল সোহেল, 'সুযোগ পেলে ও আমাকে না খাইয়ে মারবে।'

তিনজন দৌড়াতে শুরু করল।

হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ আওয়াজে চমকে গেল ওরা। ওদের জানা ছিল না এরকম কিছু দুনিয়ায় আছে। মাথা ঝনঝন করে উঠল ওদের। স্পষ্ট বুঝতে পারল, চালু করা হয়েছে জাহাজ-কাটা করাত। ওরা যেখানে আছে তার তিরিশ ফুট দূরে চেইনটা নেমে এল, ইস্পাত কেটে নামছে। দু'পাশে লুব্রিকেটিং জেট, প্রচণ্ড তাপে বাষ্প হয়ে যাচ্ছে। প্যাসেজের হিউমিডিটি একশো হয়ে গেল, চারদিকে ইস্পাতের শ্র্যাপনেল রূপার খণ্ডের মত ছিটকে গেল। করাত দিক পাল্টাল, পাশ থেকে কাটতে কাটতে আসছে এখন। ধাতব বাল্কহেডগুলো টিশ্যু পেপারের মত ছিঁড়ছে। পুরু চেইনটা ওদের একপাশের দেয়ালে ঢুকে গেল, অতি সহজে কাটছে জাহাজটা। ওদের চার ফুট দূরে ডেক কাটছে ওটা। পড়িমরি করে বামপাশে ছুটল

ওরা। করাত এগিয়ে আসছে! পোড়া ইস্পাতের গন্ধে শ্বাস নেয়া কঠিন হয়ে উঠল। ছিটকে আসছে তপ্ত টুকরোগুলো। রানার ভেজা স্যুটের পিঠে গর্ত তৈরি হলো।

আরেকটা স্টেয়ারকেসের সামনে পৌঁছে গেল ওরা, হুড়মুড় করে উঠতে শুরু করল। করাত ওদের পিছনে ছুটে আসছে এখনও! ওটা যেন ওদের চোখে চোখে রেখেছে, জানে ওরা কোথায় যাবে। করাত আগের অ্যাঙ্গেল পাল্টাল, সিঁড়ি কাটতে কাটতে এগিয়ে আসছে! সিঁড়ির রেইলিঙের দু'পাশে মাউন্ট, ও-দুটো কাটা পড়ল। করাত এখন দেয়াল ছিঁড়ছে।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সোহেল, টলে উঠল। কংকাশন ওকে ধরে বসেছে। খেয়াল করেছে রানা, হাত ধরে দ্রুত এগোল। 'তুই হাঁট, মাথায় কোনও চিন্তা রাখিস না।'

'আমরা আছি,' দৃঢ় স্বরে বলল জুডি। 'কোনও চিন্তা নেই।'

ওরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে, করাত এগিয়ে আসছে। সোহেল দ্রুত হাঁটতে পারছে না। পাশে ক্রু কেবিন, হাঁটছে ওরা। প্যাসেজ বাঁক নিল। একটু দূরেই খোলা দরজা। করাত পিছন থেকে আড়াআড়ি ভাবে এগিয়ে আসছে, জাহাজ কেটে নামিয়ে দিচ্ছে!

দরজার দশ ফুট দূরের দেয়াল লাল হয়ে উঠল, চেইন করাতের দাঁতগুলো বাল্কহেড কাটছে এখন। জাহাজটা ঠিক ছাউনির মাঝখানে নেই, যে-কারণে ওটা প্রথমে কেটেছে কোনাগুলো। এখন ডেকের দেয়াল কাটছে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল রানা, চেইনটা হলওয়ের প্রথম দশ ফুট কেটেছে, এখন আরও গিলছে। ধাতব টুকরোগুলো একদল ভীমরুলের মত ছুটছে হলওয়েতে। করাত এরপর করিডোর কাটবে।

আর পাঁচ ফুট পেরিয়ে গেলে বেরিয়ে যাবে ওরা ডেকে। এক হাতের চাপে জুডিকে বসিয়ে দিল রানা, কাঁধে প্রচণ্ড ধাক্কা দিল। 'বেরিয়ে যাও, জুডি!'

সোহেল বুঝেছে রানা কী করতে চায়, শুয়ে পড়ল ও, শরীর গড়িয়ে দিল। ওর পরপর রানা। ওরা দেখল, করাতটা চোখের সামনে বেরিয়ে আসছে, বিশ্রী আওয়াজ তুলে করিডোর কাটছে! জুডি ও সোহেল করাত পার হয়ে গেল, ডেকে গিয়ে থামল। অন্ধের মত ক্রল করল রানা, মাথার উপরে করাত ঘুরতে দেখল। পরের সেকেণ্ডে ডেকে পৌঁছে গেল ও।

উঠে বসল ওরা, এবার বুঝল, আরেকটা অ্যাম্বুশে পড়েছে!

ছয়জন লোক ওদের জন্য অপেক্ষা করছে, একে-ফোরটিসেভেন তাক করে দাঁড়িয়ে আছে। রানা বা জুডি পিস্তল তুলতে পারল না, তার আগেই লোকগুলো ওদের মাথায় মায্‌ল্ ঠেকাল। রানা ও জুডির পিস্তল কেড়ে নিল দু'জন। জাহাজের করাতের আওয়াজ দ্রুত কমছে, তারপর খ্যাস-খ্যাস শব্দ করে থেমে গেল।

জাহাজের উপরে ক্যাটওয়াকে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল এক দানব, অন্তত পৌনে সাত ফুটি। লোকটা গমগমে স্বরে বলে উঠল, 'ভাবছিলাম আমার করাত তোমাদের খতম করে দিলে মনে কষ্ট পাব।'

ওদের উঠে দাঁড়াতে বলা হলো, আদেশ দেয়া হলো দু'হাত মাথার পিছনে

রাখতে। নির্দেশ পালন করল ওরা। ক্যাটওয়াকে দাঁড়ানো লোকটার দিকে তাকাল রানা। তার বয়স পঞ্চাশও হতে পারে, তবে চেহারা মিলছে আজগার খানের সঙ্গে। বুঝতে পারল, এই লোকই মুদাস্‌সর আলী খান, জলদস্যুদের নেতা, স্মাগলিং রিঙের হোতা।

'তুমিই মুদাস্‌সর আলী খান?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'তোমরা যা খুঁজছিলে সেটা নিশ্চয়ই পেয়েছ?' বলল খান। 'কবরে যাওয়ার আগে সমস্ত কৌতূহল মিটিয়ে নাও, নইলে মনে কষ্ট পাব।' দলের লোকদের পাঞ্জাবি ভাষায় নির্দেশ দিল সে। রানা, জুডি ও সোহেলকে জাহাজের বো-র দিকে সরিয়ে নেয়া হলো।

আবার চালু হলো করাত।

অনেক উপরে আছে এক অপারেটর, করাতের চেইন ব্লেড বো-র কাছে সরিয়ে নিল সে। জাহাজের বো যেখানে কাটা হয়েছে, তার পনেরো ফুট পিছনে করাত রাখা হলো। মোটর বন্ধ হয়ে গেল। এমনভাবে রাখা হয়েছে, দুশো ফুট দৈর্ঘ্যের চেইন একটুও ঝুলে পড়েনি। ছাউনির ছাদে অসংখ্য বাতি জ্বলে উঠল। সেই আলোয় ওরা দেখল, বিশেষ অ্যালয় দিয়ে তৈরি করাতের দাঁতগুলো শতশত ছোরার মত ঝিকঝিক করছে।

কয়েক সেকেণ্ড পর মুদাসসর আলী খান নেমে এল টায়ে-টায়ের ডেকে, তার দু'পাশে রয়েছে দু'জন সশস্ত্র গার্ড। প্রকাণ্ডদেহী ছয়জন লোক টেনে সোজা করে দাঁড় করালো রানা, সোহেল ও জুডিকে। ওদের তিন জনের হাতে অদ্ভুত আকারের তিনটে পাঁচ ফুট লম্বা ধাতব দণ্ড। ওটার দুই প্রান্তে আড়াআড়িভাবে ছোট দুটো হ্যাণ্ডেল লাগানো। ওদের দুই হাত পিছনে নিয়ে একটা করে রড ভরে দেয়া হলো বগলের নীচে। দু'পাশ থেকে দু'জন একটা করে হাত ধরে রেখে ঘাড়ে তুলে নিল রড। শূন্যে ঝুলছে ওরা এখন। এমনভাবে ধরেছে যে পা ছুঁড়ে কারও গায়ে লাগাবার উপায় নেই। শরীর নেড়ে দেখল রানা, যদি হাত ছাড়ানো যায়... না, এরা শক্ত করে ধরে আরও উপরে তুলে ফেলল ওকে।

'এটাকে দিয়েই শুরু করা যাক,' বলল মুদাসসর আলী। তার গার্ডরা সোহেলকে আরও উপরে তুলে ফেলল, নির্দেশের অপেক্ষায় চেয়ে আছে মনিবের দিকে।

মুদাস্‌সর খান কী করতে চায় বুঝতে পেরে চমকে গেল রানা। হাত ছাড়াতে চাইল, পারল না। আরও দু'জন গার্ড ওর দু'পা টেনে ধরল। চ্যাংদোলা হয়ে শূন্যে আটকা পড়েছে—ঘাড় ফিরিয়ে মুদাস্‌সর আলীকে দেখল ও। জলদস্যুটার হাতে একই রকম দেখতে আরও একটা রড। ওই রড দিয়ে পিটিয়ে ওদের খুন করবে! না। মনিবের ইঙ্গিত পেয়ে গার্ডরা সোহেলকে নিয়ে এগিয়ে গেল করাতের দিকে। একবার দোল দিয়ে বুঝিয়ে দিল কী করা হবে। এরা দূরে থাকবে, কোনও বিপদ হবে না, কিন্তু আস্ত মানুষ দু'টুকরো করে কেটে নামাবে করাত!

কী ঘটবে বুঝতে পেরেছে জুডিও, সিংহীর মত লড়াই করার চেষ্টা করল, হাত ছাড়িয়ে নিতে চাইল; কিন্তু বিশালদেহী পাঞ্জাবিদের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারল না। লোকগুলো খিকখিক করে হাসল, জুডিকে আরও উঁচু করে ধরল। ওর

দু'কাঁধে প্রচণ্ড চাপ লাগল, লড়াইয়ের চিন্তা ভুলে গিয়ে, ককিয়ে উঠল ও ব্যথায়।

'শুয়োরের বাচ্চা!' রাগে চেঁচিয়ে উঠল রানা। 'হারামজাদা! তুইও বাঁচবি না!'

'এটা তো দেখি পাঞ্জাবি বলে!' হেসে ফেলল মুদাসসর আলী। গম্ভীর হয়ে গেল তার চেহারা। 'একদিন সবাই মরে, ক্যাপ্টেন টম হব্‌স্! তবে তুমি খুব তাড়াতাড়ি মরবে। খুব দ্রুত ওজন কমাতে পারো তো তুমি! আমার ছেলে বলেছে তুমি আসবে, কিন্তু এখন দেখছি তোমার অর্ধেকও নেই!'

'আমার কথাগুলো খেয়াল করে শোনো, খান,' চাপা স্বরে বলল রানা। 'আমরা জানি তোমরা দ্য চুহা দিয়ে কী করো। দ্য চুহির কথাও জানি। ওগুলো যে-কোনও বন্দরে যাক, সঙ্গে সঙ্গে আটকা পড়বে। তোমরা শেষ, খান! আরও কয়েকটা জান নিয়ে লাভ কী তোমার!'

ভুঁড়ি কাঁপিয়ে হাসল মুদাসসর আলী খান। 'টায়ে-টায়ের ক্রুদের মেরে ফেলেছি বলে আমার বিরুদ্ধে চার্জ আনা হবে না? হাহ্-হাহ্-হাহ্!'

ক্রুদের যে বাঁচিয়ে রাখা হয়নি সেটা টের পেলো রানা। দ্রুত একবার সোহেলের দিকে তাকাল, তারপর মুদাস্‌সর আলীকে বলল, 'আর ঠিক দশ মিনিট পর একটা কমাণ্ডো দল এই ছাউনির ভেতরে ঢুকবে, তোমাদের যাকে পাবে গুলি করে মারবে।'

পেট কাঁপিয়ে আবারও হেসে উঠল মুদাসসর আলী, প্রচুর আনন্দ পাচ্ছে বন্দির কথা শুনে। ডান হাতের তর্জনী তুলে নাড়ল। 'ওদের আসতে পাঁচ মিনিট দেরি হয়ে যাবে! তোমরা তখন আর নেই! লাভ কী তোমার, কথা দিয়ে তো আমাকে ঠেকাতে পারবে না! ঠিক এই মুহূর্তে আমার দলের ছেলেরা তোমার জাহাজে উঠছে। ওখানে বড়জোর পাঁচ-সাতজন মার্সেনারি আছে। আমরা ওদের হাসতে হাসতে খতম করব।'

রানা জানে, হয়তো এদের ঠেকানো যাবে না, ওদের মরতেই হবে—কিন্তু বাঁচবে না এরাও। মার্ভেলের কমাণ্ডো দল এদের ছাড়বে না, পালাতে পারবে না এরা, কুকুরের মত গুলি খেয়ে মরবে।

মুদাসসর আলীকে কথা বলানোর জন্য আলাপের সুরে বলল ও, 'ঠিক আছে, মেনে নিলাম আমরা মারা যাব। কিন্তু মরার আগে জানতে চাই তোমরা মানুষ স্মাগলিং করো কেন। মানুষ নিয়ে কী করো?'

মুদাসসর আলী রানার পা ধরা দুই গার্ডকে ইশারা করল, লোকগুলো পা ছেড়ে দিল। সোজা হয়ে দাঁড়াল রানা। ওর পাশে চলে এল খান, ছাগলের মত পিঙ্গল চোখে প্রতিপক্ষকে দেখল। লোকটার মুখে সস্তা সিগারেট ও বদহজমের বিশ্রী দুর্গন্ধ। রানার সোলার প্লেক্সাসে টেনে ঘুসি বসাল সে। ভুশ্ করে সব বাতাস বেরিয়ে গেল নাক-মুখ দিয়ে। চোখে অন্ধকার দেখল ও। বিশ সেকেণ্ড পর আবার শ্বাস নিতে পারল। চমকে গেছে লোকটার শক্তির বহর দেখে। আরও একটু জোরে ঘুসি মারলেই ফুসফুস ফেটে মারা যেত ও।

'তোমরা বোঝোনি যে, আমি জেনে গেছি দ্য চুহার পিছু নিয়েছ। যখন বুঝলাম তোমরা এই জাহাজ দেখেছ, দেরি না করে সরিয়ে নিলাম।' টিটকারির হাসি হাসল মুদাস্‌সর আলী। 'আমি দাবার চালে সবসময় এক কদম এগিয়ে

ছিলাম। এখনও কোনও ভুল করব না। তোমাকে কিছু বলা অনর্থক! জ্ঞান সবসময় পয়সা দিয়ে কিনতে হয়। এই শিক্ষা আমার ছেলেদের শিখিয়েছি। খেলতে চেয়েছ, আমি তোমাদের নিয়ে খেলেছি। আমার ক্ষতি হওয়ার রাস্তা নেই। ...আমরা কেন মানুষ সরিয়ে নিই, সেটা তোমাকে বলব কেন?'

এটা নিশ্চিত যে মুদাস্‌সর আলী খানের সঙ্গে আদম-ব্যাপারিদের সম্পর্ক আছে। দ্বিতীয় ঘুসি খাওয়ার ভয় কাটিয়ে রানা বলল, 'আমরা কাদের হয়ে কাজ করি, কেন এখানে এসেছি, তোমার জানতে ইচ্ছে করে না?'

কড়া চোখে রানাকে দেখল মুদাস্‌সর। 'আমি জানি না তোমরা কাদের চাকর। হাঁ, যদি এক হফ্‌তা আগে আসতে, তোমাদের পেট চিরে সব কথা বের করতাম। তোমরা কারা জানতে পারলে খুশি হতাম। কিন্তু এখন আর আমার কিছু যায়-আসে না। ...মূল কথা, তোমরা তোমাদের পেটের সব খবর নিয়ে কবরে যাও, আমি আমার কাজে যাই।'

ডানহাত তুলে ইশারা করল খান, সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের করাতের শক্তিশালী মোটর চালু হয়ে গেল। গিয়ার দেয়া হয়েছে, কয়েক সেকেণ্ড পর তীব্র গতি তুলল চেইন। ডেকের কাছে নেমে আসছে। কাছ থেকে অস্পষ্ট দেখা গেল। আওয়াজে তালা লেগে গেল কানে। করাত জাহাজের গায়ে দাঁত বসালে এর চেয়ে অনেক জোরে আওয়াজ করে।

ওটার দিকে তাকিয়ে একবার ঢোক গিলল রানা, সোহেলের দিকে তাকাল। চোখ সরিয়ে নিল সোহেল। হিসাব কষছে ওরা, বড়জোর নিজেদের গার্ডদের কাবু করতে পারবে, কিন্তু বাকিগুলো ওদের পাখির মত গুলি করে মারবে। জুডি মাথা ঠাণ্ডা রাখলে বেঁচে যাবে। যদি দৌড়ে গিয়ে রেইলিং টপকে পানিতে পড়ে ডুব সাঁতার কেটে বেরিয়ে যায়... জুডির দিকে একবার তাকাল রানা। চোখাচোখি হলো দু'জনের। মনে হলো পরস্পরের চোখ পড়ছে। জুডি বুঝে গেছে রানা ও সোহেল পাগলের মত কিছু করবে। আস্তে করে চোখ সরিয়ে নিল জুডি, মন প্রস্তুত করে নিল—একটু পর ভয়ঙ্কর কিছু দেখতে হবে। মানুষ দুটো মরবে। মরতে তো হবে ওরও। দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

গার্ডরা সোহেলকে ঘুরন্ত করাতের কাছে নিয়ে গেল। সোহেল বুঝতে পারছে, এক পা সামনে এগোতে প্রবল মানসিক জোর লাগছে। করাতটা আর পাঁচ ফুট দূরে! ঘুরছে! প্রচণ্ড গতি! আশপাশে কিছু পেলে দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ফেলবে! ঘড়ঘড়-খ্যাসখ্যাস আওয়াজ করে ঘুরছে দ্রুত!

আর তিন ফুট!

মুদাস্‌সর আলী খান এগিয়ে এসেছে, একপাশ থেকে দেখবে কী ভাবে মানুষটা কাটা পড়ে। সোহেল শ্বাস আটকে ফেলল। পিশাচটার হাতে এক খণ্ড পুরু কাঠ, অন্য হাতে সোহেলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল—ঘুরন্ত করাতের ভিতরে কাঠের টুকরো গুঁজে দিল। বাড়তি কোনও আওয়াজ পাওয়া গেল না, তবে চারপাশে ছিটকে গেল কাঠের গুঁড়ো। মোটা মেহগনির টুকরো কাটতে এক সেকেণ্ডের ষাটভাগের এক ভাগও লাগেনি করাতের! মুদাস্‌সর আলী খান বড়বড় হলদেটে দাঁত বের করে হাসল, পিছিয়ে রানার সামনে গিয়ে দাঁড়াল, গলা চড়িয়ে বলল,

'জনাব টম হবস্, মেয়েটাকে করাতে দেয়ার আগে আমার লোকজন একটু চেখে দেখবে! তুমি কিন্তু তখন এখানে নেই! তুমি আছ বেহেস্তের হুর-পরীদের সঙ্গে... হাহ্-হাহ্-হাহ্!'

বন্ধুর দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল রানা। খেয়াল করতে হবে সোহেল কখন কাজে নামে! সোহেলের চোখে কোনও দ্বিধার ছাপ নেই। ও সবসময় ওরকমই ছিল। নিশ্চয়ই কিছু পরিকল্পনা আছে ওর।

দু'পাশের গার্ডদের দেখল সোহেল। পরমুহূর্তে কী যেন করল! বাম বগলে চাপ ফেলেছে—সঙ্গে সঙ্গে স্প্রিং সক্রিয় হলো, নকল হাত ছিটকে সামনে চলে এল। যান্ত্রিক হাত দেখতে সাধারণ হাতের মতই, জিনিসটা প্লাস্টিক-সিনথেটিক-রাবার ও টাইটানিয়াম দিয়ে তৈরি—মাঝারি গতিতে নাড়ানো যায়, আঙুলগুলো বেশ ভারী জিনিস ধরে রাখতে পারে।

বামপাশের গার্ড হাতটা ধরে রাখতে না পেরে মুহূর্তের জন্য বোকা হয়ে গেল। সুযোগটা নিল সোহেল, ডাইভ বুটের গোড়ালি নামিয়ে আনল লোকটার স্যাণ্ডেল পরা পায়ের পাতায়। ব্যথায় অস্ফুট আওয়াজ করল লোকটা। কাঁধ থেকে রডটা খসে পড়ল। ডানপাশের গার্ড এখনও সোহেলের ডানহাত ধরে। হাত টেনে নিল না ও, উল্টো তার হাত নিয়ে সামনে বাড়ল সোহেল, ডান পায়ে জোরে মারল ওর পায়ে। প্রহরী হাত ছাড়ছে না। টানাহ্যাঁচড়া করলে ওরা করাতের মধ্যে ঢুকবে। ওটা আর মাত্র এক ফুট দূরে! লোকটা শেষমুহূর্তে বুঝল হাত না সরিয়ে নিলে করাতে কাটা পড়বে। ঝটকা দিয়ে হাত ছেড়ে দিল সে, পিছিয়ে যেতে চাইল। সোহেল ডানে ঘুরে লোকটার মুখে উল্টো হাতের চড় কষাল। লোকটা বিস্মিত হয়ে পিছিয়ে গেল। এদিকে সোহেলের বামহাত অনেকটা উপরে উঠে গেছে, আর ওটার ভারসাম্য রাখতে পারল না ও—হাতটা ঢুকে গেল ঘুরন্ত চেইনের ভিতরে! আবছা ভাবে জুডির কণ্ঠ শোনা গেল, ভয়ে চিৎকার করছে। প্লাস্টিক-সিনথেটিক হাতের ভিতরে আছে স্টিলের চেয়ে অনেক শক্ত টাইটানিয়াম—করাতের দাঁত ওই জিনিস কামড়ে ধরেছে। কাঁধের জয়েন্টে ভীষণ ঝাঁকি খেল সোহেল, ব্যথায় মনে হলো জ্ঞান হারাবে। ওর কব্জি ও কনুইয়ের মাঝখানটা স্পর্শ করল করাতের দাঁত, মুহূর্তে কাটা পড়ল হাতটা, ধপ্ করে পড়ল জাহাজের ডেকে। আরেকবার চিৎকার করল জুডি। প্রচণ্ড-গতি করাত সোহেলকে ছিটকে পিছিয়ে দিল। ডেকে পড়বার সময় নিখুঁত শোল্ডার রোল করল ও, একবার গড়ান দিয়ে উঠে বসল। খপ্ করে কাটা কনুই ধরল, গোপন কমপার্টমেন্ট থেকে টেনে বের করে নিল মডিফায়েড কেল-টেক পিস্তলটা।

কেল-টেক দুনিয়ার অন্যতম ছোট হ্যাণ্ডগান, বুলেট না থাকলে ওজন মাত্র পাঁচ আউন্স। তবে এই পিস্তলটা অন্য ধরনের, সাধারণ .২২ বা .২৫ ক্যালিবারের গুলি ছোঁড়ে না, এটা পি-রেটেড .৩৮০ কার্ট্রিজ ফায়ার করে—এর গুলিতে অনায়াসে তেড়ে আসা ষাঁড়ও ঠেকানো যায়।

পিস্তলের ম্যাগাজিন ও চেম্বারে থাকে মাত্র সাতটা বুলেট। সোহেলের ইচ্ছে ছিল প্রথম বুলেট ঢুকিয়ে দেবে মুদাস্সর আলী খানের করজের ভিতর। কিন্তু গার্ডদের কাছে রাইফেল আছে বলে তাদের দিকেই তাক করল। রানার দু'পাশের

দুই গার্ড প্রায় একইসঙ্গে কপালে গুলি খেল। ঘুরে বসল সোহেল, একটু আগে ওকে ধরে রাখা গার্ডদের একজন বুকে গুলি খেয়ে করাতের মধ্যে পড়ল। রক্ত ছিটকে উঠল, মনে হলো লাল রঙের কোনও ফোয়ারা। কাটা মাথা ও ডান উরু ফিরে এল ডেকে।

ওদিকে রানা মুহূর্তে এক মৃত গার্ডের একে-ফোরটিসেভেন তুলে নিয়েছে, সোহেলকে আটকে রাখা দ্বিতীয় সেই গার্ড কাঁধে রাইফেল তুলছে এখন—তিনটে বুলেটের আঘাতে লোকটার মুখ ছিন্নভিন্ন হলো। ধড়াস্ করে পড়ল লাশটা। চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল রানা, জুডিকে বন্দি করা গার্ডদের দিকে রাইফেল তুলল। সোহেলও ওর পিস্তল তাক করল। ওই দুই গার্ড জুডির আড়াল নিয়েছে। ডান দিকের লোকটার বাম হাঁটু একটু বেরিয়ে আছে, ওখানে গুলি করল সোহেল। পিশাচটা তীক্ষ্ণ সুরেলা চিৎকার ছাড়ল, দু'হাতে হাঁটু ধরে করাতকে হার মানিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে শুয়ে পড়ল। দ্বিতীয়জনের মুঠো থেকে এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিল জুডি, লাফ দিয়ে সরে গেল। পরের সেকেণ্ডে রানার গুলিতে লোকটার বুক ঝাঁঝরা হলো। এইবার একসঙ্গে ফিরল দুই বন্ধু পাঞ্জাবি পিশাচটার দিকে।

নেই! গায়েব হয়ে গেছে মুদাস্সর আলী খান! তার সঙ্গে আসা দুই গার্ডও উধাও। ক্যাটওয়াকে উঠে আরও উপরে চলে যাচ্ছে ওরা। তাদের একজন সাহস ফিরে পেল, ঘুরে দাঁড়িয়ে একে-ফোরটিসেভেন দিয়ে এক পশলা গুলি ছুঁড়ল। পাল্টা গুলি করল রানা, চিৎকার করে জুডিকে ডাকল। উড়ে এল মেয়েটা।

'রেইলিং! জলদি!' বলল রানা, আরও দুটো গুলি পাঠিয়ে দিল গার্ডের দিকে। লোকটা লুকিয়ে পড়েছে।

জুডি, সোহেল ও রানা প্রায় একইসঙ্গে দৌড়ে রেইলিঙের পাশে পৌঁছে গেল, দৌড়ের গতি কাজে লাগিয়ে রেইলিং টপকে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওরা—রওনা হয়ে গেল নীচের পানির দিকে। মাথা তাক করে রেখেছে ডাইভ দেয়ার ভঙ্গিতে। কিন্তু উচ্চতা আঁচ করতে না পারায় পড়ল বিশ্রী ভাবে, প্রচুর পানি ছিটিয়ে। মুহূর্তে ডুবে গেল ওরা নোংরা পানিতে।

ডুব-সাঁতার কেটে ইমপ্যাক্ট ওয়েভের বাইরে সরে যেতে চাইল। শুনতে পেল কেউ জাহাজের করাতের মোটর বন্ধ করেছে। ছাউনির ভিতরে এখন আর প্রচণ্ড আওয়াজ নেই। সোহেল ধীরে ধীরে দশ গুনল, জানে দম নিতে হবে, তবে আরও বিশ সেকেণ্ড গুনে তারপর উঠতে শুরু করল। সবার আগে দম নিতে উঠল জুডি, পাঁচ সেকেণ্ড এদিক-ওদিকে উঠল সোহেল ও রানাও। জাহাজের গায়ের কাছে ভেসে উঠেছে ওরা। ফুসফুসে ঘুসি-খাওয়া জায়গাটা দব্-দব্ করছে, পাত্তা দিল না রানা। 'সোহেল, সোজা ড্রেইগারের দিকে চল্, ডানহাতে ছেমড়ির হাত ধর্, বাম হাত ধরছি আমি।'

দম নিয়ে আবারও ডুব দিল ওরা। যে-কোনও সময় ওদের দিকে গুলি ছুটে আসবে। দ্বিতীয়বার উঠল ড্রেইগার যেখানে রেখে গেছে, তার বিশ ফুট আগে। পানিতে একের পর এক গুলি এসে পড়ছে। ভয়ে গলা শুকিয়ে গেল ওদের। অন্ধকারে পানি ছিটকে উঠছে, সাদা ফেনা তৈরি হচ্ছে। দ্বিতীয়বার শ্বাস নেওয়ার সাহস পেল না ওরা, ডুব দিল আবারও। ওদের মনে হলো কোনও দিন গন্তব্যে

নিত্য নতুন ইবুকের জন্য

সবসময় ভিজিট করুন

www.DOWNLOADPDFBOOK.com

STOP

বিনা অনুমতিতে

সরাসরি ডাউনলোড লিঙ্ক

শেয়ার না করার অনুরোধ রইল

পৌঁছুনো যাবে না, তবে তিরিশ সেকেণ্ড পর পৌঁছে গেল। সোহেলকে ওর গিয়ারটা পরে নিতে বলল রানা, নিজেরটা পিঠে ঝুলানোর ফাঁকে বলল, 'সোহেল, তুই বেরিয়ে যা। আমি জুডিকে নিয়ে দশ ফুট তলা দিয়ে আসছি। সবাই মিলে বিপদে পড়ার মানে হয় না।'

'ওকে আমারটা দিচ্ছি,' বিনা দ্বিধায় বলল সোহেল। 'ও বেরিয়ে যাক। চল্ আমরা দু'জন একসঙ্গে যাই।' ড্রেইগার বাড়িয়ে দিল ও জুডির দিকে।

আপত্তির সুরে শুরু করল জুডি, 'কিন্তু আমি কেন...'

আর কোনও তর্কে গেল না রানা, 'জুডি, ও ঠিকই বলেছে, ড্রেইগার পরে নাও। আমরা পরে আসছি।'

'কিন্তু...'

'পরে নিন তো,' প্রায় ধমকে উঠল সোহেল। 'যে-কোনও সময় বুলেট ওটার বারোটা বাজাবে!'

জাহাজ থেকে পশলা পশলা গুলি আসছে। আশা করছে যে-কারও গায়ে গুলি লাগবে। লোকগুলো রাগে অন্ধ হয়ে গেছে। সঙ্গীদের লাশ পড়ে আছে ডেকে। নিজেরা কিছুই করতে পারেনি।

দ্রুত হাতে ড্রেইগার পিঠে তুলল জুডি, সোহেল স্ট্র্যাপ আটকে দিয়ে ফিন দিল। পরে নিয়ে একবার রানা ও সোহেলকে দেখল জুডি, নীরবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ডুবে গেল। ভাবছে, এরা দুই বন্ধু অদ্ভুত, বিনা দ্বিধায় ঝুঁকি নিল একটা মেয়েকে সাহায্য করতে গিয়ে! এমন মানুষ এখনও আছে পৃথিবীতে!

'বোকা ছেমড়ি গেছে,' স্বস্তির শ্বাস ফেলল সোহেল, 'আয় এবার আমরা পালাই!'

সোহেলকে একটা ফিন বাড়িয়ে দিল রানা। 'নে শালা, তোর বোন আর বলতে পারবে না নিজেই সব নিয়েছি।'

প্রচণ্ড গোলাগুলির আওয়াজ শুনতে পেল ওরা। থমকে গেল সোহেল, চমকে গেছে রানাও। এটা অযোগ্য গার্ডদের সাধারণ গোলাগুলি না, থেমে থেমে এই গোলা-বর্ষণের আওয়াজ ওরা ভাল করেই চেনে। বন্ধুর দিকে তাকিয়ে নিষ্ঠুর হাসল রানা। মৃদু মাথা দোলাল সোহেল। মুদাস্‌সর আলী খানের লোকজন মার্ভেলে উঠতে চেষ্টা করছে। অনিল বসে আছে ওখানে ভিডিও স্ক্রিনের সামনে, জাহাজের বোফোর্স ফোরটি এমএম অটোক্যানন চালু করেছে ও!

টায়ে-টায়ের ডেক থেকে যারা গুলি করছে, তাদের কেউ পানিতে ওদের নড়াচড়া খেয়াল করেছে। হঠাৎ বাকিরা ব্যস্ত হয়ে উঠল। রানা-সোহেলের চারপাশে এসে গুলি পড়ছে, পানিতে সরু সরু নালা তৈরি হলো!

দুই বন্ধু একটা করে ফিন পরে নিল। সোহেলের মুখে রেগুলেটর গুঁজে দিয়ে নিজেও ডুব দিল রানা। অর্ধেক বাতাসে চালিয়ে নিতে হবে ওদের, নইলে ড্রেইগারের বাতাস বিষাক্ত হয়ে যাবে! ফলাফল—ভালো না!

সাত

ওয়্যারহাউজের ভিতরে জাহাজের করাত চালু হতেই কমাণ্ডোদের নিয়ে জোডিয়াকে উঠেছে উর্বশী, রওনা হয়ে গেছে। এদিকে অনিল, গগল ও আতাসি অপেক্ষা করছে অপারেশন্স সেন্টারে, নিজেদের সিটে। ঘরে জ্বলছে এখন ব্যাটল লাইট, কম্পিউটারের নীল স্ক্রিন থেকে বেগুনী আলো উৎসারিত হলো।

ওরা আন্দাজ করে নিয়েছে এত রাতে কেন খানের করাত চালু হয়েছে। ওদের দুই সঙ্গী নিশ্চয়ই এখন বন্দি! হেলম-এ দাঁড়িয়ে আছে গগল, উইপন্স-এ বসে অনিল, আতাসি দেখছে থ্রেট বোর্ড।

'উর্বশী ম্যাডাম, আপনারা নেটওয়ার্কে আছেন তো?' জানতে চাইল আতাসি।

'আছি, মার্ভেল,' বলল উর্বশী। 'এগিয়ে চলেছি স্টেল্‌থ্‌ মোডে। ইটিএ সাত মিনিট।'

উর্বশীরা জোডিয়াক নিয়ে দ্রুত যেতে পারে, করাতের আওয়াজ ওদের এগিয়ে যাওয়ার শব্দ ঢেকে দেবে—কিন্তু আকাশে চাঁদ মামা হাসছে, জোডিয়াকটা কালো সাগরে ফেনা তুললে পরিষ্কার দেখা যাবে।

'মার্ভেল, সৈকতের কাছে অনেক লোক,' বলল উর্বশী। 'ওদের সঙ্গে চারটে ইউটিলিটি বোট। রিপিট করছি, চারটে বোট। থারমাল স্ক্যান বলছে, ওগুলোর গানেল-এ অনেক লোক বসে আছে।'

'পেয়েছি ওদের,' উইপন্স স্টেশন থেকে জানাল অনিল। থারমাল/আইআর/লো-লাইট ক্যামেরাটা মার্ভেলের প্রধান মাস্তুলে বসানো আছে, ওটা স্ক্রিনে সব দেখাচ্ছে। 'আন্দাজ পঞ্চাশজন। সঙ্গে অটোমেটিক রাইফেল আর রকেট-প্রপেল্ড গ্রেনেড।' কি-বোর্ডে কমাণ্ড টাইপ করল ও, সঙ্গে সঙ্গে স্ক্রিনে জাহাজের বিপুল অস্ত্রের তালিকা বেরিয়ে এল। স্ক্রিনটা চার ভাগ করে নিল অনিল। প্রতিটা চল্লিশফুটি বোটকে এখন আলাদা আলাদা ভাবে দেখা যাচ্ছে ভাগগুলোয়। একটা সুইচ টিপতেই চারটে সাইট রেটিক্‌ল্‌ দেখা দিল স্ক্রিনে, স্থির হলো কালো রং করা বোটগুলোর উপর। এখন মার্ভেলের বোফোর্স ব্যবহার করলে জোডিয়াক বিপদে পড়বে কি না জানতে চাইল ও।

উত্তর দিল আতাসি, 'কোনাকুনি ভাবে যাচ্ছে জোডিয়াক, তবে খুবই ধীর গতিতে।'

জোডিয়াকটা আছে মার্ভেলের স্টার-বোর্ডে, ধীরে চলেছে। ওদিকে খানের লোকজন সরাসরি জাহাজের দিকে ধেয়ে আসছে। কিন্তু উর্বশী এখন গতি বাড়াতে পারবে না, সাগরে ফেনা দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে গুলি শুরু করবে ওরা।

অপারেশন্স সেন্টারের বিরাট স্ক্রিনে দেখছে ওরা। লাইন অভ সাইট থেকে জোডিয়াকটা সরে যাবার অপেক্ষা করছে অনিল। অস্থির বোধ করছে ইউটিলিটি বোটগুলোকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসতে দেখে।

'সৈকত থেকে মিসাইল!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল ফারা।

থমকে গেল অনিল সবাই।

কথাটা শেষ হতে না হতে প্রচণ্ড শব্দে একটা আরপিজি এসে পড়ল জাহাজে। পাঁচ পাউণ্ডের সোভিয়েত রকেট-প্রপেল্ড গ্রেনেড মার্ভেলের বো-এর উপরের অংশে আঘাত হেনেছে। মুহূর্তে স্টিলের প্লেটিং উড়ে গেল, ডেকে বড়সড় একটা গর্ত তৈরি হলো। অবশ্য নোঙরের শিকল বা যন্ত্রপাতি নষ্ট করেনি।

'আরও! বেশ কয়েকটা!'

সৈকতের অনেক কাছে নোঙর ফেলেছে মার্ভেল, ফলে জাহাজের অটোমেটেড ডিফেন্সিভ সিস্টেমগুলো আরপিজিগুলোকে উড়ন্ত অবস্থায় ধ্বংস করতে পারবে না। বাধ্য হয়ে অনিল বলল, 'গগল পিছিয়ে যান! ফুল ব্যাক!'

গগলও একই কথা ভেবেছে, ইতিমধ্যে ডুয়াল থ্রটল নিয়ে কাজ করছে। মার্ভেলের বুকের মধ্যে বসে থাকা চারটে প্রকাণ্ড ম্যাগনেটোহাইড্রোডাইনামিক ইঞ্জিনগুলো জেগে উঠল। বাতি যেমন দপ্ করে জ্বলে, তেমনি মুহূর্তে পুরো শক্তি পেয়ে গেল। ইঞ্জিনগুলো সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের ড্রাইভ টিউবের ভিতরে প্রচণ্ড ঢেউ তুলল।

মার্ভেলের পিছিয়ে যাওয়ার গতি এত দ্রুত যে গ্যালিতে রাখা সমস্ত ডিশ ঝনঝন করে পড়ল। তবে এই গতিও যথেষ্ট নয়। একের পর এক আরপিজি আসছে, আসতেই থাকল।

ওগুলোর ছয়টা টার্গেট মিস করে সাগরে গিয়ে পড়ল, একটা লাগল মার্ভেলের নকল কার্গো ডেরিকে—ওটা সঙ্গে সঙ্গে আছড়ে পড়ল। স্টিলের ভারী মাস্তুল পুরো জাহাজটাকে কাঁপিয়ে দিল। অষ্টম মিসাইল এসে পড়ল ব্রিজের ঠিক নীচের সুপারস্ট্রাকচারে। হাই এক্সপ্লোসিভ ওয়ারহেডগুলো তৈরি হয়েছে ট্যাঙ্কের পুরু আর্মার উড়াতে, কাজেই ওটা আধ ইঞ্চি স্টিল ভাঙবার পরেও অনেক শক্তি রাখে। বিস্ফোরণটা পাশের দুটো কেবিন শুইয়ে দিল। ড্যামেজ কন্ট্রোল কম্পিউটার মুহূর্তে আগুন নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি কাজে লাগাল—দেরি না করে ড্যামেজ কন্ট্রোল টিমকে জানিয়ে দিল কোথায় যেতে হবে।

জাহাজের ইমার্জেন্সি চ্যানেলে কথা বলল অনিল, 'টিম লিডার, আধ মিনিটের মধ্যে রিপোর্ট দাও।'

গগল জিপিএস ডিসপ্লে দেখে নিয়ে স্পিড ইণ্ডিকেটর দেখল। ওরা ব্রেকার্সের ইয়ার্ড ছেড়ে পিছিয়ে চলেছে। এই মুহূর্তে বিশ নট, তবে প্রতি ক্ষণে গতি আরও বাড়ছে। আরও কিছুক্ষণ, তারপর চলে যাবে ওরা খানের আরপিজি'র রেঞ্জের বাইরে। তবে লোকগুলোর কাছে যদি স্টিংগার মিসাইলের মত সফেসটিকেটেড কিছু থাকে, তা হলে আরও দূরত্ব দরকার, নইলে রকেট আকাশ থেকে ফেলা যাবে না।

'উর্বশী, আপনাদের কী খবর?' জানতে চাইল অনিল।

'ধাওয়া করছে,' শান্ত স্বরে বলল উর্বশী। ওর কথার উপর দিয়ে ভেসে এল জোডিয়াকের ইঞ্জিনের গর্জন ও মেশিনগানের গুলির আওয়াজ। 'একটা বোট আসছে আমাদের দিকে। বাকি তিনটে আপনাদের দিকে ছুটছে।'

'এখান থেকে বেরিয়ে যেতে আরও এক মিনিট লাগবে আমাদের,' জানাল গগল।

'তারপর আমরা আপনাদের কাভার দিতে পারব,' বলল অনিল।

'ঠিক আছে,' চুপ হয়ে গেল উর্বশী।

নেটওয়ার্কে ক্যাপ্টেন আলম সিরাজ যোগ দিলেন, 'আমি এখন আমাদের দুইনম্বর ইউএভি আকাশে তুলছি, তিন মিনিট পর আপনারা রণক্ষেত্রের পরিষ্কার ছবি দেখতে পাবেন।'

জোডিয়াক এখন চল্লিশ নট গতিবেগ তুলে সরে যাচ্ছে। উর্বশীর পক্ষে এই অবস্থায় এম-ফোরএওয়ান দিয়ে ইউটিলিটি বোটে গোলা-লাগানো সম্ভব নয়, তবে ওদের কিছুটা নিরুৎসাহিত করতে থেমে থেমে তিন রাউণ্ডের বার্স্ট চালিয়ে যাচ্ছে ও। ফলে ইউটিলিটি বোটের লোকগুলো তাদের অস্ত্র গানেলের উপরে রেখে আন্দাজের উপর গুলি করছে অনর্গল।

উর্বশী হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে, ভালবেসে ফেলা কারোর বা কিছুর ক্ষতি দেখলে কেমন লাগে—নিজের চোখ বিশ্বাস করতে পারছে না ও। মার্ভেল সত্যিই রকেটের আঘাত নিচ্ছে! মনে হচ্ছে ওর নিজের পাঁজর ভাঙছে কেউ। তবে এটাও জানে, মিস্টার চ্যাটার্জি স্বাভাবিক ভাবে ধরে নিয়েছেন এরকম হতেই পারে। জানে তো ও-ও, কিন্তু মন মানে? আরও বড় চিন্তা ওই পাগল মানুষটাকে নিয়ে—ওদিকের ওই ওয়্যারহাউসে বন্দি হয়েছে ও। ওখানে কী হচ্ছে কে জানে! রানা আর মিস্টার আহমেদকে উদ্ধার করতে হবে, ওদের নিয়ে এই ফাঁদ থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। অথচ ওরা নিজেরাই এখনও তাড়া খেয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে!

এইমাত্র জাহাজের করাত থেমে গেছে। উর্বশী বুঝতে পারছে না এটা ভাল, নাকি ভয়ঙ্কর কিছু। মার্ভেল ওদের পিছনের তেড়ে আসা বোটটাকে সরিয়ে না দিলে ওরা ওয়্যারহাউজে ঢুকতে পারবে না। ...নাকি পারবে?

কমাণ্ডো আবু কাশেম আছে জোডিয়াকের হেলম-এ, উর্বশী হাত নেড়ে তাকে বুঝিয়ে দিল কী চায়। কাশেম নীরবে মাথা দোলাল—হালকা জোডিয়াকটা দ্রুত ঘুরিয়ে নেবে সে, তারপর উড়িয়ে নিয়ে যাবে ওয়্যারহাউজের মুখের কাছে।

ওদের নৌযান ঘুরিয়ে নেয়ায় ইউটিলিটি বোট অনেক কাছে চলে এসেছে। ওটার জলদস্যুরা সুযোগটা টের পেয়ে সাহসী হয়ে উঠল—জোডিয়াকের আরোহীদের শেষ করতে গর্জে উঠল অন্তত বারোটা রাইফেল। রাবারের খোলে অসংখ্য ফুটো হতো, উর্বশী দলবল নিয়ে থেমে গিয়ে মরত, কিন্তু কাশেম ফিরতি পথে খরগোশের মত এঁকে-বেঁকে ছুটছে!

কমাণ্ডোরা বোটের উপরে পাল্টা গুলি বর্ষণ করল। এমন কী কাশেমও, এক হাতে থ্রটল, অন্য হাতে পিস্তল। ইউটিলিটি বোটের এক ডাকাত রাইফেল ফেলে দু'হাতে গলা চেপে ধরল, পড়ে গেল রেইলিং টপকে। বো-র ঢেউ তাকে টেনে নিল, পরমুহূর্তে লোকটা বোটের নীচে তলিয়ে গেল। গলার আঘাতটা গুরুতর না হলেও বোটের প্রপেলার তাকে কিমা করবে।

বোটের হুইল-হাউজে বসা লোকটা মাথা নিচু করে রেখেছে, নৌযানটা দ্রুত জোডিয়াককে পেরিয়ে গেল। সুযোগটা নিল কাশেম, ওয়্যারহাউজের মুখে পৌঁছে

গতি কমিয়ে দিল। ঠিক তখনই করাত আবারও হুঙ্কার ছাড়ল—তবে এখন ওটার আওয়াজ কমেছে, জাহাজের লোহা কাটছে না।

ডানহাতে M-4A1 ধরল উর্বশী, জোডিয়াকের নরম পাশে চলে এসে আস্তে করে পানিতে নেমে পড়ল। কাশেম সঙ্গে সঙ্গে জোডিয়াক নিয়ে সরে গেল, দ্রুতগতিতে সৈকতের পাশ দিয়ে ছুটল।

ছাউনির গেটে পৌঁছে দম নিল উর্বশী, ডুব দিল। এক মিনিট পর ভেসে উঠল ভিতরের পানিতে। চারপাশে আলোর অভাব নেই। জাহাজটার পোর্ট-সাইডে এখন কোনও নাম নেই। করাতটা খ্যাস-খ্যাস করে ঘুরছে, আর কোনও আওয়াজ নেই। এখানে কী হচ্ছে বুঝবার উপায় নেই।

উর্বশী রেডিয়ো করল, 'মার্ভেল, আমি অ্যাসল্ট ওয়ান, এখন ছাউনির ভেতরে। মাসুদ রানা আর মিস্টার আহমেদকে খুঁজব এখন।'

'আমরা এক মিনিটের মধ্যে এনগেজ করব,' জানাল অনিল। 'আপনারা ফেরার সময় কোনও বাধা পাবেন না। অ্যাণ্ড... গুড লাক।'

রেডিয়ো অফ করল উর্বশী, সাঁতার কেটে এগিয়ে গেল জাহাজের পাশে—ভাবছে ডেকে উঠবে কী করে। তারপর নাক কাটা বো-র দিকে পিস্তল ও রাইফেলের আওয়াজ শুনতে পেল। কয়েক সেকেণ্ড পর তিনটে দেহ রেইলিং টপকে খসে পড়ল। দু'জনের পরনে ওয়েট স্যুট, বাকি জন কমব্যাট ইউনিফর্ম পরা। প্রথম দু'জন বোধহয় রানা ও মিস্টার আহমেদ, ভাবল উর্বশী। কিন্তু তৃতীয়জন কে? বুক-কোমর-নিতম্বের বাঁক দেখে মনে হলো কোনও মেয়ে! ঠোঁট বাঁকাল উর্বশী, রানা দেখছি এই বিপদেও সঙ্গিনী যোগাড় করে নিয়েছে!

দেহ তিনটে পানিতে পড়বার একটু পরেই রেইলিঙে এসে থামল দু'জন গার্ড, পলাতকদের খুঁজছে। লোকগুলো আছে উর্বশীর রেঞ্জের বাইরে, কাজেই নিঃশব্দে তাদের দিকে সাঁতার কেটে এগোল ও। নীচের দিকে একটা ক্যাটওয়াক ছাউনি প্রায় ঘিরে রেখেছে, ওটা জোয়ারের স্রোতের একটু উপরে—ওটার তলা দিয়ে এগিয়ে চলল উর্বশী। দু'বার রানাদের ভেসে উঠতে দেখল। মেয়েটাকে কেন যেন চেনা-চেনা লাগল! ওরা একটা খোলা স্টেয়ারওয়েলের দিকে চলেছে। উর্বশী বুঝল, রানা ও সোহেল রিব্রিদারগুলো ওদিকেই রেখেছে।

গার্ডরা পানিতে গুলি করছে, কিন্তু আসলে জানে না পলাতকরা কোথায়। উর্বশী জানে, রানারা ডুব দেওয়ার পর অন্তত এক মিনিট পার হয়ে গেছে। রানা দু'মিনিটের বেশি দম রাখতে পারে। মিস্টার আহমেদ বা মেয়েটা? এতক্ষণে রানার ড্রেইগার সেটের কাছে পৌঁছে যাওয়ার কথা। কোথায় ও?

রেডিয়োতে মিস্টার চ্যাটার্জির কণ্ঠ শুনতে পেল উর্বশী। তিনি জানিয়ে দিলেন এনগেজ করছেন। পরমুহূর্তে মার্ভেলের ফোর কোয়ার্টার থেকে চল্লিশ এমএম অটোমেটিক ক্যানন গর্জে উঠল।

ছাউনির গার্ডরা কামানের শব্দ খেয়াল করেনি, সম্পূর্ণ মনোযোগ রেখেছে স্টেয়ারকেসের নীচের দশ ফুট বৃত্তে, নিয়মিত পানি ফুটো করছে। ওখানে কিছু একটা দেখেছে তারা। উর্বশী কমব্যাট বুট পরে আছে, সুইম ফিন নেই, কিন্তু দু'পায়ের জোরে দেহ প্রায় কোমর পর্যন্ত তুলে ফেলল, এক টানে কাঁধে M-4A1

তুলে নিল। মাধ্যাকর্ষণের টানে পানিতে ডুবে যাওয়ার আগেই তিন রাউণ্ড গোলা পাঠিয়ে দিল ও। এক গার্ডের একে-ফোরটিসেভেন ছিটকে পড়ল, দ্বিতীয় গার্ডের মাথা লালচে কুয়াশা হয়ে গেল।

ভারী অস্ত্র নিয়ে ঝুপ্ করে ডুবে গেল উর্বশী, অপেক্ষা করল। জাহাজের ডেকে আরও গার্ড থাকতে পারে, পানিতে গুলি ছুঁড়বে হয়তো। কিন্তু তার বদলে চমকে গেল, কেউ ওর এক গোড়ালি খপ্ করে ধরেছে! পা ছুঁড়ে ভেসে উঠতে ইচ্ছা হলো, কিন্তু জোর করে নিজের মন নিয়ন্ত্রণ করল।

সম্ভবত রানাই, ওর মুখে রেগুলেটর মাউথপিস গুঁজে দিল! দু'বার দম নিল উর্বশী, কৃতজ্ঞ বোধ করল। অক্সিজেনটুকু ওর দরকার ছিল—রেগুলেটর ফিরিয়ে দিল ও। ওটার মালিক আরও কাউকে দিল! একটা ধাতব হাত স্পর্শ করল উর্বশী। চট্ করে বুঝে গেল রানা ও মিস্টার আহমেদ একসঙ্গে আছে। মেয়েটা কোথায়? হাত ধরে কে যেন ইঙ্গিত করছে, বুঝিয়ে দিল এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। তিনজনের এই অদ্ভুত দল পাশাপাশি এগোল, কেউ এখন নিয়মিত ভাবে সাঁতার কাটছে না। একটু পরপর রেগুলেটর পরস্পরকে দিচ্ছে। ওরা মিনিট পাঁচেক সাঁতার কেটে জাহাজের স্টার্নের কাছে চলে এল। এবার এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে।

আরও দশ মিনিট পর ওরা ছাউনির দরজার কাছে চলে এল, ক্যাটওয়াকের তলায় ভেসে উঠল। মিস্টার সোহেলের কাটা হাত ও কপালের অবস্থা দেখে থমকে গেল উর্বশী।

'একেবারে ঠিক সময় এসেছেন, উর্বশী,' বলল সোহেল। 'মনে হয় গার্ডরা আমার ফিন দেখে ফেলেছে, নইলে টের পেত না কোথায় আছি।'

'আরও গার্ড আছে?' জিজ্ঞেস করল উর্বশী।

'না বোধহয়,' বলল রানা। 'মুদাস্‌সর খান পালিয়েছে, ওর সঙ্গে ওই দু'গার্ড ছিল। তুমি ওদের ঠেকিয়েছ।'

আরেকটা নারী কণ্ঠ বলল, 'কিন্তু মুদাস্‌সর আলী খানের কী হবে?' ক্যাটওয়াকের নীচে এগিয়ে এসেছে জুডি, অপেক্ষা করছিল সঙ্গীদের জন্য। 'এবার আমাদের এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া উচিত। এদের আরও লোক আসতে পারে।'

মেয়েটা সুযোগ পেয়েও পালিয়ে যায়নি। উর্বশী মনে মনে ওর প্রশংসা করল। সাহস আছে! ট্যাকটিকাল রেডিয়োতে বলল ও, 'মার্ভেল, অ্যাসল্ট ওয়ান বলছি। রানা, মিস্টার আহমেদ আর সঙ্গে এক মেয়ে আছে, যাকে আমরা অ্যাভালাঞ্চ থেকে উদ্ধার করেছি। জোডিয়াক আমাদের তুলে নিলে ভাল হয়।'

'অপেক্ষা করতে হবে। এখনও একটা ইউটিলিটি বোট রয়ে গেছে। আমরা ওটাকে আকাশ থেকে ট্র্যাক করছি এখন, তবে খতম করতে খানিক সময় লাগবে।'

উর্বশীর কাছ থেকে হেডসেট নিল রানা। 'নেগেটিভ, মার্ভেল। মুদাস্‌সর আলী খান পালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের ওকে দরকার।'

'বেশ, রানা,' বলল অনিল। 'তোদের জন্য জোডিয়াক পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

আড়াই মিনিট পর ওয়্যারহাউজের ফটক পেরল ওরা, বেরিয়ে এল সাগরে। রিব্রিদার ফেলে রেখে এসেছে। কয়েক মিনিট পেরিয়ে গেল, তারপর জোডিয়াক হাজির হলো—ইঞ্জিন মৃদু মৃদু গর্জন করছে। কমাণ্ডোরা ওদের জোডিয়াকে টেনে তুলল। রানা পুরোপুরি উঠে বসবার আগেই থ্রটল খুলল কাশেম, গতি তুলে ঢেউয়ের উপর দিয়ে দ্রুত এগোল।

মাত্র কয়েক সেকেণ্ড হাঁপ ছাড়ার সুযোগ পেল, তারপরই সৈকত থেকে ওদের দিকে শুরু হলো গুলি—অন্ধকারে মনে হলো ওদিকে জোনাকি জ্বলছে। সৈকতের দিক থেকে সরে গেল কাশেম, উল্টোদিকে ছুটল। ওদিকে আছে মার্ভেল, ওটা শেষ বোট খুঁজে বের করবে। অন্য তিনটে বোট এখন জ্বলন্ত ধ্বংস-স্তূপ, একটু পরে সাগরে ডুবে যাবে। চতুর্থ বোট সম্ভবত জং-ধরা জাহাজগুলোর মধ্যে লুকিয়ে পড়েছে।

জোডিয়াকের বো-এ চলে এল রানা, হাতের ইশারায় কাশেমকে দেখিয়ে দিল কোন্ পথে পরিত্যক্ত জাহাজগুলোর মধ্য দিয়ে এসেছে। এক কমাণ্ডোর কাছ থেকে নাইট ভিশন গগলস্ ধার নিল রানা। দু'পাশে অসংখ্য জাহাজ, ওগুলোর গায়ে আউটবোর্ড ইঞ্জিনের আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরছে। চারপাশে এত জাহাজ যে মনে হলো ওরা একটা গোলকধাঁধায় ঢুকেছে। দ্রুত গতির কারণে দৃশ্যটা অদ্ভুত লাগছে। কাশেম মাসুদ ভাইয়ের দেখানো হাত অনুসরণ করে এগিয়ে চলেছে। ডানে পড়ল একটা সুপারট্যাঙ্কার, ওটা দৈর্ঘ্যে অন্তত এক হাজার ফুট। বামে আছে দুটো গাড়ি পার করবার ফেরি—যে-কোম্পানি ওগুলো দিয়ে ইংলিশ চ্যানেল পারাপার করত, সেই কোম্পানির নাম এখনও লেখা।

দ্বিতীয় ফেরির বো-র কাছে পৌঁছে গেল ওরা। বামে অর্ধেক ডুবে যাওয়া একটা টাগ-বোট ও কন্টেইনার শিপ। এবার বাঁক নিতে যাবে, এমনসময় শেষ ইউটিলিটি বোট আরেকটা জাহাজের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। কমাণ্ডোরা সুযোগ নিল, বোটের সারাদেহে গুলি বর্ষণ করল।

দ্রুত ঘুরিয়ে নেয়া হলো বোট, জোডিয়াকের পিছু নিয়ে তেড়ে আসছে এবার। উপসাগরে জোয়ার আসছে, ঢেউগুলো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। দুই নৌযান নাচছে স্রোতে, কারও পক্ষেই নিখুঁত ভাবে গুলি করা সম্ভব নয়। শান্ত সাগরে জোডিয়াক অনায়াসে ভারী ওয়ার্ক বোটকে অনেক পিছনে ফেলে দেবে, কিন্তু জোয়ারের খ্যাপা ঢেউ এখন দুই নৌযানকেই সমান সুযোগ করে দিল।

বারবার কাশেম পরিত্যক্ত জাহাজের আড়াল থেকে বেরিয়ে সাগরে গিয়ে পড়তে চাইছে, কিন্তু ইউটিলিটি বোট বারম্বার এগিয়ে এসে বাধা দিচ্ছে। জোডিয়াকটা জাহাজগুলোর কোনও ফাঁক খুঁজে নিয়ে মার্ভেলে পৌঁছে গেলে আর কোনও সমস্যা হবে না।

হঠাৎ আউটবোর্ড ইঞ্জিন কেশে উঠল। মুহূর্তের জন্য গতি কমল, তারপর আবারও সিলিণ্ডারগুলোর কাজ শুরু হলো। কাশেম ঘুরে ইঞ্জিনের কাউলিঙে হাত রাখল, বিড়বিড় করে কাকে যেন অভিশাপ দিল। ওর হাত একটা বুলেটের গর্ত খুঁজে পেয়েছে। আঙুলে কী যেন লাগল। দু' আঙুলে জিনিসটা মেখে দেখল। ইঞ্জিনের আওয়াজ ছাপিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'মাসুদ ভাই, গ্যাস ট্যাঙ্ক ফুটো করে

দিয়েছে। ইঞ্জিন কতক্ষণ চলবে জানি না। ইঁদুর-বিড়াল খেলা বোধহয় শেষ!'

ওরা আবারও বাঁক ঘুরল। আপাতত ইউটিলিটি বোট তেড়ে আসছে না। কিন্তু কখন কোনদিক থেকে আবারও ধেয়ে আসবে বলা যায় না। খানের লোক ওদের মার্ভেলের দিক থেকে তাড়িয়ে সরিয়ে দিয়েছে। অসংখ্য জাহাজের গোলকধাঁধায় ঘুরছে ওরা।

'ওরা কি তীরের দিকে গেছে?' জিজ্ঞেস করল জুডি।

'মনে হয় না,' বলল রানা। পরমুহূর্তে বোটটা বিরাট একটা কমার্শিয়াল ফিশিংম্যানের আড়াল থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল।

জোডিয়াকের দিকে অসংখ্য গুলি ছুটে এল। বুলেটগুলো চারপাশের সাগরে গাঁথছে। কাশেম ইঞ্জিনের কাছ থেকে আরও আধ নট আদায় করতে ব্যস্ত। নাকে পোড়া গন্ধ পেল, কাউলিঙের ভিতরে ফিউল পুড়ছে। শয়তানদের বুলেট গ্যাস ট্যাঙ্ক তো ফুটো করেছেই, আরও কোনও ক্ষতি করে দিয়েছে। এঁকেবেঁকে ফেরিবোটগুলো আবারও পার হলো ওরা।

ঠিক তখন একটা জিনিস খেয়াল করল রানা। 'কাশেম, ওই অর্ধেক ডোবা টাগ-বোটের কাছে নিয়ে চলো তো! একটা বুদ্ধি এসেছে!'

জোডিয়াক লাফাতে লাফাতে ছুটল অন্ধকার জাহাজের দিকে। টাগ-বোট যেখানে আছে সেখানে সাগরের তলায় কিছু আছে, যে-কারণে ওটার বো নাক তুলে আছে। জাহাজের পিছনের ডেক ডুবে গেছে পানিতে। ওখানে আছে একটা ভাঙা, পড়ি-পড়ি ক্রেন। চাঁদের আলোয় ওটা প্রায় দেখাই যায় না।

রানা বলে দিল কোনদিক দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে, নিজেও খেয়াল করছে জায়গাটা। দুনিয়ার আর সব ভুলে গেছে। বোটের গুলির কথাও মনে নেই। বুঝতে পারছে, ওরা মাত্র একবার সুযোগ পাবে। দু'হাত দু'পাশে প্রসারিত করল রানা, শেষ কয়েক সেকেণ্ডে সামান্য কোর্স পাল্টাতে বলল। কাশেম সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ পালন করল। হালকা হাতে জোডিয়াকের হুইল নিয়ন্ত্রণ করল ও।

'ঠিক আছে, গতি কমিয়ে দাও,' বলল রানা। 'ওরা তেড়ে আসুক।'

পাগলাটে নির্দেশটা শুনল সবাই, ভুরু কুঁচকে গেল জুডির, তবে কেউ কোনও প্রশ্ন তুলল না। জোডিয়াকের গতি মন্থর হয়ে গেল। বোট ছিল সত্তর ফুট পিছনে, কিন্তু দ্রুত এগিয়ে আসছে। লোকগুলো কী করে যেন টের পেয়েছে বিজয় পাওয়ার সময় হয়ে গেছে। বোটের পাইলট থ্রটল খুলে দিল, এবার তারা শিকার হাতে পেয়ে গেছে, জোডিয়াক ডুবিয়ে দেবে!

রানা প্রতিমুহূর্তে কাশেমকে গতিপথ বলছে। আর কয়েক সেকেণ্ড, তারপর ওরা ভাঙা টাগ-বোটের পিছনে পৌঁছে যাবে। কাঁধ ঘুরিয়ে পিছনে তাকাল রানা। ইউটিলিটি বোট ছুটে আসছে, লোকগুলো শেষ মুহূর্তের জন্য তৈরি হচ্ছে—এর পরেই হাঙরের মত ঝাঁপিয়ে পড়বে।

আর মাত্র কয়েক সেকেণ্ড, মনে মনে বলল রানা। আরেকবার ঘুরে বোট দেখল। আর দু'সেকেণ্ড। এবার! হাতের ইশারা করল ও, 'কাশেম, পোর্টে ঘুরে যাও!'

জোডিয়াক দ্রুত ছুটল টাগের ভাঙা ক্রেনের তলা দিয়ে। অপেক্ষাকৃত অনেক

বড় ইউটিলিটি বোট, তেড়ে এল জোডিয়াকের দিকে। ওটার পাইলট বোঝেনি তাকে ফাঁদে ফেলা হয়েছে।

'এবার সবাই মাথা নিচু করে বসে পড়ো!' চিৎকার করে বলল রানা। ওদের জোডিয়াক ডুবে থাকা টাগের রেইলিং পেরিয়ে গেল, ছুটল নষ্ট ক্রেন-বুমের তলা দিয়ে। বুমটা তিন ফুট উপরে রইল, মাথা নিচু না করলে ইস্পাতের ডেরিক ওদের মাথা ফাটিয়ে দিত।

তলা দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে এল ওরা। ঘুরে তাকাল রানা। ইউটিলিটি বোট তেড়ে আসছে এখনও, তবে শেষ মুহূর্তে হেলম্‌স ম্যান ক্রেনটা দেখতে পেল। বনবন করে হুইল ঘোরাল সে, কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। বোট অনেক বেশি জোরে চলছে। নৌযানটা সরাসরি ক্রেনের উপর আছড়ে পড়ল—ইস্পাতের বুম ফাইবার-গ্লাসের খোল চুরমার করল। বোটের মাথা থেকে শুরু করে লেজ পর্যন্ত চিরে গেল। বড়সড় ট্যাঙ্কের একটা মাউন্ট থেকে উপড়ে এল।

চুরমার হওয়া বোটের লোকরা বুঝতে পারেনি কী ঘটছে, হঠাৎ দ্রুতগতি থেমে যাওয়ায় তারা বো থেকে ছিটকে গিয়ে সাগরে পড়ল। তবে একজনের কপাল মন্দ, ক্রেনের বুমে মাথা দিয়ে পড়েছে সে, সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল।

প্রচণ্ড আঘাতে বোটের একটা ট্যাঙ্ক ফেটে গেছে, ওটার ডিজেল পড়ছে খোলের ভিতরে। ওগুলো সাগরের পানিতে মিশে যাওয়ার আগেই নষ্ট ইলেক্ট্রিকাল সিস্টেম থেকে একটা স্ফুলিঙ্গ বের হলো। সঙ্গে সঙ্গে ডিজেল বিস্ফোরিত হলো, বোট একটা কমলা রঙের গোলাকার আগুনে পরিণত হলো। কালো ধোঁয়া বোটের চারপাশ ঘিরে নিল।

'শেষ ইউটিলিটি বোট আর নেই, মার্ভেল,' ট্যাকটিকাল রেডিয়োতে বলল রানা। 'আমরা বাড়ি ফিরছি।'

পাঁচ মিনিট পর পরিত্যক্ত জাহাজের কবর থেকে বেরিয়ে এল ওরা। ওদের জোডিয়াক মার্ভেলের একশো ফুট দূরে থেমেই গেল, বাকি পথ বৈঠা বাইতে হলো। জোডিয়াকের মোটর থেমে যাওয়ায় ওরা সৈকত থেকে খানের লোকজনের অস্ত্রের আওয়াজ পেল। তারা বোকার মত খামোকা অন্ধকার সাগরে গুলি ছুঁড়ছে।

গ্যারাজের পাশে পৌঁছে গেল জোডিয়াক, এক ডেক-হ্যাণ্ডের দিকে দড়ি ছুঁড়ে দিল রানা। বাহন ছেড়ে নেমে পড়ল ওরা, ওটা র‍্যাম্পে তোলা হলো। কমাণ্ডোরা অপেক্ষা করছে, ওরা জানে ওদের কাজ শেষ হয়নি।

গ্যারাজে ঢুকল ডক্টর ফারা, সঙ্গে একটা নতুন হাত। নষ্টটা খুলে ওটা আটকে দিল সোহেলের কাঁধে। আসবার পথে সোহেল রেডিয়ো করেছে, যেন আরেকটা দেয়া হয়। কাঁধ পরীক্ষা করে দেখল ফারা। কোথাও জখম হয়নি, তবে পেশি প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়েছে, লাল হয়ে গেছে চামড়া। দেখা শেষে ফারা জানাল কাঁধের ব্যথা কয়েকদিন থাকবে, আর কিছু না। এবার ও পড়ল সোহেলের কপাল নিয়ে, কড়া স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'কী করে হয়েছে?' পেনলাইট দিয়ে ক্ষতটা দেখছে।

'ওরা রাইফেল দিয়ে মেরেছে!' শিশুর মত কাঁদো কাঁদো গলায় বলল সোহেল।

হেসে ফেলল ফারা। চোখে আলো ফেলে দেখল কংকাশন হয়েছে কি না।

মনে হলো অবাক হয়েছে সোহেলকে স্বাভাবিক ভাবে পলক ফেলতে দেখে। শেষে বিরক্ত স্বরে বলল, 'তোমার মাথাটা কামানের গোলার মত। শরীর কেমন লাগছে? ঝিমঝিমানি? চিন্তাগুলো উল্টোপাল্টা লাগছে? বমি-বমি ভাব, বা মাথা ঘোরা?'

'কিছুই না। তবে লবণপানি লেগে কপাল জ্বলছে।'

'আচ্ছা? আর কিছুই না?' ফারা বুঝতে পারছে আর সব পুরুষের মত সোহেলও চুপচাপ ব্যথা সহ্য করছে, মুখে কিছুই বলবে না। ওর কনুইয়ে ও কপালে আচ্ছামত অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল মেখে দিল ফারা। এবার জ্বলুনি সহ্য করতে দু' ভ্রূ কুঁচকে ফেলল সোহেল। ব্যাণ্ডেজ শেষে বলল ফারা, 'ঠিক আছে, সব ঠিক হয়ে যাবে। বিশ্রাম নাও গিয়ে।'

'আমার কাজ শেষ হয়নি,' বলল সোহেল। চট্ করে রানাকে দেখল, আশা করছে বন্ধু ওকে উদ্ধার করবে।

'যা শুয়ে পড় গিয়ে, ডাক্তারের কথা মানতে হয়,' নিষ্ঠুরের মত বলল রানা।

'কিন্তু আমি...' সোহেলকে থামতে হলো, চোখ পাকিয়ে রানাকে দেখল।

সোহেলের কথা পাত্তাও দেয়নি ফারা, হাতের ইশারায় দরজা দেখিয়ে দিল। সাফ কথা, সোজা কেবিনে গিয়ে বিশ্রাম করো, যাও!

মনে মনে রানাকে জোরে কানমলা দিয়ে নিজের কেবিনের দিকে রওনা হয়ে গেল সোহেল।

জুডির দিকে তাকাল ফারা, 'বলো তো তুমি এখানে কেন, মিস স্টিভেনসন! নাকি প্রশ্ন করা উচিত হবে না?'

'ও লণ্ডনের লয়েডস-এ আছে,' বলল রানা, 'জাহাজ চুরির রহস্য উদ্ধার করতে এসেছে। ইনশিওরেন্স বাবদ প্রচুর টাকা গচ্চা যাচ্ছে ওদের।'

হাত বাড়িয়ে দিল জুডি। হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে দিল ফারা, মৃদু হেসে বলল, 'আর আমি ভেবেছিলাম তুমি গুরুতর অসুস্থ!' তোয়ালে বাড়িয়ে দিল ও। 'এখন কি ডাক্তার দরকার?'

তোয়ালে নিয়ে চুল মুছল জুডি। 'থ্যাঙ্কস্, না, ডক্টর। একটু আগে খুব ভয় পেয়েছিলাম, এখন পুরোপুরি সুস্থ বোধ করছি।'

উর্বশী কখন যেন চলে গেছে, এইমাত্র আবারও গ্যারাজে এসে ঢুকল। পোশাক পাল্টেছে, ঘুরে এসেছে অপারেশন্স সেন্টার থেকে। ও কিছু বলবার আগেই রানা জিজ্ঞেস করল, 'কী করছে ওরা?'

'বিচ থেকে গুলি ছুঁড়ছে এখনও,' কাঁধ ঝাঁকাল উর্বশী। 'সব ছোট ক্যালিবারের অস্ত্র। সঙ্গে আরপিজি নেই। ...ক্যাপ্টেন সিরাজ ইউএভি দিয়ে কম্পাউণ্ডে চোখ রেখেছেন। করাত থামার পর এক লোক ওয়্যারহাউজ থেকে বেরিয়ে গেছে, একটা জিপে উঠে দ্রুত চলে গেছে এক মাইল দূরের বাংলোগুলোতে। ওগুলোর একটার পাশে হেলিপ্যাডে চপার আছে; তবে রওনা হয়নি ওটা।'

'আর আমাদের হেলিকপ্টার? ওটা তৈরি?'

'ক্রুরা রেডি,' বলল উর্বশী। 'নির্দেশ পাওয়ার দশ মিনিটের মধ্যে রবিনসন উড়বে।'

'তা হলে ক্যাপ্টেন সিরাজকে জানিয়ে দাও উনি যেন ইউএভিটা নামিয়ে আনেন। ওঁকে আমাদের দরকার। রওনা হবো। মুদাস্‌সর খানকে জ্যান্ত ধরতে পারলে অনেক ইনফরমেশন পাওয়া যাবে।'

'তা তো বটেই,' বলল উর্বশী। 'তোমরা ফিরলে সরকারী কর্মকর্তাদের ঘুম থেকে তুলব আমি। খানের সঙ্গে কারা এসবে ছিল সব বেরিয়ে আসবে। ব্রেকার্স ইয়ার্ডে এখন নেভি বা কোস্ট গার্ডের রেইড দরকার।'

'বস্,' খোলা সার্কিটে হঠাৎ আতাসির কণ্ঠ শোনা গেল। একটু কাঁপছে ওর গলা। 'বস্, আল্লাহর কসম, শুনুন! আমরা মিস্টার ফু-চুঙের ট্র্যান্সপণ্ডার থেকে সিগনাল পেয়েছি!'

'কখন?'

'এইমাত্র, বস! দুই সেকেণ্ড আগে!'

'ও কোথায়?'

'ভাবতে অবাক লাগছে,' একটু ইতস্তত করল আতাসি। 'রাশা, বস্! কামচাটকা পেনিনসুলার পশ্চিম তীরে! আল্লাহ্ জানেন ওখানে কী করে গেলেন উনি! আমি তো জানতাম আদম-ব্যাপারিরা ইউএসএ বা জাপানে লোক পাঠায়।'

অপেক্ষা করছে আতাসি, কিন্তু কোনও কথা বলছে না রানা। আশপাশের কারও দিকে তাকিয়ে নেই ও। মনে হলো চিন্তায় হারিয়ে গেছে। পরিকল্পনা আঁটছে, মার্ভেলের গতি নিয়ে চিন্তা করছে, কামচাটকার দূরত্বটাও জরুরি—সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, ওদের মিশনে কোন্‌টার পর কোন্‌টার গুরুত্ব।

ফু-চুংকে দ্রুত উদ্ধার করতে হবে, আবার মুদাস্‌সর আলী খানকে ছেড়ে দেওয়া যাবে না।

দুটোই জরুরি।

ফু-চুং নিশ্চয়ই ওখানে একা নেই, আরও বহু মানুষ আটকা পড়েছে। তাদের উদ্ধার করতে হবে। ওখানে খারাপ কিছু ঘটছে। সেটার সঙ্গে মুদাস্‌সর আলীর সম্পর্ক? ওই ইবলিশটা মানুষ যোগাড় করছে, ট্র্যান্সপোর্টেশনও ধার দিয়েছে। তার ড্রাই-ডকগুলো মানব-পাচারের কাজে ব্যস্ত। কোনও জাহাজ থেকে সেটা দেখা গেলেই তাদের ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে। শয়তানটা যা খুশি তা-ই করছে! এতদিনে একটু আন্দাজ করা যাচ্ছে হারানো মানুষগুলো যাচ্ছে কোথায়। তাদের কি কামচাটকায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে? কোনও একটা বিরাট কর্মকাণ্ড চলছে সেখানে। মুদাস্‌সর আলীর বিরাট নেটওঅর্ক রয়েছে। তারা সহজেই সস্তা শ্রমিক যোগাড় করছে। এদের ঠেকাতে না পারলে আরও হাজার হাজার মানুষ ফাঁদে পড়বে, হারিয়ে যাবে চিরতরে।

'সস্তা শ্রম,' আনমনে বলল রানা।

'কিছু বললে?' জানতে চাইল জুডি। ভেজা জ্যাকেট খুলে ফেলল ও, তলায় পাতলা একটা টি-শার্ট, কাঁধে একটা তোয়ালে। ওটা মেয়েটির স্তন যুগল মোটেই ঢাকেনি, কিন্তু সে-ব্যাপারে সচেতন নয় মোটেও। চারপাশ দেখছে জুডি, বুঝতে পারছে এই জাহাজ কোনও গোপন অপারেশনে ব্যবহৃত হচ্ছে। আশপাশের এই মানুষগুলো সাধারণ কেউ নয়।

'ওখানে ওরা সস্তা শ্রম সংগ্রহ করে, মানুষগুলো আসলে ক্রীতদাস,' বলল রানা। 'যে-রাতে আমরা তোমাকে উদ্ধার করি, সে-রাতে একদল জলদস্যু আমাদের উপর হামলা করেছিল। ট্রলারটা ডুবিয়ে দিই আমরা। ওদের ট্রলারে একটা কন্টেইনার ছিল। ভেতরে অনেক মানুষ ছিল। তাদের সময়মত উদ্ধার করতে পারিনি, ডুবে মারা গিয়েছিল। কন্টেইনার তুলে আনি আমরা। একজনের কাছ থেকে একটা ডায়ারি পাওয়া যায়। সেই সূত্র ধরে আমার এক বন্ধু চিনে যায়। নিজেকে ও আদম-ব্যাপারিদের হাতে তুলে দেয়। এখন জানা যাচ্ছে ওকে কামচাটকা পেনিনসুলায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

'লয়েড্স্-এর আমরা ধারণা করছিলাম মুদাস্সর আলী খান এদিকের সাগর থেকে জাহাজ সরিয়ে নিচ্ছে,' বলল জুডি। 'তদন্ত করে আমার মনে হয়েছে এখানকার ফ্যাসিলিটি বেআইনী কাজে ব্যবহার করা হয়। আজ রাতে গিয়ে প্রমাণ পেলাম।'

'মুদাস্সর আলী আরও বড় ব্যাপারে জড়িত,' বলল রানা। 'ওরা দক্ষিণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে লোভ দেখিয়ে অনেক মানুষ নিয়ে গেছে কামচাটকা পেনিনসুলায়। দ্য চুহার মত প্রকাণ্ড জাহাজ যাদের লাগে তারা কত মানুষ নিয়েছে বোঝা যায়।'

'ধরে নিলাম মানুষগুলো এখন ক্রীতদাস। কিন্তু এরা এত লোক নিয়ে কী করবে?' জিজ্ঞেস করল জুডি।

'যে-কোনও কিছু হতে পারে,' ইন্টারকমের পাশে থামল রানা, বাটন টিপল। 'গগল, একটু পর তুমি এখান থেকে বেরিয়ে যাবে। মার্ভেলের ফুলস্পিড তুলবে। কামচাটকা পেনিনসুলায় গিয়ে ফু-চুংকে খুঁজে বের করবে। এদিকে কাশেম আর জলিলকে নিয়ে আমি মুদাস্সর আলী খানের পেছনে যাব।' একমুহূর্ত থামল রানা, তারপর বলল, 'তোমরা পৌঁছে যাও, আমরা প্লেনে আসছি পেদ্রোপাভ্লোভস্ক-এ।'

'সম্ভব নয়, রানা,' খোলা সার্কিটে অনিলের কণ্ঠ ভেসে এল। 'ফু-চুং কোথায় আছে জানার পর ইন্টারনেটে ঢুকেছি আমি। রাশান গভার্নমেন্ট থেকে জানানো হয়েছে ওরা ওখানে মেজর ভলকানিক ইভেন্টের আশংকা করছে। ওখানে এত ছাই পড়ছে যে ওরা এয়ারপোর্ট বন্ধ করে দিয়েছে।'

চেপে রাখা শ্বাস ফেলল রানা। 'ঠিক আছে, কিন্তু বসে থাকব না আমরা। তোরা রওনা হয়ে যা।'

'মুদাস্সর আলী খানের কী হবে?' জিজ্ঞেস করল সোহেল। ও অপারেশন্স সেন্টারে হাজির হয়ে গেছে।

'পারলে ধরে আনব,' বলল রানা। 'তোরা মার্ভেলের পুরো গতি তুললে আধঘণ্টায় রবিনসনের রেঞ্জের বাইরে চলে যাবি। তার আগেই আমরা ফিরে আসব।'

'একটা কথা বলব?' পাশ থেকে বলল জুডি।

ঘুরে তাকাল রানা।

'আমি ওই ফ্যাসিলিটি ভালমত ঘুরে দেখেছি। খানের জায়গাটা বিশাল। গত এক সপ্তাহ ধরে ওটার ওপরে চোখ রেখেছি, কিন্তু পুরোটা দেখা হয়ে ওঠেনি।'

চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল রানা।

'তুমি মাত্র তিরিশ মিনিটে মুদাস্‌সর আলীকে খুঁজে পাবে না। তবে আমি সঙ্গে গেলে দেখিয়ে দিতে পারব খানের বাড়ি কোনটা।'

এক সেকেণ্ড দ্বিধা করল রানা। জুডি স্টিভেনসন প্রায় অপরিচিত একজন, কিন্তু মেয়েটার চোখে অনড় আত্মবিশ্বাস ও নির্ভেজাল সততা আছে, যেন নিজেকেই দেখতে পাচ্ছে রানা মেয়েটির চোখে। কিছুক্ষণ আগে বিপদে পড়েছে জুডি, জানে আবারও বিপদে পড়তে পারে—কিন্তু সাহস হারাবে না। ডুবে যাওয়া অ্যাভালাঞ্চে হাল ছাড়েনি। ওকে সঙ্গে নেয়া যায়।

'চলো তা হলে,' বলল রানা।

জুডি ভেবেছিল রানা আপত্তি করবে। ওর নীল চোখে বজ্র-মেঘ লুকিয়ে ছিল, কিন্তু রানা রাজি হয়ে যাওয়ায় একটু থতমত খেল, দু'ঠোঁট একটু ফাঁক হয়ে গেল।

'পাঁচ মিনিটের মধ্যে কাপড় পাল্টে অস্ত্র নিয়ে তৈরি হতে হবে,' বলল রানা। 'এসো আমার সঙ্গে। কাশেম, তুমিও এসো। স্নাইপার হিসেবে থাকবে সঙ্গে।'

রবিনসন আর-ফোরটিফোর হাইড্রোলিক প্যাড থেকে আকাশে উঠে যেতেই বাঁক নিল মার্ভেল। গগলের নির্দেশে চারটে ম্যাগনেটোহাইড্রোডাইনামিক ইঞ্জিন প্রায় বিমানের গতি তুলল। তার আগেই অনিল ওদের হেলিকপ্টারকে কাভার দেওয়ার জন্য সৈকতে গ্যাটলিং গান দাগল। কয়েক সেকেণ্ডে খানের লোকজন জান-প্রাণ নিয়ে পালাল।

ক্যাপ্টেন সিরাজ রবিনসনের বাম পাশের সিটে বসেছে। পাশে রানা। পিছনের বেঞ্চ সিটে জুডি ও কাশেম। প্রত্যেকে দরকারি ইকুইপমেন্ট নিয়েছে, সঙ্গে যার-যার পছন্দের অস্ত্র। কাশেমের কোলে একটা .৫০ ক্যালিবারের বেরেটা স্নাইপার রাইফেল। ছোট্ট হেলিকপ্টারে ঠাসাঠাসি হয়ে গেছে ওরা। ক্যাপ্টেন সাগর বেড় দিয়ে থাকা সৈকতের দিকে গেলেন না, ইয়ার্ডের অনেকখানি জায়গা এড়িয়ে উত্তর দিকে চললেন।

'সৈকতের এক মাইল পরে আছে একটা কম্পাউণ্ড,' হেলোর ইন্টারকমে বলল জুডি। 'কর্তৃপক্ষ ওখানে বাস করে। গত এক সপ্তাহ ওখানে চোখ রেখেছি। অন্য বাংলোগুলোর চেয়ে অনেক বড় একটা বাংলো আছে—ওটাই মুদাস্‌সর আলী খানের।'

'কতজন গার্ড থাকে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'অন্তত দশজন। তবে রাত বারোটার পর ওখানে কম গার্ড থাকে। আমরা এখন হামলা করলে ওরা সুবিধে করতে পারবে না।'

রানা বুঝতে পারছে আজ রাতে ওরা সতর্ক থাকবে। 'ওই বাংলোতে যাওয়ার পথ কোনটা?'

'উত্তর থেকে দক্ষিণে গেছে একটা রাস্তা, মুদাস্‌সর আলীর বাংলো তার বামে।'

'রাস্তায় গাড়ি চলাচল কেমন?'

'লরি যায়-আসে, ওগুলো জাহাজের প্লেট নিয়ে স্টিল প্ল্যান্টে পৌঁছে দেয়।

তবে সন্ধ্যার পর ওগুলো কমই চলে।'

'ঠিক আছে, আমরা চলে এসেছি,' বললেন সিরাজ। রবিনসনের নাকে বসে থাকা নাইট ভিশন ক্যামেরার সঙ্গে সংযুক্ত আছে তাঁর হেলমেট। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন। 'মিস স্টিভেনসন যে জায়গার কথা বলেছে, সেটা সামনেই। প্রচুর বাতি জ্বলছে। লোকজন গিজগিজ করছে। প্রায় সবার হাতে অস্ত্র।'

'ওদের রেঞ্জের বাইরে থাকুন। দেখতে চাই কী করে।'

'কম্পাউন্ডের ওপাশে একটা প্যাড আছে,' বললেন সিরাজ। 'ওখানে একটা জেটরেঞ্জার বসে আছে। এইমাত্র ওটার রোটর ঘুরতে শুরু করল।'

'আমরা ওটার পিছু নিতে পারব?' জিজ্ঞেস করল জুডি।

'জেটরেঞ্জারের গতি আমাদের চেয়ে অন্তত চল্লিশ নট বেশি,' বলল রানা। 'রেঞ্জও বেশি, আমাদের চেয়ে একশো মাইল দূরে যাবে।' ঘাড় ফিরিয়ে কাশেমকে দেখল। 'কী মনে হয়, কাশেম?'

স্নাইপার হিসেবে এসেছে আবু কাশেম। লাজুক হাসল। 'মাসুদ ভাই, পারব। আমি না পারলে আপনি তো আছেনই!'

'এটুকু জায়গায় বসে? পারব না!'

'লজ্জা দেবেন না, মাসুদ ভাই।' গম্ভীর হয়ে গেল কাশেম, কাঁধ থেকে হার্নেস খুলে ফেলল। 'ক্যাপ্টেন, আমাকে স্থির রাখুন।' দরজা খুলে ফেলল সে। সঙ্গে সঙ্গে কেবিনের সবাই রোটর থেকে ছুটে আসা প্রচণ্ড বাতাসের ঝাপটা খেল।

বেরেটা রাইফেলটা দেখতে বিশ্রী, লম্বায় প্রায় পাঁচ ফুট। ওজনটা অতিরিক্ত, তবে এক্সপার্টের হাতে পড়লে ওটা জাদু দেখাতে পারে। .৫০ ক্যালিবারের আধ ইঞ্চি ব্যাসের বুলেটগুলো একমাইল দূরে ঠিক জায়গায় আঘাত হানতে সক্ষম।

সিরাজ রবিনসন ঘুরিয়ে নিলেন। এবার দরজা থেকে সরাসরি জেটরেঞ্জার দেখা যাবে। দু'চারজন গার্ড ঝুলন্ত রবিনসনকে গুলি করল, কিন্তু তারাও জানে দূরত্ব অনেক বেশি। কাশেম বিরাট রাইফেলটা কাঁধে তুলে নিল, নাইট ভিশন স্কোপের সাইটে চোখ রাখল। অপটিক্স-এ দুনিয়াটা সবুজ লাগল, মনে হলো খুব কাছ থেকে সব দেখা যাচ্ছে। গার্ডদের চেহারায় অসন্তোষ, চপারের দিকে গুলি করছে তারা, কিন্তু এটাও বুঝতে পারছে এত দূর থেকে গুলি করে কোনও লাভ নেই। চারপাশ দেখল কাশেম, তারপর মনোযোগ দিল বসে থাকা জেটরেঞ্জারের উপর। পরিষ্কার দেখা গেল, ওটার টারবাইন থেকে এক্সজস্ট বেরিয়ে আসছে, তপ্ত বাতাস সরে যাচ্ছে।

কাশেমের রাইফেল কামানের মত গর্জন ছাড়ল। কাঁধে প্রচণ্ড ধাক্কা সহ্য করল ও, কিন্তু সাইট থেকে চোখ সরাল না। গার্ডরা রাইফেলের গর্জন শুনবার আগেই বুলেট পৌঁছল, তারা টের পাওয়ার আগেই ধ্বংসযজ্ঞ শুরু হয়ে গেল। বিস্মিত হওয়ার আগেই তাদের সর্বনাশ হলো। জেটরেঞ্জারের রোটর দণ্ডটা হেলিকপ্টারের সবচেয়ে দুর্বল জায়গা, বুলেট ওখানে গিয়ে লাগল—সঙ্গে সঙ্গে ঘুরন্ত দণ্ড থেকে খসে গেল রোটর। প্রকাণ্ড দুটো কাঁচির মত ছিটকে গেল রোটরগুলো। একদল গার্ড শোল্ডার-ফায়ার্ড মিসাইল নিয়ে কাজ করছিল, এক জোড়া রোটর তাদের উপরে গিয়ে পড়ল, লোকগুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। দৃশ্যটা দেখে কাশেমের মত

দক্ষ কমাণ্ডোও ভ্রূ কুঁচকে ফেলল।

দ্বিতীয় রোটর মাউন্টে বসে থাকা বিরাট ফিউল ট্যাঙ্কে গিয়ে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন এভিয়েশন গ্যাস বিস্ফোরিত হলো। স্কোপের লাইটের ফিল্টার কাশেমকে পুরোপুরি রক্ষা করল না। চোখ সরিয়ে রাইফেলের উপর দিয়ে তাকাল ও। জেটরেঞ্জার যেখানে আছে তার একটু দূরেই এখন আগুনের বিরাট একটা ছাতা গজিয়েছে, ওটা চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল। আগুনের গোলকটা দ্রুত উপরে উঠছে। ট্যাঙ্কের একশো ফুটের মধ্যে যারা ছিল, প্রচণ্ড কংকাশনে ছিটকে পড়ল। পঞ্চাশ ফুটের মধ্যে যারা ছিল ঝলসে মারা গেল।

'কয়েকজনের মুভমেন্ট দেখছি,' বললেন সিরাজ। 'জেট-রেঞ্জারের পেছনের দরজা খুলে গেছে। এক লোক দৌড়ে সরে যাচ্ছে। লম্বা দাড়ি আছে।'

'সম্ভবত ওইটাই মুদাস্‌সর আলী খান,' বলল জুডি। 'কোনদিকে যায়?'

'একটু অপেক্ষা করুন।' সিরাজ কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে দেখলেন। 'একটা গাড়ির দিকে ছুটছে এখন। ওটা বড়সড় একটা মার্সিডিজ সেডান। পিছনের সিটে উঠছে। সে ছাড়া শুধু ড্রাইভার আছে গাড়িতে।'

'আমি কি লোকটাকে গুলি করব, মাসুদ ভাই?' জিজ্ঞেস করল কাশেম। রাইফেলটা আবারও কাঁধে তুলে নিয়েছে।

'এখনই না,' বলল রানা। 'রাস্তায় বেরিয়ে যাক, তখন ওর গার্ডরা ওকে বাঁচাতে পারবে না। লোকটাকে হাতে পেতে চাই।'

'সে কাউকে রেডিয়ো করেছে,' বললেন সিরাজ। 'একটা গাড়ি রেসিডেন্সিয়াল কম্পাউণ্ড ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। ওটার ভিতরে অন্তত তিনজন লোক। মুদাস্‌সর খানকে সহজে পাওয়া যাবে না।'

চট্ করে ঘড়ি দেখল রানা। তিরিশ মিনিটের তিন ভাগের এক ভাগ শেষ হয়ে গেছে এরইমধ্যে। মার্ভেল প্রতি মুহূর্তে আরও দূরে সরে যাচ্ছে।

দুই গাড়ির হেডলাইট জ্বলে উঠল। ওরা দ্রুত গতি তুলে রওনা হলো। বাঁক নিয়ে পিছনের গেটে চলে গেল, তারপর প্রধান সড়কে পড়ে দক্ষিণে ছুটল। অন্ধকার জঙ্গল যেন রাস্তাটা ঘিরে রেখেছে। দূর থেকে মনে হলো ছুটন্ত গাড়িগুলো সুড়ঙ্গে ঢুকেছে। মাঝে মাঝে হেডলাইটের প্রভা দেখা গেল। ক্যাপ্টেন সিরাজ রবিনসন নিয়ে পিছু নিলেন, আড়াই মিনিট পর গাড়ি দুটো পিছনে ফেললেন।

দ্বিতীয় ড্রাইভার সামনের গাড়ির পঞ্চাশ ফুট পিছনে ছুটছে। গাড়ি দুটো বড় কাছাকাছি, হিসাব কষল রানা। কাঁধে ঝুলন্ত ওয়েব হার্নেস থেকে একটা গ্রেনেড তুলে নিল। চপারের ডানপাশের দরজায় ছোট্ট একটা জানালা আছে, ওটা খুলে ফেলল। সাধারণত গ্রেনেডের ফিউজ হয় পাঁচ সেকেণ্ডের, এর ফলে কোনও ফক্সহোলে ফেললে বা ট্রুপস এগিয়ে এলে কোনও সমস্যা হয় না। তবে ওই গাড়ি দুটো নব্বুই মাইল গতিতে ছুটছে, ঘড়ির কাঁটা এক সেকেণ্ড পার হতে না হতে চলে যাচ্ছে একশো ফুট দূরে।

গ্রেনেডের পিন খুলে ফেলল রানা, সতর্কতার সঙ্গে শক্ত করে স্পুন ধরে রাখল। হাত বের করে দিল জানালা দিয়ে। হাতের আন্দাজে গ্রেনেডটা ঠিক জায়গায় ফেলতে হবে। অঙ্কের হিসাব কষে লাভ হবে না। গ্রেনেডের স্পুন রিলিজ

করল রানা, একমুহূর্ত অপেক্ষা করল, তারপর বোমাটা ছেড়ে দিল।

মুহূর্তে গ্রেনেডটা অন্ধকারে হারিয়ে গেল, যেন গপ করে গিলে নিল কেউ। আরও এক সেকেণ্ড পর মার্সিডিজের ড্রাইভার এঁকেবেঁকে সরে গেল। সে গাড়ির ট্রাঙ্কে ভারী কিছু পড়তে শুনেছে। জিনিসটা পিছনের রাস্তায় গিয়ে পড়ল, ড্রপ খেয়ে অ্যাসফল্টের উপর দিয়ে ছুটল। পিছনের গাড়ির চালক জানে না সামনে কী পড়েছে, দেখবার কথাও নয়—তার গাড়ি ওটার উপর দিয়ে ছুটল। মিলি সেকেন্ড পার হলো। রানা আন্দাজ করল গ্রেনেডটা ভুল জায়গায় ফেলেছে। পিছনে হাত বাড়িয়ে থলি থেকে আরেকটা গ্রেনেড তুলে নেবে, এমনসময় নীচেরটা গাড়ির গ্যাস টাঙ্কির নীচে ফাটল।

আধ সেকেণ্ড এদিক-ওদিকে দুটো বিস্ফোরণ ঘটল। গ্রেনেডের চাপা আওয়াজটার সঙ্গে মিশে গেল গ্যাসোলিনের বিস্ফোরণ। গাড়ির পিছনের দিকটা রাস্তা থেকে উঠে গেল, পরমুহূর্তে গাড়ি নাক উঁচু করল, দাঁড়িয়ে গেল নাকের উপর, উল্টে পড়ল। ওটার ছাদ এখন মেঝে হয়ে গেছে। ঘসটে এগিয়ে গেল, কয়েকবার উল্টোপাল্টা ডিগবাজি খেল। জ্বলন্ত পেট্রল ওটাকে গিলে নিল। ধ্বংসস্তূপটা রাস্তার ধারে একটা গাছে গিয়ে ধাক্কা খেয়ে থামল।

মুদাস্‌সর আলী খানের ড্রাইভার রিয়ারভিউ মিররে দেখেছে কী ঘটেছে। অজান্তেই গতি কমিয়ে ফেলেছে সে। সুযোগটা নিল কাশেম। এদিকে ক্যাপ্টেন সিরাজ হেলিকপ্টার নামিয়ে এনেছেন অনেক নীচে, এখন মার্সিডিজের পঞ্চাশ ফুট ডানে চলেছেন। গাছগুলো না থাকলে নেমেই পড়া যেত। কাশেম কাঁধে রাইফেল তুলে নিয়েছে, দেরি না করে গুলি ছুঁড়ল। সাধারণ বুলেট শুধু টায়ার ফুটো করত, কিন্তু .৫০ ক্যালিবারের বুলেট ফ্রন্ট অ্যাক্সেলের কাছে স্প্লাইন চুরমার করে দিল। আটকে গেল হুইল আর হাব। সঙ্গে সঙ্গে টায়ার গাড়ি থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল। ভারী মার্সিডিজের অ্যাক্সেল ছুটন্ত অবস্থায় চুরমার হলো। গাড়িটা রাস্তা ঘষে এগিয়ে চলল। চারপাশের রাস্তা স্ফুলিঙ্গে ভরে উঠল। গাড়ির গতি দ্রুত কমে এল। ড্রাইভার রাস্তায় টিকে থাকতে আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

কাশেম সামনের হুডের ভিতরে দুটো বুলেট পাঠিয়ে দিল, মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'আর যাবে না কোথাও।' নষ্ট হয়ে যাওয়া রেডিয়েটার থেকে তপ্ত বাষ্প ছিটকে বেরল।

ক্যাপ্টেন সিরাজ মার্সিডিজের পঁচিশ ফুট সামনে রাস্তায় নামলেন। গাড়িটা তখনও ধীরে এগিয়ে আসছে। তারপর ঝাঁকি খেয়ে থেমে গেল। তার আগেই হেলিকপ্টার থেকে নেমে পড়েছে রানা, কাশেম ও জুডি—ছুটল ওরা গাড়ির দিকে। রানা ও কাশেমের হাতে এখন M-4A2 অ্যাসল্ট রাইফেল। জুডি মার্ভেলের আর্মারি থেকে একটা বেরেটা সেমি-অটোমেটিক পিস্তল নিয়েছে।

ওরা দশ ফুট পেরতেই গাড়ির সামনের দরজা খুলে গেল, ড্রাইভার বেরিয়ে এল, শত্রুদের দেখে মুহূর্তে দরজার আড়াল নিল। লোকটার হাতে মেশিন-পিস্তল, ব্রাশ ফায়ার করল। ভয়ে অস্থির হয়ে আছে সে, বুলেটগুলো কারও দিকে গেল না। তার আগেই রাস্তায় শুয়ে পড়েছে রানা, কাশেম ও জুডি। এম-ফোর দিয়ে গুলি করল কাশেম। গাড়ির দরজা দিয়ে ৫.৫৬ এমএম বুলেটগুলো ঢুকল, ভিতরে

ভ্রমরের মত ছোটাছুটি করল। বুলেট-প্রুফ গ্লাস আঘাতে আঘাতে ঘোলা হয়ে গেল।

রানা আন্দাজ করছে, মার্সিডিজটা আর্মার্ড। দরজার তলা দিয়ে গুলি করল ও। প্রথম বুলেট ড্রাইভারকে ছুঁলো না, দ্বিতীয় বর্ষণে লোকটার এক হাঁটু চুরমার হলো। ডানপায়ের গোড়ালি ফুটো হয়ে গেল। আর্তনাদ বের হলো হাঁ করা মুখ থেকে, দরজা ধরে রাখতে চাইল ড্রাইভার, কিন্তু ভিতর থেকে তাকে ধাক্কা দেয়া হলো—দরজাটা দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল। ড্রাইভার আবার অস্ত্র তাক করতে গিয়ে বুকে জুডির গুলি খেল, ছিটকে ফেণ্ডারে গিয়ে পড়ল। ওখান থেকে নামল রাস্তায়, একটা স্তূপের মত পড়ে থাকল।

ক্রল করে মার্সিডিজের পিছন দরজার কাছে চলে এল রানা, হ্যাণ্ডেল টানল। লক করা। পয়েন্ট-ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গ্লাসে বেশ কয়েকবার গুলি করল ও। ল্যামিনেট করা শক্ত গ্লাস চ্যাপটা বুলেটগুলোকে ফিরিয়ে দিল। জানালাতে ব্যারেলের মাযল দিয়ে গুঁতো মারল রানা, কয়েকবার আঘাত করবার পর ছোট্ট একটা গর্ত তৈরি হলো। সরে দাঁড়িয়ে ম্যাগাজিন পাল্টে নিল। কাশেম সেই সুযোগে গুঁতিয়ে গর্তটা আরও বড় করল। কাঁচগুলো চারপাশে ছিটকে পড়ল, চপারের আলোয় মনে হলো ওগুলো জ্বলজ্বলে হীরার খণ্ড।

রিলোড হয়ে গেছে রানার, কাশেমের কাঁধে টোকা দিয়ে বুঝিয়ে দিল, ওরা আপাতত গুলি করবে না।

'মুদাস্‌সর, তোমাকে তিন সেকেণ্ড সময় দেব আমি,' বলল রানা। 'এরইমধ্যে দু'হাত বাইরে রাখবে তুমি।' গাড়ির ভিতর থেকে কথা শোনা গেল না। 'ওয়ান... টু... থ্রি!'

রানা ও কাশেম একইসঙ্গে গুলি ছুঁড়ল। গর্তের মধ্যে গুলি ঢুকছে, বুলেটগুলো উল্টো দিকের জানালায় গিয়ে আঘাত হানছে। কয়েকটা বুলেট পিছনের সিটে গিয়ে গাঁথল। কিছু লাগল আর্মার্ড প্লেটিঙে। বুলেট তীক্ষ্ণ খটাখট আওয়াজ তুলে ঘুরছে ভিতরে। গতি কমলে কোথাও না কোথাও ঢুকছে। রাইফেলের গর্জনের উপর দিয়ে কর্কশ একটা চিৎকার শোনা গেল। একটা একটা করে গুলি করছে রানা ও কাশেম, থামছে না।

'মুদাস্‌সর?' ডাক দিল রানা।

চেঁচিয়ে উঠল লোকটা, 'গুলি লেগেছে আমার! হায় রে আল্লাহ্‌, আমি মারা যাচ্ছি!'

'জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে দাও,' বলল রানা। 'নইলে ভেতরে গ্রেনেড ফেলব।'

'আমি নড়তে পারছি না! তুমি আমার দু'পা প্যারালাইজ করে দিয়েছ!'

রানা-কাশেম ভাল করেই জানে, লোকটাকে বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু শয়তানটাকে হাতে পেতে হবে। গাড়ির ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিল রানা, হ্যাণ্ডেলে চাপ দিল। কাশেম রাইফেল হাতে তৈরি থাকল। ফোকরের ভিতর দিয়ে চারপাশ দেখা যায় না, কিন্তু তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। দরজা খুলে যাওয়ায় ইন্টেরিয়ার লাইট জ্বলে উঠল। মুদাস্‌সর মেঝেতে বসে, একটা টার্গেট পেতেই মেশিন-পিস্তল

তুলে গুলি করল। তার নিশানা ড্রাইভারের চেয়েও খারাপ। বুলেটগুলো আর্মার্ড দরজায় বিঁধল। অল্পের জন্য বেঁচে গেল কাশেম, ছিটকে সরে গেছে। হাজারো ঘণ্টার ট্রেইনিং ওকে বলে দিল, এখনই গুলি করতে হবে। রাইফেল তুলল কাশেম, কিন্তু তার আগেই রানার ওয়ালথারের প্রথম বুলেটটা ঢুকল খানের মুখ গহ্বরে। দ্বিতীয়টা বাম চোখে ঢুকে মাথার পিছন দিয়ে বেরিয়ে গেল। হলদেটে মগজ ছিটকে গিয়ে ওপাশে পড়ল।

রাইফেল নামিয়ে নিল কাশেম। ওর দিকে তাকাল রানা, কাঁধ ঝাঁকাল। 'লোকটা আমাদের ফাঁকি দিয়ে চলে গেল।'

ওদের মাঝখান দিয়ে এগোল জুডি, গাড়ির ভিতরে উঁকি দিল। শ্বাস আটকে ফেলল করডাইটের কটু গন্ধে। মগজ, রক্তের আঁশটে ঘ্রাণটা বিশ্রী। মুদাস্‌সর আলী খান চওড়া সিটের পায়ের কাছে পড়ে আছে। জুডি ভিতরে ঢুকল, দু'হাতে লাশটা সরাল। খানের বুকের তলা থেকে একটা চামড়ার বিলফোল্ড বের করে নিল, মানিব্যাগটাও। ওগুলো রানার হাতে দিল। সিটের কুশনের নীচে একটা ব্রিফকেস পাওয়া গেল। আরও কিছু থাকতে পারে। চারপাশ ভাল করে দেখল। তবে আর কিছু নেই।

পিছিয়ে বেরিয়ে এল জুডি, প্যান্টের পায়ে দু'হাত মুছল। 'কানাগলিতে আটকে গেলাম আমরা, তা-ই না, রানা?' রবিনসনকে নিয়ে অপেক্ষা করছেন ক্যাপ্টেন সিরাজ। ওদিকে দেখাল জুডি। 'খানের লোকজন দ্রুতই সামলে নেবে, মালিকের পেছন পেছন আসবে। আমার মনে হয় আমাদের চলে যাওয়া উচিত। রানা, তুমি কী বলো?'

'চলো, ফিরব আমরা,' ঘুরে দাঁড়াল রানা, চপারের দিকে পা বাড়াল।

সিরাজ ওদের আসতে দেখে রোটরের গতি বাড়ালেন, টেকঅফের জন্য তৈরি হচ্ছেন। খুদে খুদে কাঁকর চারপাশে ছিটকে পড়ছে। ধুলো উড়ছে। সবাই কুঁজো হয়ে কেবিনের দিকে চলল। তার ফাঁকে একবার মার্সিডিজ দেখল রানা, জুডির কানের কাছে মুখ নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'জুডি, তুমি তা হলে লয়েড্‌স্‌-এর ইনভেস্টিগেটর?'

প্রশ্নটা শুনে হেসে ফেলল জুডি। কাঁধ ঝাঁকাল। 'আমি লয়েড্‌সে যোগ দেয়ার আগে হার ম্যাজেস্টি'জ সার্ভিসে কাজ করতাম। আর কিছু না!'

'কী কাজ করতে?'

হোলস্টারে চাপড় দিল জুডি। 'সামান্য ট্রাবল-শ্যুটিং।'

হেলিকপ্টারে উঠে পড়ল ওরা। সিরাজ টেকঅফ করলেন। ছুটে চললেন মার্ভেলের দিকে।

রানা বলল, 'সামান্য ট্রাবল-শ্যুটিং, জুডি?'

'আর কী?' জুডি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকল।

আট

খালি গায়ে ট্রাউজার্স পরে নকল ব্রিজে বসে আছে রানা। প্রায় উড়ে চলেছে মার্ভেল। পোর্টে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। আকাশে এখন নানা রঙের খেলা। অনেক উত্তরে কামচাটকা পেনিনসুলায় অসংখ্য পর্বত-চূড়া, ওগুলো থেকে আগ্নেয় ছাই ও ধুলো উঠছে আকাশে। আজকের দিন প্রায় পেরিয়ে গেল, কিন্তু ব্রিজে এখনও গরম লাগছে। ও শুনেছে, এদিকের সাগরে এরকম আবহাওয়া হলে প্রচণ্ড ঝড় আসে।

পুব চিন সাগর ও জাপান সাগরের চিহ্নিত নৌপথ এড়িয়ে যাচ্ছে গগল। ওখানে প্রচুর জাহাজের ভিড়। কাজেই ফিলিপাইনস দ্বীপপুঞ্জ ছাড়িয়েই মার্ভেল নিয়ে পুবে সরে গেছে ও, জাপানের প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূল ঘেঁষে চলেছে এখন।

এদিক দিয়ে যাওয়ার পরেও কেউ যদি মার্ভেলকে প্রতি ঘণ্টায় পঞ্চাশ নট গতিতে ছুটতে দেখে, তো কিছু করবার নেই। ওরা অবশ্য মার্ভেলের ইকুইপমেন্ট দিয়ে চারপাশের রেইডার জ্যাম করেছে। তবে কেউ দেখে ফেললে হৈ-চৈ উঠবেই। দু' ঘণ্টা পর মার্ভেল টোকিয়ো শিপিং লেন পেরিয়ে যাবে, তারপর থেকে সাগরে অল্প জাহাজই থাকবে। তখন আর গাড়ি বহনকারী ক্যারিয়ার বা কন্টেইনার শিপ নিয়ে চিন্তা নেই, বারবার ঘুরে এগোনোর ঝামেলা থাকবে না।

মাঝে মাঝে পথ বদলে নিতে হচ্ছে, তবে তা কয়েক মিনিটের জন্য। ওরা জানে, হাতে বাড়তি সময় নেই। ফু-চুং এখনও দু'দিনের পথ দূরে। এদিকে পেদ্রোপাভ্‌লোভস্ক-এ আটকা পড়া রাশান ভলকানোলজিস্টরা জানিয়েছেন, যে-কোনও সময় ভয়ঙ্কর অগ্ন্যুৎপাত হতে পারে। কামচাটকা পেনিনসুলায় বারবার প্রবল ভূমিকম্প হচ্ছে। একই চেইনের তিনটি আগ্নেয়গিরি ছাই ও বিষাক্ত গ্যাস ছুঁড়ছে। এখনও কোনও মানুষ মারা যাওয়ার খবর পাওয়া যায়নি, তবে কামচাটকায় জনবসতি কম থাকায় সম্পূর্ণ খবর এসে পৌঁছেনি।

নানান খারাপ খবরের মধ্যে একমাত্র ভাল খবর, ফু-চুঙের ট্র্যান্সমিটার এখনও কাজ করছে। তবে তাতেও সমস্যা রয়েছে। স্যাটালাইটের ডেটা অনুযায়ী, ফু-চুং আছে একটা সৈকতে, ওটার উত্তরে মাথা তুলেছে একটা আগ্নেয়গিরি—যে-কোনও সময় ওটা অগ্ন্যুৎপাত করবে। ডক্টর ফারাকে জিজ্ঞেস করেছিল রানা, ট্র্যান্সমিটারের বাহক মারা গেলে কতক্ষণ পর্যন্ত ট্র্যান্সমিশন চলবে। জবাবটা এখন জানে ও। এমনও হতে পারে ফু-চুং এক সপ্তাহ আগেই মারা গেছে, কিন্তু ট্র্যান্সমিটারটা এখনও কাজ করছে।

'এত কী ভাবছ, রানা?'

ব্রিজে বসে চুপচাপ ভাবছিল রানা, চমকে ঘুরে তাকাল। কণ্ঠটা চেনে ও। এক সেকেণ্ডের জন্য বিরক্ত হলো।

'দুঃখিত, চমকে দিতে চাইনি,' বলল জুডি।

'ঠিক আছে, অসুবিধে নেই,' বলল রানা। সামনের দিগন্তে চোখ রাখল। যদি কোনও ভাবে এই দূরের পথ কাছিয়ে আনা যেত!

'মনে হলো তুমি এটা পেলে খুশি হবে,' বলল জুডি। হাতে ফিলিপাইনের বিখ্যাত স্যান মিগুয়েল বিয়ার।

জুডি স্টিভেনসনের পরনে একটা সাদা লিনেনের স্কার্ট ও সবুজ পোলো শার্ট। পায়ে চটি স্যাণ্ডেল। পাগলা হাওয়া ওর চুলগুলো মুখের উপর নিয়ে এসেছে, এক হাতে ওগুলো সরিয়ে দিল। মেয়েটির দিকে তাকাল রানা। জুডির চোখ ওর চওড়া কাঁধ, কিলবিল করা পেটের পেশি, শক্তিশালী উরু দেখছে। তারপর সরে গেল দৃষ্টি।

দু'পা জানালার নীচের রেইলে রেখেছে রানা, নামিয়ে নিল, সোজা হয়ে বসল। নিজের উপরে একটু বিরক্ত। মেয়েটার উপস্থিতি ওকে সচেতন করে তুলেছে। মন বলছে, এই মেয়ের সামনে ওর অনেক বেশি স্মার্ট থাকা উচিত। নিজেকে চোখ রাঙাল। তুই চিনিস এই মেয়েকে, যে এর সামনে হিরোর মত আচরণ করতে হবে!

হাতের ইশারায় জুডিকে কাছের চেয়ারে বসতে বলল রানা। বিয়ারের বোতলটা নিয়ে দু'বার চুমুক দিয়ে বলল, 'থ্যাঙ্কস্। আসলে চিন্তায় ডুবে গিয়েছিলাম।'

আরামদায়ক চেয়ারে অর্ধেক ডেবে গেল জুডি। 'বন্ধুর কথা ভাবছিলে? ওঁর নাম বোধহয় ফু-চুং?'

'লিউ ফু-চুং। ঘনিষ্ঠ বন্ধু।'

'মিস্টার আহমেদের কাছে তোমাদের সবার ব্যাপারে খানিকটা শুনেছি,' বলল জুডি। 'তোমরা একদল লোক, খুনিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছ।'

'তোমাকে জাহাজ ঘুরিয়ে দেখাইনি বলে দুঃখিত,' বলল রানা। 'উচিত ছিল সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া।'

'জানি তুমি ব্যস্ত ছিলে। মিস উর্বশী দাশা আমাকে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে।' শার্টে হাত বোলাল জুডি। 'আমাকে তোমাদের ম্যাজিক শপ থেকে পোশাক ধার দেয়া হয়েছে।'

'আর তোমার কেবিন? ওটা পছন্দ হয়েছে?'

জুডির দু'চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। 'শুধু পছন্দ? লণ্ডনে আমার ফ্ল্যাট যতটা, কেবিনটা তার চেয়েও বড়!' হেসে ফেলল জুডি। 'আমি চলে যাবার পর ওই বাথরুমের মার্বেল টাবটা খুঁজে না পেলে আমাকে দোষ দিয়ো না! তোমাদের জাহাজের বাবুর্চি দুর্দান্ত রান্না করে, কুনার্ডকে হারিয়ে দিয়েছে। আমি ওর কাছ থেকে কয়েকটা নতুন পদ শিখেছি।'

'তা হলে মার্ভেলে খুব খারাপ লাগছে না?'

মাথা দোলাল জুডি। প্রসঙ্গ পাল্টাল, 'আসলে কী ঘটছে, রানা? তোমার ধারণা কী? মানুষগুলো নিয়ে কী করা হচ্ছে?'

'এ-মুহূর্তে আমরা শুধু আন্দাজ করতে পারি, আসলে কী ঘটছে আমরা জানি না,' বলল রানা। 'মনে নানান প্রশ্ন জাগছে, কিন্তু কোনও উত্তর জানা নেই।

মুদাস্‌সর আলী খান মারা যাওয়ায় আমরা লিঙ্কটা হারিয়েছি।'

'কিন্তু ফু-চুং বলতে পারবেন।'

চট্ করে চেয়ার ছাড়ল রানা, সামনের কাউন্টার থেকে পোর্টফোলিওটা নিয়ে জুডির হাতে দিল। 'এক ঘণ্টা আগে আমাদের কম্পিউটার ওটা পরীক্ষা করেছে। তুমি হয়তো ইন্টারেস্টিং কিছু পেয়ে যাবে।'

'জিনিসটা কী?' জিজ্ঞেস করল জুডি। পোর্টফোলিও মোলায়েম চামড়া দিয়ে মোড়া। খুলল।

'ওটা তুমি নিয়ে এসেছ। মুদাস্‌সর আলী খানের গাড়ির ভিতরে ছিল। দলবল নিয়ে যত জাহাজ হাইজ্যাক করেছে তার লিস্ট। কয়েক বছর হলো এরা প্রশান্ত মহাসাগরে জাহাজ হাইজ্যাক করছে। লিস্ট দেখে বেশ কিছু কেস বন্ধ করে দিতে পারবে। বেশির ভাগ জাহাজ খান ব্রেকার্স ইয়ার্ডে ভাঙা হয়ে গেছে। কিছু আছে, নতুন নামে সাগরে নেমেছে। ওগুলো বিভিন্ন দেশের পতাকা বহন করছে। মুদাস্‌সর খানের কোম্পানিগুলো ওসব চালায়।'

'আচ্ছা?' চোখ তুলে তাকাল জুডি।

'কপাল খারাপ যে দ্য চুহার সিস্টার শিপ দ্য চুহি সম্বন্ধে কিছু নেই ওখানে,' বলল রানা। 'মুদাস্‌সর খান ওটা নিয়ে কী করেছে জানতে পারলে ভাল হতো। আমার ধারণা ওটাও অনেক জাহাজ সরিয়েছে। খান ওটার হিসাব অন্য কোনও লেজারে রেখেছে।'

রানার চোখে তাকাল জুডি। 'আলাদা লেজারে রাখবে কেন?'

'জানি না কেন, কিন্তু মনে হচ্ছে তা-ই করেছে।'

'হয়তো দ্য চুহির উপরে তার নিয়ন্ত্রণ নেই।'

চেয়ারে বসল রানা, জুডির দিকে একটু ঝুঁকল। 'তুমি ভাবছ ভ্লাদিমিয়ার সরোকিন ওটা নিয়ে অন্য কিছু করছে?'

'এই জাহাজে এসে লোকটার নাম শুনেছি আমি,' বলল জুডি। 'মিস্টার আহমেদ, মিস্টার চ্যাটার্জি ও মিস দাশা আলাপ করছিল। আমি আগে কখনও ওই লোকের নাম শুনিনি।'

'আমরা জানি সে সোভিয়েত ব্যুরো অভ ন্যাচারাল রিসোর্সেস-এর কর্মকর্তা ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন বিলুপ্ত হওয়ার পর রাশা সরকারের কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেছে। সে কী করে জলদস্যু মুদাস্‌সর আলী খানের সঙ্গে জড়িয়ে গেল আমাদের জানা নেই।'

'কামচাটকায় কোনও মূল্যবান খনিজ আছে? সে যখন ব্যুরোর কাজ করত তখন কোনও রিপোর্ট দেখে থাকতে পারে। হতে পারে না? ওগুলো হীরা, অন্য রত্ন বা কোনও দামি ধাতু?'

'অনিল ডেটাবেজে খুঁজে দেখেছে। কামচাটকায় দামি কিছু নেই।'

জ্বলজ্বল করে উঠল জুডির চোখ। 'এমন যদি হয় জিনিসটা রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়নি? সরোকিন যখন সোভিয়েতদের কাজ করত তখন হয়তো রিপোর্টটা তার ডেস্কে আসে, সে বুঝতে পারে ওই দামি জিনিস প্রচুর পরিমাণে আছে। কাজেই সে আবিষ্কারের রিপোর্টটা কবর দিয়ে ফেলল?'

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। 'অসম্ভব নয়। কামচাটকায় অনেক মানুষ নিয়ে যাওয়া হয়েছে আমরা জানি। এমন হতেই পারে, ভ্লাদিমিয়ার সরোকিন হয়তো তাদের নিয়ে গিয়ে কোনও খনিতে ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাজ করাচ্ছে।' চট্ করে মোবাইলটা বের করল রানা, ডায়াল করবার পর তৃতীয় রিঙে মার্ভেলের প্রাইভেট সেলুলার সিস্টেমে অনিলকে পাওয়া গেল। 'অনিল। তুই এখন কোথায়?'

'ম্যাজিক শপে, আমার ভাঙা রিস্টওয়াচ মেরামত করিয়ে নিচ্ছি,' বলল অনিল।

'এক কাজ কর্, দোস্ত। একটা কম্পিউটার টার্মিনালের কাছে চলে যা, জরুরি,' বলল রানা। 'আমাদের জানা দরকার মারকিউরি কোন্ ধরনের খনির কাজে লাগে।'

'টার্মিনাল কাছেই আছে, একটু দাঁড়া,' বলে ফোন রেখে দিল অনিল।

'মারকিউরি নিয়ে কী ভাবছ?' জিজ্ঞেস করল জুডি।

'ট্রলার নিয়ে জলদস্যুরা আমাদের আক্রমণ করেছিল, তোমাকে বলেছি,' বলল রানা। 'ডক্টর ফারা তাদের লাশ অটোপসি করেছে। ওসব দেহে প্রচুর মারকিউরি পাওয়া গেছে। সবাই ছিল ওই বিষে আক্রান্ত।'

'তোমার ধারণা কামচাটকায় ওরা পারদ বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিল?'

'মৃত ইমিগ্র্যান্টদের দেহে কিন্তু পারদের বিষ পাওয়া যায়নি,' বলল রানা। 'জলদস্যুদের দেহে ছিল। এরা হয়তো নিয়মিত কামচাটকায় ইমিগ্র্যান্ট নিয়ে যেত। তখন তাদের গার্ডের ডিউটি দেয়া হতো। যে-কারণেই হোক, এদের দেহে বিষ ঢুকে গেছে।'

ওরা দু'জন চুপ হয়ে গেল। দিগন্তের দিকে তাকিয়ে থাকল। পাঁচ মিনিট পেরিয়ে যাওয়ার পর রানার ফোন মিষ্টি সুরে বাজল। রিসিভ করেই জিজ্ঞেস করল রানা, 'কী পেলি, অনিল?'

'সোনা হচ্ছে একমাত্র ধাতু যেটার সঙ্গে পারদ মিশে থাকতে পারে,' বলল অনিল। 'পারদ সোনার "ওর" থেকে খাঁটি সোনা সরিয়ে নিতে ব্যবহৃত হয়। পরিবেশ ও মানুষের দেহে ভয়ঙ্কর প্রভাব ফেলে বলে বহু দেশে পারদ ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। তবে এখনও দক্ষিণ আমেরিকায় এভাবে সোনা পরিশুদ্ধ করা হয়। ...আর কিছু, দোস্তো?'

'চলবে, অনিল, থ্যাঙ্কস্!' বলল রানা। 'রাখি।' ফোন রেখে দিয়ে জুডির দিকে তাকাল। 'কামচাটকায় সোনার খনিতে কাজ চলছে।'

'ভ্লাদিমিয়ার সরোকিন ওই মানুষগুলোকে ক্রীতদাসের মত খাটিয়ে নিচ্ছে, আর মুদাস্‌সর আলীর কোম্পানি মানুষ যোগাড় করে দেয়ার দায়িত্বে ছিল,' বলল জুডি। 'এরা রাশান গভর্নমেন্টের নাকের ডগায় বসে নিজেদের কুকীর্তি চালাচ্ছে!'

'তা-ই তো মনে হয়।'

'আমরা এখন জানি কারা কী করছে,' বলল জুডি। 'কিন্তু এবার জানতে হবে কেন করছে।'

'হ্যাঁ, সেটা জানতে হবে,' কর্কশ হয়ে গেল রানার কণ্ঠ।

ওর কণ্ঠে এমন কিছু আছে, যার কারণে জুডি বলল, 'কী ভাবছ তুমি, রানা?'

'মুদাসসর আলী খানের জলদস্যুতার দিন শেষ, তোমার কাজ এখন শেষ,' বলল রানা। 'কিন্তু আমাদের কাজ মাত্র শুরু। জানি না কামচাটকা পেনিনসুলায় পৌঁছে কী দেখব, তবে মনে হচ্ছে ওখানে আমাদের রীতিমত লড়াই করতে হবে। মুদাস্‌সরের চেয়ে বড় মাপের শয়তানের সঙ্গে টক্কর লাগবে ওখানে।'

'তুমি আরও কিছু বলতে চাও,' বলল জুডি। খানিকটা ভয় পাচ্ছে ও, আন্দাজ করছে রানা কী বলবে।

'আর এসবের সঙ্গে তোমার না জড়ানোই ভাল। আমরা জাপানের উত্তর প্রান্তে থামতে পারি, তোমাকে কপ্টারে তুলে পৌঁছে দিতে পারি। তাতে বড়জোর একটা ঘণ্টা সময় হারাব।'

রানার কথা শেষ হওয়ার আগেই রাগে টকটকে লাল হয়ে গেল জুডি, চট্ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ঝুঁকে এল রানার নাকের এক ইঞ্চি দূরে। 'আমি গত ছ'মাস ধরে তদন্ত করছি, মিস্টার রানা! জাগ্রত প্রতিমুহূর্তে এই তদন্ত নিয়ে ভেবেছি। অনেক লড়াই করে রয়েল জিয়োগ্রাফিক সোসাইটির এক্সপিডিশনে এসেছি। জলদস্যুদের ঠেকাতে পারিনি। অ্যাভালাঞ্চে আমার বন্ধুরা ছিল। এই দানবগুলো ওদের খুন করেছে। আমি তখনই প্রতিজ্ঞা করেছি, যদি বাঁচি তো প্রতিশোধ নেব। এই পিশাচগুলোকে ছাড়ব না! মিস্টার রানা, তুমি ভেবেছ তুমি চাইলেই তোমার কথা মত সুড়সুড় করে চলে যাব আমি, তা-ই না? তা-ই ভেবেছ? না?'

কয়েক সেকেন্ড পরস্পরের দিকে দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। কড়া চোখে পরস্পরকে দেখছে। কেউ কাউকে ছাড় দিল না। রানা জানে এই মেয়ের দুঃসাহসী একটা মন আছে, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিও রাখে। ও জানে, এই মেয়ে কিছুতেই প্রতিজ্ঞা থেকে সরবে না।

কাঁধ ঝাঁকাল রানা, নরম স্বরে বলল, 'তুমি এখন জানো ইচ্ছে করলে চলে যেতে পারো। আমরা কামচাটকায় চাইলেও তোমাকে নিরাপত্তা দিতে পারব না।'

রানার কণ্ঠ শুনে আঁচ করল জুডি, ওকে চলে যেতে বাধ্য করা হবে না। মুহূর্তে ওর রাগ দূর হয়ে গেল, মৃদু হাসল। দু'জনের মুখ এক ইঞ্চি দূরে, কিন্তু ওদের মনে হলো ওরা আছে হাজারো মাইল দূরে। দীর্ঘশ্বাস ফেলল জুডি, 'আমি আশা করছি না তোমরা নিরাপত্তা দেবে। তোমরা যখন ওই ক্রিমিনালগুলোকে ধরবে, তখন আমি ওখানে থাকতে চাই।' কেন যেন রানার ঠোঁটে চুমু দিতে ইচ্ছে হলো ওর, কিন্তু অনেক কষ্টে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। বিয়ারে চুমুক দিয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'বেশ!'

নয়

ফু-চুং মনে মনে স্বীকার করেছে, যারা ওদের আটকে রেখেছে, তারা নিজেদের কাজ বোঝে—পালাবার কোনও পথ রাখেনি। টিলার ওপাশের পর্বতটা মাথার উপরে ঝুলে আছে। সর্বক্ষণ ছাই ছুঁড়ছে। ছাইগুলো কয়লার মত কালো, মৃত্যু-সৈকতে নেমে আসছে। কিছুক্ষণ পর পর থর-থর করে কাঁপছে জমি। তাল মিলিয়েছে পাগলা হাওয়া। সমুদ্র সীসার মত ধূসর হয়ে গেছে, উন্মত্ত হয়ে উঠছে। প্রহরীদল ওদের কোনও ছুটি দেয়নি, প্রতিনিয়ত খাটিয়ে নিচ্ছে। নিজেদের জন্য প্রহরীদের আলাদা পরিকল্পনা আছে। লাভা উদ্গিরণ হলে জাহাজ নিয়ে সরে যাবে। বয়লারগুলো প্ল্যান্ট থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। তবে বয়লারে এখনও আগুন জ্বলছে। যতক্ষণ সম্ভব সোনার বিশোধন চলবে। শ্রমিকরা চাবুক বা মুগুরের মুখে কাজ করে যেতে বাধ্য হচ্ছে। ক্রীতদাসরা একের পর এক বাস্কেট কাদা দিয়ে ভরছে, নীচে এনে স্লুইস বক্সে ফেলছে মানুষের রক্তের বিনিময়ে সোনার কণা উদ্ধার চলছে। সন্ধ্যা হওয়ার পর ক্রীতদাসদের বন্দিশালায় নামিয়ে এনে তালা মেরে আটকে রাখা হচ্ছে। ভোর হলেই আবারও রক্ত-পানি করা পরিশ্রম, সেই সঙ্গে নির্মম নির্যাতন।

ড্রাই-ডকটা উপসাগরে ভাসছে। টাগ-বোটের ক্রুরা ওখানে কাজ করছে। ডকের পেট থেকে আরেকটা জাহাজ খালাস হচ্ছে। কাজটা শেষ হলে ড্রাই-ডকের ওজন অনেক কমে যাবে। পাগলা সমুদ্র নানাভাবে বাধা দিচ্ছে, নইলে অনেক আগেই জাহাজটা সরিয়ে নেওয়া হতো। ফু-চুং এক দাড়িওয়ালা যুবককে দেখেছে, প্রকাণ্ডদেহী লোকটা ছিল সরোকিন নামের এক রাশানের সঙ্গে। দু'জন তর্ক করছিল। দাড়িওয়ালা বলছিল সে লাভা উদ্গিরণের আগেই ড্রাই-ডকটা সরিয়ে নেবে। ওটার ভিতরের জাহাজটা সরিয়ে ফেললে আর হত্যাকাণ্ডের কোনও প্রমাণ থাকবে না।

সৈকতে যেসব পুরোনো জাহাজ আছে, সেগুলো অর্ধ ডুবন্ত—কিন্তু ওই জাহাজটা একটা ক্রুজ লাইনার, একদম নতুন। দৈর্ঘ্যে চারশো ফুট। দেখতে অপূর্ব। শ্যাম্পেনের গ্লাসের মত ক্লাসিক স্টার্ন। প্রায় প্রতিটি কেবিনের সঙ্গে ব্যালকনি। সাধারণত বিত্তশালী মানুষ এসব জাহাজে ওঠে, গ্যালাপ্যাগোস বা অ্যান্টার্কটিকা ঘুরে দেখে।

কিন্তু এখন ওটা পরিত্যক্ত। যাত্রীদের অনেক আগেই খুন করা হয়েছে। রেইলিঙের পিছনে এখন দাঁড়িয়ে আছে দুশো ইমিগ্র্যান্ট। ড্রাই-ডক ওদের সহ জাহাজ উগরে দিল। লোকগুলো উপসাগরে ভাসছে। জাহাজের ইঞ্জিনগুলো আগেই সরিয়ে ফেলা হয়েছে, এখন আর ব্যালাস্ট পুরোপুরি ঠিক নেই। অনেক বেশি ভেসে আছে, ওয়াটার-লাইনের উপরে অ্যান্টিফাউলিং পেইন্ট দেখা গেল। মৃদু ঢেউ জাহাজটাকে দুলিয়ে দিচ্ছে। এইমাত্র বড় একটা ঢেউ দেখল ফু-চুং।

জাহাজটাকে নিয়ে লোফালুফি করল ওটা। ওটার ডেকে দাঁড়ানো লোকগুলো ভয়ে আর্তচিৎকার করল।

তাদের কপাল ভাল, মাত্র জোয়ার আসছে। জাহাজটা সৈকতের দিকে এগিয়ে এল। কিছুক্ষণ পর ওটা সৈকতে গেঁথে গেল। একদল গার্ড শ'খানেক মজুর নিয়ে ওখানে কাজ শুরু করল। ক্রেন দিয়ে জাহাজটা বালুকাবেলার আরও উপরে টেনে তোলা হচ্ছে। সমুদ্র থেকে শীতল হাওয়া ধেয়ে আসছে, ফু-চুং আন্দাজ করল, তুমুল ঝড় আসছে। নিশ্চয়ই ঝড় আসবার আগেই জাহাজটা সৈকতে আটকে দেওয়া হবে? না হলে সাগর আবারও ওটাকে টেনে নিয়ে যাবে, মানুষগুলো মুহূর্তে জাহাজ সহ ডুবে যাবে। জাহাজে কোনও লাইফ-বোট দেখা যাচ্ছে না।

ড্রাই-ডকের দিকে তাকাল। ওটার প্রকাণ্ড বো-গেট আবারও বন্ধ হয়ে গেছে। পাম্পগুলো পানি বের করছে। কাজটা শেষ করতে আরও কয়েক ঘণ্টা লাগবে। তখন একটা টাগ-বোটও ড্রাই-ডক টেনে নিয়ে যেতে পারবে। দ্বিতীয় বোট "ওর" প্রসেসিং বিল্ডিঙের একশো গজ দূরে এসে থেমেছে।

আগেও খেয়াল করেছে ফু-চুং, প্রসেসিং প্ল্যান্টটা একটা সমতল বার্জের উপরে। ওটাকে টেনে সরিয়ে নেওয়া হবে, সে ব্যবস্থা হচ্ছে। বার্জের চারপাশের সৈকতে অনেক পাথর জমেছে, শ্রমিকরা এখন ওগুলো সরিয়ে ফেলছে। সৈকতে মোবিলের ড্রাম এনে রাখা হয়েছে, মোবিল দিয়ে চারপাশ ভিজানো হবে। কিছুক্ষণ পর ওই টাগ-বোট এসে বার্জ টেনে সাগরে নামাবে। দক্ষিণ আফ্রিকান ম্যানেজার গিলবার্ট ওয়ালজ্যাক নির্দেশ দিয়েছে, বাড়তি পারদ প্রসেসিং প্ল্যান্টের এলাকার বাইরে নিয়ে ফেলে দেওয়া হবে। পারদের চকচকে পুকুরগুলো বৃষ্টির পানির সঙ্গে মিশে সাগরে গিয়ে পড়বে। এখনই মিশে গেছে অন্তত একশো গ্যালন পারদ।

ইতিমধ্যে যারা পারদের বিষাক্ত বাষ্পে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাদের দিয়ে প্ল্যান্টের কাজ করিয়ে নেওয়া হচ্ছে। ওই মানুষগুলো যোম্বির মত নড়ছে, ধীরে ধীরে কাজ করে চলেছে—তাদের মগজ আর নড়ে না। ফু-চুং চারপাশ দেখল। ওর মত যারা রয়েছে, তারাও ভাল নেই। একটু পর পর ভূমিকম্প হচ্ছে, কাঁপছে ধরণী। দাঁড়িয়ে থাকাই কঠিন। ওরা আগামী ক'দিন যদি টিকেও থাকে, পারদের বিষ ওদের ভয়ঙ্কর ক্ষতি করে দেবে। শেষে যদি বেঁচেও থাকে, ভবিষ্যৎ বংশধররা চিরদিনের জন্য খুঁতগ্রস্ত হবে, পঙ্গু হয়ে জন্ম নেবে।

সব ভুলে মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে ফু-চুং, হঠাৎ খেয়াল করল ওর পাশের শ্রমিক কাদা দিয়ে নিজের বালতি ভরে ফেলেছে। লোকটা ওর দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারায় বলতে চাইল, বিপদে পড়ে যাবে তুমি! কিন্তু তার আগেই এক গার্ড খেয়াল করেছে ও কাজ থামিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। লোকটা চাবুক তুলে দু'বার নামিয়ে আনল ওর পিঠে। ফু-চুঙের পা পিছলে গেল, কিন্তু কোনওমতে সামলে নিল। গার্ডের দিকে ভুলেও চোখ তুলে তাকাল না। লোকটা সুযোগ পেলে বেধড়ক পেটাবে ওকে। শরীরের এই বেহাল অবস্থায় মার খেলে না-ও বাঁচতে পারে ও।

পঞ্চাশ পাউণ্ড ওজনের বালতিটা কাঁধে তুলে নিল ফু-চুং, নীচের দিকে রওনা

হয়ে গেল। জাহাজে ওর পাশের ম্যাট্রেসে থাকে হুয়েং, সে খেয়াল করেছে ফু-চুং কখন নীচের দিকে যায়—ফু-চুঙের পাশে চলে এল সে। তাদের কেবিনে দশজনকে থাকতে দেয়া হয়েছিল, তাদের মধ্যে এখন পর্যন্ত টিকে আছে শুধু সে ও ফু-চুং।

'ওদের মুখে শুনেছি আজকে চলে যাবে,' নীচের দিকে তাকিয়ে হাঁটছে হুয়েং।

'আমারও তা-ই মনে হয়েছে,' বলল ফু-চুং। 'কয়েক ঘণ্টা পর ড্রাই-ডক খালি হয়ে যাবে। প্রসেসিং প্ল্যান্ট সাগরে নামাতে বেশি সময় লাগবে না। এটা খেয়াল করেছ, অনেকক্ষণ হলো মাছধরা ট্রলারগুলো ফিরছে না।'

'না খেয়াল করে পারি?' তিক্ত স্বরে বলল হুয়েং। 'আঁশ সহ মাছের ভর্তার চেয়ে খারাপ আছে শুধু একটা জিনিস—সেটা তিনদিনের বাসী মাছের ভর্তা।' সামনে একটা পিচ্ছিল কাদা-ভরা জায়গা আছে, সেটা সাবধানে পার হলো ওরা, তারপর হুয়েং বলল, 'গার্ডদের ডরমিটরিতে কী ঘটছে জানো? যেসব জাহাজে ওরা থাকে?'

গত কয়েকদিন হলো একটা বোট গার্ডদের ডরমিটরি থেকে টাগ-বোটে কিছু সরিয়ে নিচ্ছে। ডরমিটরির চারপাশে গার্ডদের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে গেছে। তাদের বেশিরভাগই পাকিস্তানি, তবে কিছু আছে ইউরোপিয়ান—তারা পাকিস্তানি দাড়িওয়ালা লোকটার আদেশে চলে না। তাদের নির্দেশ আসে ভ্লাদিমিয়ার সরোকিনের কাছ থেকে। এই গার্ডদের শৃঙ্খলা দেখে মনে হয় এরা রাশার এলিট স্পেৎস্‌ন্যাজের সদস্য। অস্ত্রধারী লোকগুলো শ্রমিকদের বিশ্বাস করে না, পাকিস্তানি গার্ডদেরও ভাল চোখে দেখে না।

সবাই বুঝতে পারছে, এরা আসলে সোনা সরিয়ে নিচ্ছে। তিরিশ ফুটি বোট যখন টাগ-বোটের সঙ্গে মিলিত হয়, সেই সময়টা খেয়াল করে দেখেছে ফু-চুং। আন্দাজ করছে, ওই বোট প্রতিবারে একশো টন সোনা সরায়। যে টাগ-বোট ড্রাই-ডকের গায়ের কাছে ভাসছে, ওটার ডেকে বেঁধে রাখা হয়েছে দুটো শিপিং কন্টেইনার। সম্ভবত ম্যানেজারের ক্রুজ লাইনার থেকে হাজার হাজার টন সোনা তোলা হয়েছে ড্রাই-ডকেও।

'তোমার কী মনে হয়, আমাদের কী হবে?' জিজ্ঞেস করল হুয়েং।

'ওয়ালজ্যাক আলাপ করছিল সরোকিনের সঙ্গে, তখন কথাগুলো শুনে ফেলেছি,' বলল ফু-চুং। 'ওরা আমাদের এখানে ফেলে রেখে চলে যাবে।'

'মানে এই দোজখে আমরা মরব, আর ওরা হাসতে হাসতে টা-টা করে সোনা নিয়ে চলে যাবে?'

হুয়েঙের কণ্ঠে দুঃখ প্রকাশ পেল। যুবক আবেগপ্রবণ হয়ে উঠেছে, কিছুটা হলেও মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছে। টিকে থাকতে হলে সবসময় পজিটিভ মানসিকতা লাগে। ফু-চুং গত এক সপ্তাহ মানুষের সহ্য করবার অসাধারণ ক্ষমতা দেখেছে, অনেকে মুখ বন্ধ রেখে কাজ করে যাচ্ছে, অন্তরে আশা জাগিয়ে রেখেছে। আবার অনেকে কয়েকদিনে শেষ হয়ে গেছে, যেন ইচ্ছে করে মৃত্যু কামনা করেছে—তারা দ্রুতই মারা গেছে। ফু-চুং বুঝতে পারছে, হুয়েং যদি এখন বাঁচবার আশা ছাড়ে, দু'দিনের মধ্যেই মারা পড়বে।

'কথাটা খেয়াল করে শোনো, হুয়েং। আমরা এভাবে মরব না। বেঁচে থাকার কোনও একটা পথ পাব।'

ক্লান্ত হাসল হুয়েং। 'সাহস দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ। তবে তোমার কথার মধ্যে কোনও সত্যতা নেই।'

'আমি কোনও ইমিগ্র্যান্ট নই,' বলল ফু-চুং। 'খেয়াল করে শোনো, হুয়েং, আমি একটা তদন্তকারী সংস্থার হয়ে কাজ করি। আমরা চিন থেকে মানুষ-পাচার ঠেকাতে কাজ করছি। ওরা এখন আমাকে খুঁজে বের করবে। একদল লোক যে-কোনও সময় এখানে হাজির হয়ে যাবে।'

'সত্যিই? মিথ্যে বলছ না তো?'

'না, ওরা যে-কোনও সময় হাজির হবে। একটা জাহাজে করে আসবে ওরা।'

হুয়েং চট্ করে ছাই উদ্গিরণ করা পর্বতটা দেখল। ওটা সৈকত থেকে কয়েক মাইল ভিতরে, কিন্তু দেখলে মনে হয় উত্তরদিকের পুরো দিগন্ত জুড়ে আছে। কিছুক্ষণ হলো জ্বালামুখ ছাই ছুঁড়ছে না। তবে এখনও সাইটে ছাই এসে পড়ছে। সাগরের দিকে তাকাল সে।

'জানি, কী বলবে,' হুয়েঙের না-বলা কথাটা বলল ফু-চুং।

হাত তুলে দেখাল হুয়েং। 'ওরা আবারও মাছ নিয়ে আসছে! রাতে মাছের ভর্তা পাবে!'

জোড়া ট্রলার সৈকতের দিকে ফিরছে আবারও। মোটাসোটা ট্রলারগুলো একমুহূর্ত দেখল ফু-চুং। একদল গাল ও-দুটোর পিছু নিয়ে আসছে। ট্রলারগুলো ফিরে আসবার পিছনে কোনও যুক্তি নেই। সরোকিন ঠিক করেছে ক্রীতদাসদের জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির মুখে ফেলে যাবে। তা হলে মানুষগুলোকে কেন খেতে দেবে? মনোযোগ দিয়ে দেখল ফু-চুং, ট্রলারগুলো স্বাভাবিক গতির চেয়ে জোরে ছুটে আসছে। ওগুলোর বো-এর ধাক্কায় ফেনা তৈরি হচ্ছে। মাছ পাওয়ার জন্য গালগুলো ডানা ঝাপটে পিছু নিয়েছে। এবার ফু-চুং বুঝতে পারল, দুই বোটের হোল্ড এখন খালি। ওগুলো আড়াআড়ি ভাবে জেটির দিকে আসছে না, যে টাগ-বোট প্রসেসিং প্ল্যান্ট নিয়ে যেতে অপেক্ষা করছে, সেটার দিকে চলেছে।

সতর্ক হয়ে উঠল ফু-চুং, চমকে গেল। মুহূর্তের জন্য ভুলে গেল ও নিজে অতি ক্লান্ত। রাশান গার্ডরা হঠাৎই সতর্ক হয়ে উঠেছে। তারা আগের চেয়ে শক্ত করে অস্ত্র ধরল, দ্রুত পায়ে কাভার খুঁজল।

'হুয়েং, জলদি আমার সঙ্গে এসো,' নির্দেশ দিল ফু-চুং।

ওরা স্লুইস বক্সের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেপারেটিং প্ল্যান্ট থেকে বিশ গজ দূরে। একদম খোলা জায়গায়। দ্রুত এখান থেকে সরে যেতে হবে। হুয়েংকে নিয়ে লম্বা টেবিলের ওপাশ দিয়ে ঘুরে টিলা বেয়ে উঠতে শুরু করল। যত দ্রুত সম্ভব দূরে সরে যেতে হবে, নইলে ওরা ক্রসফায়ারের মধ্যে পড়বে।

পিছু নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে চলেছে হুয়েং। 'হয়েছে কী, সেটা তো বলবে?' জিজ্ঞেস করল।

ফু-চুং কোনও জবাব দেবার আগেই কাছের ট্রলার থেকে অস্ত্রের গর্জন ভেসে এল। অন্তত বারোজন স্প্যাৎসন্যাজ ইতিমধ্যে ভাল আড়াল খুঁজে নিয়েছে। তাদের

দিকে গুলি ছুটে আসছে, কিন্তু তারা কাভার পেয়ে যাওয়ায় গুলি তাদের গায়ে লাগবে না। লোকগুলো উল্টো পাকিস্তানি গার্ডদের দিকে মনোযোগ দিয়েছে। এখন তারা জানে, পাকিস্তানিরা তাদের দিকে গুলি করছে। মাত্র পাঁচ সেকেণ্ড পর দু'দলের মধ্যে বিরামহীন গোলাগুলি শুরু হলো। কুয়াশাচ্ছন্ন পরিবেশে ট্রেসার বুলেট লেজার বিমের মত ছুটোছুটি করছে। হতক্লান্ত শ্রমিকরা অনেক ধীর গতিতে নড়ছে, অনেকে এটাও জানে না যে শুয়ে পড়তে হবে। প্রথম ধাক্কায় অন্তত পনেরোজন শ্রমিক গুলি খেয়ে ছিটকে মাটিতে পড়ল।

অন্তত পঞ্চাশজন গার্ড ট্রলারের আততায়ীদের সঙ্গে মিলে গুলি ছুঁড়ছে। তারা শত্রুদের একমুহূর্তে শেষ করে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু রাশানদের আধুনিক অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ তাদের বাঁচিয়ে দিল। দ্রুতই নিজেদের উপরে নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেল তারা। আগ্নেয়াস্ত্রের লড়াই শুরু হলো। রাশানরা কেউ অ্যাম্বুশে পড়েনি, বরং তাদের গুলিতে পাকিস্তানিরা একজন দু'জন করে মারা পড়ছে।

গার্ডরা প্রায় একই সময়ে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সরোকিন আছে এখন ওয়ালজ্যাকের সঙ্গে, তাদের ক্রুজ শিপে। সোনার মজুদ ওখানে রাখা হয়েছিল। এখন চলে গেছে ড্রাই-ডক ও টাগ-বোটে।

বিশ্বাসঘাতক খান এরইমধ্যে কয়েকজন গার্ডকে নিয়ে উঠে পড়েছে কন্টেইনার ভরা টাগ-বোটে। ওদিকে দ্বিতীয় টাগ-বোটের সঙ্গে বার্জটা আটকে দেয়া হয়েছে। টাগের ক্যাপ্টেন চাইলেই পালাতে পারবে না। এক ইঞ্চি মোটা কেবল কাটতে অনেক সময় লাগবে।

ড্রাই-ডকের সঙ্গে আটকে রাখা হয়েছে টাগ-বোটকে। ওটার চিমনি থেকে কালো ধোঁয়া বেরোল। বোটের স্টার্নের পিছনে কালো পানি ছিটকে উঠছে। প্রচণ্ড টানে আইসোপোডের স্ক্রুগুলো ভেঙে যেতে চাইল। ড্রাই-ডকের সমস্ত পানি দূর হওয়ার আগেই টাগ-বোট সরে যেতে চাইছে।

ফু-চুং ও হুয়েং দ্রুত পায়ে টিলা বাইছে। কয়েকজন গার্ড ওদের পাশ কাটাল, দৌড়ে নীচে চলে গেল। তারা ওয়াটার ক্যাননের কাজ দেখাশোনা করছিল। উপর থেকে আরও গার্ড আসছে। একটা বোল্ডারের আড়াল নিল ফু-চুং, অপেক্ষা করল। গার্ডরা ছুটে নেমে যাচ্ছে। তাদের একজন বোল্ডারের কাছ দিয়ে ছুটছে। এই অপেক্ষাতেই দাঁড়িয়ে ছিল ফু-চুং, চট্ করে বেরিয়ে এল ও, লোকটার নাকের উপরে প্রচণ্ড ঘুসি বসিয়ে দিল। পিছলে গেল লোকটা, কাদার মধ্যে পড়ল। একটানে তার হাত থেকে রাইফেলটা কেড়ে নিল ফু-চুং, কুঁদোটা গায়ের জোরে নামিয়ে আনল লোকটার কপালে। ঠাস্ করে ফাটল কপালের হাড়, ডেবে গেল মগজে। লোকটা কিছু বুঝবার আগেই মারা গেছে।

রাইফেল হাতে চারপাশ দেখল ফু-চুং। কী ঘটেছে কেউ দেখেনি। একে-ফোরটিসেভেন কক্ করাই আছে। হুয়েঙের দিকে তাকাল ফু-চুং, নিচু স্বরে বলল, 'এবার প্রতিশোধ!'

গত পঁচিশ বছরে সি অভ ওখোটস্ক-এ এরকম তুমুল ঝড় আসেনি। খ্যাপা ঝড়ের মাঝখানে পড়েছে মার্ভেল। দুটো নিম্ন-চাপ মিলে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। যেদিকে

যতদূর চোখ যায়, সমুদ্র ফুঁসছে। প্রকাণ্ড ঢেউগুলো ছুটে চলেছে কোথায় কে জানে! তীব্র হাওয়া সাগর ছিন্নভিন্ন করতে চাইছে, শোঁ-শোঁ আওয়াজে ঢেউয়ের মাথা ছিঁড়ে নিয়ে যাচ্ছে। কালো-ধূসর মেঘের গায়ে নীলচে বিদ্যুৎশিখা খেলছে, কড়াৎ করে চাবুক কষছে সাগরের বুকে নেমে এসে। তাপমাত্রা অনেক কমে গেছে। বরফ-ঠাণ্ডা বৃষ্টি কাত হয়ে ধেয়ে এসে ঝমাঝম পড়ছে মার্ভেলের ডেকে।

ঢেউগুলো পাহাড়ের মত উঠছে, মার্ভেল ওগুলোর পিঠে চড়ছে। বো-টা কালচে মেঘের দিকে মাথা তুলছে, তারপর ধড়াস্ করে আছড়ে পড়ছে আরেক ঢেউয়ের মাথায়। ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের আওয়াজ হচ্ছে এর ফলে। ছিটকে ওঠা ফেনাগুলো মার্ভেলের চিমনি ছাড়িয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে মার্ভেল সারাজীবনই বুঝি এই ভয়ঙ্কর আবহাওয়ার মধ্যে ছিল। স্টার্ন দ্রুত উঠছে, বো ঢেউয়ের সঙ্গে নেমে যাচ্ছে। শক্তিশালী ইঞ্জিনগুলো তখন আর পানি কাটছে না। মার্ভেল যখন দুটো ঢেউয়ের মাঝখানের খোড়লে থাকছে, তখন বাতাসের গর্জন একদম থামছে—জাহাজে নৈঃশব্দ্য নামছে। ব্রিজে দাঁড়ালে মনে হয় নীচের কালো সাগর গপ্ করে গিলে নেবে জাহাজটাকে।

এসব ক্ষণে মনে হচ্ছে মার্ভেল পাতালের দিকে নেমে চলেছে। বড় ঢেউগুলো সামনের সমস্ত হ্যাচ ডুবিয়ে দিচ্ছে। হঠাৎ করেই মনে হচ্ছে সবাই ওজন-শূন্য হয়ে গেছে, যে-কোনও সময় ধপ্ করে পড়বে। রেডিয়োর তারগুলো ছাদে গিয়ে ছিটকে লাগছে। ইঞ্জিনগুলো কর্কশ গর্জন ছাড়ছে, উন্মত্ত ঢেউ কেটে জাহাজ নিয়ে উপরে উঠছে। আবার নীচের দিকে মাথা নামিয়ে নিচ্ছে বো। ডেকের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে ঢেউয়ের পর ঢেউ, ডেরিক ও সুপারস্ট্রাকচারে গিয়ে বাড়ি মারছে। থরথর করে কাঁপছে জাহাজ। রেইলিঙের উপর দিয়ে স্রোত বয়ে চলেছে। বাড়তি পানি হড়হড় করে বেরিয়ে যাচ্ছে স্ক্যাপারগুলো দিয়ে।

সমস্ত পানি বেরিয়ে গেলে বো আবারও মাথা তুলছে, পরবর্তী ঢেউয়ের গায়ে চড়ছে। এ-ই চলছে বারংবার।

দুটো কারণে মার্ভেল এখনও ভেসে আছে, এগিয়ে চলেছে—প্রথম কারণ ওটার অসাধারণ ম্যাগনেটোহাইড্রো-ডাইনামিক ইঞ্জিনগুলো। মার্ভেলের টিকে থাকবার দ্বিতীয় কারণ, ওটার ক্যাপ্টেন। মার্ভেলের সবাই জানে, গগল না থাকলে এই ঝড়ে নিঃসন্দেহে ওরা ডুবে মরত।

ঝড় শুরু হওয়ার পর ব্রিজের সিনিয়র স্টাফরা সর্বক্ষণ উপস্থিত থাকছে। সবার রুটিন নষ্ট হয়ে গেছে। এখন টিনের খাবার খেয়ে যে-যার কাজ করে চলেছে। রানা বসে আছে ওর চেয়ারে। দু'দিন হলো ওরা ঘুমাতে পারেনি। সবাই সিট-বেল্ট আটকে চেয়ারে বসে আছে, শুধু হেলম-এ দাঁড়িয়ে আছে গগল। মার্ভেলের সফিসটিকেটেড অটোপাইলট সিস্টেমকে বিশ্বাস করছে না ও। জিনিসটা এখনও গবেষণার পর্যায়ে রয়েছে। ফ্ল্যাট-স্ক্রিন ডিসপ্লেতে জাহাজের চারপাশ দেখছে গগল। বড় ঢেউগুলো খেয়ালে রেখে এগিয়ে চলেছে। রেইডার ও থ্রটল নিয়ে সর্বক্ষণ ব্যস্ত ।

বন্ধুর দিকে তাকিয়ে আছে রানা। গগল বারবার সেন্ট্রাল ডিসপ্লেতে স্পিড ইণ্ডিকেটর দেখছে। মার্ভেলের এগোনোর গতি, তলের গতি, চারপাশের পানির

ধাক্কা ইত্যাদি হিসাবে রাখছে। ঝড়টা একশো পনেরো মাইল গতিবেগ তুলে উত্তর-পুবে ছুটছে। জেদি গগল ওটাকে এড়িয়ে উত্তর-পশ্চিমে যেতে চাইছে।

নিজে রানা বহুবার জাহাজ চালিয়েছে, ও জানে গগল যা করছে নিজে হলেও সে-চেষ্টাই করত। এমনিতেই ফু-চুঙের বাঁচবার সুযোগ অনেক কমে গেছে। কামচাটকার ওই এলাকায় অগ্ন্যুৎপাত হলে একটা মানুষও বাঁচবে না। লাভা উদ্গিরণ হওয়ার আগেই সবাইকে উদ্ধারের চেষ্টা করতে হবে।

দ্য মার্ভেল অভ গ্রিস হয়তো প্রকৃতিকে হারিয়ে জিতেই যাবে। মিটিওরলজিকাল ইনর্ফমেশন বলছে ওরা ঝড়ের বাইরের মুখে চলে এসেছে। ব্যারোমিটারের কাঁটা দ্রুত উঠছে। বৃষ্টি একটু হলেও কমেছে, এখন তীরের মত এসে পড়ছে না। ঢেউ আসবার গতি আগের চেয়ে কম। একেকটা এখনও পাহাড়ের মত উঁচু, কিন্তু অনেকটা সময় নিয়ে আসছে।

জিপিএস দেখল রানা, বুঝে নিল মার্ভেল এখন কোথায় আছে। মনে মনে হিসাব কষল। ফু-চুং এখনও ষাট মাইল দূরে। মার্ভেল ঝড় থেকে বেরিয়ে গেলে চল্লিশ নট গতিতে এগিয়ে যেতে পারবে। আন্দাজ দেড় ঘণ্টা পর উপকূল দেখা যাবে। ওরা ছয় ঘণ্টা হাতে পাবে, তারপর আবারও পড়তে হবে ধেয়ে আসা ঝড়ের কবলে। কামচাটকার ওই সৈকতে কয়েক হাজার মানুষ আছে। তাদের উদ্ধার করবার জন্য বেশি সময় পাবে না ওরা। মার্ভেলে মাত্র আড়াইশো লোক তোলা যাবে। ওরা কপ্টার ও সাবমারসিবলগুলো সরিয়ে ফেললে সব মিলে এক হাজার মানুষ নিতে পারবে। কিন্তু ঝড়ের মধ্যে অগ্ন্যুৎপাত হলে মানুষ উদ্ধার করা যাবে না। সেক্ষেত্রে বহু মানুষ মরবে।

'রানা, আমি একটা কনট্যাক্ট পাচ্ছি,' রেইডার রিপিটার দেখছে উর্বশী, সোজা হয়ে বসল।

'জিনিসটা কী?'

'ঝড়ের কারণে ভাল বোঝা যাচ্ছে না, তবে মনে হচ্ছে ওটা দ্য চুহার বোন। চল্লিশ মাইল দূরে একইসঙ্গে দুটো হিট পাচ্ছি, দুটোই কাছাকাছি। একটা অন্যটার চেয়ে অনেক বড়। সম্ভবত দ্য চুহি আর ওটার একটা টাগ-বোট।'

'কোর্স আর স্পিড?'

'মিস্টার ফু-চুঙের ট্র্যান্সপণ্ডার যেখান থেকে সঙ্কেত পাঠাচ্ছে, ওগুলো সেখানেই আছে। দক্ষিণে এগিয়ে আসছে। ঘণ্টায় বড়জোর ছয় নট। আমাদের স্টার-বোর্ডে পড়বে, বাধা না দিলে দশ মাইল দূর দিয়ে যাবে।'

কমিউনিকেশন স্টেশনে বসে আছে আতাসি, তার দিকে তাকাল রানা। 'ফু-চুঙের সিগনাল কি সরে গেছে?'

'আট ঘণ্টা আগে সাড়া পাওয়া গেছে। পরে সরে গিয়ে থাকলে পারে।'

ফু-চুং এখন দ্য চুহির ডেকে থাকতে পারে। তবে রানা ধারণা করছে, ও সঙ্গীদের ছেড়ে সরবে না। সম্ভবত এখনও সৈকতে রয়ে গেছে।

'দ্য চুহি যাক,' বলল রানা। 'পরে ওটাকে ধরা যাবে।'

'আগেরবার মুদাস্‌সর আলী খান আমাদের বোকা বানিয়েছে,' বলল উর্বশী। 'দ্য চুহিকে আগে ধরলে ভাল হতো না?'

'ওটা একবার ঝড়ের মধ্যে পড়লে চল্লিশ নট গতিবেগের হাওয়া ওটাকে ধরে বসবে,' বলল গগল। 'ড্রাই-ডকের ব্যালাস্ট কমিয়ে আনলেও শরীরটা পালের মত বাধা দেবে, টাগ-বোট চাইলেও এগোতে পারবে না। এমনও হতে পারে আবারও উত্তরদিকে চলতে বাধ্য হবে।'

'ওই সময়ে আমরা ফু-চুঙের কাছে চলে যাব,' বলল রানা। 'ওখানে সৈকতে অনেক মানুষ আটকা পড়েছে। ওদের উদ্ধার করতে পারব। ওখান থেকে সরে এসে দ্য চুহিকে ধরব। ...সম্ভবত ওটার রেইডার মার্ভেলের মতই আধুনিক। ওটাকে জ্যাম করা দরকার।' উর্বশীর দিকে তাকাল রানা। 'আমাদের তরফ থেকে কমপ্লিট রেইডার ব্ল্যাকআউট করো।'

নড়েচড়ে বসল উর্বশী। 'দ্য চুহিতে সফিসটিকেটেড রেইডার থাকলে ওরা জেনে যাবে আমরা জ্যাম করেছি।'

'আমরা এখনই হিট্ করলে টের পাবে না,' বলল রানা।

'বস্ ঠিক বলেছেন,' বলল আতাসি। 'ওদের রেইডার এখন ঝড়ের দিকে তাক করে রয়েছে। বিশাল সব ঢেউয়ের ব্যাকস্ক্যাটার তো আছেই, সঙ্গে আছে একটু পর পর বজ্রপাত—ওরা আমাদের দেখবে না। এখন জ্যামার্স কাজে লাগালে কী হয়েছে টেরও পাবে না।'

'রেইডার, রেডিয়ো, সমস্ত স্যাটালাইট আপলিঙ্কস বন্ধ করে দিচ্ছি,' বলল উর্বশী। ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

'গগল, আমরা দ্য চুহিকে এড়িয়ে এগোব,' বলল রানা। 'কোর্স পাল্টে নাও। অন্তত বিশ মাইল দূরত্ব রেখে এগিয়ে চলো।'

'সেটাই ভাল,' কম্পিউটারের বাটন টিপে কোর্স নির্ধারণ করল গগল।

তিরিশ মিনিট পর রেইডারে প্রথমবারের মত সৈকত ধরা পড়ল। ছ'টা ধাতব কনট্যাক্ট একইসঙ্গে পাওয়া গেল। পাঁচটি সৈকতে গেঁথে আছে, অন্যটি হয়তো কোনও টাগ-বোট—ওটা আছে গভীর পানিতে, তীর থেকে একশো গজ দূরে।

এঅ্যারিয়াল ড্রোন পাঠিয়ে এলাকাটা দেখতে চাইল রানা। কিন্তু ক্যাপ্টেন সিরাজ বললেন এই ঝোড়ো বাতাসে ওটা দশ সেকেণ্ডও টিকবে না। উনি জানতে চাইলেন চট্ করে রবিনসন নিয়ে চারপাশ দেখে আসবেন কি না। ট্যাকটিকাল ডেটা পেলে ওদের জন্য হামলা করা অনেক সহজ হতো, কিন্তু বারণ করল রানা। কপ্টার নিয়ে উড়লে শত্রুদের চমকে দেওয়া যাবে না। আরও সমস্যা আছে, ওটার এয়ার ফিলটারেশন সিস্টেম ভারী ছাই ঠেকাতে পারবে না, যে-কোনও সময় ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে খসে পড়বে কপ্টার।

ক্যাপ্টেন সিরাজ প্রস্তুত অবস্থায় হ্যাঙারে অপেক্ষা করছেন। ছটফট করছেন কিছু একটা করবার জন্য।

পিন মাইক হেডসেটে রানা বলল, 'ক্যাপ্টেন সিরাজ, আপনি রিজার্ভে থাকুন, দরকার পড়লে আপনাকে ডাকব আমরা। পাঁচ মিনিটের অ্যালার্টে উড়তে হবে।'

পাঁচ মিনিটের অ্যালার্ট মানে হোল্ডের হ্যাচ খোলা মাত্র রবিনসন তৈরি থাকবে। আগে থেকেই ইঞ্জিন চালু থাকবে, টেমপারেচার উপরে তুলে রাখা হবে। ডেকে উঠে এলেই রওনা হওয়া যাবে।

'অপেক্ষায় থাকলাম, মিস্টার রানা,' জানিয়ে দিলেন সিরাজ।

এবার সবাই স্ট্যাটাস রিপোর্ট দিল।

অনিল উইপন্স স্টেশনে বসে আছে, গ্যাটলিং গান ও চল্লিশ এমএম অটোক্যাননের উপর থেকে কাভার সরিয়ে দিল। ডেকের .৫০ ক্যালিবারের গিম্বল মেশিনগান লোড করা শেষে লক করা হলো। জোড়া টিউবের মধ্যে ঢুকে গেল টর্পেডো, আউটার হাল ডোর বন্ধ হলো। অনিল প্রতিটি ক্যামেরা পরীক্ষা করে দেখল, সব ঠিক আছে। আতাসি দ্বিতীয়বার কমিউনিকেশন ও রেইডার সিস্টেম দেখে নিল। উর্বশী অ্যাসল্ট টিম নিয়ে তৈরি। ড্যামেজ কন্ট্রোল টিম যার যার নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে। সোহেল সব কিছু নিয়ন্ত্রণে রাখবে। কমাণ্ডোরা চলে গেছে বোট-গ্যারাজে। তিন মিনিট পর ওখানে হাজির হলো উর্বশী। ডক্টর ফারা মেডিকেল বে-তে কিচেনের স্টাফদের নিয়ে অপেক্ষা করছে। কেউ আহত হলে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা দেবে।

জাহাজের ওয়াইড চ্যানেলে কথা বলল রানা, 'অ্যাটেনশান, অল হ্যাণ্ডস্। মাসুদ রানা বলছি। মন দিয়ে শোনো। সৈকতে আমাদের একজন আটকা পড়েছে। মিস্টার লিউ ফু-চুং। আমাদের প্রথম কাজ তাকে উদ্ধার করা। একইসঙ্গে আমাদের আরেকটা দায়িত্ব দ্রুত নিরীহ মানুষ সরিয়ে নেওয়া। ওখানে কত লোক আছে এখনও জানি না আমরা। ধরে নেওয়া যায় তাদের শারীরিক অবস্থা ভাল নয়। আবারও বলছি, এদের সরিয়ে নিতে হবে। যে-কোনও সময় পর্বত থেকে অগ্ন্যুৎপাত হতে পারে, কাজেই দ্রুত কাজ করতে হবে। প্রত্যেকে মাথায় রেখো, আমরা মার্ভেলকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলব না।

'আমরা ওখানে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি মোকাবিলা করব, কাজেই প্রত্যেকে পাশের জনের দিকে খেয়াল রাখবে। আমরা আর বড়জোর একঘণ্টা পর শত্রুদের মুখোমুখি হবো। আমাদের হেরে যাওয়া চলবে না। মনে রেখো হাজারো মানুষের ভাগ্য আমাদের উপর নির্ভর করছে। আমার আর কিছু বলার নেই। তোমরা মানসিক ভাবে তৈরি হয়ে নাও।'

রেডিয়ো বন্ধ করে দিল রানা।

নেট-এ কমাণ্ডোদের আলাপ শোনা গেল, 'মাসুদ ভাই রাজনৈতিক নেতাদের মত জমিয়ে বলতে পারেন না!'

'না পারুন, বিপদে পাশে পাওয়া যায়!'

চুপ হয়ে গেল সবাই।

দশ

অ্যাসল্ট টিমের সঙ্গে দেখা করবার আগে নিজের কেবিনের ফিরল রানা, পোশাক পাল্টে কালো ফেটিগ পরে নিল, সঙ্গে কেভলার ভেস্ট ও কমব্যাট হার্নেস। কিডনি হোলস্টারে পুরল একটা এফএন ফাইভ-সেভেনএন পিস্তল। শোল্ডার হোলস্টারে

থাকল প্রিয় ওয়ালথার। সঙ্গে নিল এম-ফোরএওয়ান অ্যাসল্ট রাইফেল। কোমরের পাউচে রাখল ছয়টা ম্যাগাজিন। চার ইঞ্চি ফলাওয়ালা গার্বারটা থাকল কাঁধের স্ট্র্যাপে। এবার কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে বোট-গ্যারাজে চলে এল।

ভিতরের পরিবেশ শীতল, ভেজা-ভেজা। সবাই শেষ মুহূর্তে অস্ত্র ও নেটওয়ার্ক পরীক্ষা করছে। জোডিয়াক ব্যবহার করা হবে না। এখন গ্যারাজের অনেকটা অংশ জুড়ে রয়েছে রাবার-রিমড্ পলিকারবোনেট-হাল্ড্ অ্যাসল্ট বোট। ওটার মাঝখানে বসে আছে প্রায়-নিরাপদ হুইল-হাউজ। বোটে দুটো আউটবোর্ড ইঞ্জিন। এই বোট ক্ষিপ্ত সাগরে এগিয়ে চলতে সক্ষম, পঞ্চাশ নট গতি তুলে ছুটতে পারবে।

গ্যারাজের বাতিগুলো এখন বাইরের পরিবেশের সঙ্গে মিশে ম্লান ভাবে জ্বলছে। সবাইকে ফ্যাকাসে লাগল, যেন রক্তশূন্য হয়ে পড়েছে। তবে চোখ জ্বলছে ওদের, নড়াচড়ায় চিতা-বাঘের ক্ষিপ্রতা। একজন আরেকজনের ইকুইপমেন্ট পরীক্ষা করছে। ম্যাগাজিনগুলো নির্দিষ্ট জায়গায় ক্লিক করে বসে যাঁচ্ছে। কক্ করা হচ্ছে রাইফেল।

গ্যারাজের আরেক প্রান্তে জুডি স্টিভেনসনকে দেখতে পেল রানা। মেয়েটা অ্যাসল্ট ফোর্সের সঙ্গে যাবে। ধরে নেওয়া যায় সৈকতে মুখোমুখি লড়াই হবে, সেটার জন্য আলাদা প্রশিক্ষণ লাগে, কাজেই রানা জানিয়ে দিয়েছে, সে বোটে থাকতে পারে, কিন্তু মাটিতে নামতে পারবে না। মার্ভেলের অ্যাসল্ট টিম বারংবার একসঙ্গে ট্রেনিং করেছে, পরস্পরের ইশারা জানে, আক্রমণের পদ্ধতি চেনে, কাজেই অন্য কেউ ইচ্ছে করলেই তাল মিলাতে পারবে না, বরং টিমের সবার মনোযোগ সরিয়ে দেবে।

অ্যাভালাঞ্চের সবাই মারা যাওয়ায় জুডি যেন নিজেকে দোষ দিচ্ছে। রানা জানে, কখনও কখনও মানুষ এমন ভাবেই ভেবে নেয়। জুডিকে বারবার বুঝিয়েছে ও, কিন্তু মেয়েটা যাবেই। জেদ দেখে শেষপর্যন্ত সম্মতি দিয়েছে ও, তবে বোটেই থাকতে হবে তাকে—ডাঙায় উঠবার জন্য জেদ করতে পারবে না। এর ফলে জুডি প্রতিশোধ নিতে না পারলেও, শত্রুদের মরতে দেখে শান্তি পাবে মনে।

রানার দিকে তাকিয়ে মাথা দোলাল জুডি—সে যুদ্ধে যেতে তৈরি। জবাবে হাসল রানা। ওর হেডসেটে কড়কড় আওয়াজ হলো, সোহেলের কণ্ঠ ভেসে এল, 'কী করিস, রানা? অনিল বলেছে এক মিনিট পর সৈকতের ভিডিও দেখা যাবে। ছবি তোর কাছে পাঠিয়ে দেব।'

'ঠিক আছে।'

অ্যাসল্ট বোটের গানেল টপকে ডেকে নেমে গেল রানা, ককপিটে চলে এল। ফ্ল্যাট-প্যানেল ডিসপ্লে অন করল। মার্ভেল ঢেউয়ের দোলায় নাচছে বলে ক্যামেরা নড়ছে, ছবি ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে সরছে। ক্যামেরাগুলো জুম করে সৈকতে তাক করেছে অনিল, একাগ্র দৃষ্টিতে সামনে চেয়ে আছে। মার্ভেল এইমাত্র উপসাগরে ঢুকেছে, ছুটছে সৈকতের দিকে।

অনিল ক্যামেরায় প্রথমে একটা ভাসমান বার্জ দেখাল। ওটার উপরে একটা দাতব বিল্ডিং। রাইফেলধারী লোকগুলো ওটা দখল করতে চাইছে। চারপাশে

গোলাগুলি চলছে। ওখানে যে-লোকগুলো, তাদের মত লোক চিন-সাগরে দেখেছে ওরা। গভীর রাতে, মার্ভেলে, যখন জলদস্যুরা ডেকের উপরে উঠে এসেছিল। এখন বার্জের সঙ্গে টো লাইন নিয়ে ভাসছে একটা টাগ-বোট, আরেকদল ওখানে আক্রমণ করেছে। ক্যামেরা ঘুরে গেল, সৈকতের দিকে অসংখ্য মানুষের দৌড়াদৌড়ি। কাদাভরা টিলা বেয়ে উঠছে তারা। অস্ত্রধারীরা টিলা ও সৈকতে, শত্রুদের দিকে গুলি ছুঁড়ছে। রানা বুঝতে পারল, ওরা রেইডারে সৈকতে যে জাহাজগুলো দেখেছে, সেগুলো আসলে পুরোনো ক্রুজ লাইনার। পাথুরে সৈকতে গেঁথে গেছে সব। কিন্তু মনে হলো ওগুলোর মধ্যে একটা কমবেশি নতুন জাহাজ। এবার অনিল চট্ করে বহুদূরের আগ্নেয়গিরির শট দেখাল। পর্বতের মাঝখানের চূড়া বাষ্প ছাড়ছে, ভলকে ভলকে কালো ধোঁয়া ছাড়ছে, সেই সঙ্গে বেরুচ্ছে ছাই।

রানা ট্যাকটিকাল সুবিধে ও পরিস্থিতি খেয়াল করছে, মনে মনে রণক্ষেত্র সাজিয়ে নিল, একের পর এক নির্দেশ দিল। কমাণ্ডোরা চুপচাপ শুনল, তারপর তাদের একদল জাহাজের করিডোর ধরে ছুটে চলে গেল, মার্ভেলকে রক্ষা করবে। সবাই লড়াইয়ের জন্য মানসিক ভাবে তৈরি, আরও সতর্ক হয়ে উঠেছে।

পাঁচ মিনিটে মার্ভেল আরও এগোল। এবার ওরা সবাই কালো ইউনিফর্ম পরা একদল লোক দেখতে পেল। ককেশিয়ান লোকগুলো মার্ভেলকে পাত্তা দিল না। কিন্তু মুদাস্‌সর আলী খানের লোকজন জাহাজের দিকে গুলি করছে।

মার্ভেলের কয়েকজন ডেকহ্যাণ্ড অ্যাসল্ট বোটের গা থেকে শেকল সরিয়ে নিল। রানা ও সোহেলকে জানিয়ে দিল ওরা এখন রওনা হবে, মার্ভেলকে যেন তীর থেকে সরিয়ে নেয়া হয়। খানের লোকজন আস্ত একটা জাহাজ পেয়ে ব্যস্ত হয়ে গুলি করছে, সেই সুযোগটা পেল রানা, বোট-গ্যারাজ খুলে দেয়া হলো।

গেট উপরের দিকে উঠে যেতেই কমাণ্ডোরা লাফ দিয়ে বোটে উঠল। টিমের মেম্বাররা নিজেদের নাম ডাকল, ওরা সবাই বোটে উঠেছে। কমাণ্ডো আবু কাশেম ইঞ্জিন চালু করতেই গ্যারাজ-বোট মাস্টারের উদ্দেশে মাথা দোলাল রানা। সঙ্গে সঙ্গে হাইড্রোলিক পুলিগুলো বোটকে গুলতির মত ছিটকে দিল। র‍্যাম্প বেয়ে সাগরে এসে পড়ল বোট । গতি যথেষ্ট, কাশেম সাগরে প্রপেলার নামিয়ে দেয়ায় আরও বাড়ল। বিশাল আউটবোর্ড ইঞ্জিনগুলো সাগর ছিঁড়ছে। পানি মার্ভেলের গায়ে গিয়ে আছড়ে পড়ল।

প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হাওয়া সবার হাতে-মুখে কামড় বসাল। সাগরের পানির ছিটে লাগলে মনে হয় শরীরে আগুন ধরে গেছে। অ্যাসল্ট বোট বাঁক নিয়ে একটা জং ধরা ফ্রেইটারের দিকে ধেয়ে চলেছে। দেখতে না দেখতে গতিবেগ পঞ্চাশ নটে উঠে গেল। সৈকত থেকে কেউ আন্দাজে গুলি করতে পারে, কিন্তু দ্রুতগতির ফলে কারও গায়ে লাগানো প্রায় অসম্ভব।

কাশেম বোট নিয়ে এঁকেবেঁকে ছুটে চলেছে, রানা ওকে বলেছে সৈকতের ঠিক কোথায় উঠতে চায়। ওরা একটা জাহাজের আড়ালে চলে যেতে চাইছে। জাহাজটা সৈকতের ওখানে এত দেবে গেছে যে শ্রমিকরা জাহাজের ডেকে উঠতে পাথরের সেতু বানিয়েছে। জাহাজের চারপাশে এত জঞ্জাল জমেছে যে, এখন আর জোয়ারের পানি ওগুলো সরিয়ে নেয় না।

অ্যাসল্ট বোট সৈকতের কাছের অগভীর পানিতে চলে এল, তীর মাত্র দু'গজ দূরে। কমাণ্ডোরা লাফ দিয়ে পানিতে নেমে পড়ল। সৈকতে ছোট-বড় বোল্ডারের অভাব নেই, আড়াল খুঁজে নিল ওরা। রানা ও উর্বশী দোতলা বাড়ির মত প্রকাণ্ড একটা বোল্ডারের পিছনে থামল। ইতিমধ্যে কাশেম বোট নিয়ে গভীর পানিতে চলে গেছে। রানা ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিল, জুডি ওর নির্দেশের অন্যথা করেনি। সৈকতে নামার জন্য জেদ ধরেনি। মেয়েটার বুদ্ধি আছে, অভাব নেই সাহসেরও। এখন খোলা জায়গায় পাইলট-হাউজে কাশেম আর জলিলের পাশে দাঁড়িয়ে সৈকত দেখছে।

'কী করবে ভাবছ, রানা?' জিজ্ঞেস করল উর্বশী।

'দুই দল লড়াই করছে, আমরা তার মধ্যে হাজির হয়েছি,' বলল রানা। 'সম্ভবত মুদাস্‌সর খানের ছেলে একদল লোককে নির্দেশ দিচ্ছে। ওপাশে আছে সরোকিনের লোক, কালো পোশাক পরা।'

তিক্ত হাসল উর্বশী। 'আমার শত্রুর শত্রু মানেই আমার বন্ধু নয়, কী বলো?'

'তা-ই আসলে!'

ওদের সঙ্গী কমাণ্ডোরা ক্রুজ লাইনারটা বামে রেখে ক্রল করে এগিয়ে চলেছে। ওপাশে খান ও সরোকিনের লোকজন তুমুল গোলাগুলি করছে। রানার দলের সবাই সৈকত পেরিয়ে টিলার পায়ের কাছে চলে গেল। টিলার গায়ে চুপচাপ পড়ে আছে অনেকে—চাইনিজ, বাঙালি, থাই, নানান দেশের মানুষ। অস্ত্রধারী কমাণ্ডোদের দেখে ভয়ে চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল সবার। রানা মানুষগুলোকে বাংলা, হিন্দি, ম্যাণ্ডারিন ও থাই ভাষায় আরও দূরে গিয়ে আড়াল নিতে বলল। কিন্তু নিশ্চল চেয়ে রইল ওরা, যেন ভয়ে জমে গেছে, ধরে নিয়েছে মরতেই হবে।

রানা বুঝতে পারছে, এসব মানুষকে উদ্ধার করতে হলে আগে লড়াই বন্ধ করাতে হবে।

'রানা, আমরা তৈরি,' ট্যাকটিকাল নেট-এ সোহেলের কণ্ঠ শোনা গেল।

মার্ভেল ইতিমধ্যে অবস্থান পাল্টেছে, এখনও ওটার গ্যাটলিং গান ঢেকে রেখেছে, কিন্তু জাহাজ তাক করেছে মাছধরা ট্রলারগুলোর দিকে। দুই ট্রলার মোটা দড়ি দিয়ে টাগ-বোটের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে।

'আমরাও প্রায় তৈরি,' বলল রানা। 'তোরা ফু-চুংকে দেখতে পেলি?'

'না। অনিল এখন উইপন্স নিয়ে ব্যস্ত। আতাসি ওর কাছ থেকে ক্যামেরা বুঝে নিয়েছে। ও ভাল ছবি পাচ্ছে, কিন্তু সৈকতে এত লোক যে আমাদের কম্পিউটারের,ফেশাল রিকগনিশন সফটওয়্যার হিমশিম খাচ্ছে।'

'সৈকতের যেখানে লড়াই বেশি হচ্ছে, ওখানে ফু-চুংকে খুঁজতে বল্,' বলল রানা। 'সুস্থ থাকলে ও লড়াই করছে।'

'ভাল কথা বলেছিস। ...আতাসি?'

'শুনেছি, বস্,' বলল আতাসি। 'ক্যামেরা অন্যদিকে সরিয়ে নেব এখন।'

কমাণ্ডোদল নিয়ে কাদাভরা টিলা বেয়ে উঠছে রানা। ঝুঁকে ছুটল সবাই। আড়াই শো ফুট উপরে উঠে থামল ওরা। সৈকত এখন অনেক নীচে। ওদিকে আর তাকাল না কেউ। টিলার বুকে চোখ বোলাল। সাইটের এই এলাকায় প্রচুর

মাটি তোলা হয়েছে। ওয়াটার ক্যানন দিয়ে শক্ত মাটি ধসিয়ে দিয়েছে। নজলগুলো এখন আকাশে পানি ছুঁড়ছে। মাটিতে অসংখ্য কোদাল ও বালতি পড়ে। গোলাগুলি শুরু হওয়ায় ক্রীতদাসরা পালিয়ে গেছে। তাদের গার্ডরাও এখানে নেই, সৈকতে নেমে গিয়ে লড়াই করছে।

সবাইকে নিয়ে সাবধানে এগোল রানা। রাইফেল বাগিয়ে তৈরি হয়ে আছে সবাই। চোখ একই জায়গায় দ্বিতীয়বার শত্রু খুঁজছে না।

অনেক নীচে বিস্ফোরণের আওয়াজ পেল ওরা। গ্রেনেড। বার্জের ওপাশে ফেটেছে। চট্ করে ওদিকটা দেখে নিল সবাই। সরোকিনের এক লোক, কালো ইউনিফর্ম পরা দেহটা অলস ভঙ্গিতে আকাশে ভেসে উঠল, উড়ে গিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে সৈকতে পড়ল। এত উপর থেকে লাশটা ছোট্ট একটা স্তূপ মনে হলো। পরমুহূর্তে ওরা কানের কাছে একে-ফোরটিসেভেনের গর্জন শুনতে পেল।

মুহূর্তে মাটিতে শুয়ে পড়ল সবাই। চারপাশে কাদা ছিটকে গেল। রিফ্লেক্সের কারণে গুলি করল এক কমাণ্ডো, সামনের একটা ওয়াটার ক্যাননের চারপাশে বুলেট বিঁধল। মুহূর্তে তার অর্ধেক ম্যাগাজিন খালি হয়ে গেল। এটা ভাল ওয়ার ডিসিপ্লিন বলা যায় না, তবে আক্রমণকারী গুলির ভয়ে সরে গেছে। ওখান থেকে আর দ্বিতীয়বার গুলি এল না।

তবে লোকটাকে দেখেছে উর্বশী, তিন রাউণ্ড গুলি বর্ষণ করল ও—বুকে গুলি খেল লোকটা, পিছিয়ে গিয়ে কাদা ভরা পুকুরের মধ্যে ঝপ করে পড়ল। লাশটা মুহূর্তে ডুবে গেল, কিন্তু পানিতে রক্ত ভেসে থাকল। রানার দলের সবাই ক্রল করে একটা নালার মধ্যে নেমে পড়ল। মাত্র পাঁচ সেকেণ্ড পর মনে হলো একদল রাইফেলধারী আকাশ থেকে পড়েছে। লোকগুলো পুকুর পাড়ের ঢালে ছিল, বেরিয়ে এসে একের পর এক গুলি করছে। প্রচণ্ড আওয়াজে চারপাশ কাঁপছে। আশপাশে একজন মজুরও নেই, আগেই পালিয়েছে।

কমাণ্ডোরা পাল্টা গুলি করল। লোকগুলো পিছু হটে পুকুরের ঢালে নেমে গেল। কিছুক্ষণ নীরবে কাটল। উর্বশী বলল, 'এখানে এদের সঙ্গে লড়াই করার সময় নেই আমাদের।'

টিলার নীচের দিকে তাকাল রানা, সাগর দেখল। অ্যাসল্ট বোট নির্দিষ্ট জায়গায় চলে গেছে। এবার মার্ভেল গ্যাটলিং গান দিয়ে ওটাকে কাভার দেবে। পুকুরের পাড় দেখল রানা। ওপাশে মুদাস্‌সর আলী খানের পাকিস্তানিরা রাইফেল নিয়ে অপেক্ষা করছে, ওদের এগোতে দেবে না। লোকগুলো এরইমধ্যে আবারও পুকুরের পাড়ে উঠে এসেছে, মাঝে মাঝে গুলি করছে, ছড়িয়ে পড়ছে। এগোনো তো দূরের কথা, একটু পর পিছানোও যাবে না। এই নালায় আটকা পড়তে হবে।

থ্রোট মাইক্রোফোনে বোটের সঙ্গে কথা বলল রানা, 'কাশেম, তোমরা আমার কথা শুনছ?' কোনও জবাব এল না। আবারও ডাকল রানা, কিন্তু বোট এখনও পঞ্চাশ নট গতিতে ছুটে চলেছে, ওটার ইঞ্জিনের গর্জনে ক্রুরা কিছুই শুনবে না। বাধ্য হয়ে মার্ভেলে যোগাযোগ করল রানা। 'অনিল, তোকে দরকার। ক্যামেরায় আমাদের দ্যাখ্। উপরের টিলায় খানের অন্তত পঞ্চাশজন আছে, রাইফেলসহ। আমাদের গেঁথে ফেলেছে।'

'কাশেমরা টাগ-বোটে হামলা করবে এখন,' বলল অনিল। 'তোরা দশ মিনিট আটকে রাখতে পারবি?'

উপরের দিকে তাকাল রানা। লোকগুলো ক্রল করে দু'পাশের বোল্ডারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আড়াল পেলে এগিয়েও আসবে। 'না, ঠেকানো সম্ভব নয়,' স্পষ্ট বলল রানা। 'ওরা অনেক বেশি।'

'ঠিক আছে, রানা,' অনিলের অস্ফুট কথা শুনতে পেল রানা। 'ওদের দেখছি। ...সরি, কাশেম!'

অ্যাসল্ট টিম গানেল টপকে সৈকতে চলে যেতেই কাশেম বোট পিছিয়ে নিল। যথেষ্ট গভীরতা পাওয়ার পর বোট ঘুরিয়ে নিয়ে ছুটল ফিরতি পথে। খোলা সাগরে ফিরবে, তারপর পজিশন নেবে।

বোটের গতি ক্রমেই বাড়ছে। হেডসেট খুলে রাখল কাশেম, জিজ্ঞেস করল, 'ম্যাডাম, একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

'তার আগে কথা দিতে হবে আপনি আমাকে আর কখনও ম্যাডাম বলে ডাকবেন না,' বলল জুডি। 'আপনার কী ধারণা আমি কোনও বুড়ি মেয়েলোক?'

'সরি,' হেসে ফেলল কাশেম। 'ব্রিটিশ মহিলা দেখে ম্যাডাম বলছিলাম।'

'কী জানতে চান?'

'আপনি কি বোট চালাতে পারেন?'

'লয়েডস্-এ চাকরি করি আমি, কাজেই নানান রকম বোটের চারপাশে থাকি। ক্যাপ্টেনের লাইসেন্স আছে আমার, বারো হাজার টন পর্যন্ত জাহাজ চালাতে পারি। আপনাদের দ্য মার্ভেল অভ গ্রিসও।'

'আমাদের অ্যাসল্ট বোট?'

'স্পেনে ছুটিতে গিয়ে রিভা স্পিডবোট ভাড়া করে ঘুরেছি, মনে হচ্ছে এটা অনেকটা ওরকম। কেন?'

'জলিল আর আমার আরেকটা কাজ আছে, সেজন্য কাউকে তো হালটা ধরতে হবে?'

'আমরা মার্ভেল ছেড়ে চলে আসার আগে স্টিলের যে টুকরোটা এনেছেন, নিশ্চয়ই সেটা দিয়ে কিছু করবেন?'

'মাসুদ ভাইয়ের নির্দেশ,' বলল জলিল। 'উনি বলেছেন আমরা তো এই দোজখ থেকে মানুষগুলোকে সরিয়ে নেবই, একটু স্যালভেজের কাজও করব।'

দু'চোখ হেসে উঠল জুডির।

সাগরের দিকে ছুটে চলেছে বোট, তারপর বাঁক নিয়ে মার্ভেলের আড়ালে চলে এল। ছুটল এবার টাগ-বোটের দিকে। একটা ট্রলার টাগ-বোটের একপাশ থেকে সরে গেছে, কিন্তু অন্যটা এখনও দড়িতে আটকানো। টাগের ডেকে অনেকে দৌড়াদৌড়ি করছে। বেশিরভাগই জলদস্যু, কয়েকজন টাগ-বোটের ক্রু—তারা তাদের জাহাজ রক্ষা করতে চাইছে। জলদস্যুদের কিছু লোক নৃশংসতার চরম দেখাল, ম্যাশেটি দিয়ে ক্রুদের কুপিয়ে মারল।

অনিল অ্যাসল্ট বোটের উপরে চোখ রেখেছে, ওটা যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে ছুটে

চলেছে। ঠিক সময় বুঝে গ্যাটলিং গান চালু করতে হবে। টাগ-বোটের বিশ গজ দূরে চলে যাওয়ার পর কাশেম বুঝতে পারল, ও হেডসেট পরে নেই! সঙ্গে সঙ্গে ওটা মাথায় আটকে নিল। একইসময়ে খ্যাটখ্যাট আওয়াজে গ্যাটলিং গানের ছয় ব্যারেল জেগে উঠল। কাশেম থ্রটলের স্টিক সামনে বাড়িয়ে দিল, বোটের গতি কমিয়ে আনছে।

বিশ এমএম শেলগুলো জলদস্যুদের ট্রলারে এসে লাগল না, টাগ-বোটের ডেক ঝাড়ু চালানোর মত পরিষ্কার করে দেওয়ার কথা, কিন্তু গ্যাটলিং গানের বুলেট এদিকে এলোই না! উল্টো জলদস্যুরা টাগ-বোটের রেইলিঙের ওপাশে দাঁড়িয়ে গুলি শুরু করল! অ্যাসল্ট বোট হালকা ভাবে আর্মার্ড, ওটার চারপাশের ইনফ্লেটেবল পর্দার গায়ে অজস্র বুলেট বিঁধল, ডেক ফুটো হলো। বুলেটগুলো আউটবোর্ড ইঞ্জিনের গায়ে লেগে ছিটকে অন্যদিকে যাচ্ছে। জুডি, জলিল ও কাশেম এখনও গুলি খায়নি সেটা ওদের কপাল। কাশেম হুইল নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া শুরু করল, যত দ্রুত সম্ভব টাগ-বোট এড়িয়ে সরে যেতে হবে। গোলাগুলির মধ্যে চিৎকার করে অনিলের কাছে জানতে চাইল, 'কী হয়েছে, সার? কাভার দেয়া গেল না?'

জবাব এল না।

এদিকে রানার দল ও পাকিস্তানি প্রহরীদের মাঝখানে জমি বিস্ফোরিত হলো। পাঁচশো তপ্ত ইউরেনিয়াম বুলেট মাটিতে গাঁথল। ওদিকে পুকুরের পাড়ের চার ফুট পুরু মাটি স্রেফ উধাও হলো। প্রহরীরা তাদের আড়াল হারিয়েছে আগেই, সবাইকে পরিষ্কার দেখা গেল। যারা সরাসরি আঘাত থেকে বেঁচেছে, তারা উড়ন্ত পাথরের আঘাতে মারা গেল। অন্তত বিশজনের বেশি লোক, মুহূর্তে লালচে কুয়াশায় মিলিয়ে গেল।

উর্বশী কয়েকজন কমাণ্ডো নিয়ে দেখতে গেল কেউ বেঁচে আছে কি না। নেই কেউ। থাকবার কথাও নয়। গুলি, না গোলা? ওগুলো নিজেদের কাজ শেষ করেছে। পুকুর ঘুরে এসে উর্বশী বলল, 'আমরা রওনা হতে পারি। পিছন থেকে বাধা দেয়ার কেউ নেই।'

দলের সবাইকে একত্র করল রানা, বলল, 'মনে রেখো আমরা এখন আর কাউকে চমকে দিতে পারব না। তবে আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী এগিয়ে যাব, মিস্টার ফু-চুংকে খুঁজে বের করব, শ্রমিকদের জড় করে সরে যাব।'

ওরা সবাই টিলা বেয়ে নামছে।

বোল্ডারের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকল ফু-চুং, দেখতে চায় মার্ভেল তীরের দিকে ছুটে এলে প্রহরীরা কী করে। যা ভেবেছে, রাশানরা জাহাজের দিকে ভ্রূক্ষেপ করল না, দক্ষতার সঙ্গে শত্রুদের ঠেকিয়ে রাখল। পরবর্তী পনেরো মিনিটে তারা খানের লোকবল চারভাগের একভাগ কমিয়ে দিল। কিন্তু পাকিস্তানি প্রহরীরা সংখ্যায় অনেক, মরিয়া হয়ে লড়াই করছে এখন। অ্যাম্বুশে পড়বার সময় রাশানরা বারোজন ছিল, তাদের চারজন ইতিমধ্যে মারা গেছে। তিনজন আহত, তবে এখনও নিজেদের অবস্থান ধরে রেখেছে। কিন্তু বেশিক্ষণ পারবে না, পাকিস্তানি

প্রহরীরা রাশানদের দিকে ক্রমেই এগিয়ে চলেছে—সংখ্যায় তারা অনেক বেশি। যুদ্ধের ফলাফল কী হবে বুঝে গেছে রাশানরা, এখন আর জান বাঁচানোর জন্য লড়াই করছে না, যতটা পারা যায় বেশি শত্রু মারতে চাইছে।

প্রসেসিং বিল্ডিঙের ওপাশে কী যেন চোখে পড়ল ফু-চুঙের। মনে হলো খনির ম্যানেজার গিলবার্ট ওয়ালজ্যাক। লোকটা ডরমিটরি জাহাজ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। ওয়ালজ্যাকই! সঙ্গে এক লোক! দু'জন ঢাল বেয়ে উঠে হেলি-প্যাডের দিকে চলেছে! ওখানে সরোকিনের হেলিকপ্টারটা বসে আছে। ওয়ালজ্যাকের হাতে পিস্তল, সঙ্গের লোকটার মাথায় ব্যারেল ঠেসে ধরেছে। ওই লোকটা সম্ভবত কপ্টারের পাইলট, তাকে দিয়ে জোর করে কপ্টার আকাশে তোলাবে ওয়ালজ্যাক, পালাবে। আশপাশে ভ্লাদিমিয়ার সরোকিনের কোনও চিহ্ন নেই। ফু-চুং আন্দাজ করল, দক্ষিণ-আফ্রিকান ম্যানেজার হয়তো সরোকিনকে খুন করে সরে পড়ছে।

ম্যানেজারের পিছু নেয়া ট্যাকটিকাল ভুল হবে, কিন্তু ফু-চুঙের বুকের মধ্যে প্রচণ্ড রাগ ফুঁসে উঠল। ভাবাবেগ কোনও যুক্তি গ্রহণ করে না। দিনের পর দিন খেটে মরেছে ও, পেট ভরে খেতে পায়নি, অপমান সহ্য করেছে, প্রচণ্ড মার তো ছিলই—এগুলো মন থেকে দূর হতে সময় লাগবে। কিন্তু ওই পিশাচ ম্যানেজারটাকে খুন করলে মন কিছুটা শান্তি পাবে। সেটাই বা কম কী? ইতিমধ্যে ফু-চুং হুয়েংকে জানিয়েছে কী করতে হবে। হুয়েং যত লোক পাবে, সঙ্গে নিয়ে নতুন ওই জাহাজের দিকে যাবে। অগ্ন্যুৎপাত শুরু হলে, সৈকতে যেসব জাহাজ আছে, সেগুলোর চেয়ে নতুন জাহাজটার টিকে থাকবার সম্ভাবনা অনেক বেশি। ইতিমধ্যে রানা নিশ্চয়ই ওদের উদ্ধারের উপায় ভেবে বের করবে।

ফু-চুঙের শরীরের অবস্থা এমন নয় যে গিলবার্ট ওয়ালজ্যাকের পিছু নেবে, কিন্তু তবুও ছুটল লোকটাকে হাতে পাওয়ার আশায়। উৎসাহ ফিরে পেয়েছে ও, পায়ের পেশিতে জোর পেল, ফুসফুস ভরে বাতাস টেনে নিল। মন বলল, আরেকবার বেঁচে উঠেছে ও। ঢাল বেয়ে নেমে গেল ও, জং-ধরা কন্টেইনার ও অন্যান্য ইকুইপমেন্ট পেরিয়ে তীর বেগে ছুটল হেলি-প্যাডের দিকে। পাকিস্তানি প্রহরীদের যারা ওকে দেখল, প্রাণ নিয়ে পালাতে ব্যস্ত শ্রমিক ভেবে গুলি নষ্ট করল না। ফু-চুংও ওদের দিকে গুলি খরচ করল না। মৃত এক প্রহরীর শার্ট খুলে পরে নিয়েছে ও, একে-ফোরটিসেভেন ঢোলা শার্টের আড়ালে রেখে ছুটছে।

দু'মিনিটের মধ্যে গোলাগুলির জায়গাটা পেরিয়ে এলো ও। সামনে সাগর যেন সৈকত খেয়ে নিয়েছে। ডানে বাঁক নিয়ে টিলার পাশ দিয়ে ছুটল ও। কিছুটা জায়গা পেরিয়ে সৈকত আবারও চওড়া হয়েছে। দু'পাশে বড় বড় বোল্ডার। আরেকটু সামনে বামে ছোট্ট এক উপসাগর। ওখানে একটা মোটর লঞ্চ ভাসছে, ওটা দিয়ে টাগ-বোটে সোনা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ঘের দেয়া জায়গাটা যেন আলাদা একটা সৈকত। বোল্ডারের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ফু-চুং। লঞ্চে আটজন প্রহরী উঠেছে, রওনা হবে, কিন্তু চাইনিজটাকে দেখে সবাই একইসঙ্গে চোখ তুলে তাকাল। পিছনের সৈকতে প্রহরীরা ফু-চুংকে পাত্তা দেয়নি, এদেরও তা-ই করা উচিত ছিল, কিন্তু একজন রাইফেলের দিকে হাত বাড়াল। মুহূর্তে ডান দিকের

বোল্ডারের বাঁকে হারিয়ে গেল ফু-চুং। এক সেকেণ্ড আগে যেখানে ছিল, সেখানে এসে লাগল এক ঝাঁক বুলেট। পাথরের কুচি ছিটকে লাগল ওর কাঁধে। কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করল ফু-চুং। গোলাগুলি থেমে গেল। ইতিমধ্যে ও রাইফেলটা শার্টের ভিতর থেকে বের করে নিয়েছে, চট করে বাঁকের এপাশে বেরিয়ে এল।

রাইফেলধারী প্রহরী ঘুরে বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে হাসছে, যেন খুব মজা করেছে সে। ফু-চুঙের প্রথম তিনটে বুলেট লোকটাকে একটা লাশ বানিয়ে দিল। মৃতদেহটা পাক খেয়ে সঙ্গীদের গায়ে গিয়ে পড়ল। পরবর্তী বুলেটের আঘাতে লাশটা সৈকতে এসে নামল। আরেকজনকে গেঁথে ফেলল ফু-চুং, কিন্তু অন্যরা ততক্ষণে সাবধান হয়ে গেছে। দেরি না করে রাইফেল তুলেছে তারা, পাল্টা গুলি করল। কিন্তু তার আগেই পিছিয়ে গেছে ফু-চুং, বোল্ডারের আড়াল নিয়েছে। কাঁধে রাইফেল ঝুলিয়ে পিছল বোল্ডারের গা বেয়ে উঠতে শুরু করল।

পাথরটা মাত্র আট ফুট উঁচু, কিন্তু উঠতে শুরু করে মনে হলো, ওটুকু উৎরাই সমস্ত শক্তি শুষে নেবে। ওর হাতগুলো দেহের ওজন রাখতে গিয়ে থরথর করে কাঁপছে। একে-ফোরটিসেভেনের ওজন যেন অন্তত একশো পাউণ্ড! বোল্ডারের মাথায় পৌঁছে গেল ও, ঠিক তখনই লঞ্চের ইঞ্জিন গর্জে উঠল। পাথরের মাথাটা গোলাকৃতি, শরীর পিছলে দিয়ে সামনের অংশে পৌঁছে গেল ফু-চুং, কাঁধে রাইফেল ঠেকাল। লঞ্চের ইঞ্জিনের আওয়াজ বদলে গেল, প্রপেলার এখন পানি কাটছে।

জলদস্যুরা আন্দাজ করে নিয়েছে ওই চাইনিজ আবারও গুলি ছুঁড়বে। তাদের চারজন বোল্ডারের গায়ে গুলি-বর্ষণ করল। পাথরের কুচি চারপাশে ছিটকে গেল। দু'হাতে মাথা আড়াল করল ফু-চুং, পাথরের টুকরো চামড়া ছিঁড়ে দিল—ওর মনে হলো বোলতার চাকের মধ্যে পড়েছে। প্রহরীরা গুলি বন্ধ করল না, লঞ্চ দ্রুত দূরে সরে গেল। প্রহরীরা একটু পরে বোল্ডারটা সাইটে ভাল ভাবে দেখতে না পেয়ে বাধ্য হয়ে গুলি থামাল।

মাথা তুলে লঞ্চের দিকে তাকাল ফু-চুং। ওটা টাগ-বোটের দিকে চলেছে। ওদিকে মার্ভেলের অ্যাসল্ট বোট টাগ-বোট থেকে গুলি-বর্ষণের মুখে পড়েছে। রানা নিশ্চয়ই কোনও পরিকল্পনা করেছিল, কিন্তু শেষে বাস্তবে তা কাজে লাগেনি। অ্যাসল্ট বোটে মাত্র দু'তিনজন আছে। ওরা যদি টাগ-বোট আক্রমণ করতে চায়, তা হলে মার্ভেল থেকে ওদের কাভার দিতে হবে, কিন্তু গ্যাটলিং গান এখনও নিশ্চুপ!

আধ সেকেণ্ড পর গ্যাটলিং গানের ছয় ব্যারেল খ্যাট-খ্যাট-খ্যাট-খ্যাট শুরু করল! উইপন্স বে থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল দশ ফুটি আগুনের শিখা। টিলার অনেক উপরে পুকুরগুলোর দিকে গোলা-বর্ষণ করা হচ্ছে। ওখানে মাটি-পাথর তিরিশ ফুট উপরে ছিটকে উঠল।

টিলা দেখে নিয়ে আবারও অ্যাসল্ট বোটের দিকে তাকাল ফু-চুং। বুঝল, ও বোটের কাউকে সাবধান করতে পারবে না। ওদিকে তাদের দিকে লঞ্চটা এগিয়ে চলেছে! বোল্ডার ছেড়ে নেমে এল ফু-চুং, গিলবার্ট ওয়ালজ্যাককে মুঠোয় পাওয়ার জন্য ছুটল।

লোকগুলো টাগ-বোটের রেইলিঙের ওপাশে দাঁড়িয়ে গুলি করছে। কাশেম একহাতে হুইল ধরে রেখেছে, আরেক হাতে পিস্তল—জলদস্যুদের দিকে পাল্টা গুলি করছে। জলিল আর জুডিও তা-ই করছে, বসে পড়েছে ফ্লোরবোর্ডে। নিখুঁত লক্ষ্যে গুলি করছে। বিশেষ করে জুডি, ওর তাক অলিম্পিকের মার্কস-ম্যানদের মত, ধৈর্যে স্নাইপারদের মত, গুলি ফস্কায় না।

পঞ্চমবারের মত গুলি করল ও। তার আগেই ওই লোক ধাতব রেইলিঙের আড়ালে বসে পড়েছে—অন্তত কয়েক সেকেণ্ড চুপচাপ ওখানে বসে থাকবে। তার আরেকটু দূরে হঠাৎ আরেকজন উঠে দাঁড়াল, তাক না করেই সাগরে গুলি করল। কয়েক সেকেণ্ড পর অ্যাসল্ট বোটের উপর তাক করল আবার। জুডি খুব সাবধানে লোকটার বুকে পিস্তল তাক করল। বহমান ঢেউ খেয়াল করে আস্তে করে ট্রিগার টিপল। ওর বুলেট রেইলিঙের উপরের অংশে পিছলে গেল, বিঁধল গিয়ে প্রহরীর বুকের হাড় স্টারনাম-এ—লোকটা উড়ে গিয়ে পিছনে পড়ল।

'আমরা সরছি!' চিৎকার করে জানিয়ে দিল কাশেম। 'সিজ ফায়ার!'

বনবন করে হুইল ঘোরাল সে, এমন এক পথে চলেছে যে মনে হলো টাগ-বোটের সঙ্গে সংঘর্ষ হবে, কিন্তু শেষে খোলা পানিতে বেরিয়ে গেল। গুলি আসছে না দেখে উঠে দাঁড়িয়েছে জলদস্যুরা, সুযোগ পেয়ে বোটের দিকে রাইফেল তাক করল।

'ঠিক আছে, কাশেম, সরে যাও,' এতক্ষণে রেডিয়োতে জানাল অনিল।

টিলার উপর থেকে গ্যাটলিং গান সরিয়ে নিয়েছে ও। যে-ট্রলারটা ঢেউয়ের ধাক্কায় দূরে সরছে, সেটার দিকে কয়েক সেকেণ্ড মেশিনগান চালাল ও। ডেকের কাঠগুলো ছিন্নভিন্ন হলো, উধাও হলো পাইলট-হাউজ। সিগালগুলো ডেকে পড়ে থাকা মাছগুলো খেতে নেমে এসেছিল, যে-কটা বাঁচল, দ্রুত আকাশে উঠে দূরে সরে গেল। ততক্ষণে ট্রলারের ইঞ্জিনরুম ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। বিরাট ডিজেল ইঞ্জিনটা মাউন্ট থেকে খসে পড়ল, ফিউএল ট্যাঙ্কে শতখানেক ফুটো তৈরি হয়েছে ততক্ষণে। পরমুহূর্তে ট্রলারের মাঝখানে একটা কালচে-কমলা আগুনের বড় ছাতা তৈরি হলো, শিখাগুলো আকাশ চাটল—ট্রলার মুহূর্তে বিস্ফোরিত হলো, সব কিছু শ্র্যাপনেলের মত ছিটকে গেল চারপাশের সাগরে।

এর পরেও যা থাকল, কয়েক সেকেণ্ড জ্বলল, তারপর ঢেউয়ের নীচে তলিয়ে গেল।

টাগ-বোট ওরকম নাটকীয় ভাবে উধাও হলো না। অনিল ওর গ্যাটলিং গানের ট্রিগারে কয়েক সেকেণ্ড আঙুল রাখল। দুই আঙুলে টিপে আঙুর ফাটালে যেমন দেখা যায়, ঠিক সেভাবে টাগ-বোটের চারপাশের রেইলিং ফেটে গেল—প্রচণ্ড গোলা-বর্ষণে জলদস্যুরা টুকরো টুকরো হলো। টাগের ডেকে বেঁধে রাখা শিপিং কন্টেইনারের গায়ে অজস্র ফুটো তৈরি হলো। পিছনের দিকে মুখ করা দ্বিতীয় ব্রিজের কাঁচগুলো চুরমার হয়ে ছিটকে গেল। ক্রুরা ওখানে দাঁড়িয়ে দেখত কী টেনে নিয়ে চলেছে। টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া কাঁচগুলো সমস্ত লাশ কেটে-ছিঁড়ে আরও ভয়ঙ্কর করে তুলল। অনিল অটোফায়ার দিয়ে ডেকে ঝাড়ু দিল,

নিশ্চিত হলো কেউ বেঁচে থাকবে না। রেডিয়োতে কাশেমকে জানিয়ে দিল, 'ওখানে আর কেউ নেই।'

কাশেম বোট ঘুরিয়ে নিল, ফিরে এসে টাগের রেইলিঙের পাশে থামল। এদিকের রেইলিং অনেকটা নিচু।

'জুডি, আপনি বোট সামলে রাখুন, আমরা এক মিনিটের মধ্যে ঘুরে আসছি,' বলল কাশেম।

জলিল ও কাশেম মিলে ডেকের উপরে ভারী একটা গার্ডার তুলল। নিজেরাও রেইলিং টপকাল।

'ওটা দিয়ে কী করবেন?' জিজ্ঞেস করল জুডি।

রেইলিঙে ঝুঁকে জুডির হাতে ট্যাকটিকাল রেডিয়ো ধরিয়ে দিল কাশেম। লাজুক হাসছে দুই কমাণ্ডো। জলিল বলল, 'মাসুদ ভাই বলেছেন এখানে কিছু জিনিস আছে, যেগুলো এখানে থাকার কথা নয়। ওগুলো সরিয়ে ফেলতে হবে।'

গ্যাটলিং গান আর জলদস্যুদের মানুষ রাখেনি, তারা লালচে রঙের থকথকে কাদা হয়ে গেছে। কাছে যেতেই রক্ত-মাংস-নাড়িভুঁড়ির আঁশটে গন্ধ পাওয়া গেল। ওরা নিয়ম অনুযায়ী খুঁজল কেউ বেঁচে আছে কি না। নেই।

দুই কমাণ্ডো রেইলিঙের কাছে ফিরে গার্ডারটা কাঁধে তুলে নিল, রক্ত মাড়িয়ে চলে গেল একটা কন্টেইনারের কাছে। ওটার দরজার সামনে থামল। কাশেম পিস্তল বের করে তালার মাঝখানে গুলি করল। প্যাডলক ভেঙে গেল। এদিকে জলিল বিমটা কন্টেইনারের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখল। কাশেম কন্টেইনারের দরজার এক পাল্লা খুলল, ক্যাঁচ-ক্যাঁচ আওয়াজ হলো। একমুহূর্ত ভিতরটা দেখল সে, তারপর ছিটকানি দিয়ে দরজা আটকে দিল।

চোখে প্রশ্ন নিয়ে সঙ্গীর দিকে তাকাল জলিল।

'মাসুদ ভাই ঠিকই বলেছেন।'

'সোনা?'

'সোনা।'

জলিল কুঁজো হয়ে দাঁড়াল, দু'হাতের আঙুলগুলো এক করে রাখল। ওর দেয়া মইয়ে এক পা রেখে উঠে দাঁড়াল কাশেম, দু'হাতের জোরে কন্টেইনারের ছাদে উঠে পড়ল। এবার দু'জন মিলে দুশো পাউণ্ড ওজনের বিমটা উপরে তুলল। শ্বাস ফেলে মাথা উঁচু করল কাশেম, তখনই প্রথমবারের মত লঞ্চটা দেখতে পেল। ওটা টাগ-বোটের দিকে আসছে। টাগের আড়ালে রয়েছে বলে মিস্টার চ্যাটার্জি ওটা দেখতে পাননি। অগভীর পানি ছেড়ে এসেছে লঞ্চ। গতি দ্রুত বাড়ছে। ওটার ডেকে ছ'জন লোক, সঙ্গে রাইফেল।

'যাস্‌সালা!' বলে উঠল কাশেম।

ঘাড় ফিরিয়ে দেখল জলিল। বলে উঠল, 'সারছে!'

লঞ্চটা চলে আসতে বড়জোর তিন মিনিট লাগবে। কিন্তু বিমটা নিয়ে কাজ সারতে লাগবে অন্তত দু'মিনিট, নইলে জিনিসটা কন্টেইনারের সঙ্গে আটকে দেয়া যাবে না। কন্টেইনারের ভিতরে পুরস্কারের জিনিস, সেটা তো এভাবে ফেলে যাওয়া যায় না! কিন্তু তারপর? ওদের কী হবে?

জুডির দিকে ফিরল কাশেম, চেঁচিয়ে বলল, 'জলদস্যুরা একটা লঞ্চে করে আমাদের দিকে আসছে, আপনি বোট নিয়ে সরে যান!'

'আপনাদের ফেলে রেখে? অসম্ভব!'

'আমরা হিরো হওয়ার জন্য বলছি না,' বলল জলিল। 'আপনিই তো ওদের পিছনে টেনে নিয়ে যাবেন, নইলে মিস্টার চ্যাটার্জি ওদের ঘুম পাড়াবেন কী করে?'

জুডি যুক্তিটা বুঝতে পেরে থ্রটল পুরোপুরি খুলে দিল, অ্যাসল্ট বোট তীব্র গতিতে টাগের পিছনের অংশ পেরিয়ে বামে বাঁক নিল, এবার জুডি খোলা সাগরে ছিটকে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু সে ভুলে গেছে বার্জ ও টাগ-বোট এখনও মোটা দুটো কেবল দিয়ে সংযুক্ত! ওগুলো আর দশ গজ দূরে। এখন আর এড়ানো সম্ভব নয় কিছুতেই। অ্যাসল্ট বোট কেবলের নীচে নাক ঢুকিয়ে দিল। শেষ-মুহূর্তে মাথা নিচু করে বসে পড়ল জুডি। মোটা স্টিলের তার এক সেকেণ্ডে ককপিটটা উপড়ে নিল।

ছুটন্ত বোট মুহূর্তে দ্বিতীয় কেবলের তলা দিয়ে বেরিয়ে গেল। ঠিক সামনেই পড়ল লঞ্চ। সবকিছু এত দ্রুত ঘটছে যে জলদস্যুরা মাত্র এক পলক দেখল—একটা বোট প্রচণ্ড জোরে ছুটে আসছে। বোট এসে তাদের লঞ্চের পেটে জোর গুঁতো মারল! ঝাঁকি খেয়ে এক জলদস্যু রেইলিং টপকে সাগরে গিয়ে পড়ল। অন্যরা বুঝে উঠবার আগেই বোট পিছলে সরল, মুহূর্তে বিশ গজ পেরিয়ে গেল। দ্রুত আরও দূরে চলে যাচ্ছে!

জুডির হাতে বোট এঁকে-বেঁকে ছুটছে। পিছন থেকে জলদস্যুরা গুলি ছুঁড়তে শুরু করল। ফ্লোরবোর্ডে বসে থেকে থরথর করে কাঁপছে জুডি, বিড়বিড় করে বলল, 'হ্যাঁ, জানি মেয়েরা ভাল ড্রাইভার হয় না, মানুষ চাপা দিয়ে পালিয়ে যায়, কিন্তু পারলে আমাকে ধরো তো দেখি! ধরতে পারলে তো!'

ঘাড় ফিরিয়ে দেখল ও, চমকে গেল। লোকগুলো পিছু নেয়নি, টাগের দিকেই এগিয়ে চলেছে! কাশেমের দেয়া রেডিয়ো-সেট পরে নিল ও, দ্রুত বলল, 'জুডি বলছি। আমি মিস্টার কাশেম আর জলিলের সঙ্গে অ্যাসল্ট বোটে ছিলাম।'

'জুডি, আমি সোহেল আহমেদ। সমস্যাটা কোথায়?'

'ছ'জন জলদস্যু একটা লঞ্চ নিয়ে টাগ-বোটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আপনাদের লোক দু'জন টাগ-বোটে আটকা পড়েছে। সঙ্গে শুধু পিস্তল। মারা পড়বে!'

'আপনি কোথায়?' শান্ত স্বরে জানতে চাইল সোহেল। মেয়েটিকে নার্ভাস করতে চাইছে না।

'অ্যাসল্ট বোটে। মিস্টার কাশেম চেয়েছেন আমি ওই লঞ্চটা সরিয়ে নেব, কিন্তু লোকগুলো পেছনে এল না।'

'এক মিনিট অপেক্ষা করুন। জলিল? কাশেম? তোমরা কোথায়?'

মৃদু কণ্ঠে শোনা গেল, 'সোহেল ভাই, জলিল বলছি। আমরা টাগে, কন্টেইনারের ছাদে। আধ-মিনিট পর লোকগুলো ডেক টপকে চলে আসবে।'

'ওরা কি জানে তোমরা ওখানে আছ?'

'না। ওরা আসার আগেই কাশেম একটা তারপুলিন নিয়ে এসেছে। লোকগুলো কন্টেইনারের ছাদে আমাদের না খুঁজলে লুকিয়ে থাকতে পারব। মনে

হয় না পুরো জাহাজ খুঁজে দেখবে।'

'ওরা এখন কী করছে?'

'পালিয়ে যাবে বলে টো কেবলগুলো খুলতে চাইছে। আমাদের কী করতে বলেন, সোহেল ভাই?'

'ওদের সাহায্য করতে হবে,' খোলা কমিউনিকেশন চ্যানেলে বলে উঠল রানা।

'কী করতে?!' সোহেল ও জুডি একইসঙ্গে বলে উঠল।

'ওদের সাহায্য করতে হবে,' বলল রানা। 'জলিল, কাশেম, তোমরা আপাতত চুপচাপ বসে থাকো। সোহেল, টো কেবলগুলো কেটে দেয়ার ব্যবস্থা কর।' রেডিয়োর মাধ্যমে গোলাগুলির শব্দ পাওয়া গেল। সৈকতে যুদ্ধ চলছে। রাইফেলের তীক্ষ্ণ আওয়াজ, একে-ফোরটিসেভেনের ব্রাশ ফায়ার, মানুষের মৃত্যু-আর্তনাদ, সবই শোনা যাচ্ছে।

'গ্যাটলিং দিয়ে ওগুলো কেটে দেয়া যায়,' জানাল অনিল। 'টাগের স্টার্নে কেবলের মোটাসোটা ড্রাম আছে। ওখানে হিট করলে কেবল থাকবে না।'

'তাই করুন,' বলে উঠল সোহেল।

'কাজটা করে সৈকতে মন দে, এখানে বহু মানুষ আটকা পড়েছে, গুলি খেয়ে মরছে,' বলল রানা। 'রাশানরা এখনও ঘাঁটি আটকে রেখেছে, হয়তো কয়েক ঘণ্টা টিকে যাবে। জলদস্যু আর প্রহরীদের জন্য টাগ-বোট একমাত্র বাঁচার পথ। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে এরা পালাতে পারলে বাঁচে।'

'রাশানদের কী করা যায়?' বলল সোহেল।

'আমরা সারেণ্ডার করার সুযোগ দেব, অস্ত্র না ফেললে অনিল কামান দিয়ে উড়িয়ে দেবে,' জানাল রানা।

ভয়ঙ্কর আওয়াজে চারপাশ কেঁপে উঠল। আগ্নেয়গিরির মাথায় বিস্ফোরণ ঘটেছে। আকাশ কালো করে দিল ছাই, মনে হলো ওখানে নিউক্লিয়ার মাশরুম জন্মেছে। চূড়ার দিকে তাকাল রানা। হাতে সময় আছে তো? অগ্ন্যুৎপাত পাঁচ সেকেণ্ড পরেও আসতে পারে! এদিকে ফু-চুংকে এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। সৈকতের লড়াই চলতে থাকলে শেষ পর্যন্ত দলের সবাইকে নিয়ে সরে যেতে হবে, খালি হাতে ফিরতে হবে মার্ভেলে—মানুষজন সরিয়ে নেওয়া যাবে না।

অস্বস্তি নিয়ে পর্বত চূড়ার দিকে তাকিয়ে আছে রানা, এমন সময় আতাসির উত্তেজিত কণ্ঠ শুনতে পেল, 'বস্! মিস্টার ফু-চুংকে পেয়েছি! বার্জের ওদিকে! দু'জনের পিছনে ছুটছেন। ওই দু'জনের একজন আরেকজনের হাতে বন্দি।'

'ওরা কোনদিকে যায়?'

'সৈকত পেরিয়ে উঁচু জায়গায় উঠছে। আমাদের ক্যামেরার রেঞ্জের বাইরে চলে গেছে প্রায়। ওখানে একটা হেলিকপ্টার আছে!'

'অনিল, ওটা উড়িয়ে দে,' বলল রানা। উর্বশীর দিকে তাকাল। ইন্দোনেশিয়ান কমাণ্ডার মাথা দোলাল, কমাণ্ডো দলের দায়িত্বে থাকবে ও।

দ্বিতীয়বার তাকাল না রানা, ঘুরেই ছুটল নীচের দিকে। মনে হলো উড়ে নেমে চলেছে। কিন্তু চল্লিশ গজ পার হতে না হতে একটা গোল পাথরে পা পড়ল,

পিছলে গেল রানা—ধড়াস্ করে আছাড় খেল। সেটাই ওকে বাঁচিয়ে দিল। ওর মাথার উপর দিয়ে গেল অটোমেটিক অস্ত্রের ব্রাশ ফায়ার। টিলার ঢালে শরীর গড়িয়ে দিল রানা, থামল পাথরের একটা স্তূপের পাশে—ক্রল করে ওটার পিছনে চলে গেল। একে-ফোরটিসেভেনের মালিক ঢালের নীচে। ওখানে পঞ্চান্ন গ্যালনের বেশ কিছু ড্রাম আছে, লোকটা রয়েছে ওগুলোর আড়ালে।

রানার এম-ফোরের ব্যারেলের নীচে আরেকটা ব্যারেল আছে, ওটা গ্রেনেড লঞ্চ করে—রাইফেলটা কাঁধে তুলল রানা, মাঝখানের ড্রামটার দিকে তাক করে ট্রিগার টিপল। গ্রেনেড লঞ্চার থ্যাপ্ করে ফাঁপা একটা আওয়াজ ছাড়ল, পরমুহূর্তে গ্রেনেড গিয়ে ড্রামের পেটে গুঁতো দিল। মুহূর্তে গ্রেনেডের প্রাইমারি এক্সপ্লোশন ঘটল, সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরিত হলো ড্রামের ফিউল। বাকি ড্রামগুলো প্রায় একই সঙ্গে আকাশে উড়াল দিল। রকেটের মত আরও উপরে উঠছে ওগুলো। কয়েকটা আকাশে ফাটল, অন্যগুলো নীচে পড়ে বিস্ফোরিত হলো—ওগুলোর জ্বলন্ত তেল টিলা বেয়ে সৈকতের দিকে ছুটল।

আকাশে চোখ রেখে চমকে গেল রানা, একটা ড্রাম ঠিক ওর দিকে নেমে আসছে! লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ও। ড্রামটা পাঁচ ফুট উপরের ঢালে এসে পড়ল—সঙ্গে সঙ্গে ফেটে গেল। জ্বলন্ত পেট্রল নীচের দিকে তেড়ে এল। রানার মনে হলো প্রাণপণে নীচের দিকে ছোটে, কিন্তু নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে আড়াআড়ি ভাবে ছুটল। তেড়ে আসা পেট্রল ওর পায়ের কাছে মাটি চাটছে! প্রচণ্ড তাপে শ্বাস নেয়া যাচ্ছে না, ঘাড়ের চুল পুড়ল। কয়েক সেকেণ্ড পর টের পেল ও পেট্রলের স্রোত পেরিয়ে এসেছে। দম নেয়ার জন্য থামল না, ঝেড়ে দৌড় দিল।

সামনে বার্জের ওপাশে থাকবে ফু-চুং।

জলদস্যুরা ইতিমধ্যে টাগ-বোটের ইঞ্জিন চালু করেছে। চিমনি দিয়ে কালো ধোঁয়া উঠছে। এখন কেবল কাটতে পারলেই তারা রওনা হয়ে যাবে। গ্যাটলিং গানের এক সেকেণ্ডের গোলা-বর্ষণ স্টিলের টো কেবলগুলো ছিঁড়ে দিল। রানা যা ভেবেছে সৈকতে তা-ই ঘটল।

জলদস্যুরা এতক্ষণ পর্যন্ত রাশানদের আটকে রেখেছে, কিন্তু এবার ঘুরে ছুটল টাগ-বোটের দিকে। কিছু লোক সঙ্গে অস্ত্র রেখেছে, তবে বেশিরভাগ রাইফেল ফেলে শীতল সাগরে নেমে পড়ল, সাঁতার কেটে টাগের দিকে এগোল। মনে হলো লোকগুলো আসলে ইঁদুর, ডুবন্ত জাহাজ থেকে সাগরে লাফ দিয়েছে।

কমাণ্ডোদের নিয়ে টিলার অবস্থান থেকে নেমে এল উর্বশী। পাকিস্তানি জলদস্যুদের কয়েকজন এখনও টের পায়নি পরিস্থিতি বদলে গেছে, তাদের জাহাজ রওনা হচ্ছে। তাদের দু'জন উর্বশীর গ্রেনেডে উড়ে গেল। তৃতীয় লোকটার দিকে রাইফেল তাক করেছে, এমনসময় হঠাৎ চমকে গিয়ে টের পেল ওর পায়ের কাছে পড়ে থাকা কালো পোশাক পরা রাশান লোকটা আসলে বেঁচে আছে। বাম হাতে উর্বশীর এম-ফোর সরিয়ে উঠে দাঁড়াল সে, ডানহাতে বাঁকা একটা ছোরা—উর্বশীর বুকে ছোরাটা গেঁথে দিতে চাইল। উর্বশী বাম হাতে ফলাটা সরিয়ে দিল, কিন্তু ছোরার ডগা ওর স্তন ছুঁয়ে গেল। রাইফেল পড়ে গেল হাত থেকে।

লোকটার ডান বাহুর নীচের পেশিতে ঘুসি মারল উর্বশী। জানে, ডান বাহু মুহূর্তে অবশ হয়ে যাবে। ততক্ষণে ও হাত নামিয়ে দিয়েছে, ক্রস ড্র করল, কোমরের হোলস্টার থেকে পিস্তলটা বের করেই লোকটার চোখে গুলি করল। লাশটা উল্টে পড়ল।

ফু-চুং বুঝতে পারছে ও কিছুতেই গিলবার্ট ওয়ালজ্যাককে ধরতে পারবে না। শরীর আর চলছে না। মনে হলো শুয়ে পড়ে। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে, মাথা ঘুরছে। ছুটতে ছুটতে এখন আর ফুসফুস যথেষ্ট অক্সিজেন পাচ্ছে না। তবুও মানসিক জোরে এগিয়ে চলেছে ও। ওয়ালজ্যাক তার বন্দিকে নিয়ে হেলিকপ্টারের দিকে এগিয়ে চলেছে। ওই এমআই-এইট হেলিকপ্টারটা যেন বহু দূরে। নিজের উপর রাগ হলো ফু-চুঙের, পা আর এগোচ্ছে না কেন! দৌড়ের গতি আরও কমে গেছে! মার্ভেল থেকে চল্লিশ এমএম অটোক্যানন বুম্ করে গর্জে উঠল। সৈকতে গোলা ফেলছে না, ওগুলো ওর মাথার উপর দিয়ে গেল। হেলিকপ্টারের চারপাশের এলাকা বিস্ফোরিত হলো। ধুলো কমে যাওয়ার পর দেখা গেল চপারের ককপিট বিধ্বস্ত হয়েছে। চুরমার হয়ে যাওয়া প্লেক্সিগ্লাসের মাঝখান দিয়ে লকলকে আগুন বেরিয়ে আসছে। সামনের দিকে ইলেকট্রনিক্সগুলো ছড়িয়ে পড়ে আছে।

মার্ভেলের দিকে ঘুরে তাকাল ফু-চুং, এক হাত তুলে একটু নাড়াল। তখনই দূরে একজনকে ছুটে আসতে দেখল। মুহূর্তে বুঝে নিল, মানুষটা ছাড়া আর কেউ হতে পারে না!

হেলিকপ্টারের দিকে আবারও তাকাল ফু-চুং। ওয়ালজ্যাক তার জিম্মিকে গুলি করেছে। হেলিকপ্টার নেই তো লোকটাকে বাঁচিয়ে রেখে লাভ কী! লাশটা পড়বার আগেই ঘুরে দাঁড়াল ওয়ালজ্যাক, টিলা বেয়ে নীচের দিকে ছুটল। সম্ভবত ভেবেছে টাগ-বোটে উঠতে পারলে জলদস্যুদের সঙ্গে কোনও না কোনও চুক্তি করতে পারবে। অথবা ভয়ে মাথা খারাপ হয়ে গেছে তার।

টিলার উপর থেকে দৌড়ে নেমে আসছে রানা। একবার ওকে দেখল ফু-চুং, রানা নিশ্চয়ই ওর পিছনে আসবে? অপেক্ষা করল না ও, ঘুরেই ছুটল নীচের দিকে। শুধু ভারসাম্য বজায় রাখছে, মাধ্যাকর্ষণের টানে ছুটতে ছুটতে নেমে চলেছে। সৈকত বিশ গজ দূরে থাকতে থেমে দাঁড়াল ফু-চুং, একে-ফোরটিসেভেন তুলে নিল কাঁধে। ওর সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে, সাইটের মধ্য দিয়ে আবছা ভাবে টার্গেট দেখতে পেল। ট্রিগার টিপল। কুঁদোটা কাঁধে ধাক্কা দিল, বেরল মাত্র একটা বুলেট। ওয়ালজ্যাক আওয়াজ শুনে ঘুরে দাঁড়াল, দেখল আক্রমণকারী লোকটা রাইফেল পরীক্ষা করছে—আর দাঁড়াল না সে, সৈকতের দিকে ঝেড়ে দৌড় দিল।

ফু-চুং কী ভাবে যেন রাইফেলের ব্যানানা ম্যাগাজিন রিসিভার থেকে নড়িয়ে ফেলেছে। এক টোকায় ওটা ঠিক জায়গায় ভরে দিল। রাইফেল কক করেই গুলি ছুঁড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ক্লিপের সমস্ত বুলেট ফুরিয়ে গেল।

গিলবার্ট ওয়ালজ্যাকের ডান হাঁটুর নীচে রক্ত ছিটকে উঠল। ঝাঁকি খেয়ে পড়ে গেল সে। উঠতে দশ সেকেণ্ড লেগে গেল। ততক্ষণে তার কাছে পৌঁছে গেছে ফু-

চুং—গায়ের জোরে লাথি মারল ও ওয়ালজ্যাকের চোয়ালে। পিচ্ছিল পাথরে ভারসাম্য হারিয়ে দু'জনই পড়ে গেল। বিশালদেহী ওয়ালজ্যাক আহত হয়েছে, কিন্তু দমে যায়নি; বছরের পর বছর ধরে খনির কাজ করেছে সে, ব্যথা সহ্য করতে জানে।

'মেইট, তোমার শাস্তি পেতে হবে,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল সে। ফু-চুংকে হামলা করবার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

'আয় শালা!' বলল ফু-চুং, 'দে দেখি শাস্তি!'

বলেই রাইফেলটা তুলে লোকটার মাথার পাশে নামিয়ে আনল ও। ওয়ালজ্যাক দ্রুত মাথা সরিয়ে নিল। কুঁদো বাতাস কাটল, দুর্বল হাত ফসকে ছিটকে দূরে গিয়ে পড়ল রাইফেল। ফু-চুং অবশ্য থমকে দাঁড়িয়ে নেই, গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে লোকটার হাঁটুর নীচে কিক করল।

গিলবার্ট ভ্রূ পর্যন্ত কুঁচকাল না, দু'হাতে ফু-চুংকে জড়িয়ে ধরল—গরিলাদের মত বুকে পিষে মেরে ফেলবে। ওয়ালজ্যাকের নাকে কপাল নামিয়ে আনল ফু-চুং। থ্যাচ্ করে হাড় ফেটে গেল, কিন্তু খনির ম্যানেজার ফু-চুংকে দ্বিগুণ জোরে চাপ দিয়ে ধরল। কপাল দিয়ে আবারও নাকে মারল ফু-চুং। এবার লোকটা ব্যথায় চাপা গর্জন ছাড়ল। বজ্র আঁটুনি একটু হলেও ফস্কে গেল। ফু-চুং সুযোগ পেয়ে ডানহাত বের করে নিল। খপ্ করে লোকটার বাম কান পাকড়ে ধরল, গায়ের জোরে টান দিল। ওয়ালজ্যাক পিছিয়ে যেতে চাইল। কিন্তু তার আগেই পা বাড়িয়ে ল্যাং মেরেছে ফু-চুং, একইসঙ্গে বাম হাতে ধাক্কা দিল বুকে। পড়ে যাচ্ছে লোকটা, কিন্তু পড়বার আগে ফু-চুঙের শার্টের বুক খামচে ধরল।

বুকের উপরে ফু-চুংকে নিয়ে পড়লে ওয়ালজ্যাকের ফুসফুস থেকে সব বাতাস বেরিয়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু তা হলো না। যেন গদির মধ্যে নেমেছে সে। ফু-চুঙের মনে হলো ও ওয়াটার-বেডে ঝাঁপ দিয়েছে। পরমুহূর্তে টের পেল ওরা বড়সড় একটা পুকুরে পড়েছে—ওটা পারদের!

ওয়ালজ্যাক বুঝে উঠবার আগেই লোকটার পেটে এক হাঁটু গেঁথে দিল ফু-চুং। একইসঙ্গে দু'হাতে ধরল মাথার চুল, মাথাটা পারদের মধ্যে ডুবিয়ে দিল। ওয়ালজ্যাক ব্যথায় শ্বাস টানল, তরল বিষাক্ত ধাতু এক মুখ ভরে গিলে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁকি খেল, কিন্তু চুল ছাড়ল না ফু-চুং, মাথাটা আরও চুবিয়ে ধরল। গায়ের জোর খাটিয়ে মাথা তুলল ওয়ালজ্যাক। মুখ থেকে রুপালি তরল গলগল করে বেরিয়ে এল। মাথাটা তৃতীয়বারের মত তলিয়ে দিল ফু-চুং। ছটফট করছে ওয়ালজ্যাক। এক মিনিটও হয়নি, দেহটা স্থির হয়ে গেল। লোকটার উপর থেকে সরে এল ফু-চুং, সঙ্গে সঙ্গে ভেসে উঠল লাশ। খোলা মুখ ও নাকের ফুটো থেকে চকচকে পারদ বেরিয়ে এল—ওগুলো যেন অতি খুদে কোনও পুকুর!

'আমি ওভাবে মরতে চাই না,' পাড়ের কাছে এসে থামল রানা। 'তোর অবস্থা কী?'

'মনে হচ্ছিল একাই লড়াই করে মরব,' হাসল ফু-চুং। 'তোরা আর আসবি না কোনদিন?'

দু'হাতে ওকে টেনে তুলল রানা। 'তুই একাই হিরো হবি?' লাশটা দেখাল ও,

'ভ্লাদিমিয়ার সরোকিন?'

'না। সাদা চামড়ার দক্ষিণ আফ্রিকান ম্যানেজার। গিলবার্ট ওয়ালজ্যাক। লোকটা খনি মজুরদের জন্যে একটা ভয়ঙ্কর আতঙ্ক ছিল। বহু মানুষ খুন করেছে।'

'বলতে পারিস সরোকিন এখন কোথায়?'

মাথা নাড়ল ফু-চুং। 'না। তবে ওকে সৈকতের সবচেয়ে বড় ক্রুজ শিপে মনে হয় দেখেছি ওকে। গিলবার্ট ওয়ালজ্যাক ওর পাইলটকে জিম্মি করেছিল, কিন্তু হেলিকপ্টারে ওঠার আগেই ওটা তোরা ধ্বংস করে দিলি। পরমুহূর্তে ওয়ালজ্যাক ওকে গুলি করে মেরেছে।'

'আমাদের দুর্ভাগ্য!' একমুহূর্ত চুপ করে থাকল রানা, তারপর বলল, 'আসল ফেন্সকে পাব কী করে?'

'ফেন্স? সেটা কী?'

'চোরাই মালের ক্রেতা। নিয়ম অনুযায়ী সোনার অ্যাসে হয়ে গেলে কোনও অফিশিয়াল মিন্ট থেকে স্ট্যাম্প করিয়ে নিতে হয়, নইলে সোনার কোনও মূল্য নেই। এ বেআইনী জিনিস আইনের এপারের কেউ ছোঁবে না। সরোকিন এমন একজনকে জানে যে এসব সামলে নেবে, সোনাগুলো বাজারে ছেড়ে দেবে। সে হতে পারে কোনও বড় জালিয়াত বা ব্যাঙ্কার। এমন একজন, যার সঙ্গে বহু পলিটিশিয়ানের দহরম-মহরম রয়েছে। ওই লোকটাকেই খুঁজে বের করতে হবে আমাদের।'

আস্তে করে মাথা নাড়ল ফু-চুং। 'আমাদের এমন কোনও লিঙ্ক নেই।'

মৃদু হাসল রানা। 'চিন্তা করিস না। আমরা ঠিকই শুয়োরের বাচ্চাকে খুঁজে বের করব।'

রেডিয়োতে উর্বশীর কণ্ঠ শোনা গেল, 'সৈকত পরিষ্কার হয়ে গেছে, রানা। রাশানরা যারা বেঁচে আছে, আত্মসমর্পণ করেছে। ওরা এখন আমাদের সাহায্য নিয়ে দুর্যোগ থেকে বাঁচতে চায়।'

'বেশ। এবার আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাব,' বলল রানা। চারপাশ দেখল, হঠাৎ লড়াই বন্ধ হয়ে যাওয়ায় যেন হাজারো মানুষ মাটি ফুঁড়ে উদয় হয়েছে। বোল্ডারের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে তারা। সাগরের দিকে তাকাল রানা। টাগ-বোট উপসাগরে বেরিয়ে গেছে, দ্রুত ছুটে চলেছে। চোখ ফিরাল আগ্নেয়গিরির দিকে—অবস্থা ভয়ানক, যেকোনও মুহূর্তে গল-গল করে বেরিয়ে আসবে জ্বলন্ত লাভা। গরমে ঘামছে ওরা। 'সবাইকে নিয়ে এই দোজখ থেকে বেরিয়ে যেতে হবে এবার, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব,' বলল রানা।

রানা উর্বশীকে ব্যবস্থা নিতে বলার কয়েক মিনিটের মধ্যেই কথা ছড়িয়ে পড়ল, শ্রমিকরা সবাই সৈকতে আটকে থাকা অপেক্ষাকৃত নতুন জাহাজে উঠবে। হুড়োহুড়ি হতো, কিন্তু কর্মাণ্ডোরা শ্রমিকদের লাইন করে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। ওই জাহাজে মাত্র একটা লম্বা মই, যে-কারণে সবার ডেকে পৌঁছুতে এক দেড় ঘণ্টা লাগবে।

ট্রলারগুলো যে পিয়ারে এসে ভিড়ত, সেখানে দাঁড়িয়ে আছে রানা। অ্যাসল্ট

বোট নিয়ে সেখানে থামল জুডি। হেসে জিজ্ঞেস করল, 'আমি যেদিকে যাব সেদিকেই যাবে নাকি, নাবিক?'

হালকা লাফ দিয়ে ডেকে নামল রানা। এক পা এগিয়ে এল জুডি, মুখটা উঁচু করল, যেন আশা করছে রানা ওকে চুমু দেবে। মুখ নামিয়ে আনল রানা, কিন্তু কিছু করবার আগেই ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের আওয়াজ কাঁপিয়ে দিল সবার অন্তরাত্মা। কোথা থেকে যেন এক ফুটি একটা ঢেউ এল, নেচে উঠল অ্যাসল্ট বোট।

'তুমি দুনিয়া কাঁপিয়ে দিয়েছ, রানা,' ফ্যাঁসফ্যাঁসে স্বরে বলল জুডি। দেখো, কেমন কাঁপছে সাগরের পানি।

চুমু দেয়ার ইচ্ছেটা উবে গেছে রানার, সৈকতের দিকে তাকাল। ওদিকে উর্বশীকে দেখতে পেল, ওদের দিকেই তাকিয়ে আছে। মনে মনে হাসল রানা, মেয়েদের হিংসে বড় বেশি! বাঁধন যতই আলগা হোক, দখল ছাড়তে রাজি নয়।

'চলো, মার্ভেলে ফিরি,' বলল রানা।

সবাই বুঝতে পারছে যে-কোনও মুহূর্তে অগ্ন্যুৎপাত শুরু হবে। হাতে সময় নেই মোটেই।

থ্রটল ঠেলে দিল জুডি, মার্ভেলের দিকে ছুটল অ্যাসল্ট বোট।

রানার নির্দেশে ইতিমধ্যে মার্ভেলকে ঘুরিয়ে নেওয়া হয়েছে, স্টার্ন এখন সৈকতে আটকে থাকা জাহাজটার দিকে। নাবিকরা টো কেবলগুলো ফ্যানটেইলের তলা দিয়ে রিসেসড্ হ্যাচ থেকে বের করে দিয়েছে। কেবলের সঙ্গে মোটা দড়ি বেঁধে দুটো জেট স্কি ওগুলোকে তীরে পৌঁছে দিয়েছে। যেসব শ্রমিকের খাটবার ক্ষমতা আছে, তারা নেমে পড়েছে এবার, রশি টেনে কেবলগুলো ক্রুজ লাইনারে তুলে বেঁধে ফেলবে ক্রুজ শিপের সঙ্গে।

'সোহেল, সব মিলে কী অবস্থা এখন?' নেটওয়ার্কে জানতে চাইল রানা।

'শ্রমিকরা ক্রুজ লাইনারে কেবল নিয়ে যাচ্ছে,' বলল সোহেল। 'ওটার নাম দ্য কুইন অভ শিবা। কমাণ্ডোদের নিয়ে ওখানে তদারকি করছে তোর উর্বশী। বলেছে জাহাজের বোলার্ডগুলো ব্যাঙের ছাতার মত দেখতে হলেও আসলে ওগুলো জঙের স্তূপ। আমাদের কেব্‌ল্ ওই জাহাজের নোঙরের ক্যাপস্ট্যানের সঙ্গে আটকে দেয়া হচ্ছে। ক্যাপস্ট্যান টান নিতে পারবে।'

'ঠিক আছে। আমি আসছি। মার্ভেলের সবাইকে বল্ কেবল আটকানো হলে যেন ফিরে আসে।'

'মনে হচ্ছে ফারাকে ঘরে আটকে রাখতে হবে। মানুষগুলোকে মেডিকেল সাহায্য দেয়ার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে।'

'প্রয়োজন হলে আটকে রাখ্,' বলল রানা। 'আগ্নেয়গিরি সময় না দিলে মানুষগুলো মরবে। তাড়া খেলে আমাদের সরে যেতে হবে।'

'লড়াই থামার পর রাশান কোস্ট-গার্ডের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছি,' বলল সোহেল। 'কিন্তু আগ্নেয়গিরি এত ইলেক্ট্রিক ইন্টারফেয়ারেন্স সৃষ্টি করছে যে যোগাযোগ করা যায়নি। আমরা শুধু শর্ট-রেঞ্জে নিজেরা আলাপ করতে পারছি।'

'তারমানে যা করার আমাদেরই করতে হবে।'

'হুঁ।'

'তুই অপারেন্স সেন্টারে থাক, আমি ফ্লাইং ব্রিজে উঠব। আমার সঙ্গে জুডি আছে। কাউকে পাঠাবি ওর জন্য পোশাক নিয়ে আসতে?'

'তোর জন্যও পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

জাহাজে উঠে কাদা ভরা বুট নিয়ে ব্রিজের দিকে চলল রানা। চ্যাপ্রো পাপাগোপালার শখের হলওয়ের কার্পেট দাগে ভরে উঠেছে, জিনিসটার বারোটা বেজে গেছে। ওরা ফ্লাইং ব্রিজে পৌঁছে স্টুয়ার্ডকে পেল, রূপালি মেস ট্রলির পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। দুটো বাণ্ডিল দিল সে, একটা জুডির জন্য, অন্যটা রানার। কাপড় নিয়ে রেডিয়ো শ্যাকে ঢুকে পড়ল জুডি। স্টুয়ার্ড বেরিয়ে গেলে পোশাক পাল্টে নিল রানা।

জুডি ফিরতে স্টুয়ার্ডকে আবার ডাকল রানা। ঘরে ঢুকে ট্রলির রুপালি কাভার তুলল সে। সঙ্গে সঙ্গে চারপাশে গরম সুস্বাদু খাবারের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। স্টুয়ার্ড ঘোষণা করল: 'শ্রেডেড জার্কড বিফ বারিটোস, সঙ্গে সামান্য কফি।'

মুখ ভরা ঝালঝাল খাবার নিয়ে স্টুয়ার্ডকে ধন্যবাদ দিল জুডি। মনে মনে বলল রানা, 'বেঁচে থাকো, বাপ।'

সি অভ ওখোটস্ক-এর ঝড়টা এদিকে আসছে, সাগর-বাতাস আবারও খেপে উঠছে। উইণ্ডস্ক্রিনে এসে বৃষ্টির ছাঁট লাগল। বজ্রঝড় গুড়গুড় করে উঠল আকাশে। রানা ও জুডির খাওয়া শেষ হলে স্টুয়ার্ড ট্রলির তলা থেকে দুটো রেইন কোট ও দু'জোড়া রাবার বুট বের করে দিল। 'সার, জানতাম আপনাদের এগুলো লাগবে।'

ট্রলি নিয়ে চলে গেল সে। রেইন কোট ও বুট পরে নিল ওরা। বসতে না বসতে ওয়াকিটকিতে সোহেল বলল, 'কেবল্ ওখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। উর্বশী জানিয়েছে পাঁচ মিনিটের মধ্যে জাহাজ আটকে দেয়া যাবে।'

'ঝড় আসছে, সব কাজ কঠিন করে তুলবে,' বলল রানা। ফ্লাইং ব্রিজে দমকা বাতাস আসছে। সঙ্গে বৃষ্টি তো আছেই। আগ্নেয় ছাই বৃষ্টির সঙ্গে মিশে কাদা হয়ে ঝরছে। মার্ভেলের স্টার্নের দিকে তাকাল রানা। কেবলগুলো ওখান থেকে চলে গেছে ক্রুজ লাইনারের ফেয়ারলিড্স্-এ। সবই ঠিক আছে, তবে মার্ভেল এখন আর দ্য কুইন অভ শিবার সঙ্গে সরাসরি লাইনে নেই। গগলকে ইন্টারকমে জানিয়ে দিল রানা। সঙ্গে সঙ্গে গগল পোর্টের বো থ্রাস্টার দিয়ে ঠিক জায়গায় নিয়ে গেল জাহাজ।

অ্যাসল্ট বোট ঢেউয়ের মাথায় নাচতে নাচতে চলে গেল। মার্ভেলের ক্রুদের নিয়ে আসবে। কিছুক্ষণ পর ওটা সৈকতে ভিড়ল। বাইরে বেরিয়ে এসে ওদিকে তাকাল রানা।

ওর পাশে এসে দাঁড়াল জুডি। 'তোমার কি মনে হয় জাহাজটা বালি থেকে বের করা যাবে?'

'মার্ভেলের ইঞ্জিনগুলো সুপারক্যারিয়ারের হর্স-পাওয়ারের সমান,' বলল রানা। 'আমরা ক্রুজ লাইনারটাকে টেনে সাগরে নামাতে চাইব। দেখা যাক কী হয়।'

'বাধ্য হলে মানুষগুলোকে ফেলে সরে যাবে?'

জবাব দিল না রানা, তবে উত্তরের দরকারও পড়ল না। আগে রানা যা-ই বলে থাকুক, ওর চোখ জুডিকে সব বলে দিল। দরকার হলে রানা মার্ভেলকে ধ্বংসের মুখে ফেলবে, দলের সবাইকে নিয়ে বিপদের মুখোমুখি হবে, কিন্তু অত্যাচারিত মানুষগুলোকে মৃত্যুর মুখে ফেলে সরে যাবে না।

কয়েক মিনিট পর সৈকত থেকে অ্যাসল্ট বোট মার্ভেলের দিকে রওনা হলো। ওটাতে মার্ভেলের বাকি কয়েকজন আসছে। অ্যাসল্ট বোট টো কেবল পেরিয়ে জাহাজের কাছে চলে এল, কিছুক্ষণ পর গ্যারাজে বোট তুলে দিল জুডি। ওয়াকি-টকিতে রানা বলল, 'ঠিক আছে, গগল, কেবল-এ সামান্য টান দাও।'

নড়ে উঠল মার্ভেল, সাগরে ডুবে থাকা কেবলগুলো পানি ছিটিয়ে উপরে উঠল। কেবলগুলো আরও টানটান হলো।

'না, রানা,' বলল গগল। 'বটম স্পিড জিরো। কেবল এখন পুরোপুরি টাইট হয়েছে।'

'থার্টি পার্সেন্ট শক্তি ডায়াল করো, ধরে রাখো ওখানেই।'

মার্ভেলের ইঞ্জিন তীক্ষ্ণ আওয়াজ করল। কেবলের টান ও ইঞ্জিনের শক্তি মার্ভেলকে পানিতে দাবিয়ে দিল। ঢেউগুলো ছিঁড়ে গেল, বো টপকাল।

'মুভমেন্ট পাচ্ছি আমি,' জানাল গগল। 'মার্ভেল প্রতি মিনিটে পাঁচ ফুট এগোচ্ছে।'

'ওটা কিছু নয়,' বলল রানা। 'কেবল এখনও টানটান হচ্ছে।' রানা কলেজের ছুটিতে একবার এক টাগ-বোটে কাজ করেছে, তখন দেখেছে কেবল টান খেলে মনে হয় বোঝা নিয়ে রওনা হয়ে গেছে, কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। 'গগল, দু'এক মিনিট পর বুঝবে আসলে আমরা পিছলে সরছি। সেরকমটা হলে পঞ্চাশ পার্সেন্ট ডায়াল কোরো।'

ক্রুজ লাইনারের গায়ে ঢেউ লাগছে, সেদিকে তাকিয়ে আছে রানা। জাহাজটা এগিয়ে আসছে, নাকি টান খেয়েও বসে আছে! ওটার বো-র নীচে পানি ঢুকছে, কিন্তু সামনের অংশ একটু ভেসে ওঠা মানেই স্টার্ন আসলে সৈকতে আরও দেবে যাবে।

'ফিফটি পার্সেন্ট,' কয়েক মুহূর্ত পর গগল জানাল। 'কোনও মুভমেন্ট নেই।'

'আশিতে ওঠো।'

'আমি তা রিকম্যাণ্ড করি না,' সাবধান করল উর্বশী। 'আমরা এরইমধ্যে অনেক ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছি।'

থিওরিটিক্যালি ম্যাগনেটোহাইড্রোডাইনামিক ইঞ্জিনের আউট-পুটের কোনও লাস্ট লিমিট নেই। কিন্তু সিস্টেমে বড় একটা দুর্বলতা আছে: হাই-স্পিড পাম্পগুলো যে ম্যাগনেটগুলো ঠাণ্ডা করে, সেগুলোতে তরল হিলিয়াম আছে—ওগুলো প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হলে ইমপেলরগুলোর উপরে খারাপ প্রভাব ফেলে। কামচাটকার আবহাওয়ায় এসে ইঞ্জিনগুলো এখন কেমন আচরণ করবে, কেউ জানে না।

বাংলাদেশ নেভির দু'জন ইঞ্জিনিয়ার ইঞ্জিনগুলোর দায়িত্বে আছেন, একটু গর্বই প্রকাশ পেল রানার কণ্ঠে, 'আমরা দুনিয়ার সেরা ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে

এসেছি। আশিতে ওঠো, গগল।'

মার্ভেলের স্টার্ন আরও বসে গেল, বো আকাশে উঠছে। জাহাজের পিছনে সাগর টগবগ করছে। প্রতি মিনিটে ইঞ্জিনগুলোর টানেল থেকে কয়েক শ' টন পানি জেট ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

'না, কিছুই হচ্ছে না,' আফসোস করে বলল গগল। 'মার্ভেল সম্ভবত ডুবেই যাবে! সৈকত থেকে ক্রুজ লাইনারকে নামাতে পারছি না আমরা।'

গগলের হতাশা পাত্তা দিল না রানা। 'স্টার-বোর্ডে লক করো।'

নির্দেশটা মেনে নিল গগল, শিকল দিয়ে কুকুর টেনে রাখলে যেমন আর একদিকে দৌড়াতে যায়, মার্ভেল এখন ওরকম করছে। টো-এর টান আরও কয়েক টন বাড়ল।

রানা নিজেও জানে না চেঁচিয়ে কথা বলছে, 'পোর্ট লক করো!'

মার্ভেল বাঁ দিকে বাঁক নিল, কেবলে চাপ আরও বাড়ল। প্রচণ্ড টানে কেবলগুলো থরথর করে কাঁপছে। ক্রুজ শিপের তলায় যেসব পাথর আছে, ওখানে নড়াচড়া হচ্ছে। জাহাজের হাল নড়ে উঠল। ধাতব তীক্ষ্ণ আওয়াজ পাওয়া গেল। একটু হলেও নড়ছে দ্য কুইন অভ শিবা!

'আয়, আয় সোনা!' বিড়বিড় করছে রানা। 'গগল, কোনও মুভমেন্ট?'

জুডি ওর পাশে দাঁড়িয়ে দু'হাত এমনভাবে মুঠো করে রেখেছে যে আঙুলের ডগাগুলো রক্তশূন্য হয়ে গেছে।

উত্তর দেয়ার আগে মার্ভেলকে স্টার-বোর্ডে সরিয়ে নিল গগল। 'না। মুভমেন্ট নেই। বটম স্পিড এখনও জিরো।'

উর্বশীর কণ্ঠ শোনা গেল, 'রানা, চিফ ইঞ্জিনিয়ার রিপোর্ট করেছেন, ইঞ্জিনগুলোর টেম্পারেচার অনেক বেড়ে গেছে। কুল্যান্ট পাম্পগুলো যে-কোনও সময় চালু হবে। আমাদের থামা দরকার। যে-ক'জন মানুষ মার্ভেলে তোলা যায়, তাদেরকে তো আমরা তুলে নিতে পারি?'

ক্রুজ শিপের দিকে তাকাল রানা। বলা হয়েছিল মানুষগুলো যেন ডেকে না বের হয়। টো কেবল ছিঁড়লে ছিটকে উঠবে, সামনে পড়লে যে-কোনও মানুষ টুকরো হয়ে যাবে। কিন্তু দ্য কুইন অভ শিবার বো-তে ভীত, ফ্যাকাসে মুখে গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে আছে অনেকে। হিম বৃষ্টিতে ভিজছে। মোটামোটি হিসাবে ওখানে তিন হাজার মানুষ আছে। তার তিন ভাগের এক ভাগ লোককে মার্ভেলে তোলা যাবে। 'আপাতত ইঞ্জিন আইড্‌ল্ করো, গগল,' বলল রানা।

ওর কথা শেষ হতে না হতে ইঞ্জিনের আওয়াজ মিলিয়ে গেল। দ্য মার্ভেল অভ গ্রিস এখন কিছু টানছে না, ঢেউয়ের সঙ্গে উঠছে-নামছে।

হতাশ চোখে রানার দিকে তাকাল জুডি, চোখে একটু রাগও যেন—এত সহজে হার মেনে নিল রানা? কিন্তু মানুষটার কথা এখনও শেষ হয়নি।

'কেবলগুলোর টেনশান সরিয়ে নাও, আরও একশো গজ কেবল ছাড়ো। মার্ভেলকে ধীরে ধীরে এগিয়ে নাও। তৈরি থাকো, কিছুক্ষণ পর একইসঙ্গে দুটো নোঙর নামাব আমরা।'

'রানা, তুমি কী মনে করো...' চুপ হয়ে গেল উর্বশী।

'আমাদের নোঙরের উইঞ্চগুলো পাওয়ার্ড, ইঞ্জিনগুলো চারশো হর্সপাওয়ার ওজন নেবে,' বলল রানা। 'পুরো শক্তি কাজে লাগাব আমরা এবার।'

অপারেশন্স সেন্টারে উর্বশী কম্পিউটারের কিগুলো টিপল, কেবলের ড্রাম দুটোর ক্লাচ সরিয়ে নিল। ড্রামগুলো কেবল ছাড়ছে, এদিকে ধীরে ধীরে গভীর পানির দিকে এগিয়ে চলেছে গগল। একশো গজ এগিয়ে নোঙর ছেড়ে দিল উর্বশী। দ্রুত নেমে গেল ওগুলো, পানির গভীরতা ওখানে মাত্র আশি ফুট।

'সাবধানে একটু পেছাও, গগল,' বলল রানা। 'নোঙর আটকে যাক।'

ভারী তিনকোনা নোঙরগুলো সাগরের পাথুরে জমির উপর দিয়ে গভীর দাগ কেটে পিছিয়ে আসছে, বড় বোল্ডারে টক্কর খাচ্ছে, তারপর বেড রকে বসে গেল। একটা কম্পিউটার অটোমেটিকালি নোঙরের শিকলগুলোর টেনশান নির্ধারণ করল। এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে, যেন নোঙর না সরে।

'আমরা তৈরি,' জানিয়ে দিল গগল। কণ্ঠে কোনও উৎসাহ নেই।

'কেবলের টেনশান বাড়াও, তারপর ইঞ্জিনগুলোকে তিরিশ পার্সেন্ট ক্ষমতা দাও।' ফ্লাইং ব্রিজ থেকে একটা বিনকিউলার নিয়ে এসে চোখে তুলল রানা। দ্য কুইন অভ শিবা'র রেইলিঙের দিকে ভুলেও তাকাল। একের পর এক ঢেউ জাহাজের বো-এর গায়ে আছড়ে পড়ছে। ভেসেলটা উঠছে-নামছে, স্টার্নটা বালিতটে আরও গেঁথে বসছে।

'থার্টি পার্সেন্ট,' জানিয়ে দিল গগল। 'তলার কোনও মুভমেন্ট নেই, শুধু কেবল টানটান হচ্ছে।'

'ফিফটি পার্সেন্টে ওঠো,' ক্রুজ লাইনারের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। 'নোঙরে কোনও পরিবর্তন?'

'উইঞ্চগুলোর রিকভারি একদম জিরো,' জানাল উর্বশী। 'ইঞ্জিনগুলো অনেক গরম হয়ে গেছে, ডায়ালের চারভাগের তিনভাগ উঠে এসেছে। লাল লাইনের তিরিশ ডিগ্রি বাকি, তারপর ইঞ্জিনগুলো অটোমেটিক্যালি শাটডাউন করবে।'

টো কেবলে ভয়ঙ্কর চাপ পড়ছে, মার্ভেলের প্রচণ্ড শক্তি বিশ হাজার টনি জাহাজটাকে সৈকত থেকে টেনে নামাতে চাইছে। কেবলগুলোর টানে দ্য কুইন অভ শিবার বো'টা নড়তে শুরু করেছে। হড়হড় করে পানি তলায় ঢুকছে। ফুটবলের আকারের পাথরগুলো এদিক-সেদিকে গিয়ে পড়ছে।

'কী ঘটছে?' জানতে চাইল রানা।

'উইঞ্চগুলো কিছুই টানছে না,' বলল উর্বশী, কণ্ঠে হতাশা।

'আমাদের তলার কোনও মুভমেন্ট নেই,' বলল গগল।

'গগল, মার্ভেলকে আশি পার্সেন্ট শক্তি দাও।'

'রানা!' আপত্তির সুরে বলল উর্বশী।

'যা বলছি করো তোমরা, সমস্ত ইঞ্জিনের সেফটি সরিয়ে দাও,' রানার কণ্ঠে রাগ প্রকাশ পেল। 'দরকার হলে রেড লাইন পেরিয়ে যাক! আমরা মানুষগুলোকে ফেলে যাব না।'

নির্দেশ পালন করল উর্বশী, কয়েক টোকায় কম্পিউটারকে জানিয়ে দিল এখন থেকে আর উত্তাপ নিয়ে ভাবতে হবে না, বিশাল ক্রাইও পাম্পগুলো উত্তপ্ত হয়ে

উঠুক। স্ক্রিনের দিকে তাকাল উর্বশী, টেম্পারেচার বাড়ছে, কলামগুলো লাল হয়ে উঠছে—তারপর সেফটি লিমিট পেরিয়ে গেল। আস্তে করে ও কম্পিউটারের মনিটর বন্ধ করে দিল। বিড়বিড় করে বলল, 'আমি দুঃখিত, মার্ভেল।'

পুরো জাহাজ থরথর করে কাঁপছে, মনে হচ্ছে প্রতিটি বল্টু ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবে।

'আয় ডাইনী, আয় তুই!' চোয়াল দৃঢ় হয়ে গেছে রানার। নিজেকে পাগল মনে হচ্ছে ওর। বিড়বিড় করে বলে চলেছে, 'আয়! আয় ডাইনী!'

জবাবেই যেন উপসাগর থেকে গভীর একটা আওয়াজ এল, মনে হলো এক সাথে একশো বাজ পড়ল—বিকট শব্দ তো হলোই, চারপাশ থরথর করে কাঁপিয়ে দিল। প্রচণ্ড ভয় পেল সবাই। পর্বতের মাথা কালো মেঘের মত ছাইয়ে ঢেকে গেল। জমিন এমন ভাবে কাঁপতে লাগল যে মনে হলো সৈকত আসলে তরল কিছু দিয়ে তৈরি। সবাই অন্তর দিয়ে বুঝতে পারল, সময় হয়ে গেছে, এবার মরতে হবে। অগ্ন্যুৎপাত শুরু হয়ে গেছে! মাউন্ট সেইন্ট হেলেনের মত এই পর্বতের চূড়াটাও এবার উড়ে যাবে—অতি তপ্ত ছাই ছিটকে উঠবে, উত্তপ্ত লাভা ও গ্যাস বিশাল একটা অ্যাভালাঞ্চ ঘটাবে, পথে যা পাবে গিলতে গিলতে ছুটে আসবে। বিজ্ঞানীরা এই ভয়টাই পেয়েছেন। পৃথিবীতে ভয়াবহ যে কটা প্রাকৃতিক শক্তি আছে, সেগুলোর মধ্যে অন্যতম এই আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত। এবার এখানে তা-ই ঘটবে। জীবন নিয়ে বিরাট একটা জুয়া খেলেছে রানা, এবার ও সব হারাবে। এখন আর ফিরে গিয়ে বিপর্যস্ত মানুষগুলোকে উদ্ধার করা যাবে না। ওরা নিজেরাও তো মরবে এবার। রানার দু'চোখ চকচক করে উঠল, মনে হলো জ্বলছে চোখদুটো। দাঁতে দাঁত চেপে পর্বত আর সৈকতের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা।

'রানা, কেবলগুলো এবার আমাদের কেটে দিতে হবে,' বলল উর্বশী।

কোনও জবাব দিল না রানা।

'রানা, আমাদের সরে যেতে হবে,' জোর দিয়ে বলল উর্বশী। 'আগ্নেয়গিরি থেকে কয়েক মাইল দূরত্ব দরকার, নইলে সবাই মারা যাব আমরা।'

এক-ফোঁটা মিথ্যা বলছে না উর্বশী। পাইরোক্ল্যাস্টিক ফ্লো সাগরে নেমে আসবে—টক্সিক গ্যাস, লাভা ও ছাইয়ের মেঘ চারপাশের সবকিছু জ্বালিয়ে দিয়ে সাগরের অনেকটা জায়গা দখল করবে। কিন্তু রানা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল।

'মুভমেন্ট!' গগলের চিৎকার শুনতে পেল ও। 'পোর্টের উইঞ্চ সামনে বাড়ছে! প্রতি মিনিটে পাঁচ গজ!'

'মনে হয় নোঙর পিছলে গেছে,' কাঁপা গলায় বলল উর্বশী। 'ওটা সাগর তলা থেকে ছেঁচড়ে এগোচ্ছে।'

সূর্যটা হঠাৎ করেই যেন হারিয়ে গেছে, মুহূর্তে অন্ধকার নেমে এসেছে। পর্বত বা সৈকত দেখতে পেল না রানা। চোখের সামনে সব আঁধার হয়ে গেছে। চোখে বিনকিউলার তুলে দেখল রানা। ঝরঝর করে নেমে আসা ছাইয়ের মাঝখানে দ্য কুইন অভ শিবাকে আবছা ভাবে দেখতে পেল। জাহাজটা নড়েছে কি না নিশ্চিত হতে পারল না। হয়তো উর্বশীর কথাই ঠিক, নোঙর পিছলে গেছে।

অনন্তকাল থেকে যেন সবাই চুপ করে আছে, কেউ কোনও কথা বলছে না।

গগল স্পিড ইণ্ডিকেটরগুলো দেখছে, ওগুলো যেন সবসময় ওরকম স্থিরই ছিল।

তারপর অগ্নুৎপাতের আওয়াজের উপর দিয়ে দ্য কুইন অভ শিবার কর্কশ চিৎকার শোনা গেল, মনে হলো যেন কোনও মানুষ আর্তচিৎকার করছে। দু'কেবলের ভয়ঙ্কর আকর্ষণ ওটাকে টুকরো টুকরো করে ফেলছে, নাকি প্রবল ঝড় ওটাতে শেষ করছে?

'আসছে ও,' চিৎকার ছাড়ল গগল। স্পিড ইণ্ডিকেটরগুলোর কাঁটা একটু হলেও নড়ছে।

কম্পিউটারের স্ক্রিন আবারও খুলল উর্বশী। 'দুটো উইঞ্চই সামনে বাড়ছে!'

'প্রতি মিনিটে বটমের স্পিড দশ গজ,' জানাল গগল। 'পনেরো। বিশ!'

ক্রুজ লাইনার মাত্র ভাসতে শুরু করেছে। কেবলগুলো ওটাকে টেনে নামিয়ে নিচ্ছে। গতি বাড়ছে। দু'হাতে রানার বামহাত আঁকড়ে ধরে আছে জুডি। দ্য কুইন অভ শিবা সাগরে নেমে আসছে! জাহাজের তলা থেকে ভয়ঙ্কর কর্কশ শব্দ হলো। পাথরে হড়কে নামছে সাগরে। অগ্ন্যুৎপাতের সঙ্গে সঙ্গে বিশাল ঢেউ সৈকতের দিকে ছুটে গেছে। প্রথম ঢেউটা সৈকতে ধাক্কা দিল। জাহাজের স্টার্নের নীচে এখন পানি—ধাক্কা খেয়ে নৌযানটা পুরোপুরি ভেসে উঠেছে। কেবলের টান খেয়ে গভীর পানিতে নেমে এল।

'মুক্ত হয়ে গেছে!' অপারেশন্স সেন্টারকে জানিয়ে দিল রানা।

জবাবে ক্রুদের চিৎকার শুনতে পেল। নিজের ইচ্ছাপূরণ করল গগল, মার্ভেলের ভেঁপুর শব্দ পাওয়া গেল। ওটা বোঁওওও-বাঁওওওও করে আওয়াজ করছে।

'এবার এখান থেকে পালাতে হবে,' তাড়া দিল রানা। ওর পিছু নিয়ে ব্রিজে ফিরে এল জুডি। লিফটে উঠে অপারেশন্স সেন্টারে নেমে এল ওরা। ওদের দেখে হৈ-হৈ করে উঠল সবাই। সোহেল, অনিল, গগল নিজেদের সিট থেকে নেমে এসেছে, রানাকে জড়িয়ে ধরল ওরা।

'বস্, আপনার পা ধরে একটু সালাম না করলে তো হয় না!' চলে এসেছে প্রকাণ্ডদেহী আতাসি, ঢুব করে সালাম করল ও।

লজ্জায় লাল হয়ে তাড়া দিল রানা, 'তাড়াতাড়ি যার যার সিটে যাও! জাহাজটা নেমেছে, এবার ইঞ্জিনের শক্তি পঞ্চাশ পার্সেন্টে রাখো।'

যে-যার সিটে গিয়ে বসতেই অনিল অ্যাফ্টের ক্যামেরা ফোকাস করল। মেইন স্ক্রিনের দিকে তাকাল রানা। দ্য কুইন অভ শিবা লক্ষ্মী মেয়ের মত মার্ভেলের পিছু পিছু আসছে। গগল গতি কমিয়েছে, পিছনের জাহাজের ওয়াটারলাইন দেখা গেল। ওটা ঢেউ কেটে এগিয়ে চলেছে।

'হায় ঈশ্বর!' হাঁ করে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে থাকল জুডি।

পর্বত-চূড়া হঠাৎ করেই বাষ্প হয়ে গেছে। কালো ছাইয়ের বিরাট একটা দেয়াল যেন নেমে আসছে! ওটা কালো কোনও ঢেউও বলা যায়—পাক খেতে খেতে নেমে আসছে। মনে হলো জিনিসটা যেন আসলে জীবন্ত। সব গিলে নিতে আসছে। শত বছর ধরে পর্বতে জন্মানো বিশাল সব গাছ যেন আসলে ম্যাচের কাঠি, উপড়ে গিয়ে লাভার নীচে চাপা পড়ছে। এক সেকেণ্ড পর অগ্ন্যুপাতের

আওয়াজটা মার্ভেলে এসে পৌঁছুল। বিকট আওয়াজে সবার মনে হলো কানের পর্দা ফেটে গেছে।

দ্য কুইন অভ শিবা'র ডেকে যারা ছিল, দৌড়ে গিয়ে সুপারস্ট্রাকচারে আশ্রয় নিল। দু' সেকেণ্ড পর ছাইয়ের স্রোত সৈকত পেরল, সাগরে পড়ল। তপ্ত ছাই পানিতে পড়ে বাষ্প হলো, ফোঁস-ফোঁস ভয়াবহ আওয়াজ হলো। ছাইয়ের স্রোত সাগরের উপর দিয়ে ছুটল। সৈকতে গেঁথে থাকা ক্রুজ শিপগুলো ঢাকা পড়ে গেল ছাইয়ের নীচে। একটা জাহাজ পুরোপুরি তলিয়ে গেল। প্রসেসিং প্ল্যান্ট সহ বার্জটা উল্টে পড়ল প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে।

'ওটা আসছে!' কে যেন বলল। দরকার ছিল না। রানা দেখল, ছাইয়ের মেঘ এসে দ্য কুইন অভ শিবাকে ঢেকে দিল, ওটা আর ক্যামেরায় দেখা যাচ্ছে না।

ছাইয়ের ঝড় মার্ভেলকে যেন হাতুড়ি দিয়ে আঘাত দিল। ছাই ও পিউমিসের হারিকেন বয়ে গেল। জানালার কাঁচগুলো মুহূর্তে ভেঙে চুরচুর হলো। পোর্টে উঁচু হয়ে গেল মার্ভেল, স্টার-বোর্ডের রেইলিং তলিয়ে গেল সাগরে। জাহাজটা এসবের পরেও এক নাগাড়ে এগিয়ে চলেছে, যেন জেদ ধরেছে হারবে না। প্রথম দিকের ঝাপটা কমতেই সোজা হলো মার্ভেল, ছুটে চলল। দু'মিনিট পর ছাইয়ের মেঘের ভিতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল। সন্ধ্যা নামছে সাগরে, ডিমের কুসুমের মত সূর্যটা দিগন্তে ঝুলছে।

দৃশ্যটা দেখে শ্বাস ফেলতে ভুলে গেল সবাই। মুহূর্তগুলো খুব ধীরে পেরিয়ে চলেছে, তারপর ছাইয়ের পর্দার ওপাশ থেকে দ্য কুইন অভ শিবার বো বেরিয়ে এল। জাহাজটা যেন কোনও ছাইমাখা ভূত, কিন্তু সেটা দেখেই সবার মন প্রশান্তিতে ভরে গেল, মনে হলো এত সুন্দর জাহাজ আগে বুঝি কখনও দেখেনি। সুপারস্ট্রাকচারের ছোট্ট একটা নড়াচড়া চোখে পড়ল সবার। অনিল দ্রুত জুম করল। আপার ডেকের একটা দরজা হঠাৎ খুলে গেছে। একটা ছোট্ট মূর্তি বেরিয়ে এল, চারপাশ দেখল, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে কাদের যেন হাতের ইশারায় ডাকল। একে একে বারো-চোদ্দোজন বেরিয়ে এল। লোকগুলো যেন পাগল হয়ে গেছে, লাথি দিয়ে ডেকের ছাই উড়িয়ে দিচ্ছে—বাঁচার আনন্দে নাচছে সবাই।

একটা ট্রলি নিয়ে অপারেশন্স সেন্টারে ঢুকল স্টুয়ার্ড, কান পর্যন্ত হাসছে। ট্রলির উপরে বসে আছে ডিশ ভরা নাস্তা। একে একে সবার সামনে থামল সে। সবার স্বীকার করতে হলো, ওদের বাবুর্চি প্রত্যেকের পছন্দ খেয়ালে রাখে।

রানার পাশে বসেছে জুডি, সামুসায় কামড় দিয়ে বলল, 'ডাইনীটা আসলে কে?'

'হ্যাঁ?'

'ফ্লাইং ব্রিজে তুমি "আয় ডাইনী" বলেছিলে। কাকে বলেছিলে? মার্ভেলকে, নাকি দ্য কুইন অভ শিবাকে?'

'ওদের নয়।'

'তা হলে?'

'প্রকৃতি মাতাকে।' হাসল রানা। 'বইয়ে পড়েছি, অগ্ন্যুৎপাতের আগে মেজর আর্থকোয়েক হয়। সে-সময় মাটি-পানিতে ভয়ঙ্কর পরিবর্তন ঘটে। বিজ্ঞানীরা

বলেন লিকুইফ্যাকশন। বড় ভূমিকম্প আসলে মাটিকে চোরাবালি করে দেয়। দীর্ঘদিন আটকে থাকায় দ্য কুইন অভ শিবার নীচে যে সাকশান তৈরি হয়েছিল, ভূমিকম্পে মাটি নড়ে ওঠায় ওটা বেরিয়ে যায়, নইলে একা মার্ভেলের ক্ষমতায় জাহাজ টেনে নামানো যেত না।'

'আমরা মৃত্যুর খুব কাছ থেকে ঘুরে এসেছি, তা-ই না?'

'ঝুঁকি যেমন বড়, পুরস্কারও তেমনি বড় হয়, তা-ই না?'

'রানা,' নিজের স্টেশন থেকে ডাকল উর্বশী। 'ছ'মাইল সামনে রেইডার কন্ট্যাক্ট। সাত নট গতিতে এগিয়ে চলেছে।'

'টাগ-বোট,' মন্তব্য করল সোহেল। 'ওই যায় আমাদের পুরস্কার। পিছনে পুরস্কার, সামনে পুরস্কার... বাহ্!'

'যায় না,' বলল গগল।

ক্রুজ লাইনার টেনে এগিয়ে গেলেও মার্ভেল মাত্র পনেরো মিনিটে টাগ-বোট ধরতে পারবে। পিছু ধাওয়া করল গগল।

ফু-চুং স্টেশন থেকে সরে গেল, ডেকে যাবে। ওখানে ওর সঙ্গে থাকবে কমাণ্ডোরা।

রানা গগলকে জানিয়ে দিল মার্ভেল যেন টাগ-বোটকে পোর্টে রাখে। ওখানে কম সংখ্যক জলদস্যুই থাকবে। সঙ্গীদের ফেলে পালিয়ে এসেছে এরা। সাঁতার কেটে জাহাজে উঠতে গিয়ে ডুবে মরেছে প্রচুর গার্ড।

বারো মিনিট পর টাগ-বোটের পাশে পৌঁছে গেল মার্ভেল। ওটার ডেকে প্রায় কেউ নেই। দু'জন জলদস্যু মার্ভেলকে দেখে দৌড়ে গিয়ে ফ্লাইং ব্রিজে উঠল। কিন্তু এরা একে-ফোরটিসেভেন কাঁধে তুলবার আগেই অনিল ফিফটি ক্যালিবারের মেশিনগান দিয়ে ব্রাশ ফায়ার করল। লোকগুলো অবশ্য তার আগেই লুকিয়ে পড়েছে। আর দেখা গেল না।

'কাশেম, জলিল, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?' রেডিয়োতে ডাকল রানা।

ট্যাকটিকাল চ্যানেলে জলিল জানাল, 'মাসুদ ভাই, আমরা তো ভেবেছিলাম আপনারা আমাদের ভুলেই গেছেন।'

'এখনই বেরিয়ে এসো না,' বলল রানা। 'আমি টাগের স্টার্নে দুটো কন্টেইনার দেখছি, তোমরা কোনটার উপরে আছ?'

'পিছনেরটা।'

'আর লিফটিং অ্যাসেম্বলিটা?'

'তৈরি হয়ে বসে আছে, মাসুদ ভাই।'

'আমরা এক মিনিটের মধ্যে পাশে চলে আসব,' বলল রানা। এবার অনিলের উদ্দেশে বলল, 'টাগের রেইডার উড়িয়ে দে।'

চল্লিশ এমএম বোফোর্সের অটোক্যানন তাক করল অনিল, টাগের ফ্যানটেইলে ছয় রাউণ্ড গোলা বর্ষণ করল। সঙ্গে সঙ্গে নৌযানের গতি কমতে শুরু করল। স্টার্নের নীচের অংশে গোলা ঢুকেছে, ওখান থেকে তেল ছড়িয়ে পড়ল সাগরে।

মার্ভেলকে টাগের পাশে নিয়ে গেল গগল, তবে সাবধান থাকল, দরকার হলে

মুহূর্তে সরে যাবে। দুটো নৌযান এখন পাশাপাশি হয়েছে, গতি আরও কমে গেল। দুটোর দূরত্ব বড়জোর এক ফুট। রেইডার ও বো থ্রাস্টার দিয়ে টাগের পাশে থাকছে গগল। ক্যামেরা থেকে চোখ সরাল না অনিল। প্রয়োজন পড়লেই কাভার ফায়ার দেবে। তবে এখনও জলদস্যুদের দেখা নেই।

মার্ভেলের দু'জন ডেক-হ্যাণ্ড মেইন ডেরিকের বুমটা টাগের উপরে নিয়ে গেল, কেবলসহ হুকটা চলে গেল কন্টেইনারের এক ফুট উপরে। এবার কাশেম ও জলিল তারপুলিনের তলা থেকে বেরিয়ে এল, হুকটা আটকে দিল বিমের সঙ্গে। বিম এবার কন্টেইনারের ওজন নেবে। হাতের ইশারা করল কাশেম, সঙ্গে সঙ্গে ডেক ছাড়ল ক্রেট।

মুদাস্‌সর আলী খানের দ্বিতীয় পুত্র এতক্ষণ বিশ্বস্ততার সঙ্গে বাবার মালামাল সযত্নে রেখেছে। আব্বাজান বলেছে তুই লড়াই করবি না, দরকার হলে আমাদের লোক মরুক। কিছুক্ষণ আগে টাগ-বোটের ক্রুদের সঙ্গে যখন তার বাবার লোকদের গোলাগুলি হলো, এবং পরে গ্যাটলিং গানের আক্রমণ এল, তখন সে বুদ্ধি করে একটা কেবিনে লুকিয়ে ছিল—কিন্তু এখন সে দেখল সোনার কন্টেইনার ওর জাহাজ ছেড়ে চলে যাচ্ছে! আসকার আলী খানের টনক নড়ল, ওদের জিনিস তো ডাকাতি হয়ে যাচ্ছে! ব্রিজ থেকে দৌড়ে নেমে এল সে, ভয়ঙ্কর বিশ্রী সব গালি দিতে দিতে পিস্তল হাতে তেড়ে এল অ্যাফট ডেকে।

লোকটাকে মাত্র এক মুহূর্ত দেখল অনিল, মেশিনগান তাক করতে পারল না।

আসকার আলী খান এক হাতে কন্টেইনারের ছাদ ধরে ফেলল, ওটার সঙ্গে শূন্যে উঠে যাচ্ছে। কিন্তু ক্রেট ছাড়ল না। ঢেউয়ের দোলায় ডেকটা নিচু হয়ে গেল। এবার সে বাধ্য হয়ে পিস্তল ফেলে দিয়ে দুইহাতে কন্টেইনারের ছাদ ধরল।

উইঞ্চম্যান কেবল টেনে নিচ্ছে, কন্টেইনারটা টাগের রেইলিং পার করাবে। বুম সরিয়ে মার্ভেলের ডেকের দিকে নিতেই হঠাৎ জোর একটা ঢেউ এল। গগল দুই জাহাজের সংঘর্ষ এড়াতে চেষ্টা করল, কিন্তু ডেকহ্যাণ্ডরা কন্টেইনারের দুলুনি ঠেকাতে পারল না—ওটা সোজা গিয়ে টাগের ব্রিজে লাগল। এর ফলে নরম একটা ভেজা আওয়াজ হলো। কন্টেইনার মার্ভেলের দিকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল আসকার আলী খান নামে যে লোকটা ছিল, সে এখন টাগের ব্রিজের সঙ্গে মিশে থাকা লাল মাংসের কিমা!

উইঞ্চম্যান ষাট টনের কন্টেইনার সহজেই মার্ভেলের ডেকে নামিয়ে আনল।

কাশেম ও জলিল সরাসরি অপারেশন্স সেন্টারে চলে এল। কাশেমের হাতে একটা সোনার বার। হাত তুলে দেখাল সবাইকে।

সোহেল সবার উদ্দেশে বলল, 'ওরা কন্টেইনার না খুললে আমরা জানতাম না ভিতরে কী আছে।'

চকচকে সোনালী বারটা সবাই দেখছে। রানা বলল, 'এবার আমরা রওনা হব।'

এগারো

ফ্রেডারিখ বাউয়ারের ব্যাঙ্ক থেকে ফিরে এখন বুঝতে পারছে রানা, আসলে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান ওকে আগামী পনেরো দিন ছুটি দিয়েছেন, তারপর অফিসে ফিরতে হবে। সোহেলের কপাল অত ভাল নয়, সাত দিন পর অফিসে যোগ দিতে হবে ওকে।

আজ বিকেলের ফ্লাইটেই অনিল, গগল, উর্বশী, ফু-চুং, আতাসী—ওরা সবাই রওনা হয়ে গেছে লণ্ডনের পথে। সেখান থেকে ফিরে যাবে দেশে। কয়েকটা দিনের জন্য ধরে নিয়ে গেছে ডা. ফারা সোহেলকে দক্ষিণ হল্যাণ্ডে, নিজের দেশে। মার্ভেলের সমস্ত ক্রু স্বদেশে ফিরেছে, শুধু যায়নি একজন—সে অবশ্য ক্রু নয়।

হোটেল কক্ষের নীল দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আছে রানা, ফিরে গেছে কয়েক দিন আগের ঘটনায়।

ওরা যখন ক্রুজ লাইনারটা সৈকত থেকে সাগরে নামিয়ে আনল, তখন কিছু তীক্ষ্ণ পাথর জাহাজের খোল কেটে দিয়েছিল। ওরা জাহাজটা টো করে উত্তর-পুব কামচাটকা উপকূলে গিয়ে ভেড়ে। জায়গাটা ছিল মাত্র বিশ মাইল দূরে, ওখানে ওরা একটা অগভীর ইনলেট-এ জাহাজটা ডুবতে দিয়েছে। মানুষগুলো সৈকতে অপেক্ষা করেছে। মার্ভেল থেকে বাড়তি খাবার ও ওষুধ নামিয়ে দেয়া হয়েছে। ডক্টর ফারা ওর গ্রুপ নিয়ে ওখানে নেমে গিয়েছিল। চিকিৎসার জন্য চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিয়েছে রানা। তারপর মার্ভেল আবারও দক্ষিণে রওনা হয়েছে।

অত্যাচারিত মানুষগুলো যে-সৈকতকে মৃত্যু-সৈকত বলত, তার দেড়শো মাইল দক্ষিণে দ্বিতীয় টাগ-বোট ও দ্য চুহিকে খুঁজে পেয়েছে মার্ভেল। ঝড়ের মধ্যে জাহাজগুলো বেশি দূরে যেতে পারেনি। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সতর্ক না করেই মার্ভেল দ্য চুহির পেটে একটা টর্পেডো গেঁথে দিয়েছে। টাগের স্টার্নপোস্ট রেইডার উড়ে গেছে চল্লিশ এমএম কামানের গোলায়।

এরপর রানা রাশান কোস্ট-গার্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। ছয়টি স্যাটালাইট ঘুরিয়ে রেডিয়ো রিলে করায় ওদের অবস্থান হারিয়ে গেছে। ও জানিয়ে দিয়েছিল কয়েকটা জাহাজ সি অভ ওখোটস্ক-এ বিপদে পড়েছে। সঙ্গে নতুন বসতির জিপিএস কোঅর্ডিনেট দিয়েছে। অনেক দেশের মানুষ ওখানে আটকা পড়েছে শুনেও অপারেটর পাত্তা দিচ্ছিল না, কিন্তু পরে যখন শুনল একটা টাগ-বোট বেআইনীয় ভাবে রাশার খনি থেকে সোনা তুলে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, রাশানরা ব্যস্ত হয়ে উঠল।

পরদিন দুনিয়া জানল হাজারো মানুষ কীভাবে উদ্ধার পেয়েছে, আরেকটু

হলে সবাই কী ভাবে মারা পড়ত। বিজ্ঞানীরা জানাল গত এক দশকে এশিয়ায় এরকম বিশাল অগ্ন্যুৎপাত ঘটেনি। সেদিনই মার্ভেল ধুঁকতে ধুঁকতে ভ্লাদিভোস্টক বন্দরে ভিড়ল। দিনের প্রথম কাজ হিসেবে রানা রাশান মার্সেনারিদের কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিল। এরপর রানা বিসিআই-এর চিফের সঙ্গে যোগাযোগ করল, যা ঘটেছে বিস্তারিত জানাল তাঁকে। বুড়োর মুখে কোনও প্রশংসা ছিল না, তবে মনে হলো খুশি হয়েছেন।

পরে রানা ফোনে চ্যাঞ্জো পাপাগোপালার সঙ্গে কথা বলেছে। দু'ঘণ্টার মধ্যে দ্য মার্ভেল অভ গ্রিসকে ড্রাই-ডকে তোলা হয়েছে। পরদিন ওটার আসল ক্রুরা চলে এল।

এরপর আর সবার সঙ্গে পেদ্রোপাভলোভস্ক ফিরেছে রানা, একটা হোটেলে উঠেছে। এর চারদিন পর আবারও রাহাত খান ফোন করলেন। রানাকে জানালেন, একদল রেসকিউ কর্মী মৃত্যু-সৈকতে গিয়েছে, সেখানে এক লোককে উদ্ধার করেছে তারা। অগ্ন্যুৎপাতের সময় লোকটা একটা ক্রুজ শিপে লুকিয়ে ছিল। ঘটনাটা যখন ঘটল তখন সে ফুড লকারে নিজেকে আটকে রেখেছিল। গোটা জাহাজ পাঁচ ফুট তপ্ত ছাইয়ের নীচে পড়েছিল। লোকটার নাম ভ্লাদিমিয়ার সরোকিন, এক ভলকানোলজিস্ট। এদিকে তাকে অনেকেই চেনে। লোকটা এখন পেদ্রোপাভলোভস্ক-এর একটা হোটেলে উঠেছে। কথাগুলো জানানোর পর আর কোনও মন্তব্য করেননি রাহাত খান, ফোন রেখে দিয়েছেন।

রানা নিজে ভ্লাদিমিয়ার সরোকিনকে ধরতে পারত, কিন্তু ভেবে দেখেছে, খবরটা ফু-চুঙের জানা দরকার। কথাটা ও পাড়তেই ফু-চুং রওনা হয়ে গেছে। ওর সঙ্গে সোহেলও।

ওরা দু'জন সন্ধ্যার পর ফিরেছে, এক লোকের নাম-ধাম শুনে এসেছে। লোকটার নাম ফ্রেডারিখ বাউয়ার। এক ব্যাঙ্কার। সে-ই সরোকিনের সোনাগুলো ফেন্স করত।

ফু-চুং ও সোহেল ওর ঘরে এসে বসবার পর রানা জানতে চেয়েছে, 'কী ভাবে কী করলি তোরা?'

'খুব সাধারণ ভাবে,' বলেছে ফু-চুং। 'প্রথমে আমরা দরজা খুলে ওর ঘরে ঢুকলাম, জানালাম আমি ওর দাস-ক্যাম্পের বিনা বেতনের একজন ক্রীতদাস। আত্মা চমকে গেল ব্যাটার। কিডন্যাপ করে এয়ারপোর্টে নিয়ে গেলাম। বললাম, ওর ব্যাপারে আমরা প্রায় সবই জানি; যা জানি না সেটুকু বললে ওকে আমরা খুন করব না।'

'তারপর?'

'বুঝে গেল, কোয়াপরেট না করলে সত্যিই প্রাণটা যাবে।'

'তখন?'

'আরেকটা কথা এখানে বলে নিই,' বলল ফু-চুং। 'রাশানরা ক্রুজ লাইনার থেকে যে তিন হাজার লোক উদ্ধার করেছে, তাদের নিয়ে বিপদে পড়ে গেছে। অত বাড়ি পাবে কোথায়? শেষে তারা এয়ারপোর্টের একটা হ্যাঙারে এক হাজার

লোক রেখেছে। সরোকিন যখন আমাদের সব প্রশ্নের জবাব দিয়ে দিল, তখন ওকে নিয়ে হ্যাঙারে গেলাম। কিছু লোক জড় হতেই জানিয়ে দিলাম তাদের জীবনে যা ঘটেছে, সেসব আসলে ওই সরোকিনের কারণে হয়েছে। কয়েকজন চিনতেও পারল ওকে। তারপর যা হয় আর কী, নিয়তি বড়ই নিষ্ঠুর।'

সোহেলের দিকে তাকিয়ে চোখ নাচাল রানা। 'আর তারপর?'

'ফু-চুং যা বলেছে, তা-ই হলো। আমরা তো কথা দিয়েছি তাকে খুন করব না। করিওনি! তারই বন্দিদের হাতে তাকে তুলে দিয়েছি। আমরা পঞ্চাশ ফুট এগোনোর আগেই সরোকিনের চিৎকার থেমে গেছে। এই আর কী?'

পরদিন সুইটযারল্যাণ্ডের পথে রওনা হয়ে গেল ওরা। সঙ্গে ছিল কয়েকটা এয়ারফ্রেইট কন্টেইনার। ওগুলো নিয়ে ফ্রেডারিখ বাউয়ারের সঙ্গে মিটিং শেষে সন্তুষ্ট হলো ওরা।

প্রথমে ফ্রেডারিখ বাউয়ার ভয় পেয়েছিল, খুন হয়ে যাবে বুঝি। যেত, কিন্তু রানা বাঁচিয়ে দিল ওকে। স্থির হলো, ষাট টন সোনা কিনে নেবে বাউয়ার, সে-টাকায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য একটা ট্রাস্ট করা হবে। এ ছাড়া যত মানুষ মারা গেছে তাদের পরিবার-পরিজনদের প্রতিটা মৃত্যুর জন্য দশ লাখ ডলার করে ক্ষতিপূরণ দেবে তার ব্যাঙ্ক। যারা বেঁচে আছে তারা প্রত্যেকে পাঁচ লাখ ডলার করে পাবে। তারপর বাউয়ার নিজের ব্যাঙ্ক বেচে দেবে, জীবনে আর কখনও ব্যাঙ্ক-ব্যবসা করবে না, কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করবে।

রানার প্রতিটি প্রস্তাব মেনে নিয়েছে বাউয়ার। জানে, ওর সব অপকর্ম যদি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ হয়ে যায়, সম্মান তো যাবেই, যাবজ্জীবন জেল খাটতে হবে তাকে। কথা ঠিক-ঠাক মত রক্ষা করা হচ্ছে কি না, সেটার তদারকি করবে স্থানীয় রানা এজেন্সি। একটু এদিক-ওদিক হলেই ফাঁস করে দেওয়া হবে সব। তারপর নিজ হাতে খুন করবে ওকে লিউ ফু-চুং।

রানার সঙ্গী-সাথীরা মেনে নিল: হারামজাদা ব্যাঙ্কার যদি এসব কথা রাখে তা হলে তার খুলির মধ্যে এখুনি একটা বুলেট ঢুকিয়ে না দিলেও চলে।

লোকটার অফিস থেকে বেরিয়ে এসে পরস্পরের সঙ্গে হাত মিলাল ওরা সবাই, তারপর বিদায় নিয়ে রওনা হয়ে গেল যে-যার পথে।

ইণ্টারকম বাজতেই টিপয় থেকে রিসিভার তুলে নিল রানা।

'আমি তৈরি,' বলল জুডি। 'তুমি আসবে, নাকি আমি?' একই হোটেলের চোদ্দো তলায় পাশাপাশি দুটো কামরায় উঠেছে ওরা। গত রাতে জুডি এসেছিল রানার কামরায় গল্প করতে, আজ রানার পালা।

দু'দিন পর ওরা বেড়াতে যাচ্ছে স্পেনের বার্সেলোনায়। তার দু'দিন পর যাবে ফ্রান্সের মার্সেই। সেখান থেকে...

কারণ, জুডিও ছুটি নিয়েছে দুই সপ্তাহের জন্য। ওর জানতে হবে, বিশাল হৃদয়ের এই অসমসাহসী, দেশপ্রেমিক যুবকটি কোন্ ধাতুতে গড়া।

'আমিই আসছি,' রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা।

দরজা খুলে যেতেই প্রথমে চমৎকার সুবাস এলো রানার নাকে, তারপর দুটো

হাত জড়িয়ে ধরে টেনে নিল ওকে কবোঞ্চ বুকে। আশ্চর্য এক দোলা অনুভব করল রানা বুকের ভিতর।

জুরিখের সেরা রেস্তোরাঁয় ডিনার করবে ওরা। তারপর ফিরে আসবে জুডির ঘরে। সারা রাত গল্প করবে ওরা। ভালবাসবে।

লবি থেকে বেরিয়ে গেল ওরা হাসতে হাসতে।

***

www.downloadpdfbook.com

মাসুদ রানা
দুইখণ্ড একত্রে

স্বর্ণ-বিপর্যয়

কাজী আনোয়ার হোসেন

মিনিস্ট্রি অভ লেবার অ্যাণ্ড ম্যান পাওয়ার থেকে জানানো হলো, বিদেশে গিয়ে সাড়ে চার হাজার বাঙালি হারিয়ে গেছে। খোঁজ-খবর নিতে গিয়ে খুন হয়ে গেছে কয়েকজন তদন্ত-অফিসার। শুধু বাংলাদেশই নয়, ভারত-বার্মা থেকে শুরু করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার থাইল্যাণ্ড-মালয়েশিয়া-লাওস-কম্বোডিয়া-ভিয়েতনাম-ফিলিপাইন, এমনকী খোদ চিন থেকেও হারিয়ে গেছে প্রচুর লোক বিদেশে ভাগ্য গড়তে গিয়ে। যারা এ-কাজ করছে, তাদের বিরাট নেটওঅর্ক রয়েছে। ওদের মোকাবিলা করতে হলে ক্ষতিগ্রস্ত সবকটি দেশকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। কয়েকটি রাষ্ট্রের সুপার-স্পাইদের নিয়ে একটা টিম গঠন করা হলো—নেতৃত্বে থাকল মাসুদ রানা। কাজে নামল রানা-সোহেল, ফু-চুং-অনিল-উর্বশী-আতাসী ও আরও কয়েকজন। শুরু হলো ওদের রুদ্ধশ্বাস অবিশ্বাস্য কাহিনি।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

নিত্য নতুন ইবুকের জন্য

সবসময় ভিজিট করুন

www.DOWNLOADPDFBOOK.com

STOP

বিনা অনুমতিতে

সরাসরি ডাউনলোড লিঙ্ক

শেয়ার না করার অনুরোধ রইল